আজকের জাতিসংঘ

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা, বাংলাদেশ

আজকের জাতিসংঘ

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র

আজকের জাতিসংঘ

প্রকাশক
জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র
আইডিবি ভবন
শের-ই-বাংলানগর
ঢাকা, বাংলাদেশ

সম্পাদনায়
মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান

সম্পাদনা উপদেষ্টা
অধ্যাপক ড. দেলোয়ার হোসেন

Basic Facts About the United Nations
ISBN 978-92-1-101279-8

Bangla translation by the United Nations Information Centre
IDB Bhaban, Sher-e-Banglanagar
Dhaka, Bangladesh

Edited by Mohammad Moniruzzaman
Editorial Advice by Prof. Dr. Delwar Hossain

unic/pub/2017/01-1000

Published in October 2017

প্রকাশকাল : অক্টোবর ২০১৭

Printed by
Shahitya Prakash
87 Purana Paltan Line
Dhaka 1000

ভূমিকা

জাতিসংঘের ইতিহাস, গঠন-কাঠামো, উন্নয়ন এবং উদ্ভূত বিভিন্ন পরিস্থিতির চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় গৃহীত পদক্ষেপগুলো সমগ্র বিশ্বের জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে ১৯৪৭ সাল থেকে 'Basic Facts about the United Nations' নামে একটি প্রকাশনা জাতিসংঘ সচিবালয়ের জন তথ্য বিভাগ (ডিপিআই) কর্তৃক নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়ে আসছে। বাংলাদেশের সাধারণ জনগণের কাছে এই প্রকাশনাটি সহজতরভাবে উপস্থাপনের লক্ষ্যে ঢাকাস্থ জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র এটি বাংলায় অনুবাদ করে 'আজকের জাতিসংঘ' নামে প্রকাশ করে আসছে।

বইটিতে জাতিসংঘ সংস্থাসমূহের গঠন, কর্মপদ্ধতি, বিশ্বের জনগণকে সেবা প্রদান ইত্যাদি বিষয়গুলো সন্নিবেশিত হয়েছে। এছাড়া জাতিসংঘের মৌলিক বিষয়সমূহ যেমন, আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন, মানবাধিকার, মানবিক কার্যক্রম, আন্তর্জাতিক আইন এবং ঔপনিবেশিকতামোচন ইত্যাদি বিষয়গুলোকে এই সংস্করণে অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে।

বাংলাদেশে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাগুলোর (এসডিজি) বাস্তবায়ন এবং অন্যান্য গবেষণা কাজেও এই বইটি সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করা যায়।

বাংলা ভাষায় জাতিসংঘকে এই প্রকাশনাটির মাধ্যমে বাংলাদেশী ও বহির্বিশ্বের বাংলা ভাষা-ভাষীদের কাছে তুলে ধরার জন্য আমি ঢাকাস্থ জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

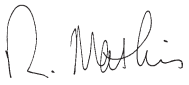

রবার্ট ডি ওয়াটকিনস
বাংলাদেশে জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারী

সেপ্টেম্বর ২০১৭

মুখবন্ধ

১৯৪৭ সাল থেকে আজকের জাতিসংঘ *Basic Facts about the United Nations* সংকলনটি জাতিসংঘের একটি বিশ্বস্ত দিক-নির্দেশনামূলক পাঠ্য হিসেবে ভূমিকা পালন করে আসছে; জাতিসংঘের পুরো ইতিহাস, এর গঠন-কাঠামো এবং বর্তমান সময়ের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপগুলো জানতে এই নতুন সংস্করণটি সহায়ক হবে।

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই জাতিসংঘ শান্তিপূর্ণভাবে আন্তর্জাতিক বিরোধ সমাধানে ও সশস্ত্র সংঘাতের ধ্বংসলীলা এড়াতে এর সদস্য দেশগুলোর ওপর চাপ অব্যাহত রেখে আসছে। একইভাবে বিশ্ব শান্তি রক্ষায় জাতিসংঘ দারিদ্র নিরসন, মানবাধিকার রক্ষা, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ও পরিবেশ সংরক্ষণে অনুপ্রেরণা দেয়। এই বৈশ্বিক সমস্যাগুলো প্রতিরোধে আমাদের শুধুমাত্র কোনো নির্দিষ্ট দেশের নয় বরং একজন বিশ্ব নাগরিক হিসেবে কাজ করতে দায়বদ্ধ করে।

নতুন এই সংস্করণটিতে শান্তি এবং নিরাপত্তার যে চ্যালেঞ্জগুলো গুরুত্ব পেয়েছে তা আন্তর্জাতিক সহযোগিতার প্রয়োজনকেই তুলে ধরে। সিরিয়ার গৃহযুদ্ধ ব্যাপক অভিবাসন ও আঞ্চলিক অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করেছে। জাতিসংঘের নতুন ১৯৩তম সদস্য দক্ষিণ সুদানে দীর্ঘস্থায়ী নিরাপত্তা ও উন্নয়ন সংকট সেখানে নতুন শান্তিরক্ষা কার্যক্রম শুরুর প্রয়োজনীয়তা সৃষ্টি করেছে। মালি এবং সুদানের আবেই অঞ্চলেও জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। কঙ্গো গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র একটি নতুন কাঠামোগত চুক্তিতে উপনীত হতে জাতিসংঘ মধ্যস্থতা করেছে, যা ছিল দীর্ঘদিনের সহিংসতা বন্ধে একটি স্থানীয় উদ্যোগ। শান্তিরক্ষার নব উদ্যেগের পাশাপাশি শুরুতেই সংঘাত এড়াতে জাতিসংঘ নিবৃত্তিমূলক কূটনীতি, মধ্যস্থতা ও অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণে সদা নিয়োজিত।

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার **(Millenium Development Goals–MDGs)** প্রতি সংস্থাটির প্রতিশ্রুতি, সংশ্লিষ্টতা ও কর্মসূচি অতি দরিদ্রতা হ্রাসে, পানীয় জলের প্রাপ্যতা ও লাখো বস্তিবাসীর জীবনমান উন্নয়নে বিশ্বব্যাপী কর্মকাণ্ডকে ব্যাপকভাবে সহায়তা করেছে। যখন আমরা কর্মসূচি সম্পন্ন করছি ও সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার সফলতাকে ভিত্তি করে অগ্রসরমান, তখন আমরা ২০১৫ সাল-পরবর্তী উন্নয়ন এজেন্ডাগুলো নির্ধারণ করার কাজটিও করছি। চলমান টেকসই উন্নয়নের নিমিত্তে একগুচ্ছ নতুন লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করার এই আলোচনা ২০১৫ সালে চূড়ান্ত হবে। ওই একই বছর জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে আইনগত বাধ্যবাধকতাসহ একটি চুক্তিতে পৌঁছতে সদস্য রাষ্ট্রগুলো প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

২০১১ সালে এই বিশ্ব মানব পরিবারের মোট জনসংখ্যা ৭০০ কোটির মাইলফলক স্পর্শ করেছে। আত্মনির্ভরশীল এই বিশ্বে মানুষ ও রাষ্ট্র উভয়েরই এমন একটি কার্যকর প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন রয়েছে, যেটি সর্বজনীন মূল্যবোধ রক্ষায়, পারস্পরিক ঝুঁকি মোকাবিলায় ও সামগ্রিক সুযোগ গ্রহণে সহায়তা করতে পারে। বিশ্বব্যাপী জনগণের সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের জন্য জাতিসংঘের ভূমিকা ও কর্মকাণ্ড আজকের জাতিসংঘ বইটি থেকে জানা যায়। আমার জানা মতে, এই মূল্যবান বইটিই আমাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সবচেয়ে ভালো ধারণা দিতে পারে।

Ki Moon Ban

বান কি মুন
জাতিসংঘ মহাসচিব

নিউইয়র্ক, ২৭ আগস্ট ২০১৩

সূচিপত্র

জাতিসংঘ আবাসিক সমন্বয়কারীর বক্তব্য iii
মুখবন্ধ v
সূচিপত্র vii
শব্দ সংক্ষেপ xiii
আজকের জাতিসংঘের এই সংস্করণ সম্পর্কে xv
জাতিসংঘের সিস্টেম চার্ট xviii

অধ্যায় : ১. জাতিসংঘ সনদ, গঠন ও পদ্ধতি

জাতিসংঘ সনদ ৪
লক্ষ্য ও নীতিমালা ৫
জাতিসংঘ সনদের সংশোধন ৫
সদস্যপদ ও দাপ্তরিক ভাষাগুলো ৬
জাতিসংঘের কাঠামো ৬
সাধারণ পরিষদ ৬
কার্যক্রম ও ক্ষমতা ৬
অধিবেশনসমূহ ৭
নিরাপত্তা পরিষদ ৮
কার্যাবলি ও ক্ষমতা ৯
ট্রাইব্যুনাল ও আদালত ১০
অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ ১৩
কার্যক্রম ও ক্ষমতা ১৩
অধিবেশন ও অঙ্গ সংগঠনসমূহ ১৪
আঞ্চলিক কমিশন ১৪
বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে সম্পর্ক ১৭
আন্তর্জাতিক বিচার আদালত ১৭
উদ্দেশ্য ১৭
বিচারিক এখতিয়ার ১৮
বিচারকগণ ১৮
বাজেট ১৮
অছি পরিষদ ১৯
সচিবালয় ১৯
মহাসচিব ২০
বিভাগ ও দপ্তর ২৩
জাতিসংঘের বাজেট ৩০
জাতিসংঘ সিস্টেম ৩২
জাতিসংঘ কর্মসূচি, তহবিল, গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য সংস্থা ৩৪
জাতিসংঘ বাণিজ্য ও উন্নয়ন সম্মেলন (UNCTAD) ৩৪
আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কেন্দ্র (ITC) ৩৫

জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (UNDP) ৩৫
জাতিসংঘ স্বেচ্ছাসেবক দল (UNV) ৩৬
জাতিসংঘ মূলধন উন্নয়ন তহবিল (UNCDF) ৩৬
জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি (UNEP) ৩৭
জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল (UNFPA) ৩৭
জাতিসংঘ জনবসতি কর্মসূচি (UN-HABITAT) ৩৮
জাতিসংঘ শরণার্থী বিষয়ক হাইকমিশনারের অফিস (UNHCR) ৩৯
জাতিসংঘ শিশু তহবিল (UNICEF) ৩৯
জাতিসংঘ মাদক ও অপরাধ বিষয়ক দপ্তর (UNODC) ৪০
নিকটপ্রাচ্যে প্যালেস্টাইনি শরণার্থীদের জন্য জাতিসংঘ
ত্রাণ ও পূর্ত সংস্থা (UNRWA) ৪১
বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (WFP) ৪২
জাতিসংঘ আন্তঃআঞ্চলিক অপরাধ ও বিচার গবেষণা ইনস্টিটিউট (UNICRI) ৪২
জাতিসংঘ নিরস্ত্রীকরণ গবেষণা ইনস্টিটিউট (UNIDIR) ৪৩
জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস কৌশল (UNISDR) ৪৩
জাতিসংঘ প্রশিক্ষণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (UNITAR) ৪৪
জাতিসংঘ সামাজিক উন্নয়ন গবেষণা ইনস্টিটিউট (UNRISD) ৪৪
জাতিসংঘ বিশ্ববিদ্যালয় (UNU) ৪৫
এইচআইভি/এইডসের জাতিসংঘ যুগ্ম কর্মসূচি (UNAIDS) ৪৫
জাতিসংঘ প্রকল্প সেবা কার্যালয় (UNOPS) ৪৬
জাতিসংঘ লিঙ্গ সমতা ও নারী ক্ষমতায়ন সত্তা (UN-WOMEN) ৪৬
বিশেষায়িত সংস্থাগুলো এবং সংশ্লিষ্ট সংগঠন ৪৭
আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO) ৪৭
জাতিসংঘ খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) ৪৮
জাতিসংঘ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা (UNESCO) ৪৮
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) ৪৯
বিশ্ব ব্যাংক গ্রুপ (World Bank Group) ৪৯
আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF) ৫২
আন্তর্জাতিক বেসামরিক বিমান চলাচল সংস্থা (ICAO) ৫২
আন্তর্জাতিক সমুদ্র চলাচল সংস্থা (IMO) ৫৩
আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়ন (ITU) ৫৩
বিশ্ব ডাক ইউনিয়ন (UPU) ৫৪
বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা (WMO) ৫৪
জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক আন্তঃসরকার প্যানেল (IPCC) ৫৫
বিশ্ব বুদ্ধিবৃত্তি সম্পদ সংস্থা (WIPO) ৫৫
কৃষি উন্নয়ন বিষয়ক আন্তর্জাতিক তহবিল (IFAD) ৫৬
জাতিসংঘ শিল্প উন্নয়ন সংস্থা (UNIDO) ৫৭
বিশ্ব পর্যটন সংস্থা (WTO) ৫৭
সার্বিক পারমাণবিক পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণ চুক্তি সংস্থার প্রস্তুতি কমিশন (CTBTO) ৫৮
আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থা (IAEA) ৫৯
রাসায়নিক অস্ত্র নিষিদ্ধকরণ সংস্থা (OPCW) ৫৯
বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO) ৬০

অধ্যায় : ২. আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা

নিরাপত্তা পরিষদ ৬৪
সাধারণ পরিষদ ৬৫
সংঘাত প্রতিরোধ ৬৫
শান্তি রক্ষা ৬৬
প্রয়োগ ৭০
নিষেধাজ্ঞা ৭০
সামরিক হস্তক্ষেপ অনুমোদন ৭১
শান্তি স্থাপন ৭২
শান্তি স্থাপনের কাঠামো ৭২
নির্বাচনকালীন সহায়তা ৭৪
উন্নয়নের মাধ্যমে শান্তি স্থাপন ৭৫
শান্তির লক্ষ্যে কার্যক্রম ৭৫
আফ্রিকা ৭৫
গ্রেট লেক এলাকা ৭৫
পশ্চিম আফ্রিকা ৭৮
মধ্য ও পূর্ব আফ্রিকা ৮৫
আমেরিকা অঞ্চল ৯২
এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগর ৯৩
মধ্যপ্রাচ্য ৯৩
আফগানিস্তান ৯৯
ইরাক ১০১
ভারত-পাকিস্তান ১০৩
মধ্য এশিয়া ১০৪
কম্বোডিয়া ১০৫
মিয়ানমার ১০৫
তিমুর-লেস্তে ১০৭
ইউরোপ ১০৭
সাইপ্রাস ১০৭
বলকান অঞ্চল ১০৯
নিরস্ত্রীকরণ ১১১
নিরস্ত্রীকরণ কাঠামো ১১১
বহুপক্ষীয় নিরস্ত্রীকরণ ও অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ চুক্তিগুলো ১১২
গণবিধ্বংসী অস্ত্র ১১৪
পারমাণবিক অস্ত্র বিস্তার রোধ ১১৬
রাসায়নিক ও জীবাণু অস্ত্র ১১৭
প্রচলিত অস্ত্র, আস্থা তৈরি ও স্বচ্ছতা ১১৭
মহাকাশের শান্তিপূর্ণ ব্যবহার ১২২
আইনগত বিধান ১২২
মহাকাশ বিষয়ক দপ্তর ১২৪
উপনিবেশবাদের অবসান ১২৫

আন্তর্জাতিক অছি সিস্টেম ১২৬
অস্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল ১২৬
ঔপনিবেশিক দেশ ও মানুষের স্বাধীনতার ঘোষণা ১২৭
নামিবিয়া ১২৯
তিমুর-লেস্তে ১৩০
পশ্চিম সাহারা ১৩১

অধ্যায় : ৩. অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন

উন্নয়ন কার্যক্রমে সমন্বয় সাধন ১৩৮
অর্থনৈতিক উন্নয়ন ১৪০
দাপ্তরিক উন্নয়ন সহায়তা ১৪০
বিশ্বব্যাপী উন্নয়ন প্রসার ১৪১
উন্নয়নের জন্য ঋণ ১৪৩
স্থিতিশীলতার জন্য ঋণ ১৪৫
বিনিয়োগ ও উন্নয়ন ১৪৬
বাণিজ্য এবং উন্নয়ন ১৪৭
কৃষি উন্নয়ন ১৪৯
শিল্প উন্নয়ন ১৫০
শ্রম ১৫১
আন্তর্জাতিক বেসামরিক বিমান চলাচল ১৫২
আন্তর্জাতিক নৌ পরিবহন ১৫৪
টেলিযোগাযোগ ১৫৬
আন্তর্জাতিক ডাক ব্যবস্থা ১৫৭
মেধাস্বত্ব ১৫৮
বৈশ্বিক পরিসংখ্যান ১৫৯
লোক প্রশাসন ১৬০
উন্নয়নের জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ১৬০
সামাজিক উন্নয়ন ১৬১
সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ১৬২
সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে অগ্রগতি ১৬৩
দারিদ্র্য নিরসন ১৬৬
ক্ষুধার বিরুদ্ধে সংগ্রাম ১৬৬
স্বাস্থ্য ১৬৯
মানব বসতি ১৭৪
শিক্ষা ১৭৫
গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ১৭৭
জনসংখ্যা ও উন্নয়ন ১৭৯
লিঙ্গ-সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন ১৮১
শিশুর অধিকার ও কল্যাণ প্রসার ১৮২
সামাজিক সংহতি ১৮৩
পরিবার ১৮৪

যুব সমাজ ১৮৪
প্রবীণ ব্যক্তি ১৮৫
আদিবাসী বিষয়াবলি ১৮৬
প্রতিবন্ধী ১৮৭
অসুশীল সমাজ : অপরাধ, নিষিদ্ধ মাদক এবং সন্ত্রাস ১৮৮
মাদক নিয়ন্ত্রণ ১৮৮
অপরাধ প্রতিরোধ ১৯০
বিজ্ঞান, সংস্কৃতি এবং যোগাযোগ ১৯২
প্রাকৃতিক, সামাজিক এবং মানবিক বিজ্ঞান ১৯২
সংস্কৃতি এবং উন্নয়ন ১৯২
সভ্যতার জোট ১৯৩
শান্তি ও উন্নয়নের উদ্দেশে খেলাধুলা ১৯৩
যোগাযোগ এবং তথ্য ১৯৪
টেকসই উন্নয়ন ১৯৪
এজেন্ডা ২১ ১৯৫
টেকসই উন্নয়ন বিষয়ক বিশ্ব সম্মেলন ১৯৬
টেকসই উন্নয়ন বিষয়ক জাতিসংঘ সম্মেলন ১৯৬
টেকসই উন্নয়নে অর্থায়ন ১৯৭
পরিবেশের জন্য উদ্যোগ ১৯৭
জলবায়ু পরিবর্তন ও বৈশ্বিক উষ্ণতা ১৯৮
ওজোন শূন্যকরণ ২০০
ক্ষুদ্র দ্বীপ রাষ্ট্র ২০১
টেকসই বনাঞ্চল ব্যবস্থাপনা ২০১
মরুকরণ ২০২
জীববৈচিত্র্য, দূষণ ও অতিরিক্ত মৎস্য শিকার ২০৩
সামুদ্রিক পরিবেশ রক্ষা ২০৪
আবহাওয়া, জলবায়ু এবং পানি ২০৬
প্রাকৃতিক সম্পদ ও শক্তি ২০৭
পরমাণু নিরাপত্তা ২০৭

অধ্যায় : ৪. মানবাধিকার

মানবাধিকার সংক্রান্ত দলিলাদি ২১৩
মানবাধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক বিল ২১৪
অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার ২১৫
নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার ২১৬
অন্যান্য চুক্তিপত্র ২১৬
অন্যান্য মানদণ্ড ২১৯
মানবাধিকার প্রক্রিয়া ২২০
মানবাধিকার কাউন্সিল ২২০
জাতিসংঘ মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনার ২২১
বিশেষ র‍্যাপোটিয়ার ও ওয়ার্কিং গ্রুপ ২২২

মানবাধিকার প্রচার এবং সুরক্ষা ২২৩
উন্নয়ন অধিকার ২২৫
জাতিসংঘ খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) ২২৫
শ্রম অধিকার ২২৬
বৈষম্য দমনে সংগ্রাম ২২৭
বর্ণ বৈষম্য ২২৭
বর্ণবাদ ২২৮
নারী অধিকার ২২৯
শিশু অধিকার ২৩০
সংখ্যালঘুদের অধিকার ২৩২
আদিবাসী জনগোষ্ঠী ২৩২
প্রতিবন্ধী মানুষ ২৩৪
অভিবাসী শ্রমজীবী ২৩৫
বিচার প্রশাসন ২৩৬
জাতিসংঘ মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনারের দপ্তর-অগ্রাধিকার ২৩৭

অধ্যায় : ৫. মানবাধিকার কর্মসূচি

মানবিক কার্যক্রম সমন্বয় ২৪২
মানবিক সহায়তা ও সুরক্ষা ২৪৪
মানবকল্যাণ কর্মীদের সুরক্ষা ২৪৬
শরণার্থী সহায়তা ও সুরক্ষা ২৪৭
ফিলিস্তিনি শরণার্থী ২৪৯

অধ্যায় : ৬. আন্তর্জাতিক আইন

বিরোধের বিচারিক নিষ্পত্তি ২৫৩
প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক মামলা ২৫৪
আন্তর্জাতিক আদালতের সাম্প্রতিক মামলাগুলো ২৫৫
উপদেষ্টা মতামত ২৫৬
আন্তর্জাতিক আইনের বিকাশ ও সংকলন ২৫৬
আন্তর্জাতিক বাণিজ্য আইন ২৫৮
পরিবেশ আইন ২৫৮
সমুদ্র আইন ২৬০
কনভেনশনের প্রভাব ২৬১
কনভেনশনের অধীনে প্রতিষ্ঠিত সংস্থাগুলো ২৬২
রাষ্ট্রপক্ষগুলোর বৈঠক ও সাধারণ পরিষদের কর্মপ্রক্রিয়া ২৬৩
আন্তর্জাতিক মানবিক আইন ২৬৩
আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ ২৬৪
আন্তর্জাতিক অপরাধবিষয়ক আদালত ২৬৬
অন্যান্য আইন সংক্রান্ত বিষয় ২৬৭
পরিশিষ্ট ২৬৯
জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রসমূহের তালিকা ২৭১

শব্দ সংক্ষেপ : ACRONYMS

CTBTO	Preparatory Commission for the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization
DESA	Department of Economic and Social Affairs
DFS	Department of Field Support
DGACM	Department for General Assembly and Conference Management
DM	Department of Management
DPA	Department of Political Affairs
DPI	Department of Public Information
DPKO	Department of Peacekeeping Operations
DSS	Department of Safety and Security
ECA	Economic Commission for Africa
ECE	Economic Commission for Europe
ECLAC	Economic Commission for Latin America and the Caribbean
ECOSOC	Economic and Social Council
ESCAP	Economic and Social Commission for Asia and the Pacific
ESCWA	Economic and Social Commission for Western Asia
FAO	Food and Agriculture Organization
IAEA	International Atomic Energy Agency
IASC	Inter-Agency Standing Committee
IBRD	International Bank for Reconstruction and Development
ICAO	International Civil Aviation Organization
ICSID	International Centre for Settlement of Investment Disputes
IDA	International Development Association
IDPs	Internally Displaced Persons
IFAD	International Fund for Agricultural Development
IFC	International Finance Corporation
ILO	International Labour Organization
IMF	International Monetary Fund
IMO	International Maritime Organization
IPCC	Intergovernmental Panel on Climate Change
ITC	International Trade Centre
ITU	International Telecommunication Union
MDGs	Millennium Development Goals
MIGA	Multilateral Investment Guarantee Agency
NEPAD	New Partnership for Africa's Development

NGOs	Non Governmental Organizations
OCHA	Office for the Coordination of Humanitarian Affairs
OHCHR	Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
OIOS	Office of Internal Oversight Services
OIA	Office of Legal Affairs
OPCW	Organization for the Prohibition of Chemical Weapons
UNAIDS	Joint United Nations Programme on HIV/AIDS
UNCDF	United Nations Capital Development Fund
UNCTAD	United Nations Conference on Trade and Development
UNDP	United Nations Development Programme
UNEP	United Nations Environment Programme
UNESCO	United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
UNFPA	United Nations Population Fund
UN-HABITAT	United Nations Human Settlements Programme
UNHCR	Office of the United Nations High Commissioner for Refugees
UNICEF	United Nations Children's Fund
UNICRI	United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute
UNIDIR	United Nations Institute for Disarmament Research
UNIDO	United Nations Industrial Development Organization
UNITAR	United Nations Institute for Training and Research
UNODA	United Nations Office for Disarmament Affairs
UNODC	United Nations Office on Drugs and Crime
UN-OHRLLS	Office of the High Representative for the Least Developed Countries, Landlocked Developing Countries and Small Island Developing States
UNOPS	United Nations Office for Project Services
UNRISD	United Nations Research Institute for Social Development
UNRWA	United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East
UNSSC	United Nations System Staff College
UNU	United Nations University
UNV	United Nations Volunteers
UN-Women	United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
UNWTO	World Tourism Organization
UPU	Universal Postal Union
WFP	World Food Programme
WIPO	World Intellectual Property Organization
WMO	World Meteorological Organization
WTO	World Trade Organization

আজকের জাতিসংঘের এই সংস্করণ সম্পর্কে

আজকের জাতিসংঘ *(Basic Facts about the United Nations)* বইটি ১৯৪৭ সাল থেকে জাতিসংঘ এবং জাতিসংঘ সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার মৌলিক তথ্যাদি নিয়ে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। যেহেতু জাতিসংঘ আরও জনবহুল এবং জটিল বিশ্বের জরুরি চাহিদা পূরণের অঙ্গীকার বিস্তৃত করেছে, তাই বইটির পরিধি ও কলেবরও বেড়েছে। একই সাথে বইটি এর মূল বিষয়ের ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ও যত্নশীল থেকেছে বিধায় সংক্ষিপ্ত অথচ সমন্বিত তথ্যবহুল এই বইটি জাতিসংঘের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিশ্ব সংস্থার পথপ্রদর্শক হিসেবে বিবেচিত। বইটি এর অতীত ঐতিহ্য অব্যাহত রেখে ২০১৪ সালের এই সংস্করণে জাতিসংঘের বর্তমান কাঠামোর রূপরেখা প্রদান এবং এর প্রতিটি অঙ্গসংগঠন কীভাবে আন্তর্জাতিক লক্ষ্য অর্জনে অবদান রাখছে তা ব্যাখ্যা করেছে।

আজকের জাতিসংঘ বইটি জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠার বর্ণনা দিয়ে শুরু হয়েছে এবং পরবর্তীকালে জাতিসংঘের বৃহত্তর গঠনতন্ত্রের প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাগুলো সম্পর্কে ধারণা প্রদান করেছে। পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে ধারাবাহিকভাবে, আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বিধানে সংস্থাটির প্রচেষ্টা, পরিবেশবান্ধব ও টেকসই পদ্ধতিতে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন, মানবাধিকার রক্ষা ও বৈষম্য দূরীকরণ, বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠী এবং প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট দুর্যোগের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারবর্গকে মানবিক ত্রাণ প্রদান এবং আন্তর্জাতিক আইন প্রস্তুত ও সঙ্গতিপূর্ণকরণ ইত্যাদির বর্ণনা দেয়া আছে। জাতিসংঘ নামের এই প্রতিষ্ঠানটি কীভাবে বিশ্বের নানা ধরনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার জন্য সমষ্টিগত কর্মকাণ্ডকে একত্রিত করার অনন্য সক্ষমতা রাখে তা এই অধ্যায়গুলোতে বলা হয়েছে।

এই বইতে জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করার সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়া, বর্তমান এবং পূর্ববর্তী শান্তিরক্ষা মিশন, জাতিসংঘের উন্নয়ন দশক পালন ইত্যাদির উপরে তথ্য দেয়া আছে, যা একটি প্রয়োজনীয় সহায়িকা বইতে থাকে। জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র, বিভিন্ন সেবা দপ্তর, দাপ্তরিক ওয়েবসাইট ইত্যাদির তথ্য-উপাত্ত ও এই সংস্করণে সন্নিবেশিত আছে। বিশ্বব্যাপী ও জাতিসংঘ সংশ্লিষ্ট সাম্প্রতিক সংঘটিত খবরাখবর এই সংস্করণে হালনাগাদরূপে বিশদভাবে সংযোজিত হয়েছে। ছবির মাধ্যমে দেখানো হয়েছে কীভাবে জাতিসংঘের বিভিন্ন অঙ্গ সংস্থা, স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলো এবং জনগণের সাথে জীবন ও জীবিকা উন্নয়নে এক সাথে কাজ করে যাচ্ছে। এই বইটি আজকের জাতিসংঘের অধিক গতিশীল ও কার্যকর চিত্র আমাদের কাছে তুলে ধরেছে। নতুন ও চলমান শান্তি রক্ষা ও শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্পর্কিত বিষয় এখানে আলোচনা করা হয়; কিন্তু যেসব দেশ ও এলাকায় নিরাপত্তার প্রয়োজন শেষ সেসব বিষয়ে আর আলোচনা করা হয়নি। অনুরূপভাবে, জাতিসংঘের পূর্ববর্তী কর্মসূচি এবং সম্মেলনগুলোর তথ্য বাদ দিয়ে নতুন সত্তাগুলো; যেমন—ইউএন উইমেন এবং জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন বিষয়ক সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলো (রিও+২০) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই সংস্করণে জাতিসংঘের প্রধান অঙ্গ হিসেবে অছি পরিষদ কর্তৃক যেসব কার্যক্রম নেয়া হয়েছিল (যা পরবর্তীকালে স্থগিত হয়) তা শান্তি ও নিরাপত্তা অধ্যায়ে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

আনুষ্ঠানিকভাবে জাতিসংঘের জন তথ্য বিভাগ (ডিপিআই) দ্বারা প্রকাশিত হলেও Basic Facts about the United Nations বইটিতে জাতিসংঘের বিভিন্ন দপ্তর, কর্মসূচি, বিভিন্ন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তাদের এই তথ্য সরবরাহের জন্যই বিভিন্ন গবেষক, ছাত্র এবং সাধারণ জনগণ মুক্তভাবে জাতিসংঘের মৌলিক তথ্যগুলো আজকের জাতিসংঘ সম্পর্কে জানতে পারছে এবং বিশ্বের দরিদ্রতম ও ঝুঁকিপূর্ণ মানুষগুলোর জীবনযাপন উন্নত করার জন্য জাতিসংঘের প্রচেষ্টা আরও জোরদার করায় তারা ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য।

এই বইতে সন্নিবেশিত তথ্যগুলো ৩১ মার্চ ২০১৩ সাল পর্যন্ত হালনাগাদ করা হয়েছে। জাতিসংঘের বিশ্বব্যাপী কর্মসূচি ও কর্মকাণ্ড এবং সাম্প্রতিক তথ্যের জন্য এই আন্তর্জাতিক সংগঠনটির বিভিন্ন ওয়েবসাইট দেখুন, যেমন–

- জাতিসংঘের দাপ্তরিক ওয়েবসাইট (www.un.org)
- ইউএন নিউজ সেন্টার (www.un.org/news)
- ইয়ারবুক অফ দ্য ইউনাইটেড নেশনস (unyearbook.un.org) (জাতিসংঘের refenece work এবং সংস্থাটির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যর ঐতিহাসিক পটভূমি এখানে বর্ণিত)
- ইউএন ক্রনিকল্ ম্যাগাজিন (www.un.org/wcm/content/side/chronicle)

জাতিসংঘের পতাকা, সদর দপ্তর নিউইয়র্ক (২৬ এপ্রিল ২০১৩ জাতিসংঘের ছবি/ রিক বাজরনাস)

The United Nations System

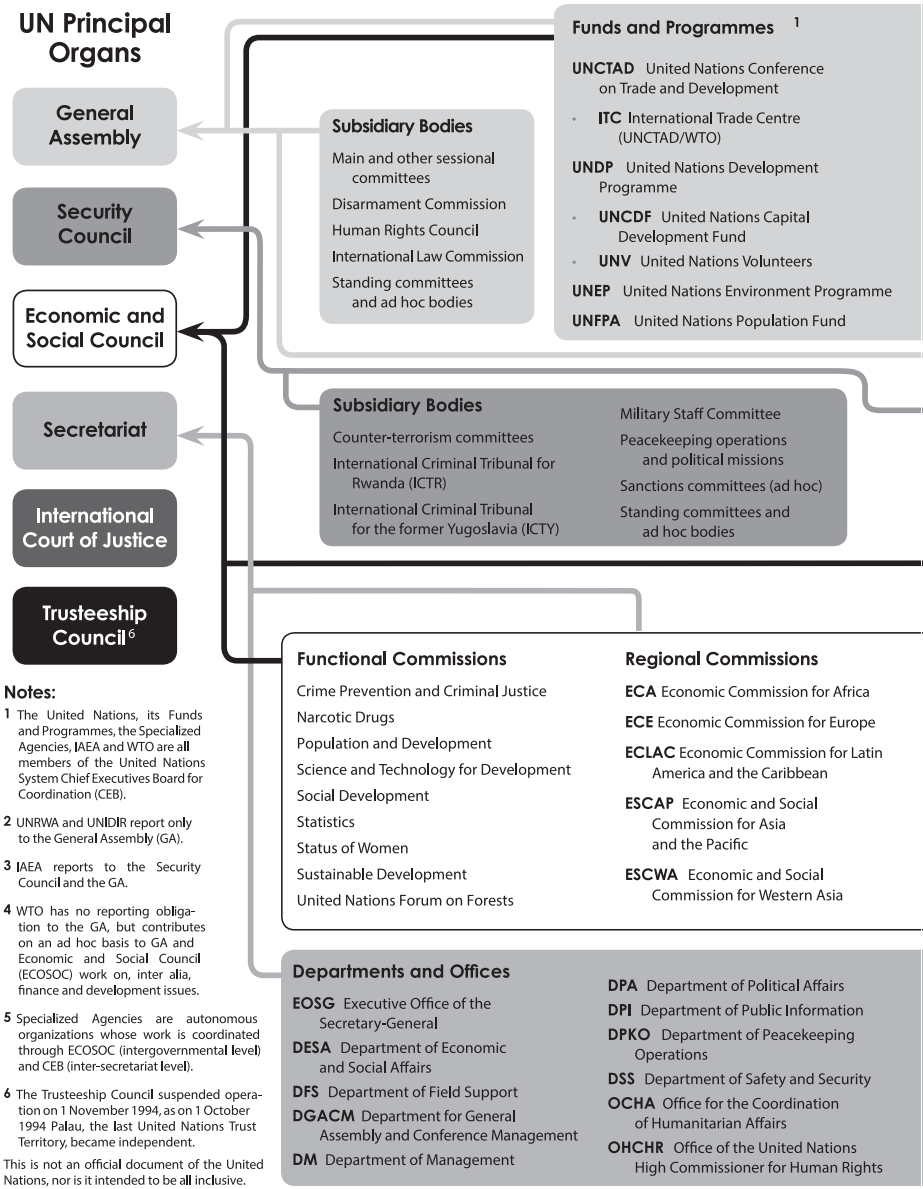

Notes:

1 The United Nations, its Funds and Programmes, the Specialized Agencies, IAEA and WTO are all members of the United Nations System Chief Executives Board for Coordination (CEB).

2 UNRWA and UNIDIR report only to the General Assembly (GA).

3 IAEA reports to the Security Council and the GA.

4 WTO has no reporting obligation to the GA, but contributes on an ad hoc basis to GA and Economic and Social Council (ECOSOC) work on, inter alia, finance and development issues.

5 Specialized Agencies are autonomous organizations whose work is coordinated through ECOSOC (intergovernmental level) and CEB (inter-secretariat level).

6 The Trusteeship Council suspended operation on 1 November 1994, as on 1 October 1994 Palau, the last United Nations Trust Territory, became independent.

This is not an official document of the United Nations, nor is it intended to be all inclusive.

UN-HABITAT United Nations Human Settlements Programme

UNHCR Office of the United Nations High Commissioner for Refugees

UNICEF United Nations Children's Fund

UNODC United Nations Office on Drugs and Crime

UNRWA [2] United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East

UN-Women United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women

WFP World Food Programme

UNITAR United Nations Institute for Training and Research

UNRISD United Nations Research Institute for Social Development

UNSSC United Nations System Staff College

UNU United Nations University

Other Entities

UNAIDS Joint United Nations Programme on HIV/AIDS

UNISDR United Nations International Strategy for Disaster Reduction

UNOPS United Nations Office for Project Services

Research and Training Institutes

UNICRI United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute

UNIDIR [2] United Nations Institute for Disarmament Research

Related Organizations

CTBTO Preparatory Commission Preparatory Commission for the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization

IAEA [1,3] International Atomic Energy Agency

OPCW Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons

WTO [1,4] World Trade Organization

Advisory Subsidiary Body

Peacebuilding Commission

Specialized Agencies [1,5]

FAO Food and Agriculture Organization of the United Nations

ICAO International Civil Aviation Organization

IFAD International Fund for Agricultural Development

ILO International Labour Organization

IMF International Monetary Fund

IMO International Maritime Organization

ITU International Telecommunication Union

UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

UNIDO United Nations Industrial Development Organization

UNWTO World Tourism Organization

UPU Universal Postal Union

WHO World Health Organization

WIPO World Intellectual Property Organization

WMO World Meteorological Organization

World Bank Group

- **IBRD** International Bank for Reconstruction and Development
- **ICSID** International Centre for Settlement of Investment Disputes
- **IDA** International Development Association
- **IFC** International Finance Corporation
- **MIGA** Multilateral Investment Guarantee Agency

Other Bodies

Committee for Development Policy

Committee of Experts on Public Administration

Committee on Non-Governmental Organizations

Permanent Forum on Indigenous Issues

United Nations Group of Experts on Geographical Names

Other sessional and standing committees and expert, ad hoc and related bodies

OIOS Office of Internal Oversight Services

OLA Office of Legal Affairs

OSAA Office of the Special Adviser on Africa

SRSG/CAAC Office of the Special Representative of the Secretary-General for Children and Armed Conflict

SRSG/SVC Office of the Special Representative of the Secretary-General on Sexual Violence in Conflict

UNODA Office for Disarmament Affairs

UNOG United Nations Office at Geneva

UN-OHRLLS Office of the High Representative for the Least Developed Countries, Landlocked Developing Countries and Small Island Developing States

UNON United Nations Office at Nairobi

UNOV United Nations Office at Vienna

Published by the United Nations Department of Public Information DPI/2470 rev.3—13-38229—August 2013

১. জাতিসংঘ সনদ, গঠন ও পদ্ধতি

আগের পাতার ছবি সম্পর্কে বর্ণনা : হাইতিতে জাতিসংঘের স্থিতিশীলতা মিশনের শান্তিরক্ষি বাহিনী এবং হাইতির সিভিল প্রোটেকশন ডিপার্টমেন্টের কর্মীরা কাবারেটের বাসিন্দাদের দুর্যোগের সময় সরিয়ে নিচ্ছেন (৯ জুলাই ২০১২, জাতিসংঘের ছবি/ ভিক্টোরিয়া হাজোউ)

শান্তির জন্য সংগ্রাম এক অবিরাম সংগ্রাম। একশ' বছরেরও বেশি সময় আগে ১৮৯৯ সালে হেগ শহরে সর্বপ্রথম আন্তর্জাতিক শান্তি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। আন্তর্জাতিক সংকটগুলোর শান্তিপূর্ণ সমাধান, যুদ্ধ প্রতিরোধ এবং যুদ্ধকালীন নিয়মকানুন নিরূপণের জন্য বহুপক্ষীয় দলিলাদি প্রণয়ন করাই ছিল এই সম্মেলনের লক্ষ্য। এই সম্মেলনে আন্তর্জাতিক বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধান বিষয়ক কনভেনশন প্রণয়ন এবং স্থায়ী সালিশ আদালত গঠন করে। ১৯০২ সাল থেকে এই আদালত তার কাজ শুরু করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে আলোচনার ফলস্বরূপ পরবর্তীকালে ১৯১৯ সালে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ধারণা প্রচারে এবং শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ভার্সাই চুক্তির অধীনে 'সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ' প্রতিষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ প্রতিরোধে ব্যর্থ হওয়ায় 'সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ'-এর কার্যক্রম স্থগিত হয়ে গেলেও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও মতবিনিময়ের মাধ্যমে যুদ্ধের শান্তিপূর্ণ সমাধানের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা এগিয়ে যেতে থাকে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন ডি রুজভেল্ট জাতিসংঘ পরিভাষাটি প্রস্তাব করেন। ১৯৪২ সালের ১ জানুয়ারিতে প্রণীত 'জাতিসংঘ ঘোষণা'তে প্রথম এই পরিভাষাটি ব্যবহৃত হয়, যেখানে ২৬টি জাতির প্রতিনিধিরা সম্মিলিতভাবে অক্ষশক্তিকে প্রতিরোধে অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়ার ঘোষণা দেন। ১৯৪৪ সালে চীন, সোভিয়েত ইউনিয়ন, যুক্তরাজ্য এবং যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের মধ্যে ওয়াশিংটন ডিসিতে অনুষ্ঠিত সুচিন্তিত মতবিনিময়ের ওপর ভিত্তি করে ১৯৪৫ সালে সান ফ্রান্সিসকোতে ৫০টি দেশের প্রতিনিধিরা সংঘবদ্ধ জাতির আন্তর্জাতিক সংগঠনের ব্যাপারে এক সম্মেলনে মিলিত হন। যুদ্ধ প্রতিহত করার দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়ে তাঁরা সেখানে জাতিসংঘ সনদ প্রণয়নের সিদ্ধান্ত নেন, যা ১৯৪৫ সালের ২৬ জুন তারিখে স্বাক্ষরিত হয়।

চীন, ফ্রান্স, সোভিয়েত ইউনিয়ন, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র এবং সনদে স্বাক্ষরদানকারী সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলোর সম্মতির ভিত্তিতে নিউইয়র্কে সদর দপ্তর প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টোবর জাতিসংঘ আনুষ্ঠানিকভাবে তার কর্মযাত্রা শুরু করে। বিশ্ব শান্তি রক্ষার উদ্যোগ গ্রহণের এই ঐতিহাসিক দিনটিকে স্মরণ করতে প্রতিবছর ২৪ অক্টোবর তারিখটি জাতিসংঘ দিবস হিসেবে উদযাপন করা হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন তীক্ষ্ণ মতপার্থক্য থেকে জন্ম হওয়ার সত্ত্বেও এবং আসন্ন স্নায়ুযুদ্ধ হতে উদ্ভূত মতপার্থক্যজনিত বিতর্কের অবতারণা সত্ত্বেও জাতিসংঘ একুশ শতকের প্রারম্ভে বিশ্ব ও বিশ্ববাসীর অভাবিত পরিবর্তনের মুখে সদা প্রাসঙ্গিক থাকার অঙ্গীকার নিয়ে এগিয়ে যাওয়ায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

জাতিসংঘ সনদ

জাতিসংঘ সনদ সদস্য দেশগুলোর অধিকার ও কর্তব্য এবং জাতিসংঘের প্রধান অঙ্গ সংস্থা ও তাদের কার্যপ্রণালি সংবলিত জাতিসংঘের গঠনতান্ত্রিক দলিল। একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি হিসেবে এই সনদে আন্তর্জাতিক সম্পর্কে মৌলিক মূলনীতিসমূহ গ্রন্থিত হয়েছে–এর মধ্যে রয়েছে রাষ্ট্রসমূহের সার্বভৌম সমতা থেকে আন্তর্জাতিক সম্পর্কে শক্তির ব্যবহার নিষিদ্ধকরণ পর্যন্ত বিষয়াবলী।

জাতিসংঘ সনদ গঠিত হয়েছে একটি প্রস্তাবনা এবং ১৯টি অধ্যায়ে সন্নিবেশিত ১১১টি অনুচ্ছেদ নিয়ে। সনদের প্রথম অধ্যায়ে রয়েছে জাতিসংঘের উদ্দেশ্য ও মূলনীতি; দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভের নিয়ম ও যোগ্যতা; তৃতীয় অধ্যায়ে রয়েছে জাতিসংঘের ৬টি প্রধান অঙ্গ সংস্থার নাম; চতুর্থ অধ্যায় থেকে পনের অধ্যায়ে এসব অঙ্গ-সংস্থার কার্যাবলি ও ক্ষমতা বর্ণনা করে; ষোল ও সতের অধ্যায়ে জাতিসংঘের সাথে চলমান আন্তর্জাতিক আইনগুলোর সম্পর্ক উল্লিখিত আছে; আর আঠারো ও উনিশ অধ্যায়ে রয়েছে সনদের সংশোধন ও অনুমোদন প্রক্রিয়া।

জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠায় যেসব দেশ একত্র হয়েছিল সেসব দেশের জনগণের সম্মিলিত আদর্শ এবং অভিন্ন লক্ষ্যগুলো মূল প্রস্তাবনায় সন্নিবেশিত হয়েছে :

আমরা জাতিসংঘভুক্ত জনগণ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ

ভবিষ্যৎ বংশধরদের যুদ্ধের অভিশাপ থেকে বাঁচাবার জন্য, যা আমাদের জীবনকালে দু'দুবার মানবজাতির কাছে অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশা বহন করে এনেছে, এবং মৌলিক মানবাধিকার, মানুষের মর্যাদা ও মূল্য এবং ছোট-বড় জাতি ও স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সমান অধিকারের প্রতি পুনরায় আস্থা রাখার জন্য, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং বিভিন্ন চুক্তি ও আন্তর্জাতিক আইনের উৎসপ্রসূত বাধ্যবাধকতার প্রতি সম্মান বজায় রাখার মতো অবস্থা সৃষ্টি করার জন্য, ব্যাপকতর স্বাধিকারের মাধ্যমে সামাজিক অগ্রগতি সাধন ও জীবনমান উন্নয়নের জন্য, পরস্পর সুপ্রতিবেশী হিসেবে শান্তিতে বসবাস, সহিষ্ণুতার অনুশীলন এবং আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা সংরক্ষণের জন্য আমাদের শক্তি সংহত করতে এবং সর্বজনীন স্বার্থ ব্যতীত সামরিক শক্তি ব্যবহার না করার নীতি গ্রহণ ও পদ্ধতিগত ব্যবস্থার মাধ্যমে এ বিষয় সুনিশ্চিত করতে, সব জাতির অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতি সাধনের জন্য আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাপনা প্রয়োগ করতে এবং উল্লিখিত উদ্দেশ্যগুলো চরিতার্থ করার জন্য আমরা আমাদের সমস্ত ইচ্ছাশক্তি একত্র করতে স্থির সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

অতএব, সানফ্রান্সিসকো নগরীতে সমবেত যথাযথরূপে পূর্ণ ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধিবর্গের মাধ্যমে আমাদের নিজ নিজ সরকার জাতিসংঘের বর্তমান সনদ গ্রহণ করে এতদ্বারা জাতিসংঘ নামে অভিহিত একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের শুভ সূচনা করেছে।

লক্ষ্য ও নীতিমালা

সনদে অন্তর্ভুক্ত জাতিসংঘের উদ্দেশ্যগুলো হলো :

- আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা সংরক্ষণ;
- বিভিন্ন জাতির মধ্যে জনগণের সমঅধিকার ও আত্মনিয়ন্ত্রণনীতির প্রতি শ্রদ্ধার ভিত্তিতে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্কের প্রসার;
- অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং মানবিক বিষয়ে আন্তর্জাতিক সমস্যাগুলো সমাধানের ক্ষেত্রে সহযোগিতা এবং মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধিকারগুলোর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনে উৎসাহ দান এবং
- এসব সর্বজনিন উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য জাতিগুলোর প্রচেষ্টায় সমন্বয় সাধনের কেন্দ্র হিসেবে কার্য পরিচালনা।

এসব উদ্দেশ্য সাধনের জন্য জাতিসংঘ নিম্নলিখিত মূলনীতি অনুযায়ী কাজ করবে :

- সব সদস্য-রাষ্ট্রের সমতামূলক সার্বভৌমত্বের ওপর এই সংগঠন প্রতিষ্ঠিত;
- সব সদস্যকে সনদ অনুযায়ী তাদের দায়দায়িত্ব সরল বিশ্বাসে পালন করতে হবে;
- তারা তাদের আন্তর্জাতিক বিরোধ শান্তিপূর্ণ উপায়ে এমনভাবে নিষ্পত্তি করবে, যাতে আন্তর্জাতিক শান্তি, নিরাপত্তা ও ন্যায়বিচার বিঘ্নিত না হয়;
- তারা অন্য কোনো রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ভীতি প্রদর্শন ও বল প্রয়োগ করা থেকে বিরত থাকবে;
- তারা জাতিসংঘ কর্তৃক সনদ অনুযায়ী গৃহীত সমস্ত কার্যকলাপে সর্বাত্মকভাবে সহযোগিতা করবে;
- এই সনদের কোনো অংশ জাতিসংঘকে কোনো রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতা প্রদান করে না।

জাতিসংঘ সনদের সংশোধন

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের ভোটে এবং নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচ স্থায়ী সদস্যসহ জাতিসংঘের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থনের মাধ্যমে জাতিসংঘ সনদ সংশোধন করা যেতে পারে। এ পর্যন্ত সনদের চারটি অনুচ্ছেদ সংশোধন করা হয়েছে, যার মধ্যে একই অনুচ্ছেদ সংশোধন করা হয়েছে দু'বার :

- ১৯৬৫ সালে নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য দেশের সংখ্যা ১১ থেকে বাড়িয়ে ১৫ করা হয় (অনুচ্ছেদ ২৩); আর নিরাপত্তা পরিষদে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সম্মতিসূচক ভোটের ন্যূনতম সংখ্যা সাত থেকে বাড়িয়ে নয় করা হয়, যার মধ্যে পাঁচ স্থায়ী সদস্যের সম্মতিসূচক ভোট অবশ্যই থাকতে হবে (অনুচ্ছেদ ২৭)।
- ১৯৬৫ সালে জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের সদস্য-রাষ্ট্রের সংখ্যা ১৮ থেকে বাড়িয়ে ২৭ করা হয় এবং ১৯৭৩ সালে তা আরও বাড়িয়ে ৫৪ করা হয় (ধারা ৬১)।
- ১৯৬৮ সালে নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক সনদ পর্যালোচনার জন্য সাধারণ সম্মেলন ডাকতে প্রয়োজনীয় ভোটের সংখ্যা ৭ থেকে বাড়িয়ে ৯ করা হয় (ধারা ১০৯)।

সদস্যপদ ও দাপ্তরিক ভাষাগুলো

শান্তিপ্রিয় সব দেশ যারা জাতিসংঘ সনদে বর্ণিত বাধ্যবাধকতাগুলো মেনে নেয় এবং যাদের এগুলো পালনের ইচ্ছা ও সক্ষমতা থাকে, তাদের সকলের জন্য জতিসংঘের সদস্যপদ উন্মুক্ত। নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশক্রমে সাধারণ পরিষদ নতুন সদস্য গ্রহণ করে। সনদের নীতিমালা লঙ্ঘন করলে কোনো দেশের সদস্যপদ স্থগিত রাখা বা তাকে বহিষ্কার করার বিধান সনদে রয়েছে, যদিও এ রকম কোনো পদক্ষেপ কখনও নেয়া হয়নি। সনদ অনুযায়ী, জাতিসংঘের দাপ্তরিক ভাষাগুলো হচ্ছে চীনা, ইংরেজি, ফরাসি, রুশ ও স্প্যানিশ। ১৯৭৩ সালে আরবি ভাষাকে দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

জাতিসংঘের কাঠামো

সনদ অনুযায়ী জাতিসংঘের মূল অঙ্গ সংস্থা ছয়টি : সাধারণ পরিষদ, নিরাপত্তা পরিষদ, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ, আন্তর্জাতিক বিচার আদালত, অছি পরিষদ এবং সচিবালয়। তবে সমগ্র জাতিসংঘ পরিবার এর চেয়ে অনেক বড়, যার মধ্যে রয়েছে ১৫টি বিশেষায়িত সংস্থা, বহুসংখ্যক কর্মসূচি ও তহবিল এবং অন্যান্য সত্তা।

সাধারণ পরিষদ

সাধারণ পরিষদ হচ্ছে জাতিসংঘের মূল আলোচনাকারী অঙ্গ সংস্থা। সব সদস্য-রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের নিয়ে এটি গঠিত, যাদের প্রত্যেকের একটি করে ভোট রয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য যেমন, শান্তি ও নিরাপত্তা, নতুন সদস্য অন্তর্ভুক্তি এবং বাজেটে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রয়োজন। অন্য বিষয়গুলো সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে নিষ্পত্তি হয়।

কার্যক্রম ও ক্ষমতা

সনদ অনুযায়ী সাধারণ পরিষদের কার্যক্রম ও ক্ষমতার মধ্যে রয়েছে:

- নিরস্ত্রীকরণ ও অস্ত্র সংক্রান্ত নীতিমালাসহ আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে সহযোগিতার বিষয় বিবেচনা ও সুপারিশ করা;
- আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত যে কোনো বিষয়ে আলোচনা করা এবং নিরাপত্তা পরিষদে আলোচনাধীন নেই এমন বিরোধ বা অবস্থা সম্পর্কে সুপারিশ করা;
- সনদের আওতাধীন এবং নিরাপত্তা পরিষদের আলোচ্যসূচির বাইরে থাকা যে কোনো বিষয়ে অথবা জাতিসংঘের যে কোনো সংস্থার কাজ ও ক্ষমতাকে প্রভাবিত করে এমন বিষয়ে আলোচনা ও সুপারিশ করা;
- আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে সহযোগিতা, আন্তর্জাতিক আইনের বিকাশ ও সার সংগ্রহ, সবার জন্য মানবাধিকার ও মৌলিক অধিকার সম্পর্কিত ধারণা এবং অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা প্রচারে শিক্ষার ব্যবস্থা ও সুপারিশ করা;
- জাতিগুলোর মাঝে বিরাজমান মৈত্রীর সম্পর্ক ব্যাহত হতে পারে এ রকম যে কোনো সমস্যা, জাতি নির্বিশেষে শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য সুপারিশ করা;
- নিরাপত্তা পরিষদ ও জাতিসংঘের অন্যান্য অঙ্গ সংস্থার প্রতিবেদন গ্রহণ ও তা বিবেচনা করা;

- জাতিসংঘের বাজেট বিবেচনা ও অনুমোদন করা এবং সদস্যদের প্রদেয় চাঁদার পরিমাণ নির্ধারণ করা;
- নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের সদস্য এবং অছি পরিষদের অতিরিক্ত সদস্য নির্বাচিত করা; নিরাপত্তা পরিষদের সমন্বয়ে আন্তর্জাতিক আদালতের বিচারকদের নির্বাচিত করা এবং নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশক্রমে মহাসচিব নিয়োগ করা।

যদি কোনো ঘটনায় বিশ্বশান্তি বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়, শান্তি ভঙ্গ কিংবা কোনো আগ্রাসন চালানো হয়ে থাকে এবং নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যদের মতানৈক্যের কারণে তারা সে ঘটনায় কোনো কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থ হয়, সেক্ষেত্রে ১৯৫০ সালের নভেম্বরে সাধারণ পরিষদ কর্তৃক গৃহীত 'শান্তির জন্য ঐক্য' প্রস্তাব অনুযায়ী সাধারণ পরিষদ সে বিষয়ে পদক্ষেপ নিতে পারে। সদস্যদের প্রতি সম্মিলিত পদক্ষেপ নেয়ার সুপারিশ করার লক্ষ্যে বিষয়টি নিয়ে তাৎক্ষণিক বিবেচনা করার ক্ষমতা সাধারণ পরিষদকে দেয়া হয়েছে। যদি শান্তি ভঙ্গ করা হয় অথবা আগ্রাসন চালানো হয়, তবে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা অথবা পুনরুদ্ধার করার জন্য প্রয়োজনে সশস্ত্র বাহিনী ব্যবহারও এই ক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত।

অধিবেশনসমূহ

প্রতি বছর সেপ্টেম্বর মাসের তৃতীয় মঙ্গলবার সাধারণ পরিষদের নিয়মিত অধিবেশন শুরু হয়; আর এই সপ্তাহ গণনা করা হয় কমপক্ষে একটি কর্মদিবস রয়েছে এমন সপ্তাহকে প্রথম ধরে। প্রতিটি নিয়মিত অধিবেশনের অন্তত তিন মাস পূর্বে পরিষদের একজন নতুন সভাপতি, ২১ জন সহ-সভাপতি ও পরিষদের ছয়টি মূল কমিটির চেয়ারপারসনদের নির্বাচিত করা হয়। প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে ভৌগোলিক সমতা নিশ্চিত করার জন্য পরিষদের সভাপতির পদটি ৫টি রাষ্ট্রভিত্তিক এলাকা থেকে পালাক্রমে নির্বাচিত করা হয় : আফ্রিকান, এশিয়ান, পূর্ব ইউরোপিয়ান, লাতিন আমেরিকান ও ক্যারিবিয়ান এবং পশ্চিম ইউরোপিয়ান ও অন্যান্য রাষ্ট্র। নিরাপত্তা পরিষদের যে কোনো নয়টি সদস্যরাষ্ট্রের ভোটে, জাতিসংঘের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যরাষ্ট্রের আহ্বানে অথবা সংখ্যাগরিষ্ঠের সম্মতিপুষ্ট কোনো একক রাষ্ট্রের অনুরোধে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে জরুরি বিশেষ অধিবেশন ডাকা যেতে পারে। প্রতিটি নির্ধারিত অধিবেশনের শুরুতে পরিষদ একটি সাধারণ বিতর্কের আয়োজন করে, যেখানে মূলত বিভিন্ন রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকারপ্রধানগণ অংশ নেন এবং সদস্যরাষ্ট্রগুলো সবচেয়ে গুরুত্বগূর্ণ আন্তর্জাতিক বিষয়গুলোতে তাদের মতামত ব্যক্ত করেন।

সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যরাষ্ট্রের আকাঙ্ক্ষাপ্রসূত প্রস্তাব ও সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে জাতিসংঘের বছরব্যাপী কার্যক্রমগুলো গৃহীত হয়। এই কাজগুলো সম্পাদিত হয়ে থাকে পরিষদের গঠিত কমিটি ও অন্যান্য সংগঠন দ্বারা, যেমন যারা নিরস্ত্রীকরণ, শান্তিরক্ষা, উন্নয়ন এবং মানবাধিকার ইত্যাদি নির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে পর্যালোচনা ও প্রতিবেদন তৈরি করে; পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত আন্তর্জাতিক সম্মেলন দ্বারা এবং মহাসচিব ও তাঁর অধীন আন্তর্জাতিক সরকারি লোকেদের সমন্বয়ে গঠিত জাতিসংঘ সচিবালয় দ্বারা।

অধিকাংশ বিষয়গুলো নিম্নোক্ত ৬টি মূল কমিটির যে কোনো একটিতে আলোচিত হয় :

- প্রথম কমিটি (নিরস্ত্রীকরণ ও আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা);
- দ্বিতীয় কমিটি (অর্থনৈতিক ও অর্থ সংক্রান্ত);

- তৃতীয় কমিটি (সামাজিক, মানবিক ও সাংস্কৃতিক);
- চতুর্থ কমিটি (বিশেষ রাজনৈতিক ও উপনিবেশ বিলোপ);
- পঞ্চম কমিটি (প্রশাসনিক ও আয়-ব্যয় সংক্রান্ত),
- ষষ্ঠ কমিটি (আইন সংক্রান্ত)।

কিছু বিষয় পূর্ণাঙ্গ কমিটির বিবেচনাধীন থাকলেও বেশিরভাগ বিষয় উপরের ৬টি কমিটির একটিতে আলোচিতহ হয়। সাধারণত ডিসেম্বরের নির্ধারিত বৈঠকের কর্মাবকাশের পূর্বেই বিভিন্ন কমিটির প্রস্তাবিত সিদ্ধান্তগুলো ভোটের মাধ্যমে বা ভোটাভুটি ছাড়াই পূর্ণাঙ্গ সভায় গৃহীত হতে পারে।

পরিষদ মূলত উপস্থিত সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের মাধ্যমে প্রস্তাবাবলি ও সিদ্ধান্তগুলো গ্রহণ করে। আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বিষয়ক প্রস্তাবনা, প্রধান অঙ্গগুলোর সদস্য নির্বাচন, বাজেট সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ইত্যাদি দুই-তৃতীয়াংশ ভোটের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়। লিপিবদ্ধকরণ, হস্ত প্রদর্শন বা নাম ডাকার মাধ্যমে ভোট নেয়া হতে পারে। পূর্ণাঙ্গ সভায় কোনো আপত্তি না থাকলে আনুষ্ঠানিক ভোট গ্রহণ ছাড়াই ধ্বনি ভোটেও সিদ্ধান্ত গৃহীত হতে পারে।

সরকারগুলোর ওপর পরিষদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের আইনগত বাধ্যবাধকতা নেই। তবে তা বিশ্ব জনমতের ভার বহন করে এবং এটি বিশ্ব সম্প্রদায়ের নৈতিক কর্তৃত্বের ধারক।

নিরাপত্তা পরিষদ

সনদ অনুযায়ী আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখার প্রাথমিক দায়িত্ব নিরাপত্তা পরিষদের। নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য সংখ্যা ১৫, এর মধ্যে ৫টি স্থায়ী সদস্য : চীন, ফ্রান্স, রুশ ফেডারেশন, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র এবং বাকি ১০টি সদস্য সাধারণ পরিষদ কর্তৃক দুই বছর মেয়াদে নির্বাচিত হয়। বর্তমানে নিরাপত্তা পরিষদের বাকি দশটি দেশ হলো— আজারবাইজান, গুয়াতেমালা, মরক্কো, পাকিস্তান, টোগো, আর্জেন্টিনা, অস্ট্রেলিয়া, লুক্সেমবার্গ, গণপ্রজাতন্ত্রী কোরিয়া এবং রুয়ান্ডা (প্রথম ৫টি সদস্যের মেয়াদ শেষ হবে ২০১৩ সালে এবং শেষ দশটির ২০১৪ সালে)। প্রত্যেক সদস্যের একটি করে ভোট রয়েছে। কার্যপরিচালনা সংক্রান্ত বিষয়গুলোতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ১৫টির মধ্যে ন্যূনতম ৯টি ভোট স্বপক্ষে থাকতে হবে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ৯টি ভোট এবং স্থায়ী সদস্যদের যে কারও নেতিবাচক ভোটের (ভেটো) অনুপস্থিতি প্রয়োজন। স্থায়ী পাঁচ সদস্যের প্রত্যেকেই কখনও না কখনও তাদের ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগ করেছে। কোনো স্থায়ী সদস্য যদি কোনো প্রস্তাব বা সিদ্ধান্ত গ্রহণে পরিপূর্ণভাবে সম্মত না হয় অথচ ভেটো প্রয়োগ করতে অনিচ্ছুক হয়, সেক্ষেত্রে ভোটদানে বিরত থাকতে পারে। এ ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত বিষয়টির স্বপক্ষে ৯টি ভোট প্রাপ্তিসাপেক্ষে তা গ্রহণ করার সুযোগ থাকে। পরিষদের সভাপতিত্ব বর্ণমালার ক্রমানুসারে প্রত্যেক সদস্যরাষ্ট্রের ওপর এক মাসের জন্য ন্যস্ত হয়।

নিরাপত্তা পরিষদের গঠন ও কার্যপ্রণালি, বিশেষত স্থায়ী আসনের সংযোজন বা অস্থায়ী সদস্যপদ সম্প্রসারণ সাধারণ পরিষদের কার্যকরী কমিটির ওপর নির্ভরশীল। বৈশ্বিক বিষয় বিবেচনায় সদস্য রাষ্ট্রগুলোর ন্যায়সঙ্গত প্রতিনিধিত্বের ব্যাপারটি অতিশয় গুরুত্ব বহন করে। জাতিসংঘের ৭৩টি সদস্য রাষ্ট্র কখনও কাউন্সিলে বসেনি, যদিও জাতিসংঘের সব সদস্য নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্তগুলো গ্রহণ ও বাস্তবায়নে সম্মতিবদ্ধ। জাতিসংঘের অন্যান্য অঙ্গসংস্থা

সরকারগুলোর কাছে কেবল সুপারিশ পেশ করতে পারে; কিন্তু শুধু নিরাপত্তা পরিষদের ক্ষমতা রয়েছে এমন সিদ্ধান্ত নেয়ার যা সনদ অনুযায়ী সদস্য রাষ্ট্রগুলো পালনে অঙ্গীকারবদ্ধ।

কার্যাবলি ও ক্ষমতা

সনদ অনুযায়ী নিরাপত্তা পরিষদের কার্যাবলি ও ক্ষমতাগুলো হচ্ছে :

- জাতিসংঘের নীতিমালা ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখা;
- সমরাস্ত্র নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে একটি পদ্ধতি প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা তৈরি করা;
- শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিরোধ মীমাংসা করার জন্য বিবদমান পক্ষদের আহ্বান করা;
- আন্তর্জাতিক সংঘাত সৃষ্টি করতে পারে এমন কোনো বিরোধ বা অবস্থা সম্পর্কে তদন্ত পরিচালনা করা এবং সমন্বয় পদ্ধতি ও মীমাংসার শর্তাবলি সম্পর্কে সুপারিশ করা;
- শান্তির প্রতি বিদ্যমান থাকা হুমকি বা আগ্রাসনের ঘটনা চিহ্নিত করা এবং এ ব্যাপারে কী পদক্ষেপ নেয়া যায় তা সুপারিশ করা;
- আগ্রাসন বন্ধ বা রোধকল্পে প্রয়োজনীয় বা আকাঙ্ক্ষিত শর্ত মেনে চলার জন্য সংশ্লিষ্ট পক্ষদের আহ্বান করা;
- কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে সশস্ত্র শক্তির প্রয়োগ না করে নিষেধাজ্ঞা জাতীয় পদক্ষেপ নেয়ার ব্যাপারে জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রগুলোকে আহ্বান জানানো;
- আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখতে ও পুনরুদ্ধার করতে, প্রয়োজনে শক্তি প্রয়োগের পথ অবলম্বন করা বা তার অনুমতি দেয়া;
- আঞ্চলিক ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় বিরোধের শান্তিপূর্ণ মীমাংসা এবং নিজস্ব কর্তৃত্ব প্রয়োগের জন্য এই আঞ্চলিক ব্যবস্থাপনার ব্যবহারকে উৎসাহ প্রদান করা;
- জাতিসংঘের মহাসচিব নিয়োগের জন্য সাধারণ পরিষদকে সুপারিশ করা এবং সাধারণ পরিষদের সমন্বয়ে আন্তর্জাতিক আদালতের বিচারকদের নির্বাচিত করা;
- যে কোনো আইনি প্রশ্নে আন্তর্জাতিক আদালতকে উপদেশমূলক মতামত প্রদানে অনুরোধ জানানো এবং
- জাতিসংঘে নতুন সদস্য অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারে সাধারণ পরিষদকে সুপারিশ করা।

নিরাপত্তা পরিষদ এমনভাবে গঠিত যেন তা অব্যাহতভাবে কাজ করতে পারে। এর প্রতিটি সদস্যের একজন করে প্রতিনিধিকে সর্বদাই জাতিসংঘের সদর দপ্তরে উপস্থিত থাকতে হয়। পরিষদ সদর দপ্তরের বাইরেও বৈঠকে বসতে পারে; যেমন— ১৯৭২ সালে ইথিওপিয়ার আদ্দিস আবাবায়, ১৯৭৩ সালে পানামার পানামা সিটিতে এবং ১৯৯০ সালে সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় পরিষদের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।

শান্তির প্রতি হুমকিমূলক কোনো অভিযোগ যখন সামনে আসে, তখন সাধারণ পরিষদের প্রথম পরামর্শ হলো সংশ্লিষ্ট পক্ষরা যেন নিজেদের মধ্যে শান্তিপূর্ণ উপায়ে চুক্তি করতে সচেষ্ট হয়। এমন ধরনের চুক্তির নীতিমালাগুলো পরিষদ ঠিক করে দিতে পারে।

কিছু কিছু ক্ষেত্রে পরিষদ নিজেই তদন্ত ও মধ্যস্থতা করতে উদ্যোগী হয়। পরিষদ মিশন প্রেরণ করতে পারে, বিশেষ দূত নিয়োগ করতে পারে কিংবা কোনো বিরোধ শান্তিপূর্ণভাবে নিষ্পত্তির ব্যাপারে মহাসচিবকে তাঁর লোকবল ব্যবহারের অনুরোধ করতে পারে।

যখন কোনো দ্বন্দ্ব লড়াইয়ে রূপ নেয় তখন পরিষদের প্রধান চিন্তা কীভাবে দ্রুততম সময়ে এর ইতি টানা যায়। লড়াইয়ের তীব্রতা রোধে পরিষদ যুদ্ধবিরতির নির্দেশনা প্রদান

করতে পারে। পরিষদ উত্তেজনা প্রশমনে সহায়তার জন্য সামরিক পর্যবেক্ষক বা শান্তিরক্ষা বাহিনী প্রেরণ করতে পারে, বিরোধী শক্তিদের পৃথক এবং শান্ত করতে পারে যাতে করে শান্তিপূর্ণ সমাধান চাওয়া সম্ভব হয়। ওপরন্তু পরিষদ অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা, অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা, আর্থিক জরিমানাও নিষেধাজ্ঞা, ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা, কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন, অবরোধ, এমনকি সম্মিলিত সামরিক কার্যকলাপও চালাতে পারে বল প্রয়োগের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতে। পরিষদের একটি মুখ্য কাজ হলো জনসংখ্যা ও অর্থনীতির অন্যান্য অংশের ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রয়োগের প্রভাব হ্রাস করার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় দ্বারা নিন্দিত কর্ম ও এর জন্য দায়ীদের প্রতি বিশেষ নজর রাখা।

২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের ওপর সংগঠিত সন্ত্রাসী হামলার পরে নিরাপত্তা পরিষদ সহায়ক সংগঠন হিসেবে সন্ত্রাসবিরোধী কমিটি প্রতিষ্ঠা করেছে। ২০০৫ সালে গঠিত শান্তি প্রতিষ্ঠা কমিশন সংঘাত থেকে উদীয়মান রাষ্ট্রে শান্তি প্রচেষ্টায় সহায়তা দেয়। সামরিক কর্মী-কমিটি জাতিসংঘের সামরিক কার্যকলাপ ও অস্ত্র নিয়ন্ত্রণের পরিকল্পনাতে সহায়তা করে।

ট্রাইব্যুনাল ও আদালত

গত দুই দশকে এই পরিষদটি সাবেক যুগোস্লাভিয়া ও রুয়ান্ডার মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচারের জন্য সহায়ক অঙ্গ সংস্থা হিসেবে নির্দিষ্ট অঞ্চলভিত্তিক দুটি অ্যাডহক আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠা করেছে। এছাড়াও জাতিসংঘের সহায়তায় যথাক্রমে কম্বোডিয়া, লেবানন ও সিয়েরা লিওন তিনটি 'হাইব্রিড' আদালত প্রতিষ্ঠা করেছে। এই আদালতগুলো স্থায়ী নয় এবং এদের কাজ শেষ হওয়ার সাথে সাথে এদের অস্তিত্বও বিলুপ্ত হবে।

সাবেক যুগোস্লাভিয়ার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল (ICTY)

১৯৯৩ সালে নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সাবেক যুগোস্লাভিয়া আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল, ১৯৯১ সাল থেকে সাবেক যুগোস্লাভিয়ায় গণহত্যা, যুদ্ধাপরাধ এবং মানবতাবিরোধী অপরাধের জন্য দায়ী ব্যক্তিদের বিচারের আওতায় আনার নির্দেশ দেয়। এই ট্রাইব্যুনালের সাংগঠনিক অঙ্গগুলো হলো এর বিচারালয়, রেজিস্ট্রি এবং প্রসিকিউটরের অফিস। এই অপরাধ ট্রাইব্যুনালে ১৬ জন স্থায়ী বিচারক, ১২ জন তদন্তকারী বিচারক (যাদের ১২ জনকে যে কোনো নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আহ্বান করা যাবে) এবং ৭৭ রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্বকারী ৮৭৩ জন কর্মী রয়েছে। এই ট্রাইব্যুনালের ২০১২-১৩ সালের নিয়মিত বাজেট ছিল ২৫০.৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ট্রাইব্যুনালটি ক্রোয়েশিয়া (১৯৯১-৯৫), বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা (১৯৯২-৯৫), কসোভো (১৯৯৮-৯৯) এবং সাবেক ম্যাসেডোনিয়া যুগোস্লাভ প্রজাতন্ত্রে (২০০১) যুদ্ধ চলাকালে হাজার হাজার ক্ষতিগ্রস্তের সাথে করা অপরাধের জন্য ১৬১ জন ব্যক্তিকে অভিযুক্ত করেছে। ট্রাইব্যুনালের প্রত্যেকে তাদের অবস্থান নির্বিশেষে নিজ নিজ দায়বদ্ধতা বজায় রাখার কারণে ট্রাইব্যুনালটি যুদ্ধাপরাধের দায়মুক্তি নিবারণে অবদান রেখেছে।

সভাপতি : বিচারক থিওডোর মেরন (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র)
প্রসিকিউটর : সার্জ ব্রামারটজ (বেলজিয়াম), **রেজিস্ট্রার :** জন হকিং (অস্ট্রেলিয়া)
সদর দপ্তর : চার্চিলপ্লেইন ১, ২৫১৭ জে ডব্লিউ, দি হেগ, নেদারল্যান্ডস
টেলিফোন : (৩১ ৭০) ৫১২ ৫০০০, ফ্যাক্স: (৩১ ৭০), ৫১২ ৫৩৫৫

রুয়ান্ডার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল (ICTR)

১৯৯৪ সালে নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত রুয়ান্ডার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল, ১৯৯৮ সালে রুয়ান্ডায় সংঘটিত গণহত্যা ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের ভয়াবহ লঙ্ঘন এবং প্রতিবেশী দেশগুলোর সীমানায় রুয়ান্ডার নাগরিকদের আইন লঙ্ঘনের জন্য দায়ী ব্যক্তিদের বিচারের আওতায় আনার হুকুম দেয়। এই ট্রাইব্যুনালের তিনটি বিচারালয় এবং একটি আপিল চেম্বারসহ মোট ১৬ জন স্বাধীন বিচারক দ্বারা গঠিত। তাদের মধ্যে যে কোনো দু'জন একই রাষ্ট্রের নাগরিক না হওয়ার শর্ত ছিল। প্রতিটি বিচারালয় একজন করে তিনজন বিচারক এবং আপিল চেম্বারে পাঁচজন বিচারক বসেন, যা সাবেক যুগোস্লাভিয়ার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের সাথে ভাগ করে নেয়া হয়। এই ট্রাইব্যুনালের আরো ১৮ জন তদন্তকারী বিচারক আছেন (যাদের ৯ জনকে যে কোনো নির্দিষ্ট প্রদত্ত সময়ের মধ্যে ডাকা যায়) এবং ৩০ জুন ২০১২ পর্যন্ত এই ট্রাইব্যুনালে ৬৮টি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্বকারী ৫২৮ জন কর্মী ছিলেন। এই ট্রাইব্যুনালের ২০১২-২০১৩ সালের বাজেট ছিল ১৭১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ১০ মে ২০১৩ পর্যন্ত আইসিটিআর-এর বিচারালয়ে ৯৩ জন অভিযুক্তের বিচার সম্পন্ন হয়েছে। আর ৪৬ জন অভিযুক্তের আপিল প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। একটি ছাড়া বাকি সব আপিলের নিষ্পত্তি ২০১৪ সালেই শেষ হবে। রুয়ান্ডার প্রথম সরকার প্রধান কর্তৃক গণহত্যা চলাকালে প্রধানমন্ত্রী জিন কাম্বাডাসহ দোষী সাব্যস্ত হওয়া ব্যক্তিদের পরবর্তীকালে গ্রেফতার ও অভিযুক্ত করা হয়।

সভাপতি : বিচারপতি ভন জয়েনসেন (ডেনমার্ক)
প্রসিকিউটর : হাসান বি. জ্যালো (গাম্বিয়া)
রেজিস্ট্রার : বোংগানি মাজোলা (দক্ষিণ আফ্রিকা)
সদর দপ্তর : আরুশা আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র, পোস্ট বক্স ৬০১৬, আরুশা, তানজানিয়া
টেলিফোন : (২৫৫ ২৭) ২৫০ ২৭ ৪২০৭ ৪২১১ বা (নিউইয়র্ক দিয়ে) (১ ২১২) ৯৬৮ ২৮৫০; ফ্যাক্স : (২৫৫ ২৭) ২৫০ ৪০০০ বা (নিউইয়র্ক দিয়ে) (১ ২১২) ৯৬৩ ২৮৪৮

সিয়েরা লিওনের বিশেষ আদালত

২০০০ সালে নিরাপত্তা পরিষদের অনুরোধক্রমে, সিয়েরা লিওন এবং জাতিসংঘ যৌথভাবে ২০০২ সালে সিয়েরা লিওনের বিশেষ আদালতস্থাপন করে। ১৯৯৬ সালের ৩০ নভেম্বর থেকে সিয়েরা লিওনের সীমানার মধ্যে আন্তর্জাতিক মানবিক আইন এবং সিয়েরা লিওনের আইনের গুরুতর লঙ্ঘনের জন্য সর্বাধিক দায়ী ব্যক্তিদের বিচারের আওতায় আনা বাধ্যতামূলক করা হয়। বিশেষ আদালতটি গঠিত হয়েছে চেম্বার (আপিল চেম্বার, বিচারালয়-১ ও বিচারালয়-২), নথি (প্রতিরক্ষা দপ্তরসহ) এবং প্রসিকিউটরের দপ্তর এই তিনটি অঙ্গসংস্থান নিয়ে। এই বিশেষ আদালতটি সরকার কর্তৃক স্বেচ্ছায় দানকৃত অর্থে সম্পূর্ণভাবে পরিচালিত প্রথম আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল এবং সারা বিশ্বের ৪০টি রাষ্ট্র থেকে এটি অর্থ বরাদ্দ পেয়েছে। ২৬ এপ্রিল ২০১২ সালে বিচারালয়-২ সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছায় যে লাইবেরিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট চার্লস টেইলর ডিসেম্বর ১৯৯৮ হতে ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯-এর মধ্যে সিয়েরা লিওনে সংঘটিত বিদ্রোহী হামলার পরিকল্পনায় অংশগ্রহণ করে।

সভাপতি : জন এম. কামান্ডা (সিয়েরা লিওন)
প্রসিকিউটর : ব্রেন্ডা হোলিস (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র)

রেজিস্ট্রার : বিনতা মানসাঢ়ে (সিয়েরা লিওন)
সদর দপ্তর : জোমো কেনাট্টা রোড, নিউ ইংল্যান্ড, ফ্রি টাউন, সিয়েরা লিওন
টেলিফোন : (২৩২ ২২) ২৯৭ ০০০ বা (ইতালি দিয়ে) (৩৯) ০৮৩১ ২৫৭০০০;
ফ্যাক্স : (২৩২ ২২) ২৯৭ ০০১ বা (ইতালি দিয়ে) (৩৯) ০৮৩১ ২৫৭০০১;
ই-মেইল : scsl-mail@un.org

কম্বোডিয়া আদালতের বিশেষ বিচারালয়

গণতান্ত্রিক কাম্পুচিয়ার সময়কালে অপরাধের বিচারের জন্য গঠিত কম্বোডিয়া আদালতের বিশেষ বিচারালয় ২০০৬ সালে গঠিত একটি জাতীয় আদালত, যা ১৭ এপ্রিল ১৯৭৫ থেকে ৬ জানুয়ারি ১৯৭৯ পর্যন্ত খেমাররুজ সরকারের জ্যেষ্ঠ সদস্যদের দ্বারা সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধ, যুদ্ধাপরাধ ও গণহত্যাসহ আন্তর্জাতিক মানব আইন ও কম্বোডিয়ার আইনের ভয়াবহ লঙ্ঘনের শাস্তি প্রদানের জন্য কম্বোডিয়া ও জাতিসংঘের মধ্যকার এক চুক্তি অনুসারে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রত্যেকটি প্রাক-বিচারালয় ও বিচারালয় পাঁচজন করে বিচারক দ্বারা গঠিত, যাদের মধ্যে তিনজন কম্বোডিয়ার অধিবাসী এবং এই তিনজনের মধ্যে একজন সভাপতি। সর্বোচ্চ আদালত বিচারালয়ে সাতজন বিচারক রয়েছেন, যাদের চারজনই কম্বোডিয়ার অধিবাসী এবং তাদের মধ্যে একজন সভাপতি। আন্তর্জাতিক বিচারকগণ জাতিসংঘের মহাসচিবের মনোনয়ন সাপেক্ষে কম্বোডিয়ার সুপ্রিম কোর্ট কাউন্সিল অব ম্যাজিস্ট্রেসি কর্তৃক নিযুক্ত হন। খেমাররুজ বিচারে জাতিসংঘ এই কম্বোডিয়া আদালতের বিশেষ বিচারালয়কে কারিগরি সহায়তা প্রদান করে (United Nations Assistance to the Khmer Rouge Trials-UNAKRT; www.unakrt-online.org)।
প্রাক-বিচারালয় সভাপতি : বিচারপতি প্রাক-কিমসান (কম্বোডিয়া)
বিচারালয় সভাপতি : বিচারপতি নীল নন (কম্বোডিয়া)
সুপ্রিম কোর্টের চেম্বার সভাপতি : বিচারপতি কং স্রিম (কম্বোডিয়া)
সদর দপ্তর : ন্যাশনাল রোড ৪, চাওম চাও কমিউন পরসেনচে জেলা, পোস্ট বক্স ৭১ নমপেন, কম্বোডিয়া; **টেলিফোন :** (৮৫৫) (০) ২৩ ৮৬১ ৫০০; **ফ্যাক্স :** (৮৫৫) (০) ২৩ ৮৬১ ৫৫৫;
ই-মেইল : info@eccc.gov.kh

লেবাননের বিশেষ ট্রাইব্যুনাল

১৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৫ সালে লেবাননের বৈরুতে এক সন্ত্রাসী হামলায় লেবাননের সাবেক প্রধানমন্ত্রী রফিক হারিরিসহ ২২ জন নিহত হলে লেবানন সরকার এই আক্রমণের অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিচারের আওতায় আনার জন্য ২০০৫ সালে একটি আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল গঠনের জন্য জাতিসংঘের কাছে অনুরোধ করে। নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাব অনুসারে লেবাননের বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠনের জন্য জাতিসংঘ এবং লেবানন একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে। এই বিশেষ ট্রাইব্যুনালটি ২০০৭ সালে নিরাপত্তা পরিষদের অতিরিক্ত প্রস্তাব অনুসারে গঠিত হয় এবং ২০০৯ সালে হেগ শহরের নিকটবর্তী লেইসচেন্ডাম– ভুরবার্গে আনুষ্ঠানিকভাবে এর কাজ শুরু হয়। বিশেষ ট্রাইব্যুনালের ট্রায়াল চেম্বারে রয়েছে একজন আন্তর্জাতিক প্রাক-বিচার আদালতের বিচারক, একটি ট্রায়াল চেম্বার (একজন লেবানিজ ও

দু'জন আন্তর্জাতিক–এ তিনজন বিচারক এবং একজন লেবানিজ ও একজন আন্তর্জাতিক–এ দু'জন বিকল্প বিচারক এই চেম্বারে অন্তর্ভুক্ত) এবং একটি আপিল চেম্বার (দু'জন লেবানিজ এবং তিনজন আন্তর্জাতিক এ পাঁচজন বিচারক এই চেম্বারে অন্তর্ভুক্ত)। জাতিসংঘ মহাসচিব লেবানন সরকারের সাথে আলোচনা করে এই বিচারকদের নিয়োগ দেন। ২০১১ সালের জানুয়ারিতে এই বিশেষ ট্রাইব্যুনালটির প্রথম অভিযোগের নিষ্পত্তি হয়।

সভাপতি : স্যার ডেভিড বারাগওয়ানাথ (নিউজিল্যান্ড)

প্রসিকিউটর : নর্মান ফ্যারেল (কানাডা); **রেজিস্ট্রার :** হারমান ভন হেবেল (দ্য নেদারল্যান্ডস)

সদর দপ্তর : ডকটর ভ্যান ডার স্টামস্ট্রাট ১; ২২৬৫ বিসি, লেইশেনদাম, দ্য নেদারল্যান্ডস;

টেলিফোন : (৩১ ০) ৭০ ৮০০ ৩৪০০; **ই-মেইল :** stl-pressoffice@un.org

অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ

জাতিসংঘ এবং বিশেষায়িত সংস্থা ও অন্যান্য সংগঠনের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ডে সমন্বয় সাধনের জন্য জাতিসংঘ সনদ অনুযায়ী একটি মূল অঙ্গ সংস্থা হিসেবে অথনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ গঠিত হয়। পরিষদের ৫৪ জন সদস্য প্রতি তিন বছরের মেয়াদে কাজ করে। ভৌগোলিক প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে এই পরিষদের সদস্যপদ বরাদ্দ করা হয়ে থাকে– আফ্রিকার রাষ্ট্রগুলোতে ১৪টি, এশীয় রাষ্ট্রগুলোতে ১১টি, পূর্ব ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলোতে ৬টি, লাতিন আমেরিকা ও ক্যারিবীয় রাষ্ট্রগুলোতে ১০টি এবং পশ্চিম ইউরোপীয় ও অন্য রাষ্ট্রগুলোতে ১৩টি। প্রতিটি সদস্য রাষ্ট্রের একটি করে ভোট রয়েছে এবং সহজ সংখ্যাগরিষ্ঠতার মাধ্যমে পরিষদের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

কার্যক্রম ও ক্ষমতা

অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের কাজগুলো হচ্ছে :

- আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং পরিবেশগত বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করার মূল কেন্দ্র হিসেবে কাজ করা এবং সদস্য রাষ্ট্রগুলো ও জাতিসংঘের জন্য নীতিনির্ধারণী সুপারিশমালা তৈরি করা;
- টেকসই উন্নয়নের ত্রিমাত্রিক ভারসাম্য অর্জনে সহায়তা করা;
- আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গবেষণা ও প্রতিবেদন তৈরি করে বা এ জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করে সুপারিশ প্রদান করা;
- অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রগুলোর ওপর আন্তর্জাতিক সম্মেলনের প্রস্তুতি ও আয়োজনে সহায়তা করা এবং এসব সম্মেলনের পরবর্তী কার্যক্রমে নিয়োজিত থাকা এবং
- আলোচনার মাধ্যমে বিশেষায়িত সংস্থাগুলোর কাজের সমন্বয় সাধন এবং সাধারণ পরিষদসহ তাদেরকে পরামর্শ ও সুপারিশ প্রদান করা।

আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা ও নীতিনির্ধারণী প্রস্তাবের মাধ্যমে, আন্তর্জাতিক উন্নয়নের প্রতিপালনে এবং জাতিসংঘ ব্যবস্থার অগ্রাধিকার নির্ধারণে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ মুখ্য ভূমিকা পালন করে।

অধিবেশন ও অঙ্গ সংগঠনসমূহ

সংগঠনের কাজ হিসেবে পরিষদ সাধারণত বছরজুড়ে সুশীল সমাজের সদস্যদের সাথে কয়েকটি সংক্ষিপ্ত অধিবেশন এবং অনেকগুলো প্রস্তুতিমূলক সভা, গোলটেবিল বৈঠক ও প্যানেল আলোচনার আয়োজন করে। এছাড়া জুলাই মাসে চার সপ্তাহব্যাপী কার্যকরী অধিবেশনের আয়োজন করে, যা পালাক্রমে প্রতিবছর নিউইয়র্ক ও জেনেভায় অনুষ্ঠিত হয়। এই উচ্চপর্যায়ের অধিবেশনে গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক, সামাজিক ও মানবিক বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করতে মন্ত্রী ও আমলারা যোগ দেন।

এছাড়া পরিষদ জাতিসংঘের বিভিন্ন কার্যক্রম; যেমন– ইউএনডিপি, ইউএনইপি, ইউএনএফপিএ, ইউএন-হ্যাবিট্যাট ও ইউনিসেফ এবং বিশেষায়িত সংস্থাগুলো; যেমন– এফএও, আইএলও, ডব্লিউএইচও ও ইউনেসকোর কাজে সহায়তা এবং কিছু পরিসরে এদের কার্যক্রম সমন্বয় পর্যন্ত করে, আর এরা সবাই পরিষদের কাছে জবাবদিহি করে এবং কার্যকরী অধিবেশনের জন্য সুপারিশ করে।

পরিষদের বছরব্যাপী কার্যক্রম তার সহযোগী ও সহগামী সংগঠনের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। এগুলোর মধ্যে রয়েছে :

- আটটি কার্যকরী কমিশন বা স্বেচ্ছাসংস্থা যাদের ভূমিকা হলো নিজস্ব আওতা ও দক্ষতা সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো নিয়ে চিন্তাভাবনা করা ও সুপারিশমালা প্রণয়ন করা : পরিসংখ্যান কমিশন, জনসংখ্যা ও উন্নয়ন বিষয়ক কমিশন, সামাজিক উন্নয়ন কমিশন, নারী অধিকার বিষয়ক কমিশন, মাদকদ্রব্য বিষয়ক কমিশন, অপরাধ নিরোধ ও অপরাধীর বিচার সংক্রান্ত কমিশন, উন্নয়নের জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক কমিশন ও টেকসই উন্নয়ন বিষয়ক কমিশন এবং বন সংক্রান্ত জাতিসংঘ ফোরাম;
- পাঁচটি আঞ্চলিক কমিশন : আফ্রিকার জন্য অর্থনৈতিক কমিশন (আদ্দিস আবাবা, ইথিওপিয়া), এশীয় ও প্রশান্ত মহাসগরীয় অঞ্চলের জন্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক কমিশন (ব্যাংকক, থাইল্যান্ড), ইউরোপের জন্য অর্থনৈতিক কমিশন (জেনেভা, সুইজারল্যান্ড), লাতিন আমেরিকা ও ক্যারিবীয় অঞ্চলের জন্য অর্থনৈতিক কমিশন (সান্তিয়াগো, চিলি) এবং পশ্চিম এশিয়ার জন্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক কমিশন (বৈরুত, লেবানন);
- তিনটি স্থায়ী কমিটি : কর্মসূচি ও সমন্বয় সম্পর্কিত কমিটি, বেসরকারি সংস্থা বিষয়ক কমিটি, আন্তঃসরকারি এজেন্সিগুলোর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা বিষয়ক কমিটি;
- ভৌগোলিক নাম, জনপ্রশাসন, কর বিষয়ে আন্তর্জাতিক সমন্বয় এবং বিপজ্জনক মালামাল পরিবহন সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ পর্ষদ;
- দেশজ বা আদিবাসী বিষয় সম্পর্কিত স্থায়ী ফোরামসহ অন্যান্য গোষ্ঠী।

টেকসই উন্নয়ন বিষয়ক জাতিসংঘ সম্মেলনে (রিও ডি জেনেরিও, ব্রাজিল, ২০-২২ জুন ২০১২) সদস্য রাষ্ট্রগুলো টেকসই উন্নয়ন বিষয়ক কমিশনের স্থলে একটি উচ্চপর্যায়ের রাজনৈতিক ফোরাম গঠনের ব্যাপারে একমত হন।

আঞ্চলিক কমিশন

জাতিসংঘের আঞ্চলিক কমিশনগুলো ইকোসোক (ECOSOC)-এর কাছে দায়িত্বপ্রাপ্ত এবং জাতিসংঘের নিয়মিত বাজেটের মাধ্যমে অর্থ বরাদ্দ পায়; তাদের দপ্তরগুলো জাতিসংঘ মহাসচিবের কর্তৃত্বাধীন। তাদের কাজ হলো প্রত্যেক অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে অগ্রসর

করা এবং নিজেদের মধ্যে ও বিশ্বের অন্য রাষ্ট্রগুলোর সাথে ঐ অঞ্চলের রাষ্ট্রগুলোর অর্থনৈতিক সম্পর্ক শক্তিশালী করা।

আফ্রিকার অর্থনৈতিক কমিশন

১৯৫৮ সালে প্রতিষ্ঠিত আফ্রিকার এই অর্থনৈতিক কমিশনটি আফ্রিকা মহাদেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক খাতগুলো বিকাশে উৎসাহ জোগায়। ইসিএ-এর ৫৩টি সদস্য দেশের মধ্যে উৎপাদন, বাণিজ্য, আর্থিক, অবকাঠামো ও প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রগুলোতে অর্থনৈতিক সহযোগিতা এবং সমন্বয় বৃদ্ধি করতে নীতি ও কৌশল অবলম্বন করে থাকে। এটি যেসব বিষয়ের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে সেগুলো হলো অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ে তথ্য বিশ্লেষণ, খাদ্য নিরাপত্তা ও টেকসই উন্নয়ন, উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা, উন্নয়নের জন্য তথ্য বিপ্লব এবং আঞ্চলিক সহযোগিতা ও সমন্বয়। নারীদের অবস্থা উন্নীতকরণ, উন্নয়ন বিষয়ে নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং জাতীয় উন্নয়নে মুখ্য উপাদান হিসেবে লিঙ্গ সমতা নিশ্চিতকরণ ইত্যাদি বিষয়গুলোতে কমিশন বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে।

নির্বাহী সচিব : ড. কার্লোস লোপেস (গিনি বিসাউ)
ঠিকানা : পোস্ট বক্স ৩০০১, আদ্দিস আবাবা, ইথিওপিয়া; **টেলিফোন :** (২৫১ ১১) ৫৫১ ৭২০০; **ফ্যাক্স :** (২৫১ ১১) ৫৫১-০৩৬; **ই-মেইল :** ecainfo@uneca.org

ইউরোপের অর্থনৈতিক কমিশন

১৯৪৭ সালে সৃষ্ট ইউরোপের অর্থনৈতিক কমিশন মূলত উত্তর আমেরিকা, ইউরোপ (ইসরায়েলসহ) এবং মধ্য এশিয়ার অর্থনৈতিক সহযোগিতার ফোরাম। ইসিইর রয়েছে ৫৬টি সদস্য রাষ্ট্র। অগ্রাধিকারভিত্তিক ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ, পরিবেশ ও মানব বসতি, পরিসংখ্যান, টেকসই শক্তি, বাণিজ্য, অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও সমন্বয়, বাসস্থান ও ভূমি ব্যবস্থাপনা, জনসংখ্যা, বনবিদ্যা ও কাঠ এবং পরিবহন অন্তর্ভুক্ত। এটি প্রাথমিকভাবে নীতি বিশ্লেষণ ও বিতর্ক, সেই সাথে রীতিনীতি, নিয়মকানুন, মানদণ্ড ও সমন্বয়ের মাধ্যমে তার লক্ষ্য অন্বেষণ করে। এসব ব্যবস্থা কমিশনের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলে এবং অবশিষ্ট বিশ্বের সাথে বাণিজ্য সহজতর করতে সহায়তা করে। পরিবেশ উন্নয়নের দিকেও নজর দেয়। ইসিই এসব বিষয়ের বাস্তবায়নে সদস্যরাষ্ট্রগুলোকে কারিগরি সহায়তা দিয়ে অবদান রাখে, বিশেষ করে যারা অর্থনৈতিক পালাবদলের শিকার।

নির্বাহী সম্পাদক : সভেন আলকালাজ (বসনিয়া অ্যান্ড হার্জেগোভিনা)
ঠিকানা : পালে দে নেশানস, সিএইচ-১২১১, জেনেভা ১০, সুইজারল্যান্ড
টেলিফোন : (৪১ ২২) ৯১৭ ৪৪৪৪; **ফ্যাক্স :** (৪১ ২২) ৯১৭ ০৫০৫
ই-মেইল : info.ece@unece.org

লাতিন আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ান অর্থনৈতিক কমিশন

১৯৪৮ সালে প্রতিষ্ঠিত লাতিন আমেরিকা এবং ক্যারিবিয়ান অর্থনৈতিক কমিশন আওতাধীন অঞ্চলে টেকসই অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে নীতিমালার সমন্বয় সাধন করে। লাতিন আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ানের ৩৩টি দেশসহ উত্তর আমেরিকা, এশিয়া এবং ইউরোপের

১১টি জাতি ইসিএলএসি-এর সদস্য, যাদের এই অঞ্চলের সাথে ঐতিহাসিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বন্ধন আছে। ক্যারিবিয়ানের নয়টি পরাধীন অঞ্চল এই কমিশনের সহযোগী সদস্য। এই কমিশন কৃষি উন্নয়ন, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিকল্পনা, শিল্প, প্রযুক্তিগত ও উদ্যোক্তাগত উন্নয়ন, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, আঞ্চলিক একীভূতকরণ ও সহযোগিতা, বিনিয়োগ ও অর্থায়ন, সামাজিক উন্নয়ন ও সাম্য, উন্নয়নে নারীর অন্তর্ভুক্তি, প্রাকৃতিক সম্পদ ও অবকাঠামো, পরিবেশ ও মানব বসতি, পরিসংখ্যান, প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা এবং জনতত্ত্ব ও জনসংখ্যা নীতি ইত্যাদির ওপর গুরুত্ব আরোপ করে।

নির্বাহী সচিব : অ্যালিসিয়া বারসেনা ইবারা (মেক্সিকো)

ঠিকানা : অ্যাভেনিদা ড্যাগ হ্যামারস্কোল্ড ৩৪৭৭ ক্যাসিয়া ১৭৯-ডি, সান্তিয়াগো দ্য চিলি

টেলিফোন : (৫৬ ২) ২৪৭১ ২০০০ **ফ্যাক্স:** (৫৬ ২) ২০৮ ০২৫২

ই-মেইল : secepal@cepal.org

এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কমিশন

১৯৪৭ সালে গঠিত এশিয়া এবং প্যাসিফিক অঞ্চলের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কমিশনের দায়িত্ব হলো এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যাগুলোর সমাধান করা। এশিয়া ও প্যাসিফিক দেশগুলোর জন্য একমাত্র আন্তঃসরকারি ফোরাম হলো ESCAP। এর ৫৩টি সদস্য রাষ্ট্র ও ৯টি সহযোগী সদস্য রাষ্ট্র বিশ্বের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৬০ শতাংশের প্রতিনিধিত্ব করে। এসক্যাপ সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সরকারগুলোকে প্রযুক্তিগত সহায়তা দেয়। সরকারগুলোকে উপদেশমূলক সেবা, প্রশিক্ষণ এবং প্রকাশনা ও আন্তঃদেশীয় সংযোগের সাহায্যে তথ্য জোগানের মাধ্যমে এই সহায়তাগুলো দেয়া হয়। কমিশন আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি এবং এই অঞ্চলে আধুনিক সমাজের ভিত্তি নির্মাণের লক্ষ্য নির্ধারণ করে। কৃষি উন্নয়ন, কৃষি যন্ত্রপাতি ও প্রকৌশল, পরিসংখ্যান এবং প্রযুক্তি স্থানান্তর– এই চারটি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান এ কমিশনের পৃষ্ঠপোষকতায় কাজ করে। অগ্রাধিকারভিত্তিক ক্ষেত্রগুলো হলো দারিদ্র্য হ্রাসকরণ, বিশ্বায়ন এবং উদীয়মান সামাজিক সমস্যাবলি।

নির্বাহী সচিব : নোয়েলিন হেজার (সিঙ্গাপুর)

ঠিকানা : জাতিসংঘ ভবন, রাজড্যামনার্ন নক অ্যাভিনিউ, ব্যাংকক ১০২০০, থাইল্যান্ড

টেলিফোন : (৬৬ ২) ২৮৮ ১২৩৪; **ফ্যাক্স :** (৬৬ ২) ২৮৮ ১০০০;

ই-মেইল : escap-registry@un.org

পশ্চিম এশিয়া অর্থনৈতিক ও সামাজিক কমিশন

১৯৭৩ সালে প্রতিষ্ঠিত পশ্চিম এশিয়া অর্থনৈতিক ও সামাজিক কমিশন অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও সমন্বয়ের মাধ্যমে এ অঞ্চলের দেশগুলোর অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের পথ সুগম করে। ১৭টি সদস্য রাষ্ট্রের সমন্বয়ে গঠিত ইএসসিডব্লিউএ জাতিসংঘ ব্যবস্থাপনায় পশ্চিম এশিয়ার অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের মূল ফোরাম হিসেবে কাজ করে। এর মুখ্য ক্ষেত্রগুলো হলো– টেকসই উন্নয়ন ও উৎপাদনশীলতা, সামাজিক উন্নয়ন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও বিশ্বায়ন, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, পরিসংখ্যান, নারীর ক্ষমতায়ন এবং দ্বন্দ্ব সম্পর্কিত বিষয়াবলি।

নির্বাহী সচিব : রিমা খালাফ (জর্ডান)
ঠিকানা : পোস্ট বক্স ১১-৮৫৭৫, রিয়াদ এল-সোল স্কয়ার, বৈরুত, লেবানন
টেলিফোন : (৯৬১ ১)৯৮ ১৩০১ বা (নিউইয়র্ক দিয়ে) (১ ২১২) ৯৬৩ ৯৭৩১
ফ্যাক্স : (৯৬১ ১) ৯৮ ১৫১০

বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে সম্পর্ক

জাতিসংঘ বেসরকারি সংস্থাগুলোকে (এনজিও) তাদের গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার এবং সুশীল সমাজের সাথে সংযোগ স্থাপনের উপায় হিসেবে বিবেচনা করে। পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত নীতি ও কার্যক্রমগুলো নিয়ে নিয়মিত পরামর্শ করে, বিশ্বের ক্রমবর্ধমান এনজিওগুলো প্রতিদিন জাতিসংঘ জনসমাজের সঙ্গে সহযোগিতার মাধ্যমে এর লক্ষ্য অর্জনে সচেষ্ট থাকে। জাতিসংঘ সনদ অনুযায়ী অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ শুধুমাত্র জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রগুলোর সাথেই নয়, বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে এনজিওগুলোর সাথেও তাদের এখতিয়ার অনুযায়ী পরামর্শ করতে পারে। সেপ্টেম্বর ২০১২ পর্যন্ত হিসাব অনুযায়ী প্রায় ৩,৭৩৫টি এনজিওর পরিষদের পরামর্শক হিসেবে মর্যাদা ছিল। পরিষদ স্বীকৃতি দেয় যে, এসব প্রতিষ্ঠানের মতামত প্রকাশের সুযোগ থাকা উচিত এবং পরিষদের কাজের ক্ষেত্রে মূল্যবান হতে পারে এমন বিশেষ অভিজ্ঞতা ও প্রযুক্তিগত জ্ঞান তাদের রয়েছে।

পরিষদ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করেছে : পরিষদের বেশিরভাগ কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িত সাধারণ সংগঠন; পরিষদের নির্দিষ্ট কার্যক্রমের জন্য কর্মদক্ষতাসম্পন্ন বিশেষায়িত সংগঠন এবং পরিষদের বিশেষ উদ্দেশ্যে গৃহীত অনিয়মিত কার্যক্রমের ক্ষেত্রে সহায়ক রোস্টার সংগঠন। যেসব বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের পরামর্শক মর্যাদা রয়েছে তারা পরিষদ কিংবা এর সহায়ক প্রতিষ্ঠানগুলোর সভাগুলোতে পর্যবেক্ষক পাঠাতে পারে এবং কার্যক্রম-সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে লিখিত বিবৃতি পেশ করতে পারে।

আন্তর্জাতিক বিচার আদালত (আইসিজে)

আন্তর্জাতিক বিচার আদালত হলো জাতিসংঘের প্রধান বিচার সংক্রান্ত অঙ্গ সংস্থা। নেদারল্যান্ডসের হেগ শহরে অবস্থিত এই সংস্থাটি জাতিসংঘের ৬টি প্রধান অঙ্গ সংস্থার মধ্যে একমাত্র, যেটি নিউইয়র্কে অবস্থিত নয়। এটি ১৯৪৬ সালে আন্তর্জাতিক বিচারের স্থায়ী আদালতের স্থলে এর কাজ শুরু করে। আইসিজে সর্বজনীন চরিত্রের একমাত্র সাধারণ বিচার ব্যবস্থা, যা বিশ্ব আদালত নামেও পরিচিত। এই আদালতের সংবিধিগুলো জাতিসংঘ সনদের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

উদ্দেশ্য

আন্তর্জাতিক আদালতের দুটি ভূমিকা রয়েছে : প্রথমটি হলো—সদস্য রাষ্ট্রগুলো কর্তৃক উত্থাপিত আইনি বিবাদগুলো আন্তর্জাতিক আইনানুসারে নিষ্পত্তি করা (আইসিজে ঘোষিত রায়গুলো অলঙ্ঘনীয় এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষ কর্তৃক আপিলের অযোগ্য) এবং দ্বিতীয়টি হলো : জাতিসংঘের অনুমোদিত অঙ্গসংস্থা এবং এজেন্সিগুলো কর্তৃক প্রেরিত আইনি প্রশ্নে উপদেশমূলক মতামত প্রদান করা। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে আইসিজের কাছে যত মামলা এসেছে

তার ৮০ শতাংশই বিরোধ সংক্রান্ত এবং আইসিজে এ পর্যন্ত ১০০টিরও বেশি বিরোধে; যেমন– আন্তর্জাতিক সীমানা ও দেশীয় সার্বভৌমত্ব, আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের লঙ্ঘন এবং কূটনৈতিক সম্পর্কিত মামলায় রায় প্রদান করেছে। এই আদালত এ পর্যন্ত প্রায় ৩০টি উপদেশমূলক মতামতও প্রদান করেছে।

বিচারিক এখতিয়ার

আইসিজে জাতিসংঘে সংবিধিভুক্ত সব রাষ্ট্রপক্ষের জন্য উন্মুক্ত, যার মধ্যে জাতিসংঘের সদস্যগুলো অন্তর্ভুক্ত। শুধু রাষ্ট্রই এই আদালতে মামলার পক্ষ হতে পারে এবং বিরোধ উত্থাপন করতে পারে। জাতিসংঘ সনদ, আন্তর্জাতিক চুক্তি ও নিয়মপত্রে উপলব্ধ সব বিষয় এই আদালতের এখতিয়ারভুক্ত। রাষ্ট্র আদালতের শরণ নিয়ে বা তার ঘোষণা দিয়ে কোনো চুক্তি বা নিয়মপত্র সই করার মাধ্যমে এ আদালতের রায়কে আগেভাগেই মেনে নিতে পারে। বাধ্যতামূলক রায় মানার এই ঘোষণা কিছু নির্দিষ্ট শ্রেণির বিরোধ ব্যতীত প্রায়ই সন্দেহের উদ্রেক করে। এই আদালত বলবৎ আন্তর্জাতিক আইন ও চুক্তিগুলো, আন্তর্জাতিক রীতিনীতি, আইনের সাধারণ তত্ত্বগুলো, সম্পূরক হিসেবে বিচারিক সিদ্ধান্ত এবং সর্বোচ্চ যোগ্যতাসম্পন্ন আন্তর্জাতিক আইন বিশেষজ্ঞদের শিক্ষার আলোকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

বিচারকগণ

আন্তর্জাতিক বিচার আদালত ১৫ জন বিচারক নিয়ে গঠিত, যারা সাধারণ পরিষদ এবং নিরাপত্তা পরিষদের স্বাধীন ভোটের মাধ্যমে নয় বছর মেয়াদের জন্য নির্বাচিত হন। পাঁচটি পদ প্রতি তিন বছর অন্তর নবায়ন করা হয় এবং বিচারকগণ আরো নয় বছরের জন্য পুনর্নির্বাচিত হতে পারেন। আদালতের প্রতিটি সদস্যকে ভিন্ন ভিন্ন দেশের হতে হবে। তারা তাদের দেশের প্রতিনিধিত্ব করেন না: তাঁরা প্রত্যেকেই স্বাধীন বিচারক। এই আদালতের গঠনকে সভ্যতার মূল রূপ এবং বিশ্বের মুখ্য আইনি ব্যবস্থাকেও প্রতিফলিত করতে হয়। বেশ কিছু বছর ধরে, আদালতটি নিরাপত্তা পরিষদের বর্তমান সদস্য অনুসারে নিম্নোক্ত ভৌগোলিক সমতা বজায় রেখেছে: বেঞ্চের পাঁচটি আসনে রয়েছে পশ্চিম ইউরোপ এবং অন্যান্য পশ্চিমা দেশের বিচারকগণ; আফ্রিকা থেকে তিনজন বিচারক; এশিয়া থেকে তিনজন; পূর্ব ইউরোপ থেকে দু'জন এবং লাতিন আমেরিকা থেকে দু'জন। কোনো দেশ নির্দিষ্টভাবে কোনো আসনের অধিকারী না হলেও, প্রতিবারই একজন করে বিচারক নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচ স্থায়ী সদস্যের মধ্যে থেকে হয়ে থাকে। যদি কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে আদালতটি প্রতিটি রাষ্ট্র থেকে একজন করে বিচারক না পায়, তাহলে ওই রাষ্ট্রগুলো প্রত্যেকে একজন করে অ্যাডহক (অস্থায়ী) বিচারক নিয়োগ করতে পারে। এ ধরনের বিচারকদের অধিকার ও দায়িত্ব, নির্বাচিত বিচারকদের মতোই হয়।

বাজেট

আন্তর্জাতিক বিচার আদালতের বার্ষিক বাজেট সাধারণ পরিষদে গৃহীত হয়। ২০১২-১৩-এর দ্বিবার্ষিক বাজেট অনুযায়ী, প্রতি বছরের জন্য ২৩.৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বরাদ্দ ছিল।
সভাপতি : বিচারপতি পিটার তমকা (স্লোভাকিয়া)

রেজিস্ট্রার : ফিলিপ কভরার (বেলজিয়াম)
সদর দপ্তর : পিস প্যালেস, কারনেগিপ্লিন ২, ২৫১৭ কে জে হেগ, নেদারল্যান্ডস
টেলিফোন : (৩১) ৭০ ৩০২ ২৩ ২৩;
ফ্যাক্স : (৩১) ৭০ ৩৬৪ ৯৯ ২৮

অছি পরিষদ

অছি পরিষদ মূলত সনদ অনুসারে সাতটি সদস্য রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে ১১টি অছি এলাকার আন্তর্জাতিক রক্ষণাবেক্ষণের জন্য, এবং এলাকাগুলোর স্বায়ত্তশাসন বা স্বাধীনতার প্রস্তুতিপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য গঠিত হয়। এই পরিষদ ৪৯ বছর ধরে এ দায়িত্ব পালন করে আসছে। ১৯৯৪ সালে গৃহীত এক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, পরিষদের বার্ষিক সাক্ষাতের প্রতিজ্ঞা সংশোধন করে শুধু প্রয়োজন অনুযায়ী– যেমন অছি পরিষদ বা এর সভাপতির সিদ্ধান্তে অথবা পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য বা সাধারণ পরিষদ বা নিরাপত্তা পরিষদের অনুরোধে সাক্ষাতের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। পরবর্তীকালে ১৯৯৪ সালের ১ অক্টোবরে সর্বশেষ জাতিসংঘ অছি এলাকা 'পালাউ' স্বাধীন হওয়ার মধ্য দিয়ে একই বছরের ১ নভেম্বর অছি পরিষদ তার কর্মকাণ্ড স্থগিত করে।

সচিবালয়

জাতিসংঘ সচিবালয় গঠিত হয়েছে বিশ্বজুড়ে কার্যদপ্তরগুলোতে কর্মরত সব জাতির প্রতিনিধিত্বকারী কর্মীদের নিয়ে, যারা সংগঠনের বিবিধ দৈনন্দিন কার্যাবলি সম্পাদন করে। বিশ্বব্যাপী প্রায় ৪২,৯০০ কর্মী সদস্য নিয়ে, সচিবালয় অন্য মুখ্য অঙ্গসংস্থাগুলোকে সেবা দান করে ও তাদের প্রতিষ্ঠিত কর্মসূচি ও নীতিমালাসমূহের তদারকি করে। সচিবালয়ের প্রধান হলেন মহাসচিব, যিনি নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশক্রমে নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক নবায়নযোগ্য পাঁচ বছর মেয়াদে নিয়োগপ্রাপ্ত।

সদর দপ্তর নিউইয়র্কে হলেও জাতিসংঘ তার উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি বজায় রেখেছে আদ্দিস আবাবা, ব্যাংকক, বৈরুত, জেনেভা, নাইরোবি, সান্তিয়াগো দ্য চিলি, ভিয়েনাতে এবং বিশ্বজুড়ে এর আরও অনেক দপ্তর রয়েছে। জাতিসংঘের জেনেভা অফিসটি কূটনৈতিক সম্মেলন এবং নিরস্ত্রীকরণ ও মানবাধিকার ফোরামের একটি কেন্দ্র। জাতিসংঘের ভিয়েনা অফিসটি আন্তর্জাতিক মাদকের অপব্যবহার নিয়ন্ত্রণ, অপরাধ নিবারণ এবং অপরাধীদের বিচার, মহাশূন্যের শান্তিপূর্ণ ব্যবহার এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য আইন বিষয়ক কার্যক্রমগুলোর সদর দপ্তর। জাতিসংঘের নাইরোবি অফিসটি পরিবেশ ও মানব বসতি বিষয়ক কার্যক্রমের সদর দপ্তর।

জাতিসংঘের নানাবিধ আলোচ্য বিষয় ও কার্যাবলির মতো, সচিবালয়ের ওপর অর্পিত দায়িত্বও ব্যাপক ও বৈচিত্র্যময়। এগুলো শান্তিরক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা, আন্তর্জাতিক বিরোধের মধ্যস্থতা করা এবং মানবকল্যাণকর ত্রাণ কর্মসূচির আয়োজন করা থেকে শুরু করে অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রবণতা নিরীক্ষা করা, মানবাধিকার ও টেকসই উন্নয়ন বিষয়ে পাঠ করা এবং আন্তর্জাতিক চুক্তির ক্ষেত্র তৈরি করা পর্যন্ত বিস্তৃত। সচিবালয়ের কর্মকর্তারা জাতিসংঘের কার্যক্রম সম্পর্কে গোটা বিশ্বকে তথা গণমাধ্যম, সরকার, এনজিও, গবেষণা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সাধারণ জনগণকে অবহিত করে। তারা বৈশ্বিক তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়

নিয়ে আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করে; সংগঠনের দাপ্তরিক ভাষাগুলোতে বিভিন্ন বক্তব্য ভাষান্তর ও দলিলাদি অনুবাদ করে এবং ক্লিয়ারিং হাউস কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির পাশাপাশি সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক কার্যক্রমের সব ক্ষেত্রগুলোসহ সম্ভাব্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতা প্রদান করে।

জাতিভিত্তিক সম্প্রদায়গুলোর জন্য কাজ করলেও আন্তর্জাতিক সিভিল সার্ভেন্ট হিসেবে কার্যরত মহাসচিব এবং কর্মকর্তারা তাদের কার্যক্রমের জন্য শুধু জাতিসংঘের কাছে জবাবদিহি করে, কোনো সদস্য রাষ্ট্র বা অন্যান্য সংগঠনের কাছে নয়। তারা কোনো সরকার বা বহিঃকর্তৃপক্ষের কাছ থেকে নির্দেশ গ্রহণ না করার ব্যাপারে অঙ্গীকারবদ্ধ। এর বদলে সনদ অনুসারে, মহাসচিব ও কর্মকর্তাদের দায়িত্বের স্বতন্ত্র আন্তর্জাতিক চরিত্রের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে এবং তাদেরকে অবৈধভাবে প্রভাবিত করা থেকে বিরত থাকার ব্যাপারে প্রতিটি সদস্য রাষ্ট্র প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

মহাসচিব

মহাসচিবের নির্বাহী দপ্তরটি মহাসচিব এবং তাঁর সিনিয়র উপদেষ্টাদের নিয়ে গঠিত, যারা সাধারণ নীতিমালা তৈরি করে এবং সংগঠনকে সামগ্রিক দিকনির্দেশনা প্রদান করে। একাধারে কূটনীতিবিদ ও প্রচারক, বেসামরিক কর্মকর্তা ও মুখ্য কার্যনির্বাহী হিসেবে মহাসচিব হচ্ছেন জাতিসংঘ আদর্শের প্রতীক এবং বিশ্বজনতা, সর্বোপরি দরিদ্র ও অরক্ষিত জনতার স্বার্থরক্ষার একজন মুখপাত্র।

জাতিসংঘ সনদ অনুযায়ী, মহাসচিব নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশের ভিত্তিতে সাধারণ পরিষদ কর্তৃক পাঁচ বছর মেয়াদির জন্য নিয়োগকৃত। অষ্টম মহাসচিব কোরিয়া প্রজাতন্ত্রের বান কি-মুন, ২০০৭ সালে প্রথমবারের মতো মহাসচিবের পদ গ্রহণ করেন এবং ২০১২ সালে দ্বিতীয় দফায় পাঁচ বছর মেয়াদ শুরু করেন। বান কি-মুনের পূর্বসূরিরা হলেন : কফি এ আনান (ঘানা), জানুয়ারি ১৯৯৭ থেকে ডিসেম্বর ২০০৬; বুট্রোস বুট্রোস-ঘালি (মিসর), জানুয়ারি ১৯৯২ থেকে ডিসেম্বর ১৯৯৬; জেভিয়ার পেরেজ ডি কুয়েলার (পেরু), জানুয়ারি ১৯৮২ থেকে ডিসেম্বর ১৯৯১; কুর্ট ওয়াল্ডহেইম (অস্ট্রিয়া), জানুয়ারি ১৯৭২ থেকে ডিসেম্বর ১৯৮১; উ থান্ট (বার্মা, বর্তমানে মিয়ানমার), নভেম্বর ১৯৬১, ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব (প্রধান মহাসচিব হিসেবে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে ১৯৬২ সালের নভেম্বরে নিয়োগ পান) হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হওয়া থেকে ডিসেম্বর ১৯৭১; ড্যাগ হ্যামারশোল্ড (সুইডেন), যিনি এপ্রিল ১৯৫৩ হতে সেপ্টেম্বর ১৯৬১ সালে আফ্রিকায় বিমান দুর্ঘটনায় নিহত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন– একমাত্র মহাসচিব যিনি কর্মরত অবস্থায় মারা যান এবং ট্রিগভি লাই (নরওয়ে), প্রথম মহাসচিব, যিনি ১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে তার কাজ শুরু করেন।

জাতিসংঘ সনদ অনুযায়ী মহাসচিব সংগঠনের 'প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তা', যিনি ঐ পদাধিকারবলে কাজ করেন এবং পাশাপাশি নিরাপত্তা পরিষদ, সাধারণ পরিষদ, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদসহ জাতিসংঘের অন্যান্য অঙ্গ সংস্থা কর্তৃক ন্যস্ত কার্যাবলিও সম্পাদন করেন। সনদ আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার প্রতি হুমকিমূলক কোনো বিষয়কে নিরাপত্তা পরিষদের নজরে আনার ক্ষমতাও মহাসচিবকে প্রদান করে। এই নির্দেশিকাগুলো দপ্তরের কার্যক্রম ও ক্ষমতা উভয়কেই বর্ণনা করে এবং কর্মের বিবেচনাযোগ্য বিচ্যুতি সামান্য পরিমাণেই অনুমোদন করে। মহাসচিবকে অবশ্যই জাতিসংঘের মূল্যবোধ ও নৈতিক কর্তৃত্ব

বজায় রেখে প্রতিটি সদস্য রাষ্ট্রের চাহিদা ও সমস্যাগুলো বিবেচনা করতে হয় এবং স্বাধীনভাবে শান্তিরক্ষার কথা বলতে ও কাজ করতে হবে, এমনকি ঐ রাষ্ট্রের সাথে মতানৈক্য বা যুদ্ধের ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও। তিনি বৈশ্বিক সমস্যা সমাধানের খোঁজে, সদস্য রাষ্ট্রগুলোর দৃষ্টিকোণ বিবেচনায় নিয়ে সতর্কভাবে দৈনন্দিন ভারসাম্য রক্ষা করে চলেন। মহাসচিবের ভ্রমণ তাঁকে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর নাগরিকদের সাথে মিলিত হওয়ার এবং আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি সম্পর্কিত সমস্যাগুলো কীভাবে সর্বত্র মানুষের জীবনকে মূর্তভাবে প্রভাবিত করে তা চাক্ষুষ দেখার সুযোগ করে দেয়।

মহাসচিব জাতিসংঘের কাজ নিয়ে একটি বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ করেন, যা সংগঠনের কার্যাবলি এবং ভবিষ্যৎ অগ্রাধিকারের রূপরেখা মূল্যায়ন করে। জাতিসংঘ মহাসচিবের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাগুলোর একটি হলো মধ্যস্থতা করা যেমন তাঁর স্বাধীনতা, নিরপেক্ষতা ও ন্যায়পরায়ণতার ওপর দাঁড়িয়ে প্রকাশ্যে বা গোপনে গৃহীত পদক্ষেপের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বিরোধের উদ্ভব, বিকাশ ও বিস্তার রোধ করা।

বহু বছর ধরে, মহাসচিবের বিশেষ ও ব্যক্তিগত প্রতিনিধি এবং দূতগণের কার্যকলাপসহ তাঁর দাপ্তরিক কর্মকাণ্ড অনেক ব্যাপক পরিস্থিতিতে হিতকর হিসেবে প্রমাণিত হয়ে এসেছে, যার মধ্যে রয়েছে সাইপ্রাস, পূর্ব তিমুর, ইরাক, লিবিয়া, মধ্যপ্রাচ্য, নাইজেরিয়া এবং পশ্চিম সাহারা সংক্রান্ত ঘটনাগুলো।

প্রত্যেক মহাসচিবের ভূমিকা ও কার্যকলাপ তার নির্দিষ্ট সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে নিরূপণ করা হয়। বান কি-মুনের প্রথম মেয়াদের কর্মকাণ্ডের অগ্রাধিকার ক্ষেত্রগুলো ছিল জলবায়ু পরিবর্তন; নিরস্ত্রীকরণ; বৈশ্বিক অর্থ সংকট প্রশমন ও দারিদ্র্য নিরসন; স্বাস্থ্য; শান্তি ও নিরাপত্তা; নারীর অধিকার ও ক্ষমতায়ন; গণহত্যা, যুদ্ধাপরাধ, জাতিগত বিরোধ ও মানবতাবিরোধী অপরাধ থেকে পৃথিবীর সব মানুষকে রক্ষা এবং জাতিসংঘের সংস্কার। তাঁর দ্বিতীয় মেয়াদের অগ্রাধিকারগুলো ছিল টেকসই উন্নয়ন; প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঝুঁকি, সশস্ত্র

মহাসচিব বান কি-মুন তুরস্কের সীমানাসংলগ্ন ইসলাহাই শহরের একটি শিবিরে সিরিয়ার উদ্বাস্তুদের পরিদর্শন করেন (৭ ডিসেম্বর ২০১২, জাতিসংঘ চিত্র/মার্ক গার্টেন)

সংঘাত, মানবাধিকার লঙ্ঘন ও অর্থনৈতিক ব্যর্থতার প্রভাব মোকাবেলা; আরও নিরাপদ ও সুরক্ষিত বিশ্ব বিনির্মাণ; পরিবর্তনমুখী জাতিগুলোকে সহায়তা প্রদান এবং নারী ও যুবসমাজের উন্নয়নের জন্য নিয়োজিত থাকা– যে অগ্রাধিকারগুলোকে তিনি 'অগ্রসরমান দায়িত্ব ও সুযোগ' নামে আখ্যায়িত করেছিলেন। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে জাতিসংঘ কর্তৃক শান্তিরক্ষার চাহিদা অভূতপূর্ব হারে বৃদ্ধি পাওয়ায়, এর সাথে তাল মেলানোর জন্য মহাসচিব তাঁর প্রথম মেয়াদের প্রারম্ভেই সংগঠনের মৌলিক কাঠামোগত সংস্কারের প্রস্তাবনা পেশ করেছিলেন। প্রত্যুত্তরে, সাধারণ পরিষদ শান্তিরক্ষার দৈনন্দিন কাজের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য একটি মাঠ পর্যায়ের কর্মবান্ধব বিভাগ তৈরির অনুমোদন দেয়, যেন শান্তিরক্ষা পরিচালনাকারী বিভাগ সার্বিক কৌশল, পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের কাজে অবাধ মনোনিবেশ করতে পারে। মহাসচিবের নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা বন্ধে ইউনাইট (UNITE) ক্যাম্পেইন বিশ্বের সব প্রান্তের নারী ও মেয়েদের বিরুদ্ধে সহিংসতা নির্মূল করার লক্ষ্যে কাজ করে। এছাড়াও তিনি নিরস্ত্রীকরণ বিষয়ক জাতিসংঘ দপ্তর তৈরি করেছেন এবং নিরস্ত্রীকরণ বিষয়ক একজন বিশেষ প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছেন।

মহাসচিবের অতীত প্রচেষ্টাপ্রসূত কার্যকলাপের লক্ষ্য ছিল আসন্ন যুগের বৈশ্বিক পরিস্থিতির সাথে জাতিসংঘকে খাপ খাওয়াতে সাহায্য করা। উদাহরণস্বরূপ, জুলাই ২০০০-এ শুরু হওয়া গ্লোবাল কম্প্যাক্ট হলো একটি নেটওয়ার্কভিত্তিক উদ্যোগ, যা মানবাধিকার, শ্রম এবং দুর্নীতি ও পরিবেশের সঙ্গে সংগ্রাম প্রভৃতি ক্ষেত্রগুলোর সর্বজনীন নীতিগুলো নিয়ে একসাথে অগ্রসর হওয়ার জন্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে জাতিসংঘ অঙ্গ সংস্থা, সরকার, শ্রমিক সংঘ ও এনজিওগুলোর সাথে একত্র করে। প্রতিষ্ঠার পর থেকে, এই উদ্যোগ ছড়িয়ে গেছে সাত হাজার ব্যবসায়িক সংস্থার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক ও জাতীয় শ্রমিক সংঘ এবং ১৪৫টি দেশের শত শত সামাজিক সংগঠনসহ দশ হাজারের অধিক অংশগ্রহণকারীর মধ্যে, যার বেশিরভাগই উন্নয়নশীল বিশ্বের অন্তর্ভুক্ত।

১৯৯৮ সাল থেকে মহাসচিব কর্তৃক ক্রমাগত জাতিসংঘ শান্তিদূত হিসেবে প্রাথমিকভাবে দুই বছর মেয়াদে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এই বিশিষ্ট ব্যক্তিদের শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত ও ক্রীড়াক্ষেত্র থেকে যত্নসহকারে বাছাই করা হয়, যারা জাতিসংঘের কাজ সম্পর্কে বৈশ্বিক মনোযোগ আকর্ষণের জন্য তাঁদের সময়, মেধা ও ইচ্ছাশক্তি স্বেচ্ছায় দান করেন। বর্তমান ১১ জন শান্তিদূত হলেন : রাজকুমারী হায়া বিনতে আল হুসেইন, ড্যানিয়েল ব্যারেনবইম, জর্জ ক্লুনি, পাওলো কোয়েলহো, মাইকেল ডগলাস, জেন গুডল, মিডোরি গোটো, ইয়ো-ইয়ো-মা, চারলিজ থেরন, এলি উইজেল ও স্টিভি ওয়ান্ডার। ২০১০ সালে মহাসচিব কর্তৃক প্রথমবারের মতো জাতিসংঘের জীববৈচিত্র্য বিষয়ক শুভেচ্ছাদূত হিসেবে নিয়োজিত হন এডওয়ার্ড নর্টন। আরও প্রায় ২০০ জন শুভেচ্ছাদূত জাতিসংঘ-সংশ্লিষ্ট কর্মপদ্ধতি, তহবিল, দপ্তর ও কার্যক্রমের আদর্শ ও উদ্দেশ্যকে সমর্থন করেন।

প্রতি-মহাসচিব (ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল)। ১৯৯৮ সালে কানাডার লুই ফ্রেশেত জাতিসংঘের প্রথম প্রতি-মহাসচিব হিসেবে নিয়োজিত হন। ২০০৬ সালে যুক্তরাজ্যের মার্ক ম্যালোক ব্রাউন, ২০০৭ সালে তানজানিয়ার আশা-রোজ মিগিরো এবং ২০১২ সালে সুইডেনের জেন ইলিওসেন প্রতি-মহাসচিব পদে স্থলাভিষিক্ত হন।

বিভাগ ও দপ্তর

অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ক বিভাগ (DESA)
উপমহাসচিব : উ হোংবো (চীন)

বিভাগটির লক্ষ্য হলো, সবার জন্য উন্নয়ন বিষয়ক প্রচারণা চালানো। ডেসা'র কাজগুলো সুদূরপ্রসারি, যার মধ্যে দরিদ্রতা হ্রাস, জনসংখ্যা, লিঙ্গ সমতা ও আদিবাসীদের অধিকার, সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি, উন্নয়ন অর্থনীতি, সরকারি খাতে নতুনত্ব, বন নীতি, জলবায়ু পরিবর্তন ও টেকসই উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত।

এই লক্ষ্যে, ডেসা–

- উন্নয়ন বিষয়ক ব্যাপক পরিমাণ তথ্য ও উপাত্ত বিশ্লেষণ, উৎপাদন ও সংগ্রহ করে;
- অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যাগুলো মোকাবেলা করার উদ্দেশ্যে আলোচনা ও সম্মেলনগুলোতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে একত্র করে;
- উন্নয়ন নীতিমালা, আন্তর্জাতিক মান ও নিয়ম প্রণয়নে সহায়তা দেয়;
- আন্তর্জাতিক চুক্তিগুলোর বাস্তবায়ন নিরীক্ষা করে ও সহায়তা দেয় এবং
- নানা ধরনের সক্ষমতা বৃদ্ধি উদ্যোগের মাধ্যমে বিভিন্ন রাষ্ট্রকে তাদের উন্নয়ন বাধাগুলো মোকাবেলায় সহায়তা করে।

ডেসা তার কার্যক্রম বাস্তবায়নে বিশ্বব্যাপী বহুমাত্রিক সহযোগী, এনজিও, সুশীল সমাজ, বেসরকারি খাত, গবেষণা ও প্রাতিষ্ঠানিক সংগঠন এবং আন্তঃসরকারি সংগঠনের পাশাপাশি জাতিসংঘ সংশ্লিষ্ট সহযোগী সংগঠনের সাথেও যুক্ত হয়।

মাঠপর্যায়ে সহায়তা বিভাগ (DFS)
উপমহাসচিব : আমিরা হক (বাংলাদেশ)

মাঠপর্যায়ে সহায়তা বিভাগ শান্তি ও নিরাপত্তা প্রচারে মিশনগুলোকে সহায়তা করার জন্য অর্থ, সরবরাহ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং মানবসম্পদ ও সাধারণ প্রশাসন ইত্যাদি বিষয় নিয়ে কাজ করে। মাঠপর্যায়ে কর্মরত সৈন্যদলের খাদ্য সরবরাহ করার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করা, যেখানে প্রায়ই সড়ক অবকাঠামো অপ্রতুল বা একদমই নেই, সেখানে মানুষের চলাচলের জন্য আকাশযানের ব্যবস্থা করা এবং নিরাপত্তা পরিষদের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতায় ব্যাপকভাবে সুপ্রশিক্ষিত কর্মী বাহিনীর ব্যবস্থা করা। এই কাজগুলো করার জন্য ডিএফএস সদস্য রাষ্ট্র ও বাণিজ্যিক অংশীদারদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা বিভাগের মধ্যে আদেশের ঐক্য নিশ্চিতকরণে সহায়তা করতে বিভাগের বিভাগীয় প্রধান এক অনন্য উপায়ে শান্তিরক্ষা কার্যক্রম সংক্রান্ত উপমহাসচিবের কাছে প্রতিবেদন পেশ করেন এবং সেখান থেকে দিকনির্দেশনা পান।

সাধারণ পরিষদ ও সম্মেলন ব্যবস্থাপনা বিভাগ (DGACM)

ভারপ্রাপ্ত প্রধান : জ্যাঁ-জ্যাক গ্রেইস (বেলজিয়াম)

সাধারণ পরিষদ ও সম্মেলন ব্যবস্থাপনা বিভাগ মূলত সাধারণ পরিষদ, নিরাপত্তা পরিষদ, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ ও তাদের কমিটি এবং অন্যান্য সহায়ক অঙ্গ সংস্থাগুলোর পাশাপাশি জাতিসংঘ সদর দপ্তর থেকে দূরে অনুষ্ঠিত সম্মেলনগুলোতে কারিগরি ও সাচিবিক সহায়তা সেবা প্রদান করে। এ বিভাগ সদর দপ্তরে সংগঠনের সব দাপ্তরিক দলিলকে দাপ্তরিক ভাষাগুলোতে অনুবাদ প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষণ এবং আন্তঃসরকারি সভায় এই ভাষাগুলোতে ভাষান্তর সেবা দেয়ার জন্য দায়বদ্ধ। উপরন্তু, এটি সভায় ধারণকৃত আলোচনার সংক্ষিপ্ত ও আক্ষরিক দলিলাদিসহ জাতিসংঘের সব দাপ্তরিক দলিল তৈরি করে। জাতিসংঘ সম্মেলন ব্যবস্থাপনা নীতি প্রণয়নে দায়িত্বপ্রাপ্ত হওয়ায়, বিভাগের উপমহাসচিব সাধারণ পরিষদের সভাপতিকে সাধারণ পরিষদের কার্যসংশ্লিষ্ট সব বিষয়ে পরামর্শ দেন।

ব্যবস্থাপনা বিভাগ (DM)

উপমহাসচিব : ইউকিও তাকাসু (জাপান)

ব্যবস্থাপনা বিভাগ সচিবালয়ের সব সত্তাকে ব্যবস্থাপনার তিনটি ক্ষেত্রে কৌশলগতনীতি নির্দেশনা ও সহায়তা প্রদান করে যেমন অর্থ, মানবসম্পদ ও সেবা খাত। এগুলো যথাক্রমে কর্মসূচি পরিকল্পনা, বাজেট ও হিসাবরক্ষণ; মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং কেন্দ্রীয় সহায়তা সেবা দপ্তরের আওতাভুক্ত। সচিবালয়ের উন্নততর ব্যবস্থাপনা নীতি নিরূপণ ও বাস্তবায়ন; কর্মচারী ব্যবস্থাপনা ও প্রশিক্ষণ এবং কারিগরি উদ্ভাবনমূলক কর্মসূচি পরিকল্পনা, বাজেট সংক্রান্ত, আর্থিক ও মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ দায়বদ্ধ। এ বিভাগ সাধারণ পরিষদের পঞ্চম (প্রশাসনিক ও বাজেট সংক্রান্ত) কমিটিকে কারিগরি সহায়তা দেয়ার পাশাপাশি কর্মসূচি ও সমন্বয় কমিটিকেও সহায়তা করে। বিভাগের প্রধান জাতিসংঘ বাজেট প্রণয়নের জন্য নীতিনির্দেশনা, সমন্বয় ও দিকনির্দেশনা দেন; ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিষয়ে মহাসচিবের প্রতিনিধিত্ব করেন; উদীয়মান ব্যবস্থাপনা বিষয় পর্যবেক্ষণ করেন এবং সংগঠনের অভ্যন্তরীণ বিচার ব্যবস্থার কার্যকর বাস্তবায়ন সুনিশ্চিত করেন।

রাজনৈতিক বিষয়ক বিভাগ (DPA)

উপমহাসচিব : জেফরি ফেল্টম্যান (যুক্তরাষ্ট্র)

রাজনৈতিক বিষয়ক বিভাগ বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন সংঘর্ষের প্রতিরোধ ও সমাধানের ক্ষেত্রে এবং যুদ্ধ শেষে শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে জাতিসংঘের প্রচেষ্টায় মুখ্য ভূমিকা পালন করে। এক্ষেত্রে ডিপিএ–

- বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিক ঘটনাগুলো পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করে;
- যার নিয়ন্ত্রণ ও সমাধানে জাতিসংঘ কার্যকর ভূমিকা নিতে পারে, সেসব সম্ভাব্য বা বাস্তবিক সংঘাত চিহ্নিত করে;
- এসব ক্ষেত্রে যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণে মহাসচিবকে সুপারিশ করে এবং গৃহীত নীতি বাস্তবায়ন করে;
- প্রতিরোধক কূটনীতি, শান্তি স্থাপন, শান্তিরক্ষা ও শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে মহাসচিব,

সাধারণ পরিষদ ও নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্পাদনে সহায়তা করে;

- সদস্য রাষ্ট্রগুলো কর্তৃক অনুরোধকৃত নির্বাচনী সহায়তার ক্ষেত্রে মহাসচিবকে পরামর্শ দান করে এবং এই অনুরোধের প্রেক্ষিতে গৃহীত কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন করে;
- সদস্য রাষ্ট্রগুলোর সাথে রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে মহাসচিবের সম্পর্ক নিয়ে পরামর্শ ও সহায়তা দেয় এবং
- নিরাপত্তা পরিষদ ও এর সহায়ক অঙ্গ সংস্থা, একই সাথে ফিলিস্তিনি জনগণের অখণ্ড অধিকারচর্চা কমিটি এবং উপনিবেশ বিলুপ্তিকরণ বিষয়ক ২৪ সদস্যবিশিষ্ট বিশেষ কমিটিকে সেবা দেয়।

বিভাগীয় প্রধান বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধান সম্পর্কিত আলোচনা ও আপসের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং তিনি জাতিসংঘের নির্বাচনী সহায়তা কার্যক্রমগুলোর কেন্দ্রবিন্দু।

জন তথ্য বিভাগ (DPI)

উপমহাসচিব : পিটার লনস্কি-টায়াফেল্থাল (অস্ট্রিয়া)

জন তথ্য বিভাগ জাতিসংঘের নীতিমালা ও কার্যক্রম সম্পর্কে বিশ্ববাসীকে অবহিত করার জন্য; বিবিধ শ্রোতামণ্ডলীর সাথে আলাপচারিতা ও অংশীদারিত্ব করার জন্য এবং শান্তি, উন্নয়ন ও মানবাধিকারের নিমিত্তে সহায়তা প্রতিষ্ঠা করার জন্য নিবেদিত। এ বিভাগ এগুলোর জন্য সংবাদ সেবা, রেডিও ও টেলিভিশন অনুষ্ঠান, সংবাদ বিজ্ঞপ্তি, প্রকাশনা, তথ্যচিত্র, প্রচার অনুষ্ঠান এবং তথ্য প্রচারণা মাধ্যমগুলো অবলম্বন করে। ডিপিআই বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জাতিসংঘ শান্তি দূত হিসেবে নিযুক্ত করে এবং আন্তর্জাতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা উপলক্ষে প্রদর্শনী, সঙ্গীতানুষ্ঠান, আলোচনা সভা ও অন্যান্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এটি গ্রন্থাগার ও জ্ঞান বিতরণ সেবাও দিয়ে থাকে। জাতিসংঘ সদর দপ্তরে কর্মী ছাড়াও সারাবিশ্বে ডিপিআই-এর ৬৩টি জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র (UN Information Centre) বা UNIC আছে এবং ব্রাসেলসে একটি আঞ্চলিক তথ্য কেন্দ্র (UN Regional Information Centre) বা UNRIC আছে।

এই বিভাগের তিনটি উপ-বিভাগ রয়েছে। এর কৌশলগত যোগাযোগ উপ-বিভাগ জাতিসংঘ অগ্রাধিকারগুলো প্রচারের জন্য যোগাযোগ কৌশল ও প্রচারণা তৈরি করে। সংবাদ ও মিডিয়া উপ-বিভাগ জাতিসংঘের সংবাদ ও তথ্য প্রস্তুত করে এবং মিডিয়াতে বিতরণ করে, যার মধ্যে রয়েছে মহাসচিবের মুখপাত্রের দপ্তরের দৈনিক সংবাদ বিজ্ঞপ্তি ও বক্তব্য, জাতিসংঘ ওয়েবসাইট, রেডিও সম্প্রচার এবং সরাসরি টিভি নির্দেশিকা। প্রচার উপ-বিভাগ, যার মধ্যে রয়েছে ড্যাগ হ্যামারস্কজোল্ড এর লাইব্রেরি, বই প্রকাশ করে, বিশেষত জাতিসংঘ বর্ষপঞ্জি এবং সাময়িকী, যেমন ইউএন ক্রনিকল এবং আফ্রিকা রিনিউয়াল; এনজিও ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে কাজ করে; অগ্রাধিকারভিত্তিক ঘটনায় বিশেষ অনুষ্ঠান ও প্রদর্শনীর আয়োজন করে এবং উন্নয়নশীল দেশের সাংবাদিকদের জন্য একটি বার্ষিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করে। এটি জাতিসংঘের লক্ষ্যগুলোর অগ্রগতির জন্য সরকারি ও বেসরকারি খাতের সাথে অংশীদারিত্ব উন্নয়নের কাজও করে।

শান্তিরক্ষা কার্যক্রম বিভাগ (DPKO)

উপ-মহাসচিব : হারভে ল্যাডসাস (ফ্রান্স)

শান্তিরক্ষা কার্যক্রম বিভাগের দায়িত্ব হলো সদস্য রাষ্ট্রগুলো ও মহাসচিবকে তাদের আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা, অর্জন ও বজায় রাখার প্রচেষ্টাকে সহায়তা করা। সদস্য রাষ্ট্রগুলো কর্তৃক প্রদত্ত সংকল্প অনুযায়ী শান্তিরক্ষা কার্যক্রমের পরিকল্পনা, প্রস্তুতি ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে এ বিভাগ এটি করে থাকে।

এ ক্ষেত্রে ডিপিকেও–

- সম্ভাব্য নতুন শান্তিরক্ষা মিশনের জন্য সম্ভাব্য পরিকল্পনার উদ্যোগ নেয়;
- সদস্য রাষ্ট্রগুলোর সাথে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বেসামরিক, সামরিক ও পুলিশ কর্মী ও সরঞ্জাম রক্ষা এবং আদেশাবলি সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সেবা নিশ্চিত করে;
- শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে রাজনৈতিক ও নির্বাহী আদেশ, দিকনির্দেশনা এবং সহায়তা দেয়;
- নিরাপত্তা পরিষদের সমাধান বাস্তবায়নের জন্য বিবদমান পক্ষগুলোর সাথে এবং নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে;
- সব শান্তিরক্ষা মিশনকে দিকনির্দেশনা দিতে ও নজরদারি করতে একীভূত কার্যনির্বাহী দলগুলোকে পরিচালনা করে;
- শান্তিরক্ষার মৌলিক বিষয়াবলি, যেমন নিরাপত্তা খাত সংস্কার, আইনের শাসন এবং নিরস্ত্রীকরণ, সৈন্যদল প্রত্যাহার ও পুনঃপ্রতিষ্ঠা ইত্যাদি সম্পর্কে নিরাপত্তা পরিষদ ও সদস্য রাষ্ট্রগুলোকে পরামর্শ দেয়।
- শান্তিরক্ষার সাথে জড়িত উদীয়মান নীতি সংক্রান্ত জিজ্ঞাসা ও সর্বোত্তম পদ্ধতি বিশ্লেষণ করে এবং কর্মপন্থা, কার্যপ্রণালি ও সাধারণ শান্তিরক্ষা মতবাদ প্রণয়ন করে।
- স্থলমাইন সম্পর্কিত জাতিসংঘের সব কার্যক্রম সমন্বয় করে এবং শান্তিরক্ষা ও জরুরি অবস্থাতে স্থলমাইন বিষয়ক কর্মসূচির উন্নতি সাধন ও সহায়তা প্রদান করে।

বিভাগীয় প্রধান মহাসচিবের পক্ষে শান্তিরক্ষা কার্যক্রমের নির্দেশনা দেন; কার্যক্রমের নীতিমালা এবং নির্দেশাবলি প্রণয়ন করেন এবং শান্তিরক্ষা ও মাইন-অ্যাকশন সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ে মহাসচিবকে পরামর্শ দেন।

সুরক্ষা ও নিরাপত্তা বিভাগ (DSS)

উপমহাসচিব : গ্রেগরি বি. স্টার (যুক্তরাষ্ট্র)

সুরক্ষা ও নিরাপত্তা বিভাগ জাতিসংঘের জন্য নেতৃত্ব, কর্মক্ষম সহায়তা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির ত্রুটিজনিত তথ্য সরবরাহ করে এবং এর মাধ্যমে কর্মী ও তাদের মুখাপেক্ষীদের সর্বোচ্চ নিরাপত্তার পাশাপাশি বিশ্বব্যাপী কার্যক্রম ও ক্রিয়াকলাপের সর্বোচ্চ নিরাপত্তা এবং সবচেয়ে কার্যকর পরিচালনা নিশ্চিত করে। সারা বিশ্বের জাতিসংঘ কর্মী ও উপদেষ্টাদের নিরাপত্তার দায়িত্বপ্রাপ্ত এই বিভাগটি একটি সমন্বিত ও শক্তিশালী নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির প্রয়োজন পূরণের লক্ষ্যে ২০০৫ সালে সাধারণ পরিষদ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়।

মানবিক বিষয়ক সমন্বয় দপ্তর (OCHA)

মানবিক বিষয়াবলি ও জরুরি ত্রাণ বিষয়ক উপমহাসচিব

সমন্বয়কারী : ভ্যালেরি আমোস (যুক্তরাজ্য)

মানবিক বিষয়ক সমন্বয় দপ্তর দুর্যোগপূর্ণ ও জরুরি অবস্থায় মানুষের দুর্ভোগ লাঘব করতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিনিধিদের সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে মানবিক ক্রিয়া পরিচালনা ও সমন্বয় করে। এর মাঠ পর্যায়ের অফিসগুলো, মানবিক সমন্বয়কারী ও স্থানীয় কর্মীদল নিয়ে গঠিত সংযোগের মাধ্যমে, ওচা ত্রাণ প্রচেষ্টার সঙ্গতি নিশ্চিতকরণে কাজ করে। এটি এর মানবিক সমন্বয়কারী ও জাতিসংঘ সংস্থার প্রচেষ্টাকে সমর্থন করে, যারা চাহিদা মূল্যায়ন, সম্ভাব্য পরিকল্পনা ও মানবিক কর্মসূচি প্রণয়নের মাধ্যমে সহায়তা দিয়ে থাকে। এছাড়াও ওচা চাহিদাগ্রস্ত মানুষের অধিকার নিয়ে কথা বলে (বিশেষভাবে নিরাপত্তা পরিষদের মতো রাজনৈতিক অঙ্গগুলোর সাথে), প্রস্তুতি ও প্রতিরোধ এবং একই সাথে নীতিমালা উন্নয়নকে সমর্থন দেয় এবং মানবিক সমস্যাগুলোর টেকসই সমাধান সহজতর করে।

জরুরি ত্রাণ সমন্বয়কারী আন্তঃবিভাগীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতিত্ব করেন, যা রেডক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট আন্দোলন এবং অন্যান্য এনজিও গোষ্ঠীসহ গুরুত্বপূর্ণ মানবিক প্রতিনিধিদের একটি পৃষ্ঠপোষক সংগঠন। সাধারণ নীতি, নির্দেশিকা এবং মানদণ্ড উন্নয়নের মাধ্যমে এই কমিটি জটিল জরুরি অবস্থা এবং প্রাকৃতিক ও পরিবেশগত বিপর্যয় মোকাবেলার জন্য সঙ্গতিপূর্ণ আন্তঃবিভাগীয় প্রতিক্রিয়া নিশ্চিত করে।

জাতিসংঘ মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনারের দপ্তর (OHCHR)

হাইকমিশনার : নাভানেথেম পিল্লাই (দক্ষিণ আফ্রিকা)

জাতিসংঘ মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনারের দপ্তর হলো জাতিসংঘের মানবাধিকার কর্মকাণ্ডের জন্য দায়বদ্ধ মূল কর্মকর্তা এবং তিনি সবার জন্য নাগরিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকার প্রচার ও নিশ্চিতকরণের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনারের এই অফিস, সাধারণ পরিষদ ও অন্যান্য নীতিনির্ধারণী অঙ্গের অনুরোধে প্রতিবেদন তৈরি করে এবং গবেষণার দায়িত্ব গ্রহণ করে। এটি সরকার, আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংগঠন এবং এনজিওগুলোকে সহযোগিতা করে। জাতিসংঘ মানবাধিকার অঙ্গগুলোর সমাবেশগুলোতে এটি দাপ্তরিক ভূমিকা পালন করে। ওএইচসিএইচআর-এর ২০১২-১৩ সালের প্রয়োজনীয় আনুমানিক বাজেট ছিল প্রায় ৪৪৮.১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যার মধ্যে ১৫৬.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার জাতিসংঘের নিয়মিত বাজেট থেকে এবং অবশিষ্ট ২৯১.৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার স্বেচ্ছাকৃত অনুদান থেকে দেয়া হয়েছিল।

৩১ ডিসেম্বর ২০১২ অনুযায়ী ওএইচসিএইচআর প্রায় ১,০৬৯ জন কর্মচারীসহ মোট চারটি বিভাগ নিয়ে গঠিত :

- ১০টি মানবাধিকার চুক্তি অঙ্গ, নির্যাতনের শিকারদের জন্য গঠিত জাতিসংঘ স্বেচ্ছাকৃত তহবিল, সমসাময়িক দাসত্ব বিষয়ক জাতিসংঘ স্বেচ্ছাকৃত তহবিল এবং নির্যাতনবিরোধী কনভেনশন সংশ্লিষ্ট ঐচ্ছিক খসড়া বিষয়ক বিশেষ তহবিলকে মানবাধিকার চুক্তি বিভাগ সহায়তা করে। এসব স্বাধীন বিশেষজ্ঞ সংস্থাও তহবিল পর্যবেক্ষণের দলিলাদি এবং অনুদান তৈরি ও উপস্থাপনে এই বিভাগ সহযোগিতা করে; ঐচ্ছিক কার্যপ্রণালির আওতায় তাদের

কাছে উপস্থাপিত প্রতিবেদন প্রক্রিয়াজাত করে; চুক্তি-পর্ষদের সভায় গৃহীত সুপারিশ ও সিদ্ধান্ত পর্যবেক্ষণ করে এবং সুপারিশ বাস্তবায়নে জাতীয় সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। একটি চুক্তি পরিষদ নির্যাতন প্রতিরোধ উপকমিটিকে মাঠ পরিদর্শন কার্যে সহায়তা করে।

- মানবাধিকার পরিষদ ও বিশেষ কার্যপ্রণালি বিভাগটি মানবাধিকার পরিষদ, পরিষদের সর্বজনীন পর্যাবৃত্ত পর্যালোচনা প্রক্রিয়া এবং এর অনুসন্ধানী ও তদন্তকারী গঠন প্রণালিকে, যার মধ্যে রয়েছে বিশেষ দূতগণ–এবং বিষয়ভিত্তিক কর্মীদল বিশ্বব্যাপী মানবাধিকার লঙ্ঘনের দলিল রচনা, ক্ষতিগ্রস্তদের সুরক্ষা বৃদ্ধি এবং তাদের অধিকার উন্নয়নের দর্শন থেকে সহায়তা করে; যাতে বিশ্বব্যাপী মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকারদের ঘটনাবলির প্রামাণিক দলিল তৈরি এবং তাদের সুরক্ষা বৃদ্ধি করা ও তাদের অধিকার নিশ্চিত করা যায়।
- উন্নয়ন গবেষণা ও অধিকার সংক্রান্ত বিভাগের দায়িত্ব হলো জাতিসংঘ পদ্ধতির কার্যাবলিতে মানবাধিকারকে একীভূত করা, উন্নয়ন অধিকারের উপলব্ধিতে অবদান রাখা এবং মানবাধিকার সংক্রান্ত জ্ঞান ও ধারণা বৃদ্ধি করা। এই বিভাগ উন্নয়ন অধিকার সংশ্লিষ্ট কর্মীদলসহ মানবাধিকার পরিষদের বেশ কিছু আদেশ সমর্থন করে।
- ওএইচসিএইচআর-এর কার্যনির্বাহী বিভাগ হিসেবে মাঠপর্যায়ের কার্যাবলি ও কারিগরি সহায়তা বিভাগ মাঠ পর্যায়ে মানবাধিকার সংক্রান্ত কার্যক্রমে সহায়তা করে এবং মানবাধিকার প্রশ্নে জাতীয়, আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক পর্যায়ে ওএইচসিএইচআর-এর সংলাপ ও কার্যাবলি পরিচালনা করে। ওএইচসিএইচআর নিজ বিভাগের অন্যান্য অংশের সাথে সম্মিলিতভাবে এবং জাতিসংঘের সহযোগী, সরকারি প্রতিনিধি, জাতীয় মানবাধিকার সংগঠন এবং সুশীল সমাজ প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে সহযোগিতার ভিত্তিতে, সংশ্লিষ্ট সবাইকে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সহায়তা করে।

অভ্যন্তরীণ পর্যবেক্ষণ সেবা দপ্তর (OIOS)

উপমহাসচিব : কারম্যান ল্যাপয়েন্ট-ইয়ং (কানাডা)

অভ্যন্তরীণ পর্যবেক্ষণ সেবা দপ্তর স্বাধীন, পেশাদার ও যথাকালীন অভ্যন্তরীণ অডিট, পর্যবেক্ষণ, পরিদর্শন, মূল্যায়ন এবং অনুসন্ধানী সেবা প্রদান করে। এটি সম্পদের দায়িত্বপূর্ণ ব্যয়, জবাবদিহি ও স্বচ্ছতার একটি সংস্কৃতি এবং উন্নত কার্যক্রম সম্পাদনকে উৎসাহিত করে। ওআইওএস জাতিসংঘ সম্পত্তির সুরক্ষা করতে এবং নিয়ম, বিধি ও নীতিমালা অনুসারে কর্মসূচির পাশাপাশি জাতিসংঘ কার্যাবলির সর্বাধিক দক্ষ ও কার্যকর বাস্তবায়নে সংগঠন ও সদস্য রাষ্ট্রগুলোকে সাহায্য করে এবং প্রতারণা, অপচয়, অপব্যবহার, অপরাধ এবং অব্যবস্থাপনা শনাক্ত করে। উপমহাসচিব মহাসচিব কর্তৃক এবং সাধারণ পরিষদের অনুমোদনসাপেক্ষে পুনর্নিয়োগের সুযোগ ব্যতীত ৫ বছর মেয়াদে নিয়োগপ্রাপ্ত হন।

আইন বিষয়ক দপ্তর (ওএলএ)

উপমহাসচিব : প্যাট্রিসিয়া ও'ব্রায়েন (আয়ারল্যান্ড)

আইন বিষয়ক দপ্তর জাতিসংঘের কেন্দ্রীয় আইন সেবাদানকারী সংস্থা। এটি আন্তর্জাতিক লোক আইন ও বাণিজ্য আইনের প্রগতিশীল উন্নয়ন ও আইন সংগ্রহতেও অবদান রাখে।

মুখ্য দায়িত্বগুলোর মধ্যে ওএলএ–

- মহাসচিব, সচিবালয়ের বিভাগ ও দপ্তরসমূহ এবং জাতিসংঘের প্রধান ও সহযোগী অঙ্গ সংস্থাগুলোকে সরকারি ও বেসরকারি আন্তর্জাতিক আইনের ক্ষেত্রে আইনি পরামর্শ প্রদান করে;
- আন্তর্জাতিক লোক আইন, সমুদ্র আইন ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য আইনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আইনি সংস্থাগুলোর জন্য বাস্তবসম্মত ও সাচিবিক কর্মকাণ্ড করে;
- বহুপক্ষীয় চুক্তির রক্ষক হিসেবে মহাসচিবের ওপর অর্পিত দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট কার্যাবলি সম্পাদন করে।

এছাড়াও ওএলএ

- আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা; জাতিসংঘের মর্যাদা, সুযোগ ও অব্যাহতি এবং জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রগুলোর পরিচিতি ও প্রতিনিধিত্ব সংক্রান্ত আইনি জিজ্ঞাসা নিয়ে কাজ করে;
- আন্তর্জাতিক নিয়মপত্র, চুক্তি, জাতিসংঘ অঙ্গ সংস্থা ও সম্মেলনের কার্যপ্রণালি নীতিমালা এবং অন্যান্য আইনি দলিলের খসড়া তৈরি করে;
- আন্তর্জাতিক বেসরকারি ও প্রশাসনিক আইন এবং জাতিসংঘ প্রস্তাব ও বিধিমালার ক্ষেত্রে আইনি সেবা ও পরামর্শ দেয়।

আফ্রিকা বিষয়ক বিশেষ উপদেষ্টার দপ্তর (ওএসএএ)

উপমহাসচিব এবং বিশেষ উপদেষ্টা : মাজেদ আবদেলফাতাহ আবদেলআজিজ (মিসর)

আফ্রিকা বিষয়ক বিশেষ উপদেষ্টার দপ্তর ২০০৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। ওএসএএ তার প্রচারমূলক ও বিশ্লেষণাত্মক কাজের মাধ্যমে আফ্রিকার উন্নয়ন ও নিরাপত্তার জন্য আন্তর্জাতিক সমর্থন বাড়ায়; জাতিসংঘের আফ্রিকা সহযোগিতা ব্যবস্থার সঙ্গতি ও সমন্বয়তা উন্নতকরণের জন্য মহাসচিবকে সহায়তা করে এবং বৈশ্বিক পর্যায়ে আফ্রিকা নিয়ে, বিশেষত নিউ পার্টনারশিপ ফর আফ্রিকা'স ডেভেলপমেন্ট (এনএপিএডি) নিয়ে আন্তঃসরকারি আলোচনা সহজতর করে। এনইপিএডির ওপর আফ্রিকা সংক্রান্ত প্রতিবেদন ও তথ্য জোগান তৈরিতে ওএসএএ নেতৃত্ব দেয়। জাতিসংঘের আফ্রিকা সহযোগিতা কাজের সঙ্গতি ত্বরান্বিত করার জন্য এই অফিস একটি আন্তঃবিভাগীয় কর্মীবাহিনীও আহ্বান করে।

শিশু ও সশস্ত্র সংঘাত বিষয়ক জাতিসংঘের বিশেষ প্রতিনিধির দপ্তর (SRSG/CAAC)

বিশেষ প্রতিনিধি : লেইলা জেরোগুই (আলজেরিয়া)

শিশু ও সশস্ত্র সংঘাত বিষয়ক জাতিসংঘের বিশেষ প্রতিনিধির দপ্তর সশস্ত্র সংঘাতে আক্রান্ত সব শিশুর অধিকার উন্নয়ন ও রক্ষা করে। বিশেষ প্রতিনিধি সশস্ত্র সংঘর্ষে ক্ষতিগ্রস্ত ছেলেমেয়েদের নিরাপত্তা ও মঙ্গলের জন্য নৈতিক কণ্ঠ ও স্বাধীন প্রবক্তা হিসেবে কাজ করেন; নিরাপত্তা বৃদ্ধির সাথে সম্পর্কিত ধারণা ও উদ্যোগ প্রস্তাবের জন্য অংশীদারদের সাথে কাজ করেন; অধিকার ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে পরামর্শ প্রদান করেন, সচেতনতা বৃদ্ধি করেন; বিশিষ্টতা দান করেন; সশস্ত্র সংঘাতে আক্রান্ত শিশুদের উদ্দেশে সম্পাদিত কার্যসাধন সহজতর করতে মানবিক এবং কূটনৈতিক পদক্ষেপের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

স্বল্পোন্নত, স্থলবেষ্টিত এবং ছোট দ্বীপপুঞ্জের উন্নয়নশীল দেশগুলোর উচ্চপ্রতিনিধির অফিস (Office of the High Representative for the Least Developed Countries, Landlocked Developing Countries and Small Island Developing States–OHRLLS)

মহাসচিব ও স্বল্পোন্নত, স্থলবেষ্টিত এবং ছোট দ্বীপপুঞ্জের দেশগুলোর উচ্চ প্রতিনিধি : জ্ঞানচন্দ্র আচার্য (নেপাল)

জাতিসংঘের ওএইচআরএলএলএস বিভাগটি ২০০১ সালে সাধারণ পরিষদ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এর উদ্দেশ্য ছিল ২০০১ থেকে ২০১০ দশকের মধ্যে ব্রাসেলস ঘোষণা এবং কর্মসূচি বাস্তবায়ন দ্বারা স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে সহায়তা করা। এটা ব্রাসেলস কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার রক্ষার জন্য মহাসচিবকে সাহায্য করে। উন্নয়নশীল ছোট দ্বীপ রাষ্ট্রগুলোর টেকসই উন্নয়নের জন্য ১৯৯৪ সালে বার্বাডোজ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয় এবং ২০০৫ সালে মরিশাস কৌশল অবলম্বন করা হয় বার্বাডোজ কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য। এই দপ্তরটি অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাধারণ পরিষদের সাথে জাতিসংঘের সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে উন্নয়ন কর্মসূচির সমন্বয় ঘটায়। জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা, সুশীল সমাজ, গণমাধ্যম ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো; এদেরকে নিয়ে এই দেশগুলোর বিভিন্ন সমস্যাকে বিশ্বের কাছে তুলে ধরে।

নিরস্ত্রীকরণ বিষয়ক দপ্তর (UDODA)

উচ্চ নিরস্ত্রীকরণ প্রতিনিধি : অ্যাঞ্জেলা কেইন (জার্মান)

নিরস্ত্রীকরণ বিষয়ক দপ্তরটি পরমাণু অস্ত্র নিরস্ত্রীকরণ ছাড়াও অন্যান্য গণবিধ্বংসী অস্ত্র যেমন রাসায়নিক ও জৈব অস্ত্র বৃদ্ধি প্রতিরোধ করে। এছাড়াও ইউএনওডিএ প্রচলিত অস্ত্র বাণিজ্যের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং প্রচারণা চালায়। এর আওতায় রয়েছে–

- অস্ত্র সংগ্রহ এবং মজুদ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি;
- সামরিক ব্যয় সংক্রান্ত প্রতিবেদন তৈরিসহ সব সামরিক বিষয়ে স্বচ্ছতা আনা;
- সাবেক যোদ্ধাদের নিরস্ত্রীকরণ এবং তাদের স্থানান্তরিত করে সুশীল সমাজে ফিরিয়ে দেয়া;
- ছোট ছোট ল্যান্ডমাইন ব্যবহারের বাধানিষেধ তৈরি এবং নিরস্ত্রীকরণ।

সাধারণ পরিষদ ও এর প্রথম কমিটি, নিরস্ত্রীকরণ কমিশন এবং নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন– এদের মাধ্যমে নিরস্ত্রীকরণের ওপর নিয়মনীতি তৈরিতে ইউএনওডিএ জোরালো ভূমিকা রাখে। এটি আঞ্চলিক পরমাণু নিরস্ত্রীকরণে উৎসাহিত করে। এই দপ্তরটি জাতিসংঘ নিরস্ত্রীকরণ প্রচেষ্টার ওপর শিক্ষাগত উদ্যোগ নিয়ে থাকে।

জাতিসংঘের বাজেট

জাতিসংঘের নিয়মিত বাজেট সাধারণ পরিষদ কর্তৃক প্রতি দুই বছর অন্তর অন্তর অনুমোদিত হয়। প্রাথমিকভাবে মহাসচিব বাজেট পেশ করেন এবং প্রশাসনিক ও বাজেট সংক্রান্ত ১৬ সদস্যের উপদেষ্টা কমিটি এর পর্যালোচনা করে। এই সদস্যরা সরকার কর্তৃক মনোনীত ও সাধারণ পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত; তবে তারা ব্যক্তিগত ক্ষমতাবলে কাজ করে। ৩৪ সদস্য বিশিষ্ট কর্মসূচি সমন্বয় বাজেটের অবকাঠামোগত দিকগুলো নিয়ে পর্যালোচনা করে, এদের সকলে সাধারণ পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত এবং নিজ নিজ সরকারের মতের

প্রতিনিধিত্ব করে। প্রতি দুই বছরের জন্য যে কৌশলপত্র তৈরি হয়, তাতে জাতিসংঘের অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো প্রতিফলিত হয়। পরিবর্তনশীল বিশ্বের সাথে সামঞ্জস্য বজায় রাখার জন্য এই দ্বিবার্ষিক বাজেটে কিছুটা পরিবর্তন করা হয়।

বাজেটের ক্ষেত্রে জাতিসংঘের আয়ের মূল উৎস হচ্ছে সদস্য দেশগুলোর প্রদত্ত চাঁদা। সাধারণ পরিষদ অনুদান কমিটির সুপারিশক্রমে সদস্য দেশের চাঁদার হার নির্ধারণ করে থাকে। অনুদান কমিটি ১৮ জন বিশেষজ্ঞ সদস্য নিয়ে গঠিত যারা পঞ্চম কমিটি (প্রশাসনিক এবং বাজেট সংক্রান্ত) দ্বারা অনুমোদন প্রাপ্ত। চাঁদার পরিমাণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে মূল বিবেচ্য বিষয় হলো রাষ্ট্রটির কী পরিমাণ চাঁদা দেয়ার বাস্তব সামর্থ্য আছে। মোট জাতীয় উৎপাদনে (জিএনপি) কোনো দেশের ভাগ এবং মাথাপিছু আয়সহ অন্যান্য বিষয় বিবেচনায় রেখে চাঁদা নির্ধারণ করা হয়। সর্বশেষ জাতীয় আয়ের পরিসংখ্যান অনুযায়ী কমিটি প্রতি তিন বছর অন্তর চাঁদার পরিমাণ পুনর্বিবেচনা করে, যাতে এটি ন্যায্য ও সঠিক হয়। কমিটি কোনো দেশের জন্য শতকরা ২২ শতাংশ সর্বোচ্চ চাঁদা হিসেবে নির্ধারণ করেছে।

২০১২-১৩-এর জাতিসংঘের দ্বিবার্ষিক বাজেট

	প্রধান ব্যয়ের ধরন	ইউএস ডলার
১.	নীতিনির্ধারণ, দিক নিয়ন্ত্রণ এবং সমন্বয়	৭২১,৭৮৮,৩০০
২.	রাজনৈতিক বিষয়ক	১,৩৩৩,৮৪৯,৩০০
৩.	আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচার ও আইনের উন্নয়নের জন্য	৯৩,১৫৫,১০০
৪.	আন্তর্জাতিক সহযোগিতা উন্নয়নের জন্য	৪৩৬,৬৩৫,৭০০
৫.	আঞ্চলিক সহযোগিতা	৫৩২,৮৯২,৩০০
৬.	মানবাধিকার ও মানবিক বিষয়ক	৩২৬,৫৭৪,২০০
৭.	পাবলিক ইনফরমেশন	১৭৯,০৯২,১০০
৮.	সাধারণ সহায়তা সেবা	৬০০,২১০,০০০
৯.	অভ্যন্তরীণ তদারকি	৩৮,২৫৪,২০০
১০.	প্রশাসনিক কার্যক্রম এবং বিশেষ খরচে যৌথ বিনিয়োগ	১৩১,২১৯,১০০
১১.	মূলধন সংক্রান্ত ব্যয়	৬৪,৮৮৬,৯০০
১২.	সুরক্ষা ও নিরাপত্তা	২১৩,৪১২,৪০০
১৩.	উন্নয়নমূলক অ্যাকাউন্ট	২৯,২৪৩,২০০
১৪.	কর্মী মূল্যায়ন	৪৫১,০৮৬,৮০০
	মোট : ৫,১৫২,২৯৯,৬০০	

২০১২-১৩ সালের দ্বিবার্ষিক অর্থবছরের অনুমোদিত বাজেট ছিল ৫.১৫২ বিলিয়ন ডলার। পরে তৎকালীন চলমান রাজনৈতিক মিশনগুলো সম্পন্ন করার জন্য বাজেট কিছুটা বৃদ্ধি পেতে পারে বলে ধারণা করা হয়েছিল। ২০১২-১৩ সালের সেসব মিশনের বাজেট ৪৯৯.৭ মিলিয়ন ডলার হবে বলে নিরাপত্তা পরিষদ এবং সাধারণ পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত হয়েছিল। এই বাজেটটি জাতিসংঘের অন্যান্য কিছু ক্ষেত্র যেমন, উন্নয়ন, গণযোগাযোগ, মানবাধিকার ও মানবীয় বিষয়াবলির কিছু ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। জাতিসংঘের

নিয়মিত বাজেটে শান্তিরক্ষা এবং বিচার সংক্রান্ত বিষয়ের অর্থ সংযোজিত থাকে না– এ বিষয়াবলির নিজ নিজ বাজেট রয়েছে। এসব বিষয়ের জন্য সদস্য রাষ্ট্রগুলো থেকেই বেশিরভাগ ঘাটতি পূরণের সাহায্য পাওয়া যায়। ২০১২ সালের ৫ অক্টোবরের সাধারণ বাজেটের পর সংস্থাটির অর্থনৈতিক অবস্থা মোটামুটি ভালো ছিল। অপরিশোধিত ঘাটতি অর্থ ছিল ৮৫৫ মিলিয়ন ডলার, যা বিগত বছর হতে ১২ মিলিয়ন ডলার কম ছিল।

শান্তিরক্ষা মিশনে সম্পদের পরিমাণ ২০১২-১৩ সালে ছিল ৭.৩ বিলিয়ন ইউএস ডলার। ২০১২ ও ২০১৩ সালে কঙ্গো গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র এবং দারফুরে জাতিসংঘ-আফ্রিকান ইউনিয়ন মিশনে বাজেট ছিল ২.৭ বিলিয়ন। উল্লেখযোগ্য জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনের বার্ষিক খরচ সমগ্র বিশ্বের সামরিক ব্যয়ের (প্রায় ১.৭ ট্রিলিয়ন-২০১২) ০.০৫ শতাংশ।

শান্তিরক্ষার জন্য সাধারণ পরিষদ থেকে এক বছরের বাজেট অনুমোদিত হয় ১ জুলাই হতে। পরিষদটি ঘাটতি অনুমান করে এই পরিষদের বাজেট তৈরি করেছিল। এই অনুমানের মধ্যে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর অর্থনৈতিক অবস্থা, শান্তিরক্ষা পরিষদের নিয়মিত সদস্যদের অর্থনৈতিক অবস্থা অন্যতম। এছাড়া শান্তিরক্ষা পরিষদের স্থায়ী সদস্য দেশগুলোই বিশ্বের শান্তিরক্ষার তাগিদে এর বেশিরভাগ অর্থ প্রদান করে। কোনো দেশ অনুদানের টাকা দিতে ব্যর্থ হলে, অন্যান্য দেশ যারা শান্তিরক্ষা মিশনে সৈন্য এবং অন্যান্য সরঞ্জাম দিয়ে সাহায্য করেছে, তাদের অর্থায়নে বিঘ্ন ঘটে। ২০১২ সালের অক্টোবরে মোট ঘাটতি অর্থ হয়েছিল ১.৮৫ বিলিয়ন ডলার। আন্তর্জাতিক বিচার ব্যবস্থার জন্য ৬৩ মিলিয়ন ডলার এবং জাতিসংঘের সদর দপ্তরের ব্যবস্থাপনা খরচের ৪.৬ মিলিয়ন ডলার ঘাটতি ছিল। জাতিসংঘের কর্মসূচি, তহবিল ও দপ্তরসমূহ যাদের মধ্যে, জাতিসংঘ শিশু তহবিল, জাতিসংঘের শরণার্থী হাইকমিশন এবং জাতিসংঘের উন্নয়ন কর্মসূচির নিজস্ব বাজেট রয়েছে। তাদের বেশিরভাগ অর্থই আসে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর অনুদান থেকে তবে কিছু অর্থ বিভিন্ন ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠান থেকে অনুদান হিসেবে পাওয়া যায়। এছাড়াও জাতিসংঘের বিশেষায়িত সংস্থা যেমন, ইউনেস্কো ও ডব্লিউএইচওর একটি বড় অংশ আসে দেশগুলোর অনুদান থেকে।

জাতিসংঘ সিস্টেম

জাতিসংঘ কতগুলো সংস্থার সমন্বয়ে গঠিত। যার মধ্যে আছে, সচিবালয়, ইউনাইটেড নেশনস প্রোগ্রাম অ্যান্ড ফান্ডস্, বিশেষায়িত সংস্থা এবং অন্যান্য অঙ্গ সংস্থা। এই প্রকল্প, তহবিল এবং কার্যালয়গুলো সাধারণ পরিষদের সহায়ক অঙ্গ হিসেবে কাজ করে। বিশেষায়িত সংস্থাগুলো স্বতন্ত্র চুক্তির মাধ্যমে জাতিসংঘের সাথে যুক্ত। অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ সাধারণ পরিষদের কাছে প্রতিবেদন উপস্থাপন করে। সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলো যেমন, আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থা এবং বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা, তাদের নিজস্ব পরিষদমণ্ডল ও বাজেট প্রণয়ন করে। জাতিসংঘ ব্যবস্থার সদস্যগুলো সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক এবং সামাজিক উদ্যোগের সব ক্ষেত্র নিয়ে কাজ করে।

জাতিসংঘের কর্মসূচি সমন্বয়কারী প্রধান কার্যনির্বাহী বোর্ড (সিইবি) হলো জাতিসংঘের সর্বোচ্চ সমন্বয়কারী কাঠামো। মহাসচিবের নেতৃত্বে জাতিসংঘের সদস্যরা জাতিসংঘের

প্রধান অংশগুলোর নেতৃত্বদানে কাজ করে। সিইবি জাতিসংঘের কার্যক্রমকে সব সদস্য দেশে সর্বজনীন লক্ষ্যে পরিণত করতে সচেষ্ট। উচ্চ পর্যায়ের কার্যক্রম কমিটির পৃষ্ঠপোষকতায় জাতিসংঘ বছরে দু'বার বৈঠকে বসে। ব্যবস্থাপনার উচ্চ পর্যায়ের কমিটি আর জাতিসংঘ উন্নয়ন গ্রুপের জাতিসংঘের ২৯ সদস্য রাষ্ট্রগুলোর অঙ্গ সংগঠনগুলোর মধ্যে রয়েছে : জাতিসংঘ, জাতিসংঘ খাদ্য ও কৃষি সংস্থা, আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থা, আন্তর্জাতিক বেসরকারি বিমান চলাচল সংস্থা, আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা, আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল, আন্তর্জাতিক নৌ সংস্থা, আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়ন, জাতিসংঘ বাণিজ্য ও উন্নয়ন সংক্রান্ত সম্মেলন, জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি, জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি, জাতিসংঘ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংগঠন, জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল, জাতিসংঘ বসতি কর্মসূচি, শরণার্থী সংক্রান্ত হাই কমিশনারের কার্যালয়, জাতিসংঘ শিশু তহবিল, আন্তর্জাতিক শিল্প উন্নয়ন সংস্থা, নিকটপ্রাচ্যে ফিলিস্তিনি শরণার্থীদের জন্য জাতিসংঘ ত্রাণ ও কর্মসংস্থা, ইউএন-উইমেন, ইউএনডব্লিউটিও, বিশ্ব ডাক ইউনিয়ন, বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, বিশ্ব বুদ্ধিবৃত্তি সংস্থা, আন্তর্জাতিক আবহাওয়া সংস্থা, বিশ্ব ব্যাংক এবং বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা।

জাতিসংঘ ও নোবেল শান্তি পুরস্কার (The UN and the Nobel Peace Prize)

জাতিসংঘ ও এর সহযোগীরা বিশ্বে শান্তিরক্ষায় তাদের অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ অনেকবার নোবেল শান্তি পুরস্কারে ভূষিত হয়েছে। জাতিসংঘ সংস্থার অন্তর্ভুক্ত নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ীরা হলেন :

- করডেল হাল : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সচিব জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠায় (১৯৪৫) ভূমিকা রাখার জন্য;
- জন বয়েড অর : জাতিসংঘ খাদ্য ও কৃষি সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা এবং মহাপরিচালক (১৯৪৯);
- রালফ বুনচে : জাতিসংঘের অছি পরিষদের পরিচালক, ফিলিস্তিন কমিশনের মুখ্য সচিব এবং মধ্যপ্রাচ্য মধ্যস্থতা প্রচেষ্টার নেতা। (১৯৫০);
- লিওন জহুওক্স : আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার একজন প্রতিষ্ঠাতা (১৯৫১);
- জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক হাইকমিশনার অফিস (১৯৫৪);
- লেস্টার বাউলেস পিয়ারসন : ১৯৫২ সালে সাধারণ পরিষদের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তিনি জাতিসংঘের মাধ্যমে মধ্যপ্রাচ্য সমস্যা এবং সুয়েজ খাল সংঘাতের সমাধানের চেষ্টার জন্য সম্মানিত হন। (১৯৫৭);
- জাতিসংঘ মহাসচিব ড্যাগ হ্যামারস্কহোল্ড : মাত্র দুটি মরণোত্তর পুরস্কারের মধ্যে একটি পেয়েছিলেন (১৯৬১);
- জাতিসংঘ শিশু তহবিল (১৯৬৫);
- আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (১৯৬৯);
- শন ম্যাকব্রাইড : জাতিসংঘের নামিবিয়া কমিশনার ও মানবাধিকার রক্ষার প্রবর্তক (১৯৭৪);
- জাতিসংঘের হাইকমিশনার ফর রিফিউজিস (১৯৮১);
- জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা বাহিনী (১৯৮৮);
- জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আনান (২০০১);

- আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থা এবং এর মহাপরিচালক মোহাম্মদ এল বারাদেই (২০০৫) এবং
- জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত আন্তঃসরকারি প্যানেল ও সাবেক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ-সভাপতি আলবার্ট আর্নল্ড (আল) গোর জুনিয়র (২০০৭)।

এই তালিকায় শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেছেন এমন অনেক নোবেল পদকপ্রাপ্তদের নাম নেই।

জাতিসংঘ কর্মসূচি, তহবিল, গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য সংস্থা
(Programmes and funds, research and training institutes, and other entities)

জাতিসংঘ বাণিজ্য ও উন্নয়ন সম্মেলন (UNCTAD)

১৯৬৪ সালে একটি স্থায়ী আন্তঃসরকারি সংস্থারূপে প্রতিষ্ঠিত UNCTAD হচ্ছে বাণিজ্য ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে সাধারণ পরিষদের মুখ্য সংস্থা। এটি আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা, বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোর বাণিজ্য, অর্থায়ন, প্রযুক্তি, পুঁজি বিনিয়োগ ও টেকসই উন্নয়নের সঙ্গে উন্নয়ন-সংশ্লিষ্ট ইস্যুকে সমন্বিতভাবে বিবেচনা করে থাকে এবং এ জন্য এই সংস্থা জাতিসংঘ ব্যবস্থায় কেন্দ্রবিন্দু রূপে কাজ করে। এর মূল লক্ষ্য হচ্ছে উন্নয়নশীল দেশগুলোর বাণিজ্য, পুঁজি বিনিয়োগ ও উন্নয়ন সুবিধাকে সর্বোচ্চ স্তরে নিয়ে যাওয়া। পাশাপাশি বিশ্বায়নের ফলে উদ্ভূত নতুন চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলায় এবং সমতার ভিত্তিতে বিশ্ব অর্থনীতিতে সংযুক্ত হতে সাহায্য করা। বিভিন্ন অংশীদারের সাথে মিলে গবেষণা ও নীতি বিশ্লেষণ, আন্তঃসরকার আলোচনা ও কারিগরি সহযোগিতা ইত্যাদি কাজ করে থাকে।

আঙ্কটাড সম্মেলনের সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী কেন্দ্র হচ্ছে মিনিস্টেরিয়াল কনফারেন্স, যেখানে ১৯৪টি দেশের সদস্যরা আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা করে এবং আঙ্কটাড-এর কর্মসূচি গ্রহণ করে। প্রতি চার বছরে একবার এই সম্মেলন বসে। ২০১২ সালে অনুষ্ঠিত ১৩তম সম্মেলনের মূল বিষয়বস্তু ছিল বিশ্বায়ন এবং বিশ্বায়নকে ঘিরে স্থায়ী উন্নয়ন। কার্যক্রম ও গৃহীত অগ্রাধিকার বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে সংস্থার সাময়িক ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করা বোর্ডের দায়িত্ব। আঙ্কটাড-এ আছে প্রায় ৪০০ জন কর্মী আর নিয়মিত বাজেট বরাদ্দ হচ্ছে প্রায় ৬৮১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। বাজেট-বহির্ভূত সম্পদ থেকে পরিচালিত হয় কারিগরি সহযোগিতা কার্যক্রম, যা প্রায় ৩৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এ সংস্থার প্রধান প্রকাশনাগুলো হচ্ছে– দ্য ট্রেড অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট, ওয়ার্ল্ড ইনভেস্টমেন্ট রিপোর্ট, ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ড ইন আফ্রিকা রিপোর্ট, লিস্ট ডেভেলভড্ কান্ট্রিজ রিপোর্ট, আঙ্কটাড হ্যান্ডবুক অব স্ট্যাটিস্টিকস্, ইনফরমেশন ইকোনমি রিপোর্ট এবং রিভিউ অব মেরিটাইম ট্রান্সপোর্ট।

মহাসচিব : সুপাচাই পানিতচকপাকডি (থাইল্যান্ড)
সদর : প্যালাইস দেস নেশনস, যোগাযোগ : Cl-L-1211 জেনেভা ১০, সুইজারল্যান্ড
টেলিফোন : (৪১ ২২) ৯১৭ ১২৩৪; ফ্যাক্স: (৪১ ২২) ৯১৭ ০০৫৭
ই-মেইল : info@unctad.org

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কেন্দ্র (International Trade Centre)

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংস্থা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য উন্নয়নের কার্যক্রম ও প্রাতিষ্ঠানিক বিষয়ে আঙ্কটাড ও বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার কার্যকরী সহায়তা এজেন্সির দায়িত্ব পালন করে। ক্ষুদ্র বাণিজ্য উন্নয়নে কারিগরি সহযোগিতার ক্ষেত্রে জাতিসংঘ ব্যবস্থায় কেন্দ্রবিন্দু এই সংস্থা উন্নয়নশীল ও উত্তরণমুখী দেশগুলোতে কাজ করে, যাতে রপ্তানি বৃদ্ধি কার্যক্রম উন্নত করার লক্ষ্যে এসব দেশ কার্যকর বাণিজ্য বিকাশ কর্মসূচি গ্রহণ করতে পারে। আইটিসির অন্যতম কাজ হলো মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল সফলতার জন্য কাজ করা। এই সংস্থার মূল প্রাধান্য হলো প্রায় ১০১টি সমুদ্রবন্দরবিহীন, সাব-সাহারা আফ্রিকা দেশ, ক্ষুদ্র দ্বীপদেশসহ স্বল্পোন্নত দেশের প্রয়োজন পূরণ করা। আইটিসি বাজেটের দুটি অংশ হচ্ছে, নিয়মিত বাজেট যেটা ডব্লিউটিও (WTO) এবং আঙ্কটাড অনুমোদন দিয়ে থাকে, আরেকটি হলো, নিয়মিত বাজেটের বাইরে অতিরিক্ত তহবিল যেটা বিভিন্ন দাতা দিয়ে থাকে।

এই সংস্থা বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা ও জাতিসংঘের (আঙ্কটাডের মাধ্যমে) একটি যৌথ সংশ্লিষ্ট সংস্থা। কারিগরি সহায়তা কর্মসূচি পালন করা হয় জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি ও স্বেচ্ছা অনুদান থেকে। আইটিসির নিয়মিত বাজেট ছিল ৪১.১ মিলিয়ন আর অতিরিক্ত বাজেটের খরচ ছিল ৩৯.৮ মিলিয়ন ডলার। ২০১২-এর শেষে আইটিসির প্রধান কার্যালয়ে আছে ২৬০ জন কর্মচারী এবং প্রায় ৭০০ জন পরামর্শদাতা, যারা বিভিন্ন ধরনের কারিগরি বিষয়ে পরামর্শ দেন।

নির্বাহী পরিচালক : আরাঞ্চা গঞ্জালেস (স্পেন)

সদর দপ্তর : পালাইস দেস নেশনস, সিএইচ ১২১১ জেনেভা ১০, সুইজারল্যান্ড

টেলিফোন : (৪১ ২২) ৭৩০ ০১১১; ফ্যাক্স: (৪১ ২২) ৭৩৩ ৪৪৩৯

ই-মেইল : ITC reg@intracen.org

জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি
(United Nations Development Programme - UNDP)

এটি বিশ্বব্যাপী জাতিসংঘের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সমন্বয়ের মূল সংস্থা। বিশ্ব পর্যায়ে প্রায় ১৬০টি দেশের সাথে কাজ করে। দারিদ্র্যবিমোচন, গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন, দুর্যোগ মোকাবেলা, পরিবেশ রক্ষা এবং জলবায়ুর পরিবর্তন মোকাবেলা করা। এই সংস্থাটি উন্নয়নশীল দেশগুলো যাতে তাদের সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে পারে, সে লক্ষ্যে তারা প্রয়োজনীয় সম্পদ ও তথ্য সংগ্রহে সাহায্য করে। ৩৬ সদস্যের নির্বাহী পরিষদ সংস্থাটির পরিচালনা করে। এতে উন্নত ও উন্নয়নশীল উভয় দেশের প্রতিনিধি রয়েছে। এর প্রধান প্রকাশনা হচ্ছে, বার্ষিক হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট–যাতে থাকে সুচিন্তিত বিশ্লেষণ এবং নীতিনির্ধারণী প্রস্তাবনা। এর বার্ষিক বাজেট প্রায় ৫ বিলিয়ন ডলার, যা কিনা সম্পূর্ণ সদস্য দেশের অনুদান থেকে আসে।

অ্যাডমিনিস্ট্রেটর : হেলেন ক্লার্ক (নিউজিল্যান্ড)

সদর : ১ জাতিসংঘ প্লাজা, নিউইয়র্ক, এনওয়াই ১০০১৭, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

টেলিফোন : (১২১২) ৯০৬ ৫০০০; ফ্যাক্স : (১২১২) ৯০৬ ৫৩৬৪

জাতিসংঘ স্বেচ্ছাসেবক দল (United Nations Volunteers)

জাতিসংঘ স্বেচ্ছাসেবী প্রোগ্রামটি বিশ্বব্যাপী শান্তি ও উন্নয়নে স্বেচ্ছাসেবাকে উৎসাহিত করে। সেই লক্ষ্যে, সব ধরনের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগের জন্য পরামর্শ দিয়ে থাকে। ইউএনভি প্রতি বছর ১৩০টি দেশ হতে প্রায় ৭০০০ স্বেচ্ছাসেবী নিয়োগ দিয়ে থাকে। এর মধ্যে ৮০ শতাংশ স্বেচ্ছাসেবী উন্নয়নশীল দেশ হতে আসে এবং ৩০ শতাংশ আসে নিজেদের দেশ থেকে। এই স্বেচ্ছাসেবীরা জাতিসংঘকে দারিদ্র্যবিমোচন ও এর মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোলে পৌঁছানোর জন্য সহায়তা করে। টেকসই পরিবেশ এবং জলবায়ু পরিবর্তন, দুর্যোগ মোকাবেলা, মানবিক সহায়তা এবং শান্তি প্রক্রিয়ায় স্বেচ্ছাসেবীরা সাহায্য করে। ১০,০০০-এর ও বেশি অনলাইন স্বেচ্ছাসেবী জাতিসংঘকে, সুশীলসমাজ এবং স্থানীয় সরকারকে পরামর্শ দিয়ে থাকে।

১৯৭০ সালে সাধারণ পরিষদ দ্বারা তৈরি ইউএনভির প্রতিবেদন জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি / জাতিসংঘ জনসখ্যা তহবিল-এর অফিসে জমা দেয়া হয়। গত দ্বিবার্ষিক অর্থবছরের (৪২৭ মিলিয়ন ডলার) তুলনায় এর বাজেট ৪৭১ মিলিয়ন ডলারে উত্তীর্ণ করা হয়েছে। ইউএনভির ফান্ড ইউএনডিপি হতে আসে এবং এই ফান্ডের নাম ইউএনভি স্পেশাল ভলেন্টারি ফান্ড।

নির্বাহী সমন্বয়কারী : রিচার্ড ডিক্টাস (নেদারল্যান্ডস)
সদর : হারমান এহলারস স্ট্রিট ১০,৫৩১১৩ বন, জার্মানি
টেলিফোন : (৪৯ ২২৮) ৮১৫ ২০০০; ফ্যাক্স : (৪৯ ২২৮) ৮১৫ ২০০১
ই-মেইল : information@unv.org

জাতিসংঘ মূলধন উন্নয়ন তহবিল (United Nations Capital Development Fund)

জাতিসংঘ মূলধন উন্নয়ন তহবিলটি বিশ্বের ৪৯টি স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য পুঁজি বিনিয়োগ করে। এই সংস্থাটি গরিব জনগণের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ এবং মূলধন ব্যবস্থার মাধ্যমে তাদের নতুন ব্যবসার সুযোগ করে দেয়। ইউএনসিডিএফ আফ্রিকার ওপর বিশেষ দ্বন্দ্ব এবং সংকট থেকে বের হয়ে আসা দেশের সাথে কাজ করে। এটা ঋণ ও অনুদান এবং প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করে যার দ্বারা আরো ক্ষুদ্র এবং দরিদ্র পরিবার ব্যবসার সুযোগ পায়। এটি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে স্থানীয় সরকারকে পানি ব্যবস্থাপনা, রাস্তাঘাট, স্কুল ও সেচ প্রকল্পে অর্থ দিয়ে সহায়তা করে। ইউএনসিডিএফ-এর ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহণকারী গ্রাহকদের মধ্যে ৬৫ শতাংশই হলো নারী। ২০০৫ সালের প্যারিস এইড অনুযায়ী, ইউএনসিডিএফ-এর সব সহায়তা সরকারি নিয়মে প্রদান করা হয়। ইউএনসিডিএফ প্রোগ্রামটি বেসরকারি খাত উন্নয়নশীল অংশীদার এবং জাতীয় সরকারগুলোর কাছ থেকে বড় ধরনের বিনিয়োগ পাওয়ার অনুঘটক হিসেব কাজ করে। ইউএনডিপি সংলগ্ন ইউএনসিডিএফ বিভাগটি ১৯৬৬ সালে সাধারণ পরিষদ কর্তৃক গঠিত হয়। এর সদর দপ্তর নিউইয়র্কে। ২০১২ সালে এর বাজেট ছিল ৫৭ মিলিয়ন ডলার এবং এই প্রোগ্রামে ১৫০ জন কর্মী নিয়োজিত আছে।

নির্বাহী সম্পাদক : মার্স বিচলার (লুক্সেমবার্গ)
সদর : ২ জাতিসংঘ প্লাজা, নিউইয়র্ক, এনওয়াই ১০০১৭, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
টেলিফোন : (১ ২১২) ৯০৬ ৬৫৬৫; ফ্যাক্স : (১ ২১২) ৯০৬ ৬৪৭৯
ই-মেইল : info@uncdf.org

জাতিসংঘের পরিবেশ কর্মসূচি (United Nations Environment Programme)

১৯৭২ সালে এই সংস্থা গঠিত হয়। এটা পরিবেশের সংরক্ষণে এবং সদস্য দেশগুলোকে সহযোগিতা করে তাদের এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জীবনের মান যাতে সুরক্ষিত থাকে। জাতিগুলো ও মানুষের জীবনমান উন্নত করার ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দান ও অংশীদারিত্বমূলক কার্যক্রমকে উৎসাহিত করা এর লক্ষ্য। পরিবেশের ক্ষেত্রে জাতিসংঘের মুখ্য সংস্থারূপে পরিবেশ কর্মসূচি বিশ্ব পর্যায়ে পরিবেশ বিষয়ক আলোচ্যসূচি নির্ধারণ, জাতিসংঘ ব্যবস্থার মধ্যে টেকসই উন্নয়নে পরিবেশগত মাত্রার বাস্তবায়ন এবং বিশ্ব পরিবেশ রক্ষায় দিকনির্দেশনা দিয়ে থাকে।

২০১০-১৩ সাল পর্যন্ত ইউনেপ ছয়টি অগ্রাধিকারের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে—

- **জলবায়ু পরিবর্তন :** উন্নয়নশীল দেশগুলো যাতে জলবায়ু পরিবর্তনের কর্মকাণ্ড জাতীয় উন্নয়ন কর্মসূচির সাথে একীভূত করতে পারে সেই লক্ষ্যে তার সামর্থ্য বৃদ্ধি করে।
- **বাস্তুতন্ত্র ব্যবস্থাপনা (ইকোসিস্টেম):** এর টেকসই ব্যবহার ও সংরক্ষণের জন্য ভূমি, পানি এবং জীববৈচিত্র্যের ব্যবস্থাপনা করে।
- **পরিবেশগত পরিচালনা :** দেশে পরিবেশগত পরিচালনা নিশ্চিত করা এবং দেশ, অঞ্চল ও বৈশ্বিকভাবে পরিবেশ মোকাবেলা জোরদার করা।
- **ক্ষতিকর পদার্থ এবং বিপজ্জনক বর্জ্য :** ক্ষতিকর পদার্থ হতে মানব ও পরিবেশকে প্রভাবমুক্ত রাখা।
- **দুর্যোগ ও সংঘাত :** প্রাকৃতিক ও মনুষ্য সৃষ্ট দুর্যোগ এবং সংঘাত থেকে প্রাপ্ত হুমকি কমিয়ে আনা এবং
- **সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার :** প্রাকৃতিক সম্পদের আহরণ, প্রক্রিয়াকরণ এবং ভোগকে পরিবেশগতভাবে টেকসই হতে হবে।

৫৮টি দেশের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত এর পরিচালনা পরিষদ বছরে একবার মিলিত হয়। সরকারগুলোর স্বেচ্ছা অনুদানের ভিত্তিতে গঠিত পরিবেশ তহবিলের অর্থায়নের কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়; ২০১২ সালের সম্মেলন অনুযায়ী এই পরিষদটির এখন বিশ্বজনীন সদস্যপদ প্রাপ্ত। ট্রাস্ট ফান্ডগুলোর দান ও জাতিসংঘ নিয়মিত বাজেটের অতিরিক্ত বরাদ্দের পরিপূরক ব্যয় নির্বাহের সহায়ক। ২০১২-১৩ দ্বিবর্ষে এই তহবিলের বরাদ্দ অর্থ ছিল জিইএফ-এর ১৪৩ মিলিয়নসহ ৬১৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার; এর কর্মচারীর সংখ্যা ৮৫০ জন।

নির্বাহী পরিচালক : আচিম স্টেনার (জার্মানি)
সদর : জাতিসংঘ এভিনিউ, গিগ্রি, পি.ও. বক্স ৩০৫৫২, ০০১০০, নাইরোবি, কেনিয়া
টেলিফোন : (২৫৪ ২০) ৭৬২ ১২৩৪; **ফ্যাক্স :** (২৫৪ ২০) ৭৬২ ৪৪৮৯, ৪৪৯০
ইমেইল : info@unep.org

জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল (United Nations Population Fund - UNFPA)

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের উদ্যোগে ১৯৬৯ সাল থেকে কার্যরত এই সংস্থা উন্নয়নশীল ও উত্তরণমুখী দেশগুলোতে জনসংখ্যার ক্ষেত্রে সম্পদ সহায়তা দানকারী বৃহত্তর আন্তর্জাতিক সংস্থা। বিভিন্ন দেশের অনুরোধে এই সংস্থা সে দেশের প্রজনন স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবার ব্যক্তিগত পছন্দ অনুযায়ী সহায়তা দেয় এবং টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে জনসংখ্যা নীতি তৈরিতে সাহায্য করে। এটি জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের একটি অনুষঙ্গী সংস্থা। ইউএনডিপির নির্বাহী পরিষদের নির্বাহী পরিষদ।

নিউইয়র্কের সদর দপ্তর ছাড়াও বিশ্বব্যাপী এর ১২৮টি নেটওয়ার্ক অফিস রয়েছে। জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল বিশ্বের ১৫৬টি দেশের উন্নয়নে সহায়তা দিয়ে থাকে, যেখানে বিশ্বের ৮৩ শতাংশ মানুষের বাস। ২০১২ সালে এই তহবিলের আয় ছিল ৯৬২ মিলিয়ন ডলার, যার মধ্যে ৪৩৮ মিলিয়ন বিভিন্ন সরকার ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা থেকে প্রাপ্ত। ২০১১ সালে এই সংস্থা ১৫৮.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রজনন স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় করে, যার মধ্যে রয়েছে নিরাপদ মাতৃত্ব, পরিবার পরিকল্পনা, যৌন, স্বাস্থ্য, কিশোরীদের প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গির পরিশীলন, গর্ভকালীন/প্রসবকালীন মৃত্যু হ্রাস, ফিস্টুলা হ্রাস, এইচআইভি/এইডস মোকাবেলা এবং জরুরি সহায়তা। ইউএনএফপিএ প্রায় ৭৬ মিলিয়ন ডলার ব্যয় করেছে জনসংখ্যা ও উন্নয়ন কৌশলের জন্যে—যার লক্ষ্য জনসংখ্যা ও উন্নয়নের মধ্যে ভারসাম্য তৈরি। যা করা হয় তথ্য সরবরাহ, নীতিনির্ধারণে এবং জনসংখ্যা কর্মসূচি নির্মাণে জাতীয় ক্ষমতা তৈরি করে। এছাড়া ৪১.৮ মিলিয়ন ডলার খরচ করেছে লিঙ্গ সমতা ও নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে। ২০১২ সালে এই সংস্থার কর্মচারী সংখ্যা ছিল ২৩০০।

নির্বাহী পরিচালক : বাবাতুনডে ওসোটিমেহিন (নাইজেরিয়া)

সদর : ৬০৫, থার্ড এভিনিউ, নিউইয়র্ক, এনওয়াই ১০১৫৮, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

টেলিফোন : (১ ২১২) ২৯৭ ৫০০০; **ফ্যাক্স:** (১ ২১২) ৩৭০ ০২০১

ই-মেইল : hq@unfpa.org

জাতিসংঘ জনবসতি কর্মসূচি (United Nations Human Settlements Programme – UN-HABITAT)

১৯৭৮ সালে স্থাপিত এই কেন্দ্র জাতিসংঘ ব্যবস্থার মধ্যে মানব বসতি বিষয়ক উন্নয়ন কার্যক্রমের সমন্বয় সাধনের প্রধান সংস্থা। এই সংস্থা নীতিনির্ধারণ, দক্ষতা বৃদ্ধি, জ্ঞান সৃষ্টি এবং সরকার ও সুশীল সমাজের মধ্যে অংশীদারিত্ব দৃঢ়তর করার মাধ্যমে টেকসই মানব বসতির বিকাশে কাজ করে। জাতিসংঘ মানব বসতি পরিষদের মূল লক্ষ্য হলো ২০২০ সালের মধ্যে অন্তত ১০০ মিলিয়ন বস্তিবাসীর উন্নয়নের মাধ্যমে মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল অর্জন করতে সহায়তা করা এবং তাদের অর্ধেক জনসংখ্যাকে নিরাপদ পানীয় জল ও স্যানিটেশনসহ মৌলিক অধিকারগুলো আদায়ের লক্ষ্যে টেকসই সমাধানে সাহায্য করা। হ্যাবিটাট সরকার স্থানীয়, কর্তৃপক্ষ, বেসরকারি সংস্থা (এনজিও) ও ব্যক্তি খাতকে সহায়তা দেয় ও একযোগে কাজ করে। এর কারিগরি কর্মসূচি ও প্রকল্পের ক্ষেত্র সুবিস্তৃত; এর মধ্যে রয়েছে নগর পরিবেশ, নগর দারিদ্র্য হ্রাস, দুর্যোগ-পরবর্তী পুনর্গঠন ও পানি ব্যবস্থাপনা। এটা স্থানীয়ভাবে সম্পদ আহরণের মাধ্যমে আশ্রয়ণের পদক্ষেপ নিয়ে থাকে। ইউএন হ্যাবিটেট ৫৮ সদস্যের একটি গভর্নিং কাউন্সিল দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ২০১২-১৩ সালে এর খরচ ছিল ৩৯৩.২ মিলিয়ন ডলার, যার ৮৮ শতাংশ বা ৩৪৭.২ মিলিয়ন ডলার প্রোগ্রাম কার্যক্রমের জন্য বরাদ্দ ছিল। বাকি ৪৬ মিলিয়ন ব্যবস্থাপনা ও অন্যান্য সহায়ক কার্যক্রমের জন্য বরাদ্দ করা হয়।

এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর : জোয়ান ক্লস (স্পেন)

সদর : পোস্ট ৩০০৩০, জিপিও, নাইরোবি, ০০১০০, কেনিয়া বক্স

টেলিফোন : ৭৬২ ৩১২০ (২০ থেকে ২৫ /এল); **ফ্যাক্স :** (২৫৪ ২০) ৭৬২ ৩৪৭৭;

ই-মেইল : habitat@unhabitat.org

জাতিসংঘ শরণার্থী বিষয়ক হাইকমিশনারের দপ্তর
(Office of the United Nations High Commissioner for Refugees)

জাতিসংঘ শরণার্থী বিষয়ক হাইকমিশনারের দপ্তরটি ১৯৫১ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বাস্তুহারা মানুষদের সাহায্য করার জন্য তৈরি হয়েছিল, যাদের এক মিলিয়ন এখনও ভাসমান অবস্থায় আছে। এই পরিষদটি সর্বপ্রথম তিন বছরের জন্য গঠন করা হয়েছিল কিন্তু পরবর্তীকালে তা পাঁচ বছর বৃদ্ধি করা হয় এবং ২০০৩ সালে সাধারণ পরিষদের নির্দেশ অনুযায়ী এই বাস্তু সমস্যা সমাধান না হওয়া পর্যন্ত কার্যক্রম চলমান থাকবে বলে ঘোষণা করা হয়। 'আন্তর্জাতিক সুরক্ষার' পাশাপাশি শরণার্থীদের মৌলিক মানবাধিকারের প্রতি সম্মান নিশ্চিত করা সংস্থাটির মূল দায়িত্ব। এর মধ্যে রয়েছে আশ্রয় প্রার্থনা করার ক্ষমতা এবং দণ্ডের আশঙ্কার কারণ আছে এমন দেশে যাতে কাউকে অনিচ্ছায় ফেরত পাঠানো না হয় তা নিশ্চিত করা। সংস্থাটি শরণার্থী বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদনে সাহায্য করে, সরকারগুলো আন্তর্জাতিক আইন মানছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করে এবং বাস্তুচ্যুত বেসরকারি নাগরিকদের খাদ্য, পানীয়, আশ্রয় ও চিকিৎসা সেবার ব্যবস্থা করে। এটি শরণার্থী সমস্যার দীর্ঘমেয়াদি সমাধান খোঁজে এবং তৃতীয় কোনো দেশে স্বেচ্ছা প্রত্যাবাসন, আশ্রয় বা পুনর্বাসন চায়। ২০১১ শেষে ইউএনএইচসিআর শরণার্থী, নিজ দেশে বাস্তুচ্যুত এবং রাষ্ট্রহীন প্রায় ২৫.৯ মিলিয়ন মানুষের দেখাশোনা করেছে।

২০১২-এর শুরুতে এই সংস্থায় ৭,৭৩৫ জন কর্মী কর্মরত ছিল, যাদের মধ্যে ৯৬০ জন সদর দপ্তরে এবং গ্লোবাল সার্ভিস সেন্টার বোদাপেস্টে (হাঙ্গেরি) কাজ করে। ইউএনসিএইচআর-এ ৮৫ শতাংশ মাঠ পর্যায়ে কাজ করে। যারা ১২৫টিরও বেশি দেশে নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মী। ইউএনসিএইচআর জাতিসংঘের আন্তঃসরকার এবং স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন হিসেবে ইন্টার-এজেন্সি কাঠামোর মধ্যে কাজ করে। এর নির্বাহী কমিটি ৮৭টি সদস্য রাষ্ট্র নিয়ে গঠিত। ইউএনসিএইচআর পুরোপুরিভাবে স্বেচ্ছাসেবী তহবিলের ওপর নির্ভর করে, যার ৯৩ শতাংশ আসে সরকার থেকে, ৪ শতাংশ আন্তঃসরকারি সংস্থা এবং বাকি ৩ শতাংশ বেসরকারি খাত। এছাড়া ইউএন সেন্ট্রাল ইমারর্জেন্সি রেসপন্স ফান্ড থেকেও অর্থ পেয়ে থাকে। ইউএনসিএইচআর বিভিন্ন দ্রব্যও ত্রাণ হিসেবে গ্রহণ করে; যেমন– তাঁবু, ওষুধ, ট্রাক ও এয়ার ট্রান্সপোর্ট। ২০১২ সালে এর বাজেট ছিল ৩.৫৯ বিলিয়ন ডলার।

হাইকমিশনার : অ্যান্টোনিও গুটেরেস (পর্তুগাল)
সদর : কেস পোস্টালে ২৫০০, ১২১১ জেনেভা ২, সুইজারল্যান্ড
টেলিফোন : (৪১ ২২) ৭৩৯ ৮১১১; **ফ্যাক্স :** (৪১ ২২) ৭৩৯ ৭৩৭৭

জাতিসংঘ শিশু তহবিল (United Nations Children's Fund)

১৯৪৬ সালে সাধারণ পরিষদ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এই সংস্থাটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যে শিশুরা যুদ্ধের তাণ্ডবে গৃহহীন হয়েছিল তাদের জরুরি খাদ্য ও স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের জন্য গঠন করা হয়েছিল। এই তহবিলটি উন্নয়নশীল দেশগুলোকে মা ও শিশুর দীর্ঘমেয়াদি মানবিক ও উন্নয়নমূলক সহায়তা প্রদান করে থাকে। এটি একটি জরুরি তহবিল হিসেবে গঠিত হলেও পরবর্তীকালে উন্নয়নমূলক সংস্থায় পরিণত হয়। এর মূল লক্ষ্য হচ্ছে, শিশুদের সুরক্ষা, উন্নয়ন ও অধিকার রক্ষা। ইউনিসেফ শিশুদের ভালো পুষ্টি, টিকা, নিরাপদ পানীয়, পর্যাপ্ত স্যানিটেশন এবং এইচআইভি থেকে সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য সরকার, সুশীল সমাজ ও

আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কাজ করে। এটি ছেলেমেয়েদের জন্য মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষার প্রচারণা করে। ইউনিসেফ শিশুদের জন্য একটি সুরক্ষিত পরিবেশ সৃষ্টি করে বিশেষ করে সহিংসতা, শোষণ ও নির্যাতন থেকে রক্ষা করার জন্য। ইউনিসেফ ১৯৩ সদস্য রাষ্ট্রের দ্বারা অনুমোদিত কনভেনশন অন দি রাইটস অব দি চাইল্ড বা শিশু অধিকার সনদের ভিত্তিতে কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে।

ইউনিসেফ জাতিসংঘের ৩৬টি সদস্য রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত একটি নির্বাহী বোর্ড দ্বারা পরিচালিত হয়। এর ১৫০টি দেশে প্রায় ১০,০০০ কর্মচারী নিয়োজিত রয়েছে। এর তহবিল পুরোপুরিভাবে স্বেচ্ছাসেবী অনুদানের ওপর নির্ভরশীল। ২০১১ সালে এর ব্যয় ছিল ৩.৮ বিলিয়ন ডলার। এর মোট আয় ছিল ৩.৭ বিলিয়ন ডলার, যার বেশিরভাগই (২০১১-তে ৬০ শতাংশ) সরকার থেকে আগত। ইউনিসেফ বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও এনজিও থেকেও বেশ কিছু অনুদান পেয়ে থাকে, যা প্রায় ১.০৯ বিলিয়ন ডলার। এর মধ্যে কিছু নিয়মিত দাতা আছেন, যারা ৩৬টি জাতীয় কমিটির মাধ্যমে নিয়মিত ২.৮ মিলিয়ন ডলার অনুদান দিয়ে থাকেন। এর ফ্লাগশিপ পাবলিকেশন 'দ্য স্টেট অব দ্য ওয়ার্ল্ডস্ চিলড্রেন' বার্ষিকভাবে প্রকাশিত হয়।

নির্বাহী পরিচালক : অ্যান্থনি লেক (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র)

সদর : ইউনিসেফ হাউস, ৩ জাতিসংঘ প্লাজা, নিউইয়র্ক, এনওয়াই ১০০১৭, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

টেলিফোন : (১ ২১২) ৩২৬ ৭০০০**ফ্যাক্স :** (১ ২১২) ৮৮৮ ৭৪৬৫

জাতিসংঘ মাদক ও অপরাধ বিষয়ক দপ্তর
(United Nations Office on Drugs and Crime - UNODC)

১৯৯৭ সালে প্রতিষ্ঠিত জাতিসংঘের মাদক ও অপরাধ বিষয়ক অধিদপ্তর অবৈধ মাদক ও আন্তঃদেশীয় অপরাধের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য অগ্রগামী ভূমিকা পালন করে থাকে। এই অধিদপ্তরটি সবার জন্য স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং সন্ত্রাস প্রতিরোধে আইনগত ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এটা সবার জন্য স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও ন্যায়বিচার অর্জনের এবং সন্ত্রাস প্রতিরোধ করার জন্য আইনগত ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়। এর পোর্টফোলিও আরও সমন্বিত আন্তর্জাতিক কর্মের আইনের শাসন সুদৃঢ় করার মাধ্যমে বিস্তৃত। এর মিশনগুলোর মধ্যে রয়েছে– গবেষণা ও প্রামাণিক রিপোর্ট তৈরি করার জন্য বিশ্লেষণ; মাদক অপরাধ ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক চুক্তি বাস্তবায়নে সদস্য রাষ্ট্রদের কারিগরি সহায়তা; এই চুক্তির সাথে সামঞ্জস্য রেখে দেশীয় আইন তৈরি এবং বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ। অন্যান্য কাজের মধ্যে আছে মাদক প্রতিরোধ, চিকিৎসা এবং পুনঃপ্রতিষ্ঠা। এছাড়াও মাদক উৎপন্নকারী কৃষকদের জন্য টেকসই বিকল্প জীবিকার সৃষ্টি। এই পদক্ষেপগুলো গ্রহণের মাধ্যমে ওষুধের অপব্যবহার, এইচআইভি/এইডসের বিস্তার এবং মাদক সংক্রান্ত অপরাধ ও অবৈধ কার্যকলাপের পরিমাণ কমিয়ে আনা হচ্ছে এর উদ্দেশ্য।

ইউএনওডিসির নিউইয়র্ক এবং ব্রাসেলসে লিয়াজোঁ অফিস ছাড়াও ৫০টিরও বেশি মাঠ পর্যায়ে এবং প্রকল্প অফিসে প্রায় ১৫০০ কর্মী কাজ করে। ২০১০-১১ সালের জন্য সাধারণ পরিষদ ইউএনওডিসির জন্য ৪২.৬ মিলিয়ন ডলার বরাদ্দ করে, যা এই সংস্থার মোট আয়ের ৯.১ শতাংশ। ২০১০-১১ এই দু'বছরের এ সংস্থার মোট স্বেচ্ছাসেবী অবদানের

পরিমাণ ছিল ৪৬৮.৩ মিলিয়ন ডলার।
নির্বাহী পরিচালক : ইউরি ফেডোটোভ (রাশিয়ান ফেডারেশন)
সদর : ভিয়েনা ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ওয়াগ্রেমার স্ট্রাসি ৫,
পোস্ট বক্স : ৫০০, ১৪০০, ভিয়েনা, অস্ট্রিয়া
টেলিফোন : (৪৩ ১) ২৬০৬০ **ফ্যাক্স :** (৪৩ ১) ২৬৩ ৩৩৮৯
ই-মেইল : info@unodc.org

নিকট প্রাচ্যের প্যালেস্টাইনি শরণার্থীদের জন্য জাতিসংঘ ত্রাণ ও পূর্ত সংস্থা (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East)

১৯৪৯ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ কর্তৃক নিকটপ্রাচ্যের প্যালেস্টাইন শরণার্থীদের জন্য জাতিসংঘ ত্রাণ ও পূর্ত সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি ১৯৫০ সালের মে মাসে এর কার্যক্রম শুরু করে। প্যালেস্টাইন শরণার্থী সংকট সমাধান না হওয়ায় আনরোয়ার ম্যান্ডেট মাঝে মধ্যে নবায়ন করা হয়। সর্বশেষ নবায়ন করা হয় ২০১৪ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত।

এই সংস্থাটি মধ্যপ্রাচ্যের ৫ মিলিয়ন নিবন্ধিত শরণার্থী যাদের মধ্যে রয়েছে জর্ডান, সিরিয়া ও লেবাননের ৫৮টি রিফিউজি ক্যাম্পে বসবাসকারী ১.৫ মিলিয়ন শরণার্থীদের মৌলিক সেবাগুলো অর্থাৎ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ত্রাণ ও সমাজকল্যাণের প্রধান সরবরাহকারী। এটি আনুষ্ঠানিকভাবে মনোনীত শিবির পরিকাঠামোর ভেতরে একটি ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি পরিচালনা করে। ইউএনআরডব্লিউএ ২০০০ সাল থেকে গাজার পশ্চিম তীরে চলমান সংকটের প্রভাব প্রশমিত করতে সব থেকে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার উদ্বাস্তুদের জরুরি মানবীয় সহায়তা প্রদান করে আসছে। ইউএনআরডব্লিউএর অপারেশন গাজা ও আম্মান, জর্ডানের দুই সদর দপ্তর দ্বারা পরিচালিত হয়। ২০০৬ সাল থেকে লেবাননে উদ্ভূত শরণার্থী সমস্যা নিয়ে এই সংস্থা কাজ করছে। এর কমিশনার জেনারেল, যিনি ২৫ সদস্যের উপদেষ্টা কমিশনের সহায়তায় সাধারণ পরিষদে রিপোর্ট পেশ করেন, যেটি অস্ট্রেলিয়া, বেলজিয়াম, কানাডা, ডেনমার্ক, মিসর, ফিনল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, আয়ারল্যান্ড, ইতালি, জাপান, জর্দান, কুয়েত, লেবানন, লুক্সেমবার্গ, নেদারল্যান্ডস, নরওয়ে, সৌদি আরব, স্পেন, সুইডেন, সুইজারল্যান্ড, সিরিয়া, তুরস্ক, ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সদস্য দ্বারা গঠিত। ইউরোপীয় ইউনিয়ন যেটি আরব রাষ্ট্রগুলো ও ফিলিস্তিন লীগের পর্যবেক্ষক। ইউএনআরডব্লিউএ-এর ৩৩,০০০ কর্মচারী স্থানীয় এবং ১৪৬ জন আন্তর্জাতিক। এই সংস্থার ২০১২-১৩ সালের বাজেট ছিল ২ বিলিয়ন ডলার, যার ৬৮১.২ মিলিয়ন ছিল প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য। এই সংস্থাটি প্রায় সম্পূর্ণভাবে দাতা দেশগুলোর স্বেচ্ছা অনুদানের ওপর নির্ভরশীল। এর চলমান দ্বিবার্ষিক অর্থবছরের বাজেটের ২.৫ শতাংশ জাতিসংঘের নিয়মিত বাজেট থেকে পূরণ করা হয়েছে। সর্বাধিক স্বেচ্ছাসেবী অনুদান নগদে পাওয়া যায়; তবে কিছু উদ্বাস্তুর জন্য খাবার অথবা জরুরি ত্রাণসামগ্রী হিসেবে পাওয়া যায়।
কমিশনার জেনারেল : ফিলিপ্পো গ্রান্ডি (ইতালি)
সদর (গাজা) : গামাল আবদুল নাসের স্ট্রিট, গাজা সিটিতে
পোস্টাল ঠিকানা : পি.ও. বক্স ৩৭১ গাজা সিটি, **টেলিফোন :** (৯৭২ ৮) ২৮৮ ৭৭০১
ফ্যাক্স : (৯৭২ ৮) ২৮৮ ৭৬৯৯ **সদর (আম্মান, জর্দান) :** বায়াদের ওয়াদি সীর, পি.ও. বক্স ১৪০১৫৭, আম্মান ১১৮১৪, জর্ডান। **টেলিফোন :** (৯৬২ ৬) ৫৮০ ৮১০০
ফ্যাক্স : (৯৬২ ৬) ৫৮০ ৮৩৩৫; **ই-মেইল :** HQ-P/O@unrwa.org

বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (World Food Programme)

বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি বিশ্বের সর্ববৃহৎ ক্ষুধার বিরুদ্ধে যুদ্ধের মানবিক সংগঠন। ১৯৬৩ সালে এর প্রতিষ্ঠার পর থেকে ডব্লিউএফপি বিশ্বের দরিদ্রতম দেশগুলোর প্রায় ২ মিলিয়ন মানুষের জরুরি খাদ্যের চাহিদা পূরণ করেছে এবং ৮০টিরও বেশি দেশে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন সমর্থন করেছে। যে কোনো প্রদত্ত সময়ে ডব্লিউএফপি সমুদ্রে ৪০টি জাহাজ, আকাশে ৬০টি বিমান এবং স্থলে ৫,০০০ ট্রাক খাদ্য সবচেয়ে জরুরি স্থানগুলোতে সরবরাহ করতে সক্ষম। এর বিশ্বব্যাপী স্কুল খাবার কর্মসূচি প্রচারণায় এটি বিশ্বের প্রায় ৬০টি দেশের ২৪.৭ মিলিয়ন বাচ্চাদের দৈনন্দিন খাবার সরবরাহ করে। ২০১২ সালে ডব্লিউএফপি ৮০টি দেশের ৯৭.২ মিলিয়ন মানুষদের ৩.৫ মিলিয়ন মেট্রিক টন খাদ্য সরবরাহ করে বিশ্বের জরুরি খাদ্যের প্রায় ৭০ শতাংশ চাহিদা পূরণ করে। ঐ বছরে সংস্থাটি উক্ত খাদ্যের ৮৬ শতাংশ ৭৫টি উন্নয়নশীল দেশ থেকে ২.১ মিলিয়ন খাদ্য ক্রয় করে, যার মূল্য ১.১ বিলিয়নেরও বেশি। সংস্থাটি পুরোপুরিভাবে দাতা দেশ, ব্যক্তি ও ব্যক্তিগত দাতা সংস্থার স্বেচ্ছা অনুদানের ওপর নির্ভরশীল। ২০১২ সালে এটি ৩.৯ বিলিয়ন ডলার অনুদান পায়। এর ১১,৭৯৯ জন কর্মচারীর মধ্যে ৯০ শতাংশ মাঠ পর্যায়ে অবস্থান করে। ডব্লিউএফপি একটি ৩৬ সদস্যের নির্বাহী বোর্ড দ্বারা পরিচালিত হয়। এটি রোমভিত্তিক দুটি একই সংগঠনের সাথে কাজ করে, জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা ও আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিলের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে। এই সংস্থাটি খাদ্য বিতরণের জন্য ২,১০০টিরও বেশি এনজিওর সাথে কাজ করে।

নির্বাহী পরিচালক : আরথারিন কাজিন (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র)
সদর : ভায়া সি.জি., ভিওলা ৬৮, পারকো ডেই মেডিসি, ০০১৪৮ রোম, ইতালি।
টেলিফোন : (৩৯ ০৬) ৬৫১৩১; **ফ্যাক্স :** (৩৯ ০৬) ৬৫৯০৬৩২, **ই-মেইল :** info@wfp.org

জাতিসংঘ আন্তঃআঞ্চলিক অপরাধ ও বিচার গবেষণা ইনস্টিটিউট (United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute-UNICRI)

জাতিসংঘ আন্তঃআঞ্চলিক অপরাধ ও বিচার গবেষণা ইনস্টিটিউটটি কর্মভিত্তিক গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও কারিগরি সহযোগিতা প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পর্কিত কাজ করে থাকে। এ সংস্থাটি সামাজিক শান্তি, উন্নয়ন ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ভঙ্গের হুমকিস্বরূপ অপরাধ মোকাবেলায় এবং দক্ষ অপরাধ বিচার ব্যবস্থার উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে আঞ্চলিকভাবে সরকারকে ও বৃহৎভাবে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে সমর্থন করে। ১৯৬৭ সালে প্রতিষ্ঠিত ইউএনআইসিআরআই অপরাধ নিবারণ এবং বিচার ক্ষেত্রে প্রস্তুত ও উন্নত নীতি বাস্তবায়ন, জাতীয় আত্মনির্ভরশীলতা প্রচার ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়ন সমর্থন করে। এই সংস্থা অপরাধ নিবারণ, বিচার অগ্রগতি এবং মানবাধিকার বর্ধিতকরণে নতুন মান প্রদান, অপরাধ, বিচার, নিরাপত্তা শাসন এবং সন্ত্রাসবাদবিরোধী ক্ষেত্রে কাজ করে। সংস্থাটি নিরাপত্তা শাসনকার্যে আলোচনা ও সহযোগিতা, অপরাধ নিবারণ এবং অপরাধীর বিচার, ভিন্নমত পোষণকারীদের একমতে আনয়ন, সদস্য রাষ্ট্রগুলোসহ গবেষণা প্রতিষ্ঠান, আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং সুশীল সমাজের সব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করে।

ইউএনআইসিআরআই একচেটিয়াভাবে স্বেচ্ছাসেবী অনুদানের মাধ্যমে সৃষ্ট। এ জন্য এটি সরকারি, বেসরকারি খাতের সংগঠন, আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থা, দাতব্য সংস্থা

ও ফাউন্ডেশন এবং সদস্য রাষ্ট্রগুলোর আর্থিক অনুদান ও সমর্থন পেয়ে থাকে। ২০১২ সালে এর মোট ব্যয় ছিল ২৪.৫ মিলিয়ন ডলার এবং ২০১২-১৩ অর্থবছরের জন্য আনুমানিক ৪৫ মিলিয়ন ডলার ব্যয় নির্ধারণ করা হয়।

পরিচালক : জনাথন লুকাস (সিসিলিস); **সদর :** ভিয়েলি মায়েস্ট্রি দেল লাভোরো ১০, ১০১ ২৭ তুরিন, ইতালি, **টেলিফোন :** (৩৯: ০১১) ৬৫৩ ৭১ ১ ১; ফ্যাক্স: (৩৯ ০১১) ৬৩১ ৩৩৬৮
ই-মেইল : information@unicri.it

জাতিসংঘ নিরস্ত্রীকরণ গবেষণা ইনস্টিটিউট
(United Nations Institute for Disarmament Research-UNIDIR)

১৯৮০ সালে প্রতিষ্ঠিত, জাতিসংঘ নিরস্ত্রীকরণ গবেষণা ইনস্টিটিউটটি নিরস্ত্রীকরণ এবং নিরাপত্তা গবেষণাভিত্তিক স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, যার লক্ষ্য হলো আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে নিরস্ত্রীকরণ বিষয়ক চিন্তা, সিদ্ধান্ত এবং প্রচেষ্টার উদ্দেশ্যে সহযোগিতা করা। এর গবেষণা প্রকল্প, প্রকাশনা এবং বিশেষজ্ঞ নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ইউএনআইডিআইআর নিরস্ত্রীকরণ ও নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে সৃজনশীল চিন্তা ও সংলাপ প্রচার করে। সংস্থাটি বর্তমান ও ভবিষ্যৎ উভয়ের নিরাপত্তা বিষয়ক প্রতিবেদন, কৌশলগত পরমাণু অস্ত্র, শরণার্থী কম্পিউটার বিরোধ সুরক্ষা, আঞ্চলিক আস্থা, ভবনের ব্যবস্থা এবং ছোট অস্ত্র হিসেবে ভিন্নতা বিষয়ক পরীক্ষা সম্পর্কিত কাজ করে। বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের বৈঠক ও আলোচনা, গবেষণা প্রকল্প কার্যকর এবং বই, রিপোর্ট ও কাগজপত্র সেই সাথে ত্রৈমাসিক জার্নাল নিরস্ত্রীকরণের ফোরাম হিসেবে প্রকাশ করে। সংস্থাটি প্রধানত সরকারি ও বেসরকারি স্বেচ্ছা আর্থিক অনুদানের ওপর নির্ভর করে। এটি ২০১২ সালে সরকার থেকে ২.৭ মিলিয়ন ডলার এবং জনগণ থেকে ১.৩ মিলিয়ন ডলার মোট ৪ মিলিয়ন ডলার অনুদান পায়। এর ২০ জন নিয়মিত কর্মচারীর পাশাপাশি গবেষণার জন্য অনেক ফেলো এবং ইন্টার্ন নেয়া হয়।

পরিচালক : থেরেসা এ হিচেনস (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র)
সদর : পালাইস দেস নেশনস, ১২১১ জেনেভায় ১০, সুইজারল্যান্ড
টেলিফোন : (৪১ ২২) ৯১৭ ৩১৮৬; **ফ্যাক্স :** (৪১ ২২) ৯১৭ ০১৭৬;
ই-মেইল : unidir@unog.ch

জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক দুর্যোগ-ঝুঁকি হ্রাস কৌশল
(United Nations International Strategy for Disaster Risk Reduction - UNISDR)

জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যালয়টি ১৯৯৯ সালে দুর্যোগ-ঝুঁকি হ্রাস করতে আন্তঃসংস্থা সচিবালয়কে সমর্থন প্রদানের লক্ষ্যে গঠন করা হয়। এটি দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস সমন্বয় এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার জন্য হিয়োগো কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য কাজ করে।

ইউএনআইএসডিআর (UNISDR) দুর্যোগ-ঝুঁকি হ্রাসের জন্য বিশ্বব্যাপী সচেতনতা সৃষ্টির প্রচারাভিযান চালায়, ঝুঁকি কমানোর জন্য বেশি বিনিয়োগ করতে উদ্বুদ্ধ করে এবং জনগণকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা যন্ত্রপাতি ও পরিসেবা দানের মাধ্যমে তাদের একজোট করে। ইউএনআইএসডিআর দুর্যোগ-ঝুঁকি হ্রাসের গ্লোবাল এসেসমেন্টের রিপোর্ট তৈরি করে। বর্তমানে এ সংস্থাটি ২০১৫ পরবর্তী দুর্যোগ-ঝুঁকি হ্রাস কর্মপরিকল্পনা প্রকল্প উন্নয়নে কাজ করছে। দুর্যোগ-ঝুঁকি হ্রাসের মহাসচিবের বিশেষ নেতৃত্বে ইউএনআইএসডিআর-এর ১০০

জন কর্মী জাতিসংঘের সদর দপ্তর জেনেভা এবং সারা বিশ্বের আঞ্চলিক সংস্থাগুলোতে নিয়োজিত রয়েছে।

মহাসচিবের বিশেষ প্রতিনিধি : মার্গারেটা ওয়ালস্ট্রম (সুইডেন)
সদর : পালাইস দেস নেশনস, ১২১১ জেনেভা, সুইজারল্যান্ড
টেলিফোন : (৪১ ২২) ৯১৭ ৮৯০৭ ৮; **ফ্যাক্স :** (৪১ ২২) ৯১৭ ৮৯৬৪;
ই-মেইল : isdr@un.org

জাতিসংঘ প্রশিক্ষণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট
(United Nations Institute for Training and Research–UNITAR)

একটি স্বশাসিত জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠান 'জাতিসংঘ প্রশিক্ষণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট' যেটি প্রশিক্ষণ ও গবেষণার মাধ্যমে জাতিসংঘের কার্যকারিতা বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার জন্য ১৯৬৫ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। ইউনিটার-এর ২১ শতকের চ্যালেঞ্জগুলো শান্তি, নিরাপত্তা, কূটনীতি, পরিবেশ ও সুশাসনের ক্ষেত্রে উন্নয়নশীল এবং পরিবর্তনশীল দেশগুলোকে ক্ষমতা উন্নয়নে সহায়তা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করে। এটি উদ্ভাবনী প্রশিক্ষণ পন্থা, পদ্ধতি, যন্ত্রপাতি এবং এদের ব্যবহারিক প্রয়োগের ওপর গবেষণা পরিচালনা করে। ২০১২ সালে ইউনিটার প্রধানত উন্নয়নশীল ও পরিবর্তনশীল দেশ হতে আগত ২৩,০০০ অংশগ্রহণকারীদের ৪০০টি কোর্স, সেমিনার ও ওয়ার্কশপের ব্যবস্থা করেছে। এর ৪,০০০-এর বেশি প্রশিক্ষণার্থী ই-লার্নিং কোর্সে অংশগ্রহণ করে, যা সব কার্যক্রমের ৩৫ শতাংশ ছিল। ইউনিটার একটি ট্রাস্টি বোর্ড দ্বারা পরিচালিত হয়। এই ইনস্টিটিউশনটি সম্পূর্ণভাবে স্ব-অর্থায়নে পরিচালিত এবং সরকার, আন্তঃসরকার সংগঠন, ফাউন্ডেশন এবং অন্যান্য বেসরকারি উৎস থেকে স্বেচ্ছা অনুদান গ্রহণ করে থাকে। এর ২০১২-১৩ সালের বাজেট ছিল ৪৪.৮ মিলিয়ন ডলার। ইউনিটার-এর কার্যাবলির সদর দপ্তর জেনেভা, সেই সাথে নিউইয়র্ক এবং হিরোশিমা অফিস থেকে পরিচালিত হয়। এর কার্যক্রমের বেশিরভাগ অংশই দেশভিত্তিক হয়ে থাকে। ইউনিটার-এর ৪১ জন নিয়মিত ও ১৭ জন সম্মানীর বিনিময়ে কাজ করে।

নির্বাহী পরিচালক : স্যালি ফেগান-উইলস (আয়ারল্যান্ড)
হেডকোয়ার্টার : আন্তর্জাতিক পরিবেশ হাউস, চেনিম দেস এনিমনস ১১-১৩, ১২১৯ চেতিলাইন, জেনেভা, সুইজারল্যান্ড; **টেলিফোন :** (৪১ ২২) ৯১৭ ৮৪০০; **ফ্যাক্স :** (৪১ ২২) ৯১৭ ৮০৪৭

জাতিসংঘ সামাজিক উন্নয়ন গবেষণা ইনস্টিটিউট
(United Nations Research Institute for Social Development)

১৯৬৩ সালে প্রতিষ্ঠিত জাতিসংঘ সামাজিক উন্নয়ন গবেষণা ইনস্টিটিউট জাতিসংঘ সিস্টেমের একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, যা সমসাময়িক মাল্টিডিসিপ্লিনারি গবেষণা করে থাকে। যেমন লিঙ্গ সমতা, সামাজিক নীতি উন্নয়ন বিষয়াবলি, আর্থসামাজিক ও নীতি বিশ্লেষণ এবং টেকসই উন্নয়ন। UNRISD সারা বিশ্বের গবেষক, নীতিনির্ধারক ও সুশীল সমাজের কর্মকর্তাদের সাথে এর সংগ্রহকৃত জ্ঞান ভাগ করে নেয়। এবং এর জন্য এই সংস্থা সামাজিক সমতা, অন্তর্ভুক্তি ও বিচারপতি উন্নয়ন বিষয়ক চিন্তা ও নীতি-নির্ধারণে জাতিসংঘের সিস্টেম এবং তার থেকেও বেশি অনুশীলন করতে কেন্দ্রীয় লক্ষ্যে কাজ করে। সংস্থাটি তার কার্যক্রম অর্থায়নের জন্য স্বেচ্ছাসেবী অনুদানের ওপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে

এবং প্রায় ৪ মিলিয়ন ডলার এর গড় বার্ষিক অপারেটিং বাজেট নির্ধারণ করা হয়েছে। গবেষণা প্রোগ্রাম এবং ইনস্টিটিউটের বাজেট অনুমোদন সোস্যাল ডেভেলপমেন্ট জাতিসংঘের কমিশন কর্তৃক মনোনীত স্বাধীন বিশেষজ্ঞদের একটি বোর্ডের ওপর ন্যস্ত এবং ইকোসক দ্বারা নিশ্চিত করা হয়।

পরিচালক : সারাহ কুক (যুক্তরাজ্য); **সদর :** পালাইস দেস নেশনস, ১২১১ জেনেভায় ১০, সুইজারল্যান্ড; **টেলিফোন :** (৪১ ২২) ৯১৭ ৩০২০; **ফ্যাক্স :** (৪১ ২২) ৯১৭ ০৬৫০

ই-মেইল : info@unrisd.org

জাতিসংঘ বিশ্ববিদ্যালয় (United Nations University)

জাতিসংঘ বিশ্ববিদ্যালয়টি ১৯৭৫ সালে টোকিওতে প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি একটি আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক, যা গবেষণা, নীতি অধ্যয়ন এবং প্রাতিষ্ঠানিক ও ব্যক্তিসক্ষমতা উন্নয়নে জড়িত সেই সাথে জাতিসংঘের শান্তি ও অগ্রগতির লক্ষ্যে অধিকতর জ্ঞান প্রচার করে। এই প্রতিষ্ঠানের ১৩টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং প্রোগ্রামের একটি বিশ্বব্যাপী নেটওয়ার্ক রয়েছে। এর লক্ষ্য হলো, মানুষের বেঁচে থাকা, উন্নয়ন ও কল্যাণের জন্য চলমান বৈশ্বিক সমস্যার সমাধানে অবদান রাখা। বিশ্ববিদ্যালয়টি সম্পূর্ণরূপে সদস্য রাষ্ট্র, বিভিন্ন সংস্থা, ফাউন্ডেশন এবং দাতা ব্যক্তিদের কাছ থেকে স্বেচ্ছা অনুদান দ্বারা চলে। জাতিসংঘের বাজেটে এর কোনো বরাদ্দ নেই; বিভিন্ন বৃত্তিমূলক তহবিলে এর যে বিনিয়োগ তার আয় থেকেই এর কার্যক্রমের ব্যয় নির্বাহ করা হয়। ২০১২-১৩ দ্বিবার্ষিক অর্থবছরের জন্য এই প্রতিষ্ঠানের বাজেট ছিল ১৪২.৮ মিলিয়ন ডলার। এর ৬৭৯ জন কর্মী, যারা উন্নয়নশীল ও উন্নত দেশগুলোর প্রতিনিধিত্ব করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের গভর্নিং বোর্ড জাতিসংঘ বিশ্ববিদ্যালয় কাউন্সিল ২৪ সদস্য দ্বারা গঠিত, যারা ছয় বছর পর্যন্ত এই পদে কাজ করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর এবং তিন পদাধিকারবলের সদস্য, যারা হলেন : জাতিসংঘ মহাসচিব, ইউনেস্কো ডিরেক্টর জেনারেল এবং UNITAR-এর নির্বাহী পরিচালক। জাতিসংঘের ইউনিভার্সিটি প্রেস হলো এর প্রকাশনা বিভাগ।

পরিচালক : ডেভিড এম মালোনি (কানাডা)

হেডকোয়ার্টার : ৫-৫৩-৭০ জিঙ্গুমাই, শিবুয়া-কু, টোকিও ১৫০-৮৯২৫, জাপান

টেলিফোন : (৮১ ৩) ৫৪৬৭ ১২১২; **ফ্যাক্স :** (৮১ ৩) ৩৪৯৯ ২৮২৮;

ই-মেইল : mbox@hq.unu.edu

এইচআইভি/এইডসের জাতিসংঘ যুগ্ম কর্মসূচি (Joint United Nations Programme on HIV/AIDS)

১৯৯৬ সাল থেকে সক্রিয়, ইউএনএইডস জাতিসংঘের একটি সত্তা, যা বিশ্বব্যাপী এইচআইভির বিরুদ্ধে সংগ্রাম, মহামারী রোধে দ্রুততর পদক্ষেপ গ্রহণ এবং বৈশ্বিক কার্যক্রমের সঙ্গে সমর্থনে অগ্রণী ভূমিকা রাখে। ইউএনএইডস, এইডস সংক্রমণ ও প্রতিরোধ, এইচআইভি সংক্রমিত লোকদের যত্ন ও সহায়তা প্রদান, এইচআইভি সম্পর্কে ব্যক্তি ও সম্প্রদায়ের দুর্বলতা হ্রাস এবং এই মহামারীর নানাবিধ প্রভাব কমাতে সর্বজনীন প্রতিক্রিয়া পরিচালনা করে। এটি এইচআইভি ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত ও এই রোগের সাথে জীবিত মানুষের বিরুদ্ধে সর্ব প্রকার বৈষম্য দূর করতে এবং একটি মানবাধিকারভিত্তিক

পদ্ধতির প্রচার করতে কঠোর পরিশ্রম করে। ইউএনএইডস এই মহামারীর সম্পর্কে কারিগরি সহায়তা ও তথ্য প্রদান করে এর প্রোগ্রামিং প্রচেষ্টা এবং ট্র্যাক, মনিটর সম্পর্কে নির্দেশনা প্রদান ও মূল্যায়ন করে থাকে। এটা বিশ্বের মানুষকে নতুন করে এইচআইভি সংক্রমণ বৈষম্য ও মৃত্যু শূন্যে নামিয়ে আনতে অনুপ্রাণিত ও পরিচালিত করার ক্ষেত্রে দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকে। ইউএনএইডস জাতিসংঘের ১১ সংগঠন-ইউএনএইচসিআর, ইউনিসেফ, ডব্লিউএফপি, ইউএনডিপি, ইউএনএফপিএ, ইউএনওডিসি, ইউএন-ওমেন, আইএলও, ইউনেস্কো, ডব্লিউএইচও এবং বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় অংশীদারদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে এইডস প্রতিক্রিয়া জন্য ফলাফল পূর্ণ বিস্তারের প্রচেষ্টায়।

নির্বাহী পরিচালক : মিশেল সিডিবি (মালি)

হেডকোয়ার্টার : ২০ এভিনিউ আপিয়া, সিএইচ-১২১১ জেনেভা ২৭, সুইজারল্যান্ড

টেলিফোন : (৪১ ২২) ৭৯১ ৩৬৬৬; ফ্যাক্স : (৪১ ২২) ৭৯১ ৪১৮৭

ই-মেইল : communications@unaids.org

জাতিসংঘ প্রকল্প সেবা কার্যালয় (United Nations Office for Project Services)

জাতিসংঘ প্রকল্প সেবা কার্যালয়ের মিশন হলো জাতিসংঘ এবং এর সহযোগী প্রতিষ্ঠানের শান্তি প্রতিষ্ঠা, মানবাধিকার ও উন্নয়ন অভিযানের জন্য প্রয়োজনীয় সব আক্ষরিক বাস্তবায়ন প্রসারিত করা। UNOPS-এর অংশীদার সমর্থন করে এর তিনটি প্রধান অঞ্চলে প্রকল্পে প্রায় ১ বিলিয়ন ডলার মূল্য বাস্তবায়নে ব্যয় করেছে। ক্ষেত্রগুলো হলো– টেকসই অবকাঠামো, টেকসই আমদানি ও টেকসই প্রকল্প ব্যবস্থাপনা। এই সংস্থার সেবা পরিসীমা হাইতিতে আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ এবং আর্জেন্টিনায় শিক্ষাগত কম্পিউটারের ব্যবস্থাকরণ থেকে দক্ষিণ সুদানে সড়ক নির্মাণে পরিচালনা পর্যন্ত। ইউএনওপিএস পৃথক অংশীদারদের চাহিদা মোতাবেক এর সহযোগিতার ধরণ পরিবর্তন করে এবং দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প উন্নয়নের জন্য স্বতন্ত্র লেনদেন সেবার প্রস্তাব প্রদান করে। এই অফিস অর্থনৈতিক প্রকল্পের বৃদ্ধি, সামাজিক ও পরিবেশগত ধারণক্ষমতা নিশ্চিত করতে সরকার ও সম্প্রদায়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে। এর ডেনমার্কের কোপেনহেগেনের সদর দপ্তরসহ এর আরো আছে আঞ্চলিক ও সদস্য দেশের অফিসের একটি নেটওয়ার্ক। ৮০টিরও বেশি দেশে এর কার্যক্রম বিস্তৃত।

নির্বাহী পরিচালক : ইয়ান ম্যাটসন (সুইডেন)

সদর : সি.আর. বক্স ২৬৯৫, ২১০০ কোপেনহেগেন, ডেনমার্ক

টেলিফোন : ৭৫০০ (৪৫) ৪৫৩৩, **ফ্যাক্স :** ৭৫০১ (৪৫) ৪৫৩৩, **ই-মেইল :** info@unops.org

জাতিসংঘ লিঙ্গ সমতা ও নারী ক্ষমতায়ন সত্তা (United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women - UN-Women)

২০১০ সালে সাধারণ পরিষদ জাতিসংঘের তৎকালীন চারটি বিদ্যমান শাখা : জাতিসংঘ নারী উন্নয়ন তহবিল, নারী উন্নয়ন বিভাগ, লিঙ্গ বিষয়ক বিশেষ উপদেষ্টা অফিস এবং নারী উন্নয়নে জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট একত্রিত করে জাতিসংঘ লিঙ্গ সমতা এবং নারী ক্ষমতায়ন সত্তার সৃষ্টি করে। এর লক্ষ্য হলো, বিশ্বব্যাপী নারী ও মেয়ে শিশুদের শিক্ষার চাহিদা পূরণ ও অগ্রগতি ত্বরান্বিত করা।

এই সত্তাটি, নারীদের অবস্থান, আন্তঃসরকার সংস্থা ও এর উদ্ভাবন নীতি এবং সদস্য

দেশগুলোর নারী বিষয়ে প্রাসঙ্গিক মান সম্পর্কিত স্থিতি বাস্তবায়নে সমর্থন করে। এটি এর নারী অধিকার ও লিঙ্গ সমতার বিষয়ে এবং এর নিয়মিত পরিবর্তন মনিটরিংয়ের জন্য অঙ্গীকার বদ্ধ। এই সংস্থার বাজেট ধরা হয় ৫০০ মিলিয়ন ডলার।

নির্বাহী পরিচালক : ফুমযাইল ম্লাম্বো-নাগসুকা (দক্ষিণ আফ্রিকা)

হেডকোয়ার্টার : ২২০ ইস্ট ৪২ স্ট্রিট , নিউ ইয়র্ক, NY ১০০১৭, ইউএসএ

টেলিফোন : (১ ৬৪৬) ৭৮১ ৪৪০০; **ফ্যাক্স :** (১ ৬৪৬) ৭৮১ ৪৪৪৪

বিশেষায়িত সংস্থা এবং সংশ্লিষ্ট সংগঠন

(Specialized agencies and related organizations)

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (International Labour Organization - ILO)

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা জাতিসংঘের সেই বিশেষায়িত সংস্থা যেটি সামাজিক ন্যায়বিচার এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মানবাধিকার ও শ্রমিক অধিকারের উত্তরণের প্রচেষ্টায় রত। ১৯১৯ সালে প্রতিষ্ঠিত আইএলও হচ্ছে ১৯৪৬ সালে জাতিসংঘের প্রথম বিশেষায়িত সংস্থা।

আইএলও আন্তর্জাতিক নীতিমালা তৈরি ও কর্মসূচির মাধ্যমে কর্মক্ষেত্রে ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন; একটি আন্তর্জাতিক শ্রম মান গড়ে তোলা, যা এসব নীতি কার্যকর করার ক্ষেত্রে জাতীয় কর্তৃপক্ষের কাছে পথ-নির্দেশিকা হিসেবে কাজ করে; এসব নীতিকে কার্যকর করে তোলার লক্ষ্যে বিভিন্ন দেশের সরকারকে সাহায্য দেয়ার জন্য কারিগরি সহযোগিতার ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ এবং প্রচেষ্টাকে আরো এগিয়ে নেয়ার জন্য প্রশিক্ষণ, শিক্ষা, গবেষণা প্রভৃতি কাজে সহায়তা করে।

বিশ্ব সংস্থার মধ্যে আইএলও একদিক থেকে বিশিষ্ট যে এখানে সরকারের পাশাপাশি শ্রমিক ও কর্মচারীদের প্রতিনিধিরা নীতিনির্ধারণে সমান ভূমিকা রাখতে পারে। তিনটি পরিষদের সমন্বয়ে এই সংস্থা গঠিত :

- আন্তর্জাতিক শ্রম সম্মেলনে সরকারি, মালিক পক্ষের ও শ্রমিক-কর্মচারীদের প্রতিনিধি থাকে এবং প্রতিবছর এর সভা হয়। এ পরিষদ আন্তর্জাতিক শ্রম মানদণ্ড গড়ে তুলতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে এবং বৈশ্বিকভাবে সামাজিক ও শ্রমিক সমস্যার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করে।
- পরিচালনা পরিষদ সংস্থার কার্যক্রমের নির্দেশনা দেয়; কর্মসূচি ও বাজেট তৈরি করে এবং আইএলও মানদণ্ডের লঙ্ঘনের ঘটনা পর্যবেক্ষণ করে।
- আন্তর্জাতিক শ্রম কার্যালয় এবং স্থায়ী সচিবালয়।

ইতালির তুরিনে অবস্থিত আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে পড়াশোনা করার এবং প্রশিক্ষণ দেয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। আন্তর্জাতিক শ্রম-অধ্যয়ন ইনস্টিটিউটের কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে গবেষণা নেটওয়ার্ক, সামাজিক নীতি ফোরাম, বিভিন্ন কোর্স ও সেমিনার, অতিথি গবেষক, ইন্টার্ন ও প্রকাশনা। আইএলওর জেনেভা সদর দপ্তরসহ বিশ্বব্যাপী ৪০টি মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়ে ২,৯৮৩ কর্মী নিয়োজিত রয়েছে। ২০১২-১৩-এর দ্বিবার্ষিক অর্থবছরে এর বাজেট ছিল ৮৬১.৬ মিলিয়ন ডলার।

মহাপরিচালক : গাই রাইডার (যুক্তরাজ্য)

হেডকোয়ার্টার : ৪, রুট দেস মরিলন্স, ১২১১ জেনেভা ২২, সুইজারল্যান্ড

টেলিফোন : (৪১ ২২) ৭৯৯ ৬১১১; **ফ্যাক্স :** (৪১ ২২) ৭৯৮ ৮৬৮৫; **ই-মেইল :** ilo@ilo.org

জাতিসংঘ খাদ্য ও কৃষি সংস্থা
(Food and Agriculture Organization of the United Nations - FAO)

জাতিসংঘ খাদ্য ও কৃষি সংস্থাটি, কৃষি, বনজ, মৎস্য ও পল্লী উন্নয়নে জাতিসংঘ ব্যবস্থার একটি নেতৃত্ব সংস্থা। ১৯৪৫ সালের ১৬ অক্টোবর এই সংস্থাটি স্থাপিত হয় এবং এই দিনটি সারা বিশ্বে বিশ্ব খাদ্য দিবস হিসেবে পালিত হয়। ফাও কৃষি উন্নয়ন, উন্নত পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা সাধন এর প্রচার করে দারিদ্র্য ও ক্ষুধা দূর করার লক্ষ্যে কাজ করে। এ ধরনের নিরাপত্তা, বিদ্যমান সময়ের সব মানুষের জন্য একটি সক্রিয় ও সুস্থ জীবনের উদ্দেশ্যে তাদের খাদ্যাভ্যাসের প্রয়োজন অনুযায়ী যথেষ্ট নিরাপদ খাদ্য, যা তাদের শারীরিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতার মধ্যে হয় সে বিষয়ে নিশ্চয়তা দেয়। বর্তমানে ১৩০টিরও বেশি দেশে এটা সরকার নীতি ও পরিকল্পনার পরামর্শ প্রদান করে; তথ্য সংগ্রহ ও সরবরাহ করে এবং কৃষি ও খাদ্য বিষয়ে বিতর্কের জন্য একটি ফোরাম হিসেবে কাজ করে। এই বিশেষ প্রোগ্রামটি খাদ্য সংকটের জন্য দেশগুলোকে প্রস্তুতি নিতে সহায়তা করে এবং জরুরি মুহূর্তে ত্রাণ সরবরাহ করে থাকে। এটা ২,০০০-এর বেশি ৯০০ মিলিয়ন মূল্যের প্রকল্প ও প্রোগ্রাম পরিচালনা করে। এই সংস্থার তহবিলে ৯৫ শতাংশ আসে ট্রাস্ট ফান্ডের অনুদান থেকে।

ফাও (FAO)-এর সদস্য দেশের সম্মেলন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এর ৪৯ জন নির্বাচিত সদস্য অধিবেশনের মধ্যে গভর্নিং বডি হিসেবে কাজ করে। ফাও-এর ৩,৫৭৬ জন কর্মী আছে যারা এর হেডকোয়ার্টার এবং মাঠ পর্যায়ে কাজ করে। ২০১২-১৩ সালে এর নিয়মিত প্রোগ্রাম বাজেট ছিল এক বিলিয়ন ডলার।

মহাপরিচালক : জোসে গ্রাজিয়ানো দ্য সিলভা (ব্রাজিল)
হেডকোয়ার্টার : ভিয়ালে ডেলে টার্মই, ০০১৫৩ রোম, ইতালি
টেলিফোন : (৩৯ ০৬) ৫৭০৫১; **ফ্যাক্স :** (৩৯ ০৬) ৫৭০ ৫৩১৫২
ই-মেইল : FAO-HQ@fao.org

জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা
(United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization-UNESCO)

১৯৪৬ সালে জাতিসমূহের মধ্যে সংলাপের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি, সংস্কৃতি এবং জনগণের, প্রচলিত সভ্যতার ওপর ভিত্তি করে টেকসই উন্নয়ন চালু, একটি শান্তিপূর্ণ সংস্কৃতি, মানবাধিকার সংরক্ষণ এবং দারিদ্র্যবিমোচনের লক্ষ্যে ইউনেস্কো গঠন করা হয়েছিল। ইউনেস্কোর কার্যক্ষেত্রগুলো হলো–শিক্ষা, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, সামাজিক ও মানবিক বিজ্ঞান, সংস্কৃতি, তথ্য ও যোগাযোগ। এর মূল উদ্দেশ্য হলো–'সবার জন্য শিক্ষা', আন্তর্জাতিক ও আন্তঃসরকারি বৈজ্ঞানিক প্রোগ্রামের মাধ্যমে প্রাকৃতিক ও সামাজিক গবেষণা প্রচার, সাংস্কৃতিক পরিচয়ের অভিব্যক্তি প্রকাশ, বিশ্বের প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষা এবং বৃদ্ধি, তথ্য ও সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার অবাধ প্রবাহ প্রচার, সেই সাথে উন্নয়নশীল দেশগুলোর যোগাযোগের ক্ষমতা শক্তিশালীকরণ। সংস্থাটির দুটি বৈশ্বিক অগ্রাধিকার রয়েছে; যথা– আফ্রিকা ও লিঙ্গ সমতা।

ইউনেস্কোর কার্যক্রম ১৯৮টি জাতীয় কমিশন এবং ৩৮০০টি সংগঠন, সেন্টার এবং রাষ্ট্র দ্বারা পরিচালিত হয়। ১৮০ দেশের ৯০০০ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে মিলে কাজ করে। সংস্থাটির গভর্নিং বডি, যা জেনারেল কনফারেন্স নামে পরিচিত, ১৯৫টি সদস্য দেশ দ্বারা

গঠিত। নির্বাহী বোর্ডটি ৫৮ সদস্যের। এই সদস্যরা, সম্মেলনে গৃহীত প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন করে থাকেন। ইউনেস্কোর ১৭০টি দেশের মোট ২,০০০ জন কর্মী রয়েছে। ৬৫টি ফিল্ড অফিস, ইনস্টিটিউট, বিশ্বব্যাপী কেন্দ্রগুলো এবং চারটি কেন্দ্রীয় শিক্ষা ব্যুরো ব্যাংকক, থাইল্যান্ড, লেবানন, বৈরুত, সেনেগাল, ডাকার, চিলি, সান্তিয়াগো ইত্যাদি স্থানে ৮৭০-এর বেশি কর্মী নিয়োজিত রয়েছে। ২০১১-১৩ সালের জন্য এর বাজেট ছিল ৬৫৩ মিলিয়ন ডলার।

মহাপরিচালক : ইরিনা বোকোভা (বুলগেরিয়া)

হেডকোয়ার্টার : ৭, ডি ফন্টেনয়, ৭৫৩৫২ প্যারিস ০৭-এসআর ফ্রান্স

টেলিফোন : (৩৩) ১৪৫৬৮ ১০০০; **ফ্যাক্স :** (৩৩) ১৪৫৬৭ ১৬৯০;

ই-মেইল : info@unesco.org

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (World Health Organization - WHO)

১৯৪৮ সালে প্রতিষ্ঠিত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা হলো স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে জাতিসংঘ ব্যবস্থার একটি নির্দেশনা এবং সমন্বয়কারী কর্তৃপক্ষ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বিষয়ে নেতৃত্ব প্রদানের জন্য দায়বদ্ধ এছাড়াও স্বাস্থ্য গবেষণা বিষয়সূচি রূপায়ণ, নিয়ম ও মান নির্ধারণ, প্রমাণভিত্তিক নীতিক্ষেত্র আদায়, বিভিন্ন দেশে কারিগরি সহায়তা প্রদান ও পর্যবেক্ষণ এবং স্বাস্থ্য প্রবণতা মূল্যায়ন করাও এর কাজের অন্তর্ভুক্ত। এর সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী অঙ্গ বিশ্ব স্বাস্থ্য সম্মেলন, যারা বছরে একবার ১৯৪ সদস্য দেশ থেকে প্রতিনিধিদের সাথে মিলিত হয়। নির্বাহী বোর্ড ৩৪ সদস্য বিশিষ্ট। ১৫০টিরও বেশি দেশ থেকে প্রায় ৮,০০০ জন মানুষ, ১৫০টি দেশভিত্তিক দপ্তর, জেনেভা সদর দপ্তর এবং এর ছয়টি আঞ্চলিক দপ্তর : ব্রাজাভিলে, ওয়াশিংটন ডিসি, কায়রো, কোপেনহেগেন, নয়াদিল্লি, এবং ম্যানিলা কাজ করে। ২০১২-১৩ সালের দ্বিবার্ষিক অর্থবছর প্রোগ্রামের বাজেট ছিল ৩.৯ বিলিয়ন ডলার, যার ৯৪৯ মিলিয়ন ডলার সদস্য রাষ্ট্র থেকে আর বাকিটা এসেছে স্বেচ্ছা অনুদান থেকে।

মহাপরিচালক : মার্গারেট চ্যান (চীন)

হেডকোয়ার্টার : এভিনিউ অ্যাপিয়া ২০, ১২১১ জেনেভা ২৭, সুইজারল্যান্ড

টেলিফোন : (৪১ ২২) ৭৯১ ২১ ১১; ফ্যাক্স: (৪১ ২২) ৭৯১ ৩১ ১১ ই-মেইল: inf@who.int

বিশ্ব ব্যাংক গ্রুপ (World Bank Group)

বিশ্বব্যাংক গ্রুপ পাঁচটি প্রতিষ্ঠান নিয়ে গঠিত–

- রিকনস্ট্রাকশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের জন্য আন্তর্জাতিক ব্যাংক (IBRD, ১৯৪৪ সালে প্রতিষ্ঠিত);
- ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্স করপোরেশন (আইএফসি, ১৯৫৬);
- ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট অ্যাসোসিয়েশন (আইডিএ, ১৯৬০);
- ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর সেটেলমেন্ট অব ইনভেস্টমেন্ট ডিসপিউটস (ICSID, ১৯৬৬);
- বহুপাক্ষীয় ইনভেস্টমেন্ট গ্যারান্টি এজেন্সি (MIGA, ১৯৮৮)।

'বিশ্বব্যাংক' শব্দটি পাঁচটি প্রতিষ্ঠানের দুটি প্রতিষ্ঠানকে নির্দিষ্টভাবে বোঝায় : IBRD এবং আইডিএ, ব্যাংকের লক্ষ্য দরিদ্র দেশগুলোর অর্থনীতিকে শক্তিশালী করা এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নের দ্বারা জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নত করে বিশ্বজুড়ে

দারিদ্র্য হ্রাস করা। ব্যাংকটি এর উন্নয়নে দুই স্তম্ভ টেকসই প্রবৃদ্ধি, কর্মসংস্থান এবং বিনিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশ তৈরি এবং দরিদ্র লোকদের জন্য বিনিয়োগে তাদের ক্ষমতায়ন, যাতে তারা উন্নয়নে অংশগ্রহণ করতে পারে। বিশ্বব্যাংক গ্রুপের মালিকানা ১৮৮ সদস্য দেশের, যাদের নিয়ে গঠিত এর বোর্ড অব গভর্নর। দৈনন্দিন কার্যাবলি দেখাশোনা করে একটি ছোট নির্বাহী পরিচালক পর্ষদ আর ব্যাংকটির প্রেসিডেন্ট এই বোর্ডের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করে। অর্থবছর ২০১২ সালের শেষ দিকে বিশ্বব্যাংক গ্রুপের প্রতিষ্ঠান একসঙ্গে ১৭০টি দেশ থেকে ১৫,০০০ জনের বেশি পেশাদার প্রশাসনিক কর্মীদল নিয়োগ দেয়। ওই ব্যক্তিদের প্রায় ৪০ শতাংশের বেশি ১১০টি উন্নয়নশীল দেশের দপ্তরে কাজ করে। অর্থবছর ২০১৩ সালে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক গ্রুপ, উন্নয়নশীল দেশগুলোকে ২৭৬টি প্রকল্পের জন্য ৩১.৫ বিলিয়ন ডলার সাহায্য প্রদান করে। ব্যাংকের আর্থিক এবং প্রযুক্তিগত দক্ষতা দিয়ে ওই দেশগুলোর দারিদ্র্য হ্রাস করার লক্ষ্যে ব্যাংক প্রায় প্রতিটি খাতে এবং উন্নয়নশীল দেশে ১,৩৩০-এর বেশি প্রকল্পে জড়িত। তার প্রধান প্রকাশিতব্য গ্রন্থের মধ্যে বার্ষিক বিশ্ব উন্নয়ন রিপোর্ট (ওয়ার্ল্ড ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট) এবং 'ডুইং বিজনেস' উল্লেখযোগ্য।

প্রেসিডেন্ট : জিম ইয়ং কিম (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র)
হেডকোয়ার্টার : ১৮১৮ এইচ রাস্তার উ.প., ওয়াশিংটন, ডি.সি.২০৪৩৩, ইউএসএ
টেলিফোন : (১ ২০২)৪৭৩ ১০০০; ফ্যাক্স : (১ ২০২)৪৭৭ ৬৩৯১;
ই-মেইল : pic@worldbank.org

আন্তর্জাতিক পুনর্গঠন এবং উন্নয়ন ব্যাংক (International Bank for Reconstruction and Development)

আন্তর্জাতিক পুনর্গঠন এবং উন্নয়ন ব্যাংক বিশ্বব্যাংকের মূল প্রতিষ্ঠান, যা ঋণ, নিশ্চয়তা (গ্যারান্টি), ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, পণ্য মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন প্রচার করে মধ্যম আয়ের দেশগুলোর মধ্যে দারিদ্র্য কমানোর আশা করে এবং বিশ্লেষণাত্মক ও উপদেশমূলক সেবা প্রদান করে। ১৮৮ সদস্য রাষ্ট্রের মালিকানাধীন এই ব্যাংকটি সদস্য দেশের উপকারের জন্য গঠিত সমবায়ের মতো পরিচালিত হয়। এটি বিশ্বের আর্থিক বাজার হতে এর বেশিরভাগ তহবিল উত্থাপন করে। ব্যাংকটি বছরের পর বছর ধরে আয় করে একটি উন্নয়ন কার্যক্রম তহবিল তৈরি করেছে এবং এর অর্থবল কম খরচে ধার ও ঋণের মাধ্যমে গ্রাহকদের যেসব ভালো প্রস্তাব করা সম্ভব, তা নিশ্চিত করার অনুমতি দিয়েছে। এই ব্যাংকে মূলধনের পাঁচ শতাংশ আসে বিভিন্ন দেশের অনুদান থেকে। ২০১২ সালের ৩৮টি দেশের ৯৩টি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ২০.৬ বিলিয়ন ডলার ঋণ আকারে প্রদান করেছে।

আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (International Development Association-IDA)

আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা দরিদ্রতম মানুষদের জন্য বিশ্বব্যাংকের একটি ফান্ড। ১৭২টি সদস্য রাষ্ট্র নিয়ে গঠিত আইডিএ হলো বিশ্বের বৃহত্তম একটি উন্নয়ন সংস্থা। এটি এর সদস্য রাষ্ট্রগুলোর সহায়তায়, বিশ্বের ৮১টি দরিদ্রতম দেশগুলোতে স্বাস্থ্য ও শিক্ষা, অবকাঠামো ও কৃষি এবং অর্থনৈতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নে সহায়তা প্রদান করে। আইডিএ-এর সাহায্যে লাখ লাখ মানুষের শত শত কাজ সৃষ্টির মাধ্যমে চরম দারিদ্র্য দূরীভূত করতে এবং এসব মানুষের নিরাপদ পানি, খাদ্য নিরাপত্তা, স্কুল, রাস্তা এবং বিদ্যুৎ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার

সুযোগ প্রদান করে। আইডিএর তহবিলের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ অনুদান হিসেবে প্রদান করা হয়; বাকি অংশ সুদমুক্ত, দীর্ঘমেয়াদি ঋণ আকারে দেয়া হয়। ১৯৬০ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে আইডিএ ক্রমান্বয়ে ২৫৫ বিলিয়ন ডলার অর্থ সরবরাহ করেছে। ২০১২ অর্থবছরের ১৪.৮ বিলিয়ন ডলার ঋণ যা ঐ বছরের মোট ঋণের প্রায় পঞ্চাশ শতাংশ, আইডিএ আফ্রিকাকে প্রদান করেছে—মূলত আইডিএর ঋণ সরবরাহের যোগ্য দেশগুলোর লক্ষ্যেই ঐ মহাদেশেই অবস্থিত। আইডিএর ঘাটতিগুলো প্রতি তিন বছর পরপর উন্নত ও উন্নয়নশীল উভয় দেশের অনুদান ও বিশ্বব্যাংকের দুটি সংস্থা রিকনস্ট্রাকশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক এবং ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্স করপোরেশন হতে পূরণ করা হয়। ৫২টি দাতা সংস্থা হতে ৪৯.৩ বিলিয়ন ডলার এর তহবিলে দান করা হয়।

ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্স করপোরেশন (International Finance Corporation - IFC)

ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্স করপোরেশন বিশ্বের বৃহত্তম উন্নয়ন সংস্থা, যা উন্নয়নশীল দেশগুলোর বেসরকারি খাতের উন্নয়নের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। এটা উন্নয়নশীল দেশগুলোর বেসরকারি খাতের বিনিয়োগ অর্থায়নের আন্তর্জাতিক আর্থিক বাজারে পুঁজির সমাবেশ এবং ব্যবসা ও উপদেশমূলক সেবা প্রদানের মাধ্যমে টেকসই প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে সাহায্য করে। আইএফসির ১৮৪টি সদস্য দেশ এই তহবিলে অর্থ জোগান দিয়ে থাকে। ২০১২ অর্থবছরে আইএফসি উন্নয়নশীল দেশগুলোতে ২০.৪ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করে, যার মধ্যে ৫ বিলিয়ন ডলার এসেছে বিভিন্ন বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে। ২০০৭ সাল থেকে আইএফসি আইডিএ থেকে ঋণ পাওয়ার যোগ্য এমন দেশগুলোতে ২৩ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করেছে এবং আইডিএর আয় থেকে আয়ের অধিক দুই বিলিয়ন ডলার ঘাটতি পূরণে অবদান রেখেছে।

বহুপক্ষীয় ইনভেস্টমেন্ট গ্যারান্টি এজেন্সি (Multilateral Investment Guarantee Agency-MIGA)

বহুপক্ষীয় বিনিয়োগ গ্যারান্টি এজেন্সিটি বৈদেশিক বিনিয়োগকারী ও ঋণদাতাদের উন্নয়নশীল দেশগুলোকে সরাসরি ঋণ প্রদানের মাধ্যমে বিনিয়োগ উন্নীত করা নিশ্চয়তা (রাজনৈতিক ঝুঁকি বীমা) প্রদান করে। এ প্রতিষ্ঠানের প্রতিশ্রুত মূলধন এর ১৭৮টি সদস্য রাষ্ট্র থেকে আসে। এই সংস্থার মূল লক্ষ্য হচ্ছে দরিদ্রতম দেশগুলোতে বিনিয়োগে সহায়তা করা, দ্বন্দ্ব আক্রান্ত দেশে বিনিয়োগ, অবকাঠামো উন্নয়ন এবং দক্ষিণ-দক্ষিণ বিনিয়োগ। ১৯৮৮ সালে এর শুরু থেকে MIGA ১০৫টিরও বেশি উন্নয়নশীল দেশে ৭০০-এর বেশি প্রকল্পের জন্য ২৭.২ বিলিয়ন ডলার অর্থের বিনিয়োগ গ্যারান্টি দিয়েছে।

বিনিয়োগের বিরোধ নিষ্পত্তির আন্তর্জাতিক কেন্দ্র (International Centre for Settlement of Investment Disputes - ICSID)

বিনিয়োগের বিরোধ নিষ্পত্তির আন্তর্জাতিক কেন্দ্র, যা ১৪৭টি সদস্য দেশের সরকার এবং বিদেশি বিনিয়োগকারীদের মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তি এবং আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে কাজ করে। এটি সরকারি ও বৈদেশিক বিনিয়োগকারী দেশগুলোর যারা এই কেন্দ্রের সদস্য তাদের মাঝে সালিশি দ্বারা উক্ত বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য কাজ করে। এছাড়াও বিরোধ

নিষ্পত্তির প্রয়োজনে এই কেন্দ্র সালিশ নিয়োগ দিয়ে থাকে এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য আইনের আওতায় জাতিসংঘ কমিশনের সালিশি আইন দ্বারা পরিচালিত হয়। সংস্থাটির বিরোধ নিষ্পত্তির কার্যক্রম ছাড়াও এই কেন্দ্র বিদেশি বিনিয়োগ আইনের ক্ষেত্রে একটি প্রকাশনা কর্মসূচি বজায় রাখে।

এটার প্রশাসনিক কাউন্সিল প্রতিটি সদস্য রাষ্ট্র থেকে একজন প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত হয় এবং বিশ্বব্যাংক গ্রুপের প্রেসিডেন্টের সভাপতিত্বে এর গভর্নিং বডি পরিচালিত হয়।

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (International Monetary Fund - IMF)

১৯৪৪ সালে ব্রেটন উড্স কনফারেন্সে প্রতিষ্ঠিত ইন্টারন্যাশনাল মনিটারি ফান্ড আন্তর্জাতিক আর্থিক সহযোগিতা, বিনিময় হারের স্থিতিশীলতা ও সুশৃঙ্খল বিনিময় ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এছাড়াও অর্থ পরিষদের ব্যবস্থা এবং প্রয়োজনীয় অস্থায়ীভাবে সদস্য রাষ্ট্রগুলোকে অর্থ জোগানে ব্যবস্থা করা। এছাড়া 'বিশেষ অর্থ উত্তোলন ক্ষমতা' নামে সদস্য দেশগুলোর জন্য একটি আন্তর্জাতিক তহবিল গঠন করে থাকে। সংস্থাটির ১৮৮ সদস্য দেশ থেকে ২০১৩-এর ফেব্রুয়ারিতে ৭৫০ বিলিয়ন ডলারের একটি তহবিল গঠন করে। আইএমএফের একটি মূল দায়িত্ব হলো, পেমেন্ট সমস্যার সম্মুখীন দেশে ঋণ প্রদান ও ভারসাম্য রক্ষা করা। এই আর্থিক সহায়তা এই দেশগুলোতে তাদের আন্তর্জাতিক মজুদ, তাদের মুদ্রায় স্থিতিশীলতা, আমদানির জন্য অর্থ পরিশোধ এবং শক্তিশালী অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আইএমএফের সদস্য দেশগুলো তাদের কোটা অনুযায়ী ঋণ নিতে পারে।

আইএমএফের গভর্নিং বোর্ডে সব সদস্য রাষ্ট্র অন্তর্ভুক্ত। প্রতিদিনের কাজ দেখাশোনা করে ২৪ সদস্যের একটি নির্বাহী বোর্ড। নির্বাহী বোর্ড দ্বারা নির্বাচিত একজন ম্যানেজিং ডিরেক্টরের নেতৃত্বে আইএমএফে ১৫৬টিরও বেশি দেশ থেকে প্রায় ২,৬০০ জন কর্মী কর্মরত রয়েছে। ২০১৩ আর্থিক বছরের জন্য ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত এই সংস্থার প্রশাসনিক বাজেট ছিল ৯৮৫ মিলিয়ন ডলার (রসিদ নিট) এবং মূলধনের বাজেট ছিল ১৬২ মিলিয়ন ডলার। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুক, গ্লোবাল ফাইনান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি রিপোর্ট এদের প্রধান প্রকাশনা।

ব্যবস্থাপনা পরিচালক : ক্রিস্টিন লাগারদে (ফ্রান্স)
হেডকোয়ার্টার : ৭০০, ১৯ স্ট্রিট NW ওয়াশিংটন, ডি.সি. ২০৪৩১, ইউএসএ
টেলিফোন : (১ ২০২) ৬২৩ ৭০০০; ফ্যাক্স : (১ ২০২) ৬২৩ ৬২২০;
ই-মেইল : publicaffairs@imf.org

আন্তর্জাতিক বেসামরিক বিমান চলাচল সংস্থা (International Civil Aviation Organization – ICAO)

আন্তর্জাতিক বেসামরিক বিমান চলাচল সংস্থা বিশ্বজুড়ে আন্তর্জাতিক বেসামরিক বিমান চলাচল নিরাপদ ও এর সুশৃঙ্খল উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে। প্রতিষ্ঠানটি বিমান চালনা নিরাপদ করা, মান নির্ধারণ করা, দক্ষতা এবং নিয়মানুবর্তিতা সেই সাথে পরিবেশ রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করে থাকে। বেসামরিক বিমান চলাচল নিরাপদ, সুরক্ষিত করা এবং টেকসই উন্নয়ন অর্জন করার জন্য সংস্থাটি এর ১৯১ সদস্য রাষ্ট্রের সহযোগিতার ওপর নির্ভর করে। আইসিএওর একটি কাউন্সিল রয়েছে যা এর নীতিনির্ধারণী অংশ। এটি

এর সব চুক্তিবদ্ধ রাষ্ট্রের ৩৬ জন প্রতিনিধির সমন্বয়ে গঠিত।
পরিষদের সভাপতি : রবার্তো কবেহ গঞ্জালেস (মেক্সিকো)
সেক্রেটারি জেনারেল : রেমন্ড বেঞ্জামিন (ফ্রান্স)
হেডকোয়ার্টার : ৯৯৯ বিশ্ববিদ্যালয় স্ট্রিট, মন্ট্রিল, ক্যুবেক এইচ ৩ সি ৫ এইচ ৭, কানাডা
টেলিফোন : (১ ৫১৪) ৯৫৪ ৮২১৯;
ফ্যাক্স : (১ ৫১৪) ৯৫৪ ৬০৭৭; **ই-মেইল :** icaohq@icao.int

আন্তর্জাতিক সমুদ্র চলাচল সংস্থা
(International Maritime Organization - IMO)

আন্তর্জাতিক সমুদ্র চলাচল সংস্থা ১৯৫৯ সালে কার্যক্রম শুরু করে। এটি আন্তর্জাতিক জাহাজ বাণিজ্যে নিরাপত্তার জন্য এবং জাহাজ থেকে সামুদ্রিক দূষণ রোধ করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আইএমও আন্তর্জাতিক শিপিংয়ের প্রবিধান চর্চা প্রভাবিত এবং কারিগরি সহযোগিতা সংক্রান্ত নিয়ম প্রণয়ন; সমুদ্রসীমার নিরাপত্তা ও দিকনির্ণয়ে দক্ষতা সর্বোচ্চ মান গ্রহণ সমাধান ও জাহাজ থেকে দূষণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সামুদ্রিক পরিবেশ রক্ষা করতে সরকারকে সহযোগিতা করে। ৫০টি কনভেনশন ও চুক্তি এবং ১,০০০টি কোড ও সুপারিশ আইএমও দ্বারা গৃহীত হয়েছে। ১৯৮৩ সালে এটি সুইডেনের সালমোতে ওয়ার্ল্ড মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি স্থাপন করে। এর প্রশাসনিক কর্মকর্তা, শিক্ষাবিদ এবং অন্যদের সিনিয়র পর্যায়ে শিপিংয়ের উন্নয়ন সম্পর্কিত বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। আইনজীবীরা প্রশিক্ষণের জন্য ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম আইন অনুযায়ী আইএমও ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম আইন ইনস্টিটিউট (ভাল্লেত্তা মাল্টা) ১৯৮৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। আইএমওর গভর্নিং বডি, দি অ্যাসেমব্লি ১৭০ সদস্য রাষ্ট্র এবং তিন সহযোগী সদস্য দ্বারা গঠিত। এটি ২০১৩ সালে আইএমওর বাজেট ছিল ৩,১৬,৮৬,০০০। এর প্রায় ৩০০ কর্মী আছে।
মহাসচিব : কোজি সিকিমিঝো (জাপান)
হেডকোয়ার্টার : ৪ আলবার্ট বাঁধ, লন্ডন, যুক্তরাজ্য ; **টেলিফোন :** (৪৪ ২০৭) ৭৩৫ ৭৬১১
ফ্যাক্স : (৪৪ ২০৭) ৫৮৭ ৩২১০; **ই-মেইল :** infor@irno.org

আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়ন
(International Telecommunication Union - ITU)

আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়ন সরকারি ও বেসরকারি খাতের জন্য বৈশ্বিক টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক এবং সার্ভিস সমন্বয় করে থাকে। এছাড়াও ইউনিয়নটি রেডিও-ফ্রিকোয়েন্সি স্পেকট্রাম এবং যেসব উপগ্রহ কক্ষপথে আবর্তিত হচ্ছে তার তদারকি করে থাকে। আইটিইউর কাজ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির দ্রুত উন্নয়ন, অভ্যন্তরীণ নেটওয়ার্ক, সরঞ্জাম নিরাপদ রাখা এবং কার্যক্রম নিশ্চিত করা। এটা নীতি ও নিয়ন্ত্রক ফ্রেমওয়ার্কের ওপর উপদেশ দ্বারা উন্নয়নশীল দেশে টেলিযোগাযোগ স্থাপনার ওপর অগ্রাধিকার রাখে, যেমন–বিশেষ এলাকায় কারিগরি সহায়তা ও প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সাইবার নিরাপত্তা, নেটওয়ার্ক ইনস্টলেশন ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের জন্য আগাম প্রশমন সিস্টেম তৈরি করে। আন্তর্জাতিক টেলিগ্রাফ ইউনিয়ন ১৮৬৫ সালে প্যারিসে প্রতিষ্ঠিত হয়,

যার বর্তমান নাম ১৯৩২ সালে আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়ন রাখা হয়, ১৯৪৯ সালে জাতিসংঘের বিশেষ সংস্থা হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করে। এর ১৯৩টি সদস্য দেশ রয়েছে এবং ৭০০-এর অধিক সেক্টর সদস্য। এছাড়াও বৈজ্ঞানিক ও শিল্প সংস্থা, পাবলিক-প্রাইভেট কোম্পানি, আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক সংগঠন ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। আইটিইউর গভর্নিং বডি, রাজদূত সম্মেলন, তার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নির্বাচন করে। সেইসাথে ৪৮ সদস্যের আইটিইউ কাউন্সিল বিশ্বের সব অঞ্চলের প্রতিনিধিত্ব করে। জেনেভাভিত্তিক আইটিইউর ৯৩ জাতীয়তার ৭৪০ জন কর্মী রয়েছে। এর ২০১২-১৩-এর দ্বিবার্ষিক অর্থবছরের বাজেট ছিল ৩২৩.৮ মিলিয়ন সিএইচএফ।

মহাসচিব : মালের হামাদুন (মালি)

হেডকোয়ার্টার : প্লেস দেস নেশনস, ১২১১ জেনেভা ২০, সুইজারল্যান্ড

টেলিফোন : (৪১ ২২) ৭৩০ ৫১১১; **ফ্যাক্স :** (৪১ ২২) ৭৩৩ ৭২৫৬;

ই-মেইল : itumail@itu.int

বিশ্ব ডাক ইউনিয়ন (Universal Postal Union–UPU)

১৯২ সদস্য রাষ্ট্রের সমন্বয়ে গঠিত বিশ্ব ডাক ইউনিয়ন আন্তর্জাতিক ডাক সেবা নিয়ন্ত্রণ করে। ১৮৭৪ সালে প্রতিষ্ঠিত এটি ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘের বিশেষ সংস্থা হয়। বিশ্ব ডাক ইউনিয়ন ডাক সেবার জন্য কারিগরি সহায়তা এবং রেন্ডার মধ্যস্থতা সম্পর্কিত উপদেশ দেয়। এর উদ্দেশ্য বিশ্বের সব জাতিদের সংযুক্ত করার জন্য সবার মধ্যে একটি সর্বজনীন ডাক সেবা প্রচার; আপ-টু-ডেট ডাক পণ্য এবং পরিসেবার বন্দোবস্তের মাধ্যমে মেইল ভলিউম বৃদ্ধি এবং গ্রাহকদের জন্য পোস্টাল সেবার মান উন্নয়ন। ইউনিভার্সাল পোস্টাল কংগ্রেস এই ইউনিয়নের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ, যার বার্ষিক বাজেট ছিল আনুমানিক ৩৭ মিলিয়ন ডলার। এর ২৫০ জন কর্মী, ৫০টি দেশ থেকে আগত যারা সুইজারল্যান্ডের টচট আন্তর্জাতিক ব্যুরোতে কাজ করে। ইউপিইউ-এর স্যান হোস, কোস্টারিকা; জিম্বাবুয়ের হারারে; কায়রো, মিসর; ক্যাস্টেরিস, সেন্ট লুসিয়া; কোটনু্য, বেনিন; ব্যাংকক, থাইল্যান্ড এবং বার্নেতে আঞ্চলিক সমন্বয়কারী রয়েছে।

মহাপরিচালক : বিসার এ হুসেইন (কেনিয়া)

হেডকোয়ার্টার : Weltpoststrasse 4, কেস Postale ৩০০০, বর্ন ১৫, সুইজারল্যান্ড;

টেলিফোন : (৪১ ৩১) ৩৫০ ৩১১১; **ফ্যাক্স :** (৪১ ৩১) ৩৫০ ৩১১০

ই-মেইল : info@upu.int

বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা (World Meteorological Organization - WMO)

বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থাটি ১৯৫১ সাল থেকে জাতিসংঘের একটি বিশেষ সংস্থা হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। এটি রাষ্ট্রের ওপর প্রামাণিক বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রদান করে এবং পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের, সমুদ্রের সঙ্গে তার মিথস্ক্রিয়ার, জলবায়ু অবস্থানের ম্যাপ তৈরি করে ও পানিসম্পদের বিতরণ এবং সংশ্লিষ্ট পরিবেশগত বিষয়গুলোর আচরণ লক্ষ্য করে। ডব্লিউএমও একটি বিশ্বব্যাপী পর্যবেক্ষণ সিস্টেম এবং একটি বৈশ্বিক নেটওয়ার্ক পরিচালনা, আঞ্চলিক ও জাতীয় আবহাওয়া কেন্দ্র, জলবায়ু ও হাইড্রোলজিক্যাল পূর্বাভাস প্রদান ও তালিকা তৈরি ইত্যাদি কাজ করে। আবহাওয়ার পূর্বাভাস, জলবায়ু ও পানি তথ্য দ্রুত

বিনিময় করে এবং তার প্রয়োগ সম্পর্কে উৎসাহিত করে। এ সংস্থার প্রধান এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো, প্রাকৃতিক বৈষম্যের প্রোগ্রামের জন্য ভালো প্রস্তুতি নেয়া। WMO-এর ১৯১টি সদস্য রয়েছে, যাদের সকলে আবহাওয়া এবং হাইড্রোলজিক্যাল সেবা করে থাকে। এর গভর্নিং বডি হলো, ওয়ার্ল্ড মেটেরোলজিক্যাল কংগ্রেস হয়। এ সংস্থার ৩০০ জন কর্মী রয়েছে। ২০১২-১৫ সাল পর্যন্ত এর বরাদ্দকৃত বাজেট ২৭৬ মিলিয়ন CHF।
মহাসচিব : মিশেল জারুদ (ফ্রান্স)
হেডকোয়ার্টার : ৭ বিস, এভিনিউ দে লা পাইস, কেস পোস্টাল নং ২৩০০, ১২১১জেনেভা ২, সুইজারল্যান্ড; **টেলিফোন :** (৪১ ২২) ৭৩০ ৮১১১; **ফ্যাক্স :** (৪১ ২২) ৭৩০ ৮১৮১;
ই-মেইল : wmo@wmo.int

জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক আন্তঃসরকার প্যানেল
(Intergovernmental Panel on Climate Change–IPCC)

জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক আন্তঃসরকার প্যানেল জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়ক শীর্ষস্থানীয় সংস্থা। এটি জাতিসংঘের পরিবেশ কর্মসূচি ও ডব্লিউএমও দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় জলবায়ু পরিবর্তনের রাষ্ট্র এবং তার সম্ভাব্য পরিবেশগত ও আর্থ-সামাজিক পরিণতির ওপর একটি পরিষ্কার বৈজ্ঞানিক দৃশ্য প্রদান করার উদ্দেশ্যে। IPCC বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তিগত এবং আর্থ-সামাজিক তথ্য বিশ্বব্যাপী উৎপাদিত যে বৈশ্বিক জলবায়ু সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক তথ্য রিভিউ ও নির্ণয় করে।

এটা গবেষণা ও ডেটা পর্যবেক্ষণ করে না। আইপিসিসি সচিবালয়, জেনেভা সদর দফতরে ডব্লিউএমও-এ ১২ জন কর্মী বসে। আইপিসিসি জাতিসংঘ এবং ডব্লিউএমওর সব সদস্য দেশের জন্য উন্মুক্ত। ১৯৫টি দেশ আইপিসিসির সদস্য। এর ব্যুরো ও চেয়ার পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে নির্বাচিত হয়।
চেয়ার : রাজেন্দ্র কে পাচুরি (ভারত)
সচিবালয় প্রধান : ড. রেন্টে ক্রাইস্ট (অস্ট্রিয়া)
সচিবালয় : C/O বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থার ৭ পুনর্বার, এভিনিউ দে লা পাই, সিপি ২৩০০, ১২১১ জেনেভা ২, সুইজারল্যান্ড। **টেলিফোন :** (৪১ ২২) ৭৩০ ৮২০৮; **ফ্যাক্স :** (৪১ ২২) ৭৩০ ৮০২৫; **ই-মেইল :** ipcc-sec@wmo.int

বিশ্ব বুদ্ধিবৃত্তি সম্পদ সংস্থা
(World Intellectual Property Organization–WIPO)

বিশ্ব বুদ্ধিবৃত্তি সম্পদ সংস্থা ১৯৭০ সালে প্রতিষ্ঠিত এবং ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘের বিশেষায়িত সংস্থায় পরিণত হয়। এর লক্ষ্য হলো, সদস্য দেশসমূহ এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে সহযোগিতার মাধ্যমে মেধা ও সম্পত্তি (আইপি) রক্ষা ও উন্নীত করা। এটি একটি ভারসাম্য ও ব্যবহারযোগ্য আন্তর্জাতিক আইপি সিস্টেম তৈরি করে, যা একটি সুষম সৃজনশীলতা ও উদ্দীপনাতে নতুনত্ব আনে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে জনস্বার্থ রক্ষায় বড় ভূমিকা রাখে। ডব্লিউআইপিওর কৌশলগত লক্ষ্যগুলো হলো : আন্তর্জাতিক আদর্শে আইপি কাঠামোর সুষম বিবর্তন; উন্নয়নের জন্য আইপি ব্যবহারের সুবিধা; বিশ্বব্যাপী আইপি সেবা প্রদান; আইপির জন্য সম্মান তৈরি; বিশ্বব্যাপী আইপির

উন্নয়নশীল পরিকাঠামো তৈরি; আইপি তথ্যের জন্য একটি বৈশ্বিক রেফারেন্স গঠন; আইপি সম্পর্কিত নীতিগুলো বিশ্বব্যাপী চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হওয়া; যেমন–জলবায়ু পরিবর্তন, জনস্বাস্থ্য ও খাদ্য নিরাপত্তা ইত্যাদি। ডব্লিউআইপিও-তে ১৮৫টি সদস্য রাষ্ট্র এবং আইপি কপিরাইটের ২৫ জন আন্তর্জাতিক চুক্তি ব্যবস্থাকারী রয়েছে। এটা জাতিসংঘ সংগঠন পরিবারের মধ্যে স্ব-অর্থায়নে চলে। ২০১২-১৩ দ্বিবার্ষিক অর্থবছরের জন্য এর বাজেট ছিল ৬৩৭.২ মিলিয়ন সিএইচএফ, যা এর সার্ভিস শিল্প ও বেসরকারি খাতের উদ্ভূত আয় থেকে আসে এবং এটি ডব্লিউআইপিওর মোট বাজেটের ৯০ শতাংশ। বাজেটের বাকি অংশ এর মধ্যস্থতা এবং প্রকাশনা কেন্দ্র ও সদস্য দেশ থেকে অনুদান এবং প্রচারণা বিক্রয়ের অর্থ হতে আসে।

মহাপরিচালক : ফ্রান্সিস গ্যারি (অস্ট্রেলিয়া), **হেডকোয়ার্টার :** ৩৪ চেমিন দেস কলম্বেটস;
আর.ও. বক্স : ১৮, ১২১১ জেনেভা ২০, সুইজারল্যান্ড;
টেলিফোন : (৪১ ২২) ৩৩৮ ৯১১১; **ফ্যাক্স :** (৪১ ২২) ৭৩৩ ৫৪২৮

কৃষি উন্নয়ন বিষয়ক আন্তর্জাতিক তহবিল
(International Fund for Agricultural Development - IFAD)

আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিলটি খাদ্য ও পুষ্টির নিরাপত্তা উন্নত করতে এবং গ্রামীণ দরিদ্র মানুষদের আয় বৃদ্ধি তাদের ক্ষমতা জোরদার এবং সক্রিয় করার জন্য নিবেদিত। ইফাদ-এর ১৭২ সদস্য দেশগুলোর সম্পদ ব্যবহার করে স্বল্প সুদে ঋণ ও অনুদান প্রদান করে পল্লী উন্নয়ন করার জন্য অর্থায়ন করে। সংস্থাটি অক্ষম দরিদ্র দেশগুলোকে ঋণের পরিবর্তে অনুদান দেয়, এটা নিশ্চিত করার জন্য যে এ অর্থ সবচেয়ে যাদের প্রয়োজন তারা যেন অযৌক্তিক আর্থিক দুর্ভোগ থেকে বাঁচতে পারে। ইফাদ সরকার, জাতিসংঘের অন্যান্য সংস্থা, দ্বিপক্ষীয় ও বহুপক্ষীয় উন্নয়ন সংস্থা, আন্তর্জাতিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র এবং বেসরকারি খাতের সঙ্গে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কাজ করে। সংস্থাটি সুশীল সমাজ, বিশেষ করে যারা কৃষকদের এবং গ্রামীণ জনগণের সাথে সম্পর্কযুক্ত, এনজিও, পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউট ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সঙ্গে দৃঢ় সম্পর্ক বজায় রাখে। সংস্থাটির তহবিল বিভিন্ন দেশের স্বেচ্ছা অনুদান, বিশেষ অনুদান, ঋণ পরিশোধের এবং বিনিয়োগ আয়ের অর্থায়নে গঠিত। এর জন্মলগ্ন থেকে ২০১২ সালের শেষ পর্যন্ত ইফাদ ৯২৪টি প্রকল্প এবং কর্মসূচিতে প্রায় ৪০০ মিলিয়নের বেশি দরিদ্র গ্রামীণ মানুষের কাছে ১৪.৮ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগের অর্থ পৌঁছে দিয়েছে। সরকার ও প্রাপক দেশের অন্যান্য অর্থায়ন উৎস, প্রকল্প অংশগ্রহণকারীদের থেকে ১২.৩ বিলিয়ন ডলারসহ বহুপক্ষীয় ও দ্বিপক্ষীয় অন্য দাতাদের কাছ থেকে ৯.৬ বিলিয়ন ডলার মিলিত বিনিয়োগ এসেছে। ইফাদ-এর গভর্নিং কাউন্সিল সব সদস্য রাষ্ট্র দ্বারা তৈরি করা হয়। নির্বাহী বোর্ড যেটি ১৮ জন সদস্য এবং ১৮ জন বিকল্প সদস্য নিয়ে গঠিত, ইফাদ-এর ঋণ ও অনুদান অনুমোদনের কাজ করে থাকে।

প্রেসিডেন্ট : কানাও এফ ওয়ানজি (নাইজেরিয়া)
হেডকোয়ার্টার : ভায়া পাওলো দি দোনো ৪৪, ০০১৪২ রোম, ইতালি
টেলিফোন : (৩৯ ০৬) ৫৪ ৫৯১; ফ্যাক্স : (৩৯ ০৬) ৫০৪ ৩৪৬৩
ই-মেইল : ifad@ifad.org

জাতিসংঘ শিল্প উন্নয়ন সংস্থা
(United Nations Industrial Development Organization - UNIDO)

জাতিসংঘের শিল্প উন্নয়ন সংস্থা টেকসই শিল্প উন্নয়ন এবং আন্তর্জাতিক শিল্প সহযোগিতার মাধ্যমে ন্যায়সঙ্গত সম্পদ সৃষ্টি এবং বিশ্বব্যাপী সমৃদ্ধির জন্য কাজ করে। ১৯৬৬ সালে সাধারণ পরিষদ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত UNIDO ১৯৮৫ সালে জাতিসংঘের বিশেষ সংস্থা হিসেবে স্বীকৃতি পায়। পরিবেশ রক্ষা করার জন্য উন্নয়নশীল দেশগুলোকে উপযুক্ত সমাধান প্রদানের মাধ্যমে বিকাশমান উৎপাদনশীল খাতে হওয়া আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অংশগ্রহণ এবং শক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে উপযুক্ততার সুযোগ প্রদান করে। সংস্থাটি জীবন ও জীবিকার সুবিধার জন্য শিল্প উন্নয়নে জটিল চ্যালেঞ্জ পূরণে সরকার, বেসরকারি খাত, ব্যবসা প্রতিষ্ঠা এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডারের সঙ্গে একযোগে কাজ করে। ভিয়েনায় ইউনিডো-এর রিসোর্স পুলের পেশাদার কর্মীরা, ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড টেকনোলজি প্রমোশন অফিস, আন্তর্জাতিক প্রযুক্তি সেন্টার এবং ন্যাশনাল ক্লিনার প্রোডাকশন সেন্টার, প্রকৌশল, শিল্প ও অর্থনৈতিক নীতি, প্রযুক্তি ও পরিবেশ ইত্যাদি ক্ষেত্রে কাজ করে। ইউনিডো-এর আঞ্চলিক এবং দেশভিত্তিক প্রতিনিধিদের দ্বারা পরিচালিত হয়।

ইউনিডোর ১৭২ সদস্য রাষ্ট্র বাজেট এবং প্রোগ্রাম অনুমোদন করার জন্য সাধারণ সমাবেশে মিলিত হয়। ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট বোর্ডটি ৫৩ সদস্য রাষ্ট্রের সমন্বয়ে পরিকল্পনা ও কর্মসূচি এবং বাজেট বাস্তবায়নের বিষয়ে সুপারিশ করে থাকে। ২০১২ সালে ইউনিডো-এর ৭০০ জন কর্মী এর প্রধান কার্যালয়সহ বিশ্বব্যাপী ৩০টি অঞ্চল ও দেশের অফিসে কর্মরত রয়েছে। কারিগরি সহযোগিতা বণ্টনে ২০১২ সালে এর খরচ ছিল ১৮৯.২ মিলিয়ন ডলার। ইউনিডো বিশেষ সংস্থা হওয়ার পর এটিই এর সর্বোচ্চ ব্যয়।

মহাপরিচালক : ক্যান্ডেহ কে ইউমকেলা (সিয়েরা লিওনে)
হেডকোয়ার্টার : ভিয়েনা ইন্টারন্যাশনাল সেন্টারে ওয়াগ্রামারস্ট্রাসি ৫
পি.ও বক্স : ৩০০, ১৪০০ ভিয়েনা, অস্ট্রিয়া; **টেলিফোন :** (৪৩ ১) ২৬০২৬ ০
ফ্যাক্স : (৪৩ ১) ২৬৯ ২৬৬৯ ই-মেইল : unido@unido.org

বিশ্ব পর্যটন সংস্থা (World Tourism Organization-UNWTO)

বিশ্ব পর্যটন সংস্থাটি স্থায়ী এবং সর্বজনীনভাবে ব্যবহারযোগ্য পর্যটন উন্নয়নে বিশ্বের নেতৃস্থানীয় আন্তর্জাতিক সংগঠন। ১৯৭৫ সালে প্রতিষ্ঠিত বিশ্ব পর্যটন সংস্থাটি ২০০৩ সালে জাতিসংঘের বিশেষ সংস্থা হিসেবে স্বীকৃতি পায়। সংস্থাটি পর্যটন নীতি সমস্যা সমাধানের জন্য একটি বৈশ্বিক ফোরাম ও 'পর্যটন সম্পর্কে জানুন'–এই বিষয়ের একটি ব্যবহারিক উৎস হিসেবে কাজ করে। সংস্থার ১৬১টি সদস্য দেশ এবং সহযোগী সদস্য, দুটি স্থায়ী পর্যবেক্ষক ও স্থানীয় সরকারসহ ৪০০ অধিভুক্ত সদস্য, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পর্যটন সংস্থা ও বেসরকারি খাতের প্রতিষ্ঠানগুলো এই সংস্থার অন্তর্ভুক্ত। ইউডব্লিউটিও পর্যটন মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও স্থায়ী উন্নয়ন উদ্দীপিত এবং বিভিন্ন জাতির মধ্যে শান্তি ও সমঝোতা উন্নীত করার লক্ষ্যে কাজ করে। এটি পর্যটনের বৈশ্বিক নৈতিকতা যা বিশ্বের পর্যটনের টেকসই উন্নয়নের জন্য একটি ফ্রেম রেফারেন্স হিসেবে কাজ করে। সংস্থাটির এই বৈশ্বিক কোডটি ২০০১ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত। এটি পরিবেশ, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও সমাজে এর সম্ভাব্য নেতিবাচক প্রভাব

কমাতে এবং পর্যটনকে আর্থ-সামাজিকভাবে পূর্ণ বিস্তার লাভবান করার লক্ষ্যে কাজ করে।

ইউডব্লিউটিও-এর সাধারণ পরিষদের সর্বোচ্চ সংস্থা, সংস্থাটির সহযোগী ও অধিভুক্ত সংস্থার বাজেট তৈরি, প্রোগ্রামের সদস্য অনুমোদন এবং পর্যটন খাতের প্রধান গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সংস্থাটির নির্বাহী পরিষদের গভর্নিং বোর্ড যেটি ৩১ স্থায়ী সদস্য যারা অ্যাসেমব্লি দ্বারা নির্বাচিত হন এবং একজন স্থায়ী সদস্য স্পেন (সংস্থাটির স্বাগতিক রাষ্ট্র) নিয়ে গঠিত। ২০১২-১৩-এর দ্বিবার্ষিক অর্থবছরের জন্য ইউডব্লিউটিও-এর বাজেট ছিল ২৫ মিলিয়ন ইউরো এবং এর কর্মী সংখ্যা ছিল ১১০ জন।

মহাসচিব : তালেব ডি রিফাই (জর্ডান)

হেডকোয়ার্টার : কাপিতান হায়া, ৪২, ২৮০২০ মাদ্রিদ, স্পেন

টেলিফোন : (৩৪ ৯১) ৫৬৭ ৮১০০; **ফ্যাক্স :** (৩৪ ৯১) ৫৭১ ৩৭৩৩

ই-মেইল : omt@unwto.org

সার্বিক পারমাণবিক পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণ চুক্তি সংস্থার প্রস্তুতি কমিশন (Preparatory Commission for the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organaization - CTBTO)

সার্বিক পারমাণবিক পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণ চুক্তিটি ১৯৬৬ সালে গৃহীত এবং স্বাক্ষরিত হয়। এটি সব উন্মুক্ত পারমাণবিক বিস্ফোরণ নিষিদ্ধ করে। ফেব্রুয়ারি ২০১৩ হিসাব অনুযায়ী ১৮৩ সদস্য দেশ এ চুক্তি স্বাক্ষর করেছে এবং ১৫৯টি দেশ এর অনুমোদন দিয়েছে। ৪৪ পরমাণু প্রযুক্তি অধিষ্ঠিত সদস্য রাষ্ট্র যাদের অনুসমর্থনে এই চুক্তি বলবৎ হয় এবং চুক্তি বলবৎ হতে দেশগুলোর এন্ট্রির জন্য প্রয়োজন হয়, আটটি যার অনুমোদন এখনো হয়নি তারা হলো : চীন, কোরিয়া (উত্তর কোরিয়া), মিসর, ভারত, ইরান, ইসরায়েল, পাকিস্তান ও মার্কিন গণতান্ত্রিক গণপ্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র, ভারত এবং পাকিস্তান। সার্বিক পারমাণবিক পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণ চুক্তি সংস্থার জন্য ভিয়েনাভিত্তিক প্রস্তুতিমূলক কমিশন CTBT যাচাই শাসন গড়ে তোলে, যাতে এটি পুরোপুরি কর্মক্ষম যখন চুক্তি হিসেবে বলবৎ হতে পারে। এছাড়াও এর ম্যান্ডেট স্বাক্ষর এবং চুক্তি অনুসমর্থন সম্পর্কিত প্রচারণা চালায়। CTBT-এর পর্যবেক্ষণ কমিটি ৩৩৭টি ফ্যাসিলিটি মনিটর করে যা পারমাণবিক বিস্ফোরণের লক্ষণ সম্পর্কে বিশ্বকে অবহিত করার লক্ষ্য নিয়ে গঠিত এছাড়াও প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিশ্লেষণের জন্য একটি আন্তর্জাতিক ডাটা সেন্টার এবং অনসাইট পরিদর্শন একটি সন্দেহজনক ঘটনার ক্ষেত্রে মাটিতে প্রমাণ সংগ্রহ করাও এর কাজের অন্তর্ভুক্ত। সংগঠনটির প্রায় ১২০ মিলিয়ন ডলার বার্ষিক বাজেট রয়েছে। সংগঠনটিতে ৭০টি দেশের ২৬০ জনের বেশি কর্মী নিয়োগ রয়েছে।

নির্বাহী সম্পাদক : টিবর টথ (হাঙ্গেরি)

হেডকোয়ার্টার : ভিয়েনা ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার

পোস্ট বক্স : ১২০০, ১৪০০ ভিয়েনা, অস্ট্রিয়া

টেলিফোন : (৪৩ ১) ২৬০৩০ ৬২০০;

ফ্যাক্স : (৪৩ ১) ২৬০৩০ ৫৮২৩

ই-মেইল : info@ctbto.org

আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থা
(International Atomic Energy Agency - IAEA)

আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থাটি পরমাণু অস্ত্রের বিস্তার রোধ ও শান্তিপূর্ণভাবে উন্নয়নশীল দেশগুলোর নিরাপত্তা প্রয়োগ এবং বিশেষ সাহায্যের জন্য পারমাণবিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির নিরাপদ ব্যবহারের জন্য এটি একটি আন্তর্জাতিক কেন্দ্র। এটি এর ১৫৯ সদস্য রাষ্ট্রের মানুষের স্বাস্থ্যের উন্নতি, খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি, পরিষ্কার পানি এবং পরিবেশ রক্ষা করার জন্য জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে সাহায্য করে। আইএইএ ৭৮টি রাষ্ট্র ১,২০০-এর বেশি কেন্দ্র ২,০০০-এরও বেশি পরিদর্শন করে। এর উদ্দেশ্য হলো দেশগুলো যাতে পারমাণবিক পদার্থ কোনো প্রকার বিধ্বংসী কাজে ব্যবহার না করে। সংস্থাটি জাতিসংঘের পৃষ্ঠপোষকতায় একটি স্বশাসিত সত্তা হিসেবে ১৯৫৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।

আইএইএ-এর নিয়ন্ত্রক সংস্থা এর অঙ্গ সংস্থানগুলো হলো, সাধারণ সম্মেলন, যেটি সব সদস্য রাষ্ট্র নিয়ে গঠিত ও বছরে একবার মিলিত হয় এবং ৩৫ সদস্যবিশিষ্ট গভর্নরস বোর্ড যা ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে মিলিত হয় ও নীতি বিষয়ক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এর মহাপরিচালক অস্ট্রিয়ার ভিয়েনাতে অবস্থিত আইএইএ-এর হেডকোয়ার্টারে ২,৪০০ কর্মী সম্পন্ন সচিবালয় নেতৃত্ব প্রদান করে। ২০১২ সালে আইএইএ-এর নিয়মিত বাজেট ছিল, ৩৩৩ মিলিয়ন ইউরো, যা প্রাথমিকভাবে বার্ষিক মূল্যায়ন দ্বারা নির্ধারিত হয়। স্বেচ্ছাসেবী অনুদানের ফলে এই বাজেট আরো বৃদ্ধি পায় ও কারিগরি সহযোগিতা তহবিলে অর্থায়ন করে, ২০১২ সালে যার লক্ষ্য ছিল ৮৮ মিলিয়ন ডলার।

মহাপরিচালক : ইউকিয়া আমানো (জাপান)
হেডকোয়ার্টার : পি.ও. বক্স : ১০০; Wagramerstrasse ৫, ১৪০০ ভিয়েনা, অস্ট্রিয়া
টেলিফোন : (৪৩ ১) ২৬০০ ০; **ফ্যাক্স :** (৪৩ ১) ২৬০০ ৭
ই-মেইল : Official.Mail@iaea.org

রাসায়নিক অস্ত্র নিষিদ্ধকরণ সংস্থা
(Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons–OPCW)

রাসায়নিক অস্ত্র নিষিদ্ধকরণ সংস্থাটি একটি আন্তর্জাতিক স্বনির্ভর সংস্থা যেটি জাতিসংঘের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে। সংস্থাটি রাসায়নিক অস্ত্র উৎপাদন, মজুদ ও ব্যবহার প্রতিরোধ এবং ব্যাপক ধ্বংস করার লক্ষ্যে গৃহীত চুক্তির বাস্তবায়নকে নিরীক্ষণ করে। কনভেনশনটি ১৯৯৭ সাল থেকে কার্যকর ও এটি প্রথম বহুপক্ষীয় রাসায়নিক নিরস্ত্রীকরণ এবং রাসায়নিক অস্ত্র বিস্তার প্রতিরোধ চুক্তি, যার লক্ষ্য হলো নির্ধারিত সময়ের ভেতর আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষণ ও তদন্তে সব ধরনের গণবিধ্বংসী অস্ত্রের নিরসন।

এই সংস্থা ১৮৮ সদস্য রাষ্ট্রের সমন্বয়ে গঠিত একটি সংস্থা। ১৯৯৭ সাল থেকে সদস্য রাষ্ট্রগুলো ৫৫,০০০ মেট্রিক টনেরও বেশি রাসায়নিক এজেন্ট ধ্বংস করেছে, যা ঘোষিত ৭১,০০০ মেট্রিক টনের ৭৮ শতাংশ। এর পরিদর্শকরা ৮৪টি দেশের ৫,০০০ সামরিক ও শিল্প অঞ্চলে পরিদর্শন পরিচালনা করেছে। এই মিশন রাসায়নিক অস্ত্র উৎপাদনের সুযোগ-সুবিধা নিষ্ক্রিয় ও ধ্বংস নিশ্চিত করেছে অথবা এর গ্রহণযোগ্য ব্যবহারে রূপান্তরিত করেছে এবং নতুন রাসায়নিক অস্ত্রের উত্থান রোধ করতে পেরেছে। এছাড়াও পরিদর্শকরা রাসায়নিক অস্ত্র ধ্বংস প্রক্রিয়া প্রত্যক্ষ করার মাধ্যমে এই গণবিধ্বংসী অস্ত্রের নিষ্ক্রিয়তা

নিশ্চিত করে থাকেন। রাসায়নিক অস্ত্র আক্রমণের হুমকি প্রতিরোধে সব OPCW সদস্য রাষ্ট্র পরস্পরকে সাহায্য করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কোনো রকম আকস্মিক ঘটনা সামাল দেয়ার জন্য, রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহারজনিত কোনো রকম ঝুঁকি মোকাবেলায় ও জীবনহানি প্রতিরোধে দ্রুত ও কার্যকর আন্তর্জাতিক মোকাবেলা কর্মসূচি গ্রহণে নিজ সক্ষমতা অব্যাহত রাখতে ওপিসিডব্লিউ নিয়মিত পরীক্ষা চালায়। এছাড়াও রসায়নের শান্তিপূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিত করতে এটি আন্তর্জাতিক সহযোগিতা প্রোগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। নেদারল্যান্ডস-এর হেগে ওপিসিডব্লিউ-এর প্রযুক্তিগত সচিবালয়ে ৪৫০-এর বেশি প্রতিনিধি কর্মরত, যারা ৮০টি দেশ থেকে আগত। ২০১২ সালে এর বাজেট ছিল প্রায় ৭০ মিলিয়ন ডলার।

মহাপরিচালক : আহমেট উযুমকু (তুরস্ক)

হেডকোয়ার্টার : জোহান ডি উইটলান ৩২, ২৫১৭ জেআর, দি হেগ, দি নেদারল্যান্ডস

টেলিফোন : (৩১ ৭০) ৪১৬ ৩৩০০; ফ্যাক্স : (৩১ ৭০) ৩০৬ ৩৫৩৫

ই-মেইল : media@opcw.org

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (World Trade Organaization-WTO)

১৯৯৫ সালে প্রতিষ্ঠিত বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা সারা বিশ্বের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংক্রান্ত আইন-কানুন বিষয়ক একমাত্র আন্তর্জাতিক সংগঠন। এই সংস্থার লক্ষ্য, বাণিজ্য ব্যবস্থা সহজতর করতে তার সব সদস্য দ্বারা সম্মত একটি বহুপক্ষীয় ফোরামের ওপর ভিত্তি করে সরকারগুলোর মধ্যে বাণিজ্য আলোচনা ও বাণিজ্য বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য কাজ করা। ডব্লিউটিও সিস্টেমের মাধ্যমে পরিচালিত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য নীতির ভিত্তিতে আছে ৬০টি চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক, যার মূল কথা হলো বৈষম্যহীনতা, উন্মুক্ত বাণিজ্য, বাণিজ্যের জন্য উৎসাহ ও প্রতিযোগিতা এবং স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য বিশেষ বিধান।

সদস্যদের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে বাণিজ্য বাধা দূরীকরণ ও সংশোধিত বাণিজ্য নিয়মাবলিভিত্তিক আন্তর্জাতিক ট্রেডিং ব্যবস্থার সংস্কার করার জন্য ডব্লিউটিও একটি ফোরাম হিসেবে কাজ করে। ২০০১ সালে ডব্লিউটিও দোহা ডেভেলপমেন্ট এজেন্ডা নামের একটি বহুপক্ষীয় আলোচনার সূত্রপাত করে, যার মৌলিক উদ্দেশ্য ছিল উন্নয়নশীল দেশগুলোর ট্রেডিং সম্ভাবনার উন্নতি। এর কর্মপরিধি বাণিজ্যের প্রায় ২০টি কর্মক্ষেত্র জুড়ে মন্ত্রী পর্যায়ের আলোচনা এখনো প্রয়োজনীয় সফলতা আনতে পারেনি। ডব্লিউটিও ১৯৮৬-১৯৯৪ সময়ে সম্পাদিত উরুগুয়ে বিশ্ব বাণিজ্য আলোচনাপ্রসূত চুক্তি বাস্তবায়নের দেখাশোনা করে যাচ্ছে। ৪৫০টির বেশি বাণিজ্য বিরোধ ডব্লিউটিওর বিতর্ক নিষ্পত্তির প্রক্রিয়ার অধীনে আনা হয়েছে।

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার ১৫৯টি সদস্য রয়েছে ও কর্মী সংখ্যা ৬৪০ জন। এর গভর্নিং বডি হলো মিনিস্ট্রিয়াল কনফারেন্স। সাধারণ পরিষদের প্রতিদিনের কাজগুলো সম্পাদন করে থাকে। ২০১২ সালের জন্য ডব্লিউটিওর বাজেট ছিল ১৯৬ মিলিয়ন CHF।

মহাপরিচালক : রবার্তো এ্যাজিভিডো (ব্রাজিল)

হেডকোয়ার্টার : সেন্টার উইলিয়াম রাপ্পারড, রু ডি লুসানে ১৫৪, ১২১১
জেনেভা ২১, সুইজারল্যান্ড

টেলিফোন : (৪১ ২২) ৭৩৯ ৫১ ১ ১; ফ্যাক্স : (৪১ ২২) ৭৩১ ৪২০৬

ই-মেইল : enquiries@wto.org

২. আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা

লেবাননস্থ চিবা শহরের নিকটবর্তী এক পর্যবেক্ষণ-ঘাঁটি থেকে জাতিসংঘের লেবাননের অন্তর্বর্তীকালীন সৈন্যদলের একজন শান্তিরক্ষক ২০০০ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক শনাক্তকৃত দক্ষিণ লেবানন থেকে ইসরাইলি সৈন্য প্রত্যাহার পর্যবেক্ষণ করছেন। (২৫ এপ্রিল ২০১২, জাতিসংঘ ছবি/পাসকুয়াল গরিজ)

জাতিসংঘের প্রাথমিক উদ্দেশ্যগুলোর একটি হচ্ছে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখা। জাতিসংঘ জন্মের পর থেকে প্রায়শই বিবদমান সদস্য রাষ্ট্রগুলোকে যুদ্ধ থেকে বিরত থাকতে, বিপজ্জনক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে, অস্ত্র ব্যবহারের বদলে আলোচনায় আসার জন্য উদ্বুদ্ধ করে। যুদ্ধ শুরু হলে শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত থাকে। বিগত কয়েক দশকে জাতিসংঘ বহুসংখ্যক সংঘর্ষ অবসানে সহায়ক হিসেবে কাজ করেছে; বিশেষ করে কম্বোডিয়া, এল সালভাদর, গুয়েতেমালা, লাইবেরিয়া, মোজাম্বিক, নামিবিয়া, সিয়েরা লিওন, তাজিকিস্তান এবং তিমুর-লেস্তে সফল শান্তি মিশনের মাধ্যমে সংঘর্ষের অবসান ও পুনঃএকত্রীকরণের ক্ষেত্রে এই আন্তর্জাতিক সংগঠনটি মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে। নিরাপত্তা পরিষদ আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বিষয়ে জাতিসংঘের মূল অঙ্গ, যদিও সাধারণ পরিষদ ও জাতিসংঘ মহাসচিব শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় উল্লেখযোগ্য সহায়ক ভূমিকা পালন করেন। উল্লেখ্য যে, সংঘর্ষ প্রতিরোধ ও অবসান, শান্তির বার্তা প্রচার, শান্তি বিনির্মাণ, শান্তি রক্ষা, ইত্যাদি জাতিসংঘের প্রাথমিক দায়িত্ব।

একুশ শতকের শুরু থেকেই বেসামরিক সংঘর্ষের অভিনব হুমকির দরুন বিশ্ব নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উদিত হয়েছে : *সশস্ত্র আক্রমণ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সক্ষমতা কতটুকু?*

নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় এবং স্থায়ী শান্তিরক্ষার জন্য জাতিসংঘ স্থানীয় সংগঠনগুলোর সহযোগিতায় নিজস্ব শান্তিরক্ষা প্রক্রিয়াগুলো আরো উন্নত করেছে, সংঘাত-উত্তর শান্তি প্রক্রিয়া বেগবান করেছে এবং নিবৃত্তিমূলক কূটনীতির আশ্রয় নিচ্ছে। বেসামরিক সংঘর্ষ প্রতিরোধে, যেখানে জাতিগত সংঘাত ও নিরাপত্তাহীনতা প্রকট, নিরাপত্তা পরিষদ আরো জটিল এবং উদ্ভাবনী শান্তিরক্ষা ও রাজনৈতিক মিশনের অনুমোদন দিয়েছে। ফলত, গত দশকে অনেক দেশে টেকসই শান্তিরক্ষা, অবাধ ও বৈধ নির্বাচনে অংশগ্রহণ এবং অর্ধ মিলিয়ন পুরনো যোদ্ধাদের নিরস্ত্র করা সম্ভব হয়েছে।

১৯৯০ সালের শেষ দিকে মধ্য আফ্রিকা, কঙ্গো গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র, কসোভো, সিয়েরা লিওন এবং তিমুরে চলমান সংকটাপন্ন পরিস্থিতির কারণে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদকে শান্তিরক্ষা কমিশনের বেশ কিছু মিশন পরিচালনা করতে হয়েছিল। ২০০৯-১০ সালে যখন জাতিসংঘ শান্তিরক্ষীরা তাদের মিশনের চূড়ায় পৌঁছে যায়, তখন ১০০,০০০ শান্তিরক্ষীদেরকে ব্লু হেলমেট নাম দেয়া হয়, যারা সারা বিশ্বে এদের শান্তিরক্ষার বাণী নিয়ে পৌঁছে যায় পৃথিবীকে আরো শান্তিপূর্ণ করতে এবং শান্তিরক্ষা পদ্ধতি আরো উন্নত করতে।

বিগত বছরগুলোতে সংঘাত বৃদ্ধি হওয়ায় জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা ও সংঘর্ষ নিবারণের ওপর জোর দিয়েছে, সংঘাত ব্যবস্থাপনায় সদস্য দেশের সক্ষমতা বাড়াতে আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে যুক্ত করেছে, অব্যাহত শান্তি ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে চেয়েছে। অব্যাহত শান্তিরক্ষা নির্ভর করে অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সামাজিক

ন্যায়বিচার, মানবাধিকার ও সুশাসনের ওপর। এ ক্ষেত্রে দেশীয় সম্পদ ও দেশি সুযোগ-সুবিধার সঠিক ও কার্যকরী ব্যবহার অপরিহার্য। বিশ্বের কোনো সংস্থারই শান্তিরক্ষার ক্ষেত্রগুলোতে জাতিসংঘের মতো ন্যায়সঙ্গত অধিকার, বহুমাত্রিক অভিজ্ঞতা, পারদর্শিতা, সমন্বয়ের সক্ষমতা ও নিরপেক্ষতা নেই। জাতিসংঘ বেশ কিছু দেশে শান্তিরক্ষার প্রয়োজনে বিশেষ রাজনৈতিক শান্তি-বিনির্মাণ মিশন ও অফিস খুলেছে। যেমন আফগানিস্তান, বুরুন্ডি, সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক, গিনি বিসাও, ইরাক, লেবানন, লিবিয়া, মালি, সিয়েরা লিওন ও সোমালিয়া। এছাড়াও সেন্ট্রাল আফ্রিকা, সেন্ট্রাল এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য এবং পশ্চিম আফ্রিকাতে এর আঞ্চলিক মিশন আছে।

আন্তর্জাতিক শান্তি এবং নিরাপত্তা বজায় রাখার জন্য জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ দমন এবং গণবিধ্বংসী অস্ত্রের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট। সদস্য রাষ্ট্রগুলো সাধারণ পরিষদ ও নিরাপত্তা পরিষদের সংশ্লিষ্ট কার্যালয় ও অঙ্গসংস্থার মাধ্যমে জাতিসংঘ কর্তৃক প্রণীত নীতিমালা মোতাবেক সন্ত্রাসবাদ দমনে সহযোগিতা করে থাকে। সংস্থাটি বহুমাত্রিক অস্ত্র নির্মূলকরণের প্রতি সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে থাকে এবং কার্যকরী প্রচেষ্টার মাধ্যমে সারা বিশ্বে অসংখ্য অস্ত্র নির্মূল বা হ্রাসকরণ চুক্তি করেছে। এগুলোর মধ্যে পারমাণবিক অস্ত্র হ্রাসকরণ এবং পরিহারকরণ, রাসায়নিক অস্ত্র ধ্বংসকরণ, জৈব অস্ত্র নিষিদ্ধকরণ এবং ছোট ও হালকা অস্ত্রের ব্যবহার হ্রাসকরণ সংক্রান্ত চুক্তি ও প্রটোকলগুলো রয়েছে। আন্তর্জাতিক পরিবেশ ও পরিস্থিতির পরিবর্তন এসব চুক্তি, সন্ধি ও প্রোটকলগুলোকে প্রভাবিত করে, এবং এক সময় নতুন নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জ দেখা দেয়।

নিরাপত্তা পরিষদ (Security Council)

জাতিসংঘ সনদ একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি। এর অন্তর্ভুক্ত দেশগুলো শান্তিপূর্ণ উপায়ে নিজেদের দ্বন্দ্ব-বিরোধ নিষ্পত্তি করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, যাতে আন্তর্জাতিক শান্তি, নিরাপত্তা এবং ন্যায়বিচার বিপন্ন না হয়। সদস্য রাষ্ট্রগুলো একে অপরের প্রতি হুমকি হওয়া অথবা শক্তি প্রয়োগ করা থেকে বিরত থাকবে এবং হুমকি অথবা শক্তি প্রয়োগ বিষয়ে কোনো অভিযোগ শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় সংক্রান্ত জাতিসংঘের প্রাথমিক দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা নিরাপত্তা পরিষদে তুলে ধরতে পারে। সনদ অনুযায়ী সদস্য দেশগুলো সংস্থাটির যে কোনো সিদ্ধান্ত মেনে নিতে ও বাস্তবায়ন করতে বাধ্য। জাতিসংঘের অন্য কোনো অঙ্গ সংগঠনের সুপারিশ নিরাপত্তা পরিষদের কোনো সিদ্ধান্তের মতো সদস্য দেশগুলোর ওপর বাধ্যতামূলক নয়, তবে তাদের মতামত আন্তর্জাতিক অঙ্গনে প্রভাব বিস্তার করে।

যখন কোনো বিবাদ নিরাপত্তা পরিষদে উপস্থাপন করা হয়, তখন নিরাপত্তা পরিষদ সাধারণত বিবদমান দেশগুলোকে বিষয়টি আলোচনার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণভাবে নিষ্পত্তি করতে বলে। নিরাপত্তা পরিষদ শান্তিপূর্ণভাবে দ্বন্দ্ব সমাধানে বিবদমান পক্ষগুলোকে সুপারিশ করতে পারে, বিশেষ প্রতিনিধি নিয়োগ দেয়, জাতিসংঘ মহাসচিবের হস্তক্ষেপ চাইতে পারে অথবা বিষয়টি তদন্ত বা মধ্যস্থতা করতে নির্দেশ দিতে পারে। যখন কোনো দ্বন্দ্ব যুদ্ধের রূপ নেয়, তখন পরিষদ যত দ্রুত সম্ভব তা অবসানের চেষ্টা করে। প্রায়শই নিরাপত্তা পরিষদের নির্দেশ মতে যুদ্ধবিরতি ঘোষণায় দীর্ঘমেয়াদে যুদ্ধ-বিগ্রহ প্রতিরোধ হতে দেখা যায়। শান্তি প্রক্রিয়ায় সহযোগিতার অংশ হিসেবে নিরাপত্তা পরিষদ সামরিক পর্যবেক্ষক নিয়োগ দিতে অথবা সংঘাতপূর্ণ এলাকায় শান্তিরক্ষী বাহিনী মোতায়েন করতে

পারে। জাতিসংঘ সনদের সপ্তম অধ্যায় অনুযায়ী নিরাপত্তা পরিষদ তার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য যে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে। পরিষদটি আদেশের যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য নিষেধাজ্ঞা ও অবরোধ আরোপ করতে পারে অথবা বল প্রয়োগ করতে পারে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে সংস্থাটি সদস্য রাষ্ট্রগুলোর জোট বা আঞ্চলিক সংস্থার মাধ্যমে সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে থাকে। নিরাপত্তা পরিষদ অবশ্য তাদের সর্বশেষ পন্থা বা পদক্ষেপ অনুযায়ী বল প্রয়োগ করে থাকে, যখন আলোচনার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ উপায়ে দ্বন্দ্বের অবসান সম্ভব হয় না এবং শান্তি প্রক্রিয়ায় এটি হুমকি ও আগ্রাসন হিসেবে গণ্য হয়। এখনকার সময়ের অনেক শান্তিরক্ষা মিশন এভাবেই নিরাপত্তা পরিষদের কর্তৃত্বে পরিচালিত হচ্ছে। এর অর্থ, শান্তি প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখার জন্য সংগঠনটি প্রয়োজনীয় যে কোনো পদক্ষেপ নিতে পারে। সনদটির সপ্তম অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নিরাপত্তা পরিষদ মানবিক অধিকার লঙ্ঘনে অভিযুক্তদের বিচারের জন্য আন্তর্জাতিক আদালত গঠন করেছে। এই অভিযোগের মধ্যে গণহত্যাও অন্তর্ভুক্ত।

সাধারণ পরিষদ (General Assembly)

জাতিসংঘ সনদের ১১নং অনুচ্ছেদ 'আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার্থে সহযোগিতার সাধারণ নীতিমালাগুলো বিবেচনা করতে' এবং 'সদস্য দেশগুলোকে বা নিরাপত্তা পরিষদকে বা উভয়কে এ ব্যাপারে সুপারিশ করতে' সাধারণ পরিষদকে ক্ষমতায়ন করেছে। জাতিসংঘের এই অঙ্গ সংগঠনটি বিভিন্ন বিবদমান বিষয়ে ঐকমত্যের উপায় খুঁজে পেতে এবং অভিযোগ প্রকাশ ও কূটনৈতিক আদান-প্রদানে ফোরাম গঠনে সহায়তা করে। শান্তিরক্ষা অথবা শান্তি প্রক্রিয়ার উন্নতি বিধানকল্পে এটা প্রয়োজনে বিশেষ অধিবেশন অথবা জরুরি অধিবেশন আহ্বান করে থাকে, যেমন–দেখা যায় নিরস্ত্রীকরণ বিষয়ে, ফিলিস্তিন প্রশ্নে অথবা আফগানিস্তান সমস্যার সমাধানে। সাধারণ পরিষদের প্রথম কমিটিতে (নিরস্ত্রীকরণ ও আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা) ও চতুর্থ কমিটিতে (বিশেষ রাজনৈতিক এবং উপনিবেশ) শান্তি এবং নিরাপত্তা বিষয়গুলোকে বিবেচনায় আনা হয়। সারা বছর ধরে এই পরিষদ শান্তি সংক্রান্ত চুক্তি ঘোষণা করে, জাতিগত দ্বন্দ্বের শান্তিপূর্ণ মীমাংসা করে এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতা করে জাতিগত শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক ত্বরান্বিত করে আসছে।

১৯৮০ সালের সাধারণ অধিবেশনের অনুমোদনে কোস্টারিকার সান জোসেতে ইউনির্ভাসিটি অব পিস প্রতিষ্ঠা করা হয়। এটি একটি আন্তর্জাতিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যেখানে শান্তি সংক্রান্ত বিষয়ে পাঠদান, গবেষণা ও জ্ঞান প্রদান করা হয়। সাধারণ পরিষদ বছরের ২১ সেপ্টেম্বর দিনটিকে 'আন্তর্জাতিক শান্তি দিবস' হিসেবে পালন করে।

সংঘাত প্রতিরোধ (Conflict Prevention)

ছোট আকারের দ্বন্দ্বগুলো যাতে বড় সংঘাতে পরিণত না হয় এর জন্য সংঘাত নিরসনে কাজ করা অপরিহার্য। দ্বন্দ্ব এবং সংঘাত নিরসনের মূল পন্থাগুলো হলো সংঘাতের পুনরাবৃত্তি রোধ, কূটনৈতিক হস্তক্ষেপ এবং প্রতিরোধী নিরস্ত্রীকরণ ব্যবস্থা তৈরি।

প্রতিরোধী কূটনীতি বলতে বেড়ে ওঠা সংঘাত থেকে দ্বন্দ্ব প্রতিরোধে গ্রহণযোগ্য কার্যকলাপকে এবং এগুলো যখন ঘটে তখন ছড়িয়ে পড়া সংঘাত কমিয়ে আনাকে বোঝায়। এ ক্ষেত্রে মধ্যস্থতা করা, শান্ত করা এবং সন্ধি স্থাপনের ব্যবস্থা করা হয়। আগাম সতর্কতা

প্রদান প্রতিরোধের একটি প্রয়োজনীয় উপাদান এবং জাতিসংঘ খুব সতর্কতার সাথে বৈশ্বিক শান্তি ও নিরাপত্তার ক্ষেত্রে হুমকি শনাক্তকরণে নিয়োজিত থাকে, যার ফলে নিরাপত্তা পরিষদ এবং মহাসচিব সংঘাত প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নিতে পারেন। মহাসচিবের দূত ও বিশেষ প্রতিনিধিরা বিশ্বব্যাপী মধ্যস্থতা ও প্রতিরোধী কূটনীতিতে নিয়োজিত থাকেন। কোনো কোনো সংঘাতপূর্ণ স্থানে একজন দক্ষ দূতের উপস্থিতিই সংঘাত প্রতিরোধ করতে পারে; এরূপ কাজ প্রায়শই আঞ্চলিক সংস্থাগুলোর সহায়তায় হয়ে থাকে। প্রতিরোধী নিরস্ত্রীকরণ প্রতিরোধী কূটনীতিরই সম্পূরক, যার উদ্দেশ্য হলো সংঘাতপ্রবণ এলাকায় ক্ষুদ্র অস্ত্রের ব্যবহার কমানো। লিবিয়া, সিয়েরা লিওন ও অন্যান্য এলাকায় এর ফলে সামরিক শক্তি (যুদ্ধ) থেকে অব্যাহতি পাওয়া গিয়েছে; অস্ত্র উদ্ধার ও ধ্বংস সামগ্রিক শান্তি চুক্তির একটা অংশ। অতীতে যে অস্ত্র ধ্বংস করা হয়েছে তা আর পরবর্তী যুদ্ধে ব্যবহারের সুযোগ থাকে না।

শান্তি স্থাপনের ক্ষেত্রে মহাসচিব খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। ব্যক্তিগতভাবে বিশেষ দূত পাঠিয়ে অথবা কোনো মিশনের মাধ্যমে, যেমন– মধ্যস্থতা, ঘটনা বা তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ। সনদ অনুযায়ী আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য হুমকিস্বরূপ যে কোনো বিষয়ই মহাসচিব নিরাপত্তা পরিষদে তুলে ধরতে পারেন।

শান্তিরক্ষা (Peacekeeping)

আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় অগ্রগতির ক্ষেত্রে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রম আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের একটি চূড়ান্ত কৌশল। সনদে সুনির্দিষ্ট রূপরেখা না থাকলেও জাতিসংঘ তার শান্তিরক্ষা কার্যক্রম শুরু করে ১৯৪৮ সালে, যখন মধ্যপ্রাচ্যে জাতিসংঘ যুদ্ধবিরতি তদারকি সংস্থা (UNTSO) গঠন করা হয়। তখন থেকে এই আন্তর্জাতিক সংগঠনটিকে ৬৮টি অপারেশন কর্মসূচি গ্রহণ করতে হয়েছিল। তন্মধ্যে ১৫টি অপারেশন ২০১৩ সালের মে মাসের শেষ নাগাদ চলমান ছিল।

নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক স্বাগতিক দেশের সরকারের অথবা বিবদমান পক্ষের সম্মতির ভিত্তিতে এসব কার্যক্রম অনুমোদন ও বাহিনী মোতায়েন করা হয়। সামরিক কায়দায় যুদ্ধবিরতি, যুদ্ধ-উত্তর সৈন্য প্রত্যাহার ও অস্ত্রবিরতি শান্তিরক্ষা কার্যক্রমের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। সামরিক ও পুলিশ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সঙ্গে বেসামরিক জনগণ নিয়ে গঠিত এ কার্যক্রমটি বর্তমানে টেকসই শান্তির ভিত্তি হিসেবে পরিচিত।

এতে সামরিক পর্যবেক্ষক মিশন, শান্তিরক্ষা বাহিনী অথবা উভয়ই সংশ্লিষ্ট থাকতে পারে। নিরস্ত্র সেনাদল নিয়ে পর্যবেক্ষক মিশন গঠিত হয়, যারা চুক্তি বা যুদ্ধবিরতি তদারকি করে থাকে। সাম্প্রতিককালে নিরাপত্তা পরিষদ জাতিসংঘ সনদের সপ্তম অধ্যায় প্রদত্ত ক্ষমতা বলে শান্তিরক্ষা বাহিনীকে আসন্ন শারীরিক আক্রমণের মুখে বেসামরিক জনগণের জীবন রক্ষায় প্রয়োজনে শক্তি প্রয়োগ করতে সুযোগ দিয়ে থাকে। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা বাহিনীর সৈন্যরা নিজেদের অস্ত্র কেবল আত্মরক্ষার জন্যই ব্যবহার করতে পারে, তবে সপ্তম অধ্যায় তাদেরকে বেসামরিক জনগণের জীবন রক্ষায় অস্ত্র ব্যবহারের অনুমতি দেয়।

জাতিসংঘের নিজস্ব কোনো সামরিক বাহিনী নেই। সদস্য রাষ্ট্রগুলো স্বেচ্ছায় শান্তিরক্ষা কার্যক্রমের সামরিক জনবল জোগায় ও অর্থায়ন করে। জাতিসংঘের মহাসচিব একজন বিশেষ দূতের মাধ্যমে শান্তিরক্ষা মিশন পরিচালনা করেন। একজন সশস্ত্র কমান্ডার কার্যক্রমের সামরিক কর্মকাণ্ডের দায়িত্বে থাকেন, যদিও পুরো সামরিক দলটি নিজ দেশের

সামরিক বাহিনীর কর্তৃত্বে থাকে। বাহিনীর সকলে জাতিসংঘের ব্লু হেলমেট ও ব্যাজসহ নিজ দেশের সামরিক পোশাকে দায়িত্ব পালন করে। বেসামরিক স্টাফদের বিভিন্ন দেশ থেকে শান্তিরক্ষা মিশন কর্মসূচিতে নিয়োগ দেয়া হয়, যাদের অনেকে জাতিসংঘ স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে দায়িত্বরত।

শান্তিরক্ষা বাজেট থেকে অংশগ্রহণকারী দেশগুলোতে পরিচালিত ও বহু দেশের সৈন্য সংবলিত শান্তিরক্ষা কর্মসূচির ব্যয় মেটানো হয়। সদস্য রাষ্ট্রগুলোকে বাজেটের নিরিখে মূল্যায়ন করা হয়; অংশগ্রহণকারী দেশগুলোকে শান্তিরক্ষা বাজেট থেকে মানসম্মত হারে ক্ষতিপূরণ দেয়া হয়।

২০১২-১৩ অর্থবছরে শান্তিরক্ষা কার্যক্রমের অনুমোদিত ব্যয় ধরা হয়েছিল আনুমানিক ৭.৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা বিশ্বের মোট সামরিক ব্যয়ের ০.৫ শতাংশ। এ ধরনের বৈশ্বিক সমস্যা ও চ্যালেঞ্জগুলো সকলে মিলে মোকাবেলা করতে পারলে মানবিক, আর্থিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অভাবনীয় কর্মক্ষমতা ও দক্ষতা লক্ষণীয় হতে পারে।

জাতিসংঘের বর্তমান শান্তিরক্ষা কার্যক্রমগুলো (Current UN peacekeeping operations)

২০১৩ সালের ৩১ মে পর্যন্ত ১১৬টি দেশের ৯০,২৪১ জন সামরিক এবং পুলিশ কর্মকর্তা নিম্নেবর্ণিত ১৫টি শান্তিরক্ষা কাজে নিয়োজিত ছিল :

- মধ্যপ্রাচ্যে জাতিসংঘ যুদ্ধবিরতি তদারকি সংস্থা (UNTSO ১৯৪৮-এ শুরু; সামরিক পর্যবেক্ষক-১৫৩ ও বেসামরিক লোকবল-২৩৪);
- ভারত ও পাকিস্তানে জাতিসংঘ সামরিক পর্যবেক্ষক দল (UNMOGIP ১৯৪৯; সামরিক-৪০ ও বেসামরিক-৭১);
- সাইপ্রাসে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা বাহিনী (UNFICYP ১৯৬৪; সামরিক-৮৫৯, পুলিশ-৬৬ ও বেসামরিক-১৪৫);
- সিরীয় গোলান উচ্চভূমিতে জাতিসংঘ ডিসএনগেজমেন্ট অবজারভার ফোর্স (UNDOF ১৯৭৪; সামরিক-৯০৮ ও বেসামরিক-১৪১);
- লেবাননে জাতিসংঘের অন্তর্বর্তী ফোর্স (UNIFIL ১৯৭৮; ১০,৮২০ জন সৈন্য ও ৯৮১ জন সাধারণ মানুষ);
- পশ্চিম সাহারার গণভোটের জন্য জাতিসংঘের মিশন (MINURSO ১৯৯১; ২৭ জন সৈন্য, ১৯৭ জন সামরিক অবজার্ভার, ৬ জন পুলিশ, ২৬৪ বেসামরিক লোক ও ১২ জন জাতিসংঘ স্বেচ্ছাসেবক);
- কসোভোতে জাতিসংঘ ইন্টারিম অ্যাডমিনিস্ট্রেশন মিশন (UNMIK ১৯৯৯; ৯ জন সামরিক অবজার্ভার, ৭ জন পুলিশ, ৩৪০ বেসামরিক লোক ও ২৮ জন জাতিসংঘ স্বেচ্ছাসেবক);
- লাইবেরিয়াতে জাতিসংঘের মিশন (UNMIL ২০০৩; ৬,৬৬১ জন সৈন্য, ১২০ জন সামরিক অবজার্ভার, ১,৪৪০ জন পুলিশ, ১,৩৬৫ বেসামরিক লোক ও ২২২ জন জাতিসংঘ স্বেচ্ছাসেবক);
- আইভরি কোস্টে জাতিসংঘের মিশন (UNOCI ২০০৪; ৮,৫৩৯ জন সৈন্য, ১৮৫ জন সামরিক অবজার্ভার, ১,৫০২ জন পুলিশ, ১১৯২ জন বেসামরিক লোক ও ১৭০ জন জাতিসংঘ স্বেচ্ছাসেবক);

- হাইতিতে জাতিসংঘের স্থিতিশীলকরণ মিশন (MINUSTAH ২০০৪; ৬,১৭৯ জন সৈন্য, ২,৬৩০ জন পুলিশ, ১,৭৫৮ বেসামরিক লোক ও ১৯৪ জন জাতিসংঘ স্বেচ্ছাসেবক);
- আফ্রিকান ইউনিয়ন-ইউএন হাইব্রিড অপারেশন ইন দারফুর (UNAMID ২০০৭; ১৪,০৮৫ জন সৈন্য, ৩৪২ জন সামরিক অবজার্ভার, ৪,৭২১ জন পুলিশ, ৩,৯৯৭ বেসামরিক লোক ও ৪৪৮ জন জাতিসংঘ স্বেচ্ছাসেবক);
- গণপ্রজাতন্ত্রী কঙ্গোতে জাতিসংঘের স্থিতিকরণ মিশন (MONUSCO ২০১০; ১৭,২৬০ জন সৈন্য, ৫১৬ জন সামরিক অবজার্ভার, ১,৪১৬ জন পুলিশ, ৩,৯৬০ বেসামরিক লোক ও ৫৮২ জন জাতিসংঘ স্বেচ্ছাসেবক);
- আবিয়াইতে জাতিসংঘের অন্তর্বর্তীকালীন নিরাপত্তা বাহিনী (UNISFA ২০১১; ৩,৮২৯ জন সৈন্য, ১১৩ জন সামরিক অবজার্ভার, ১০ জন পুলিশ, ১৫৬ বেসামরিক লোক ও ১১ জন জাতিসংঘ স্বেচ্ছাসেবক);
- দক্ষিণ সুদানে জাতিসংঘের মিশন (UNMISS ২০১১; ৬,৮০৬ জন সৈন্য, ১৪৬ জন সামরিক অবজার্ভার, ৬৪৯ জন পুলিশ, ২,২১০ বেসামরিক লোক ও ৪০৯ জন জাতিসংঘ স্বেচ্ছাসেবক);
- মালিতে জাতিসংঘের স্থায়িত্বের জন্য বহুমাত্রিক মিশন (MINUSMA ২০১৩; ১২,৬৪০ ইউনিফর্মধারী কর্মকর্তা)।

MISSIONS DIRECTED BY THE DEPARTMENT OF PEACEKEEPING OPERATIONS

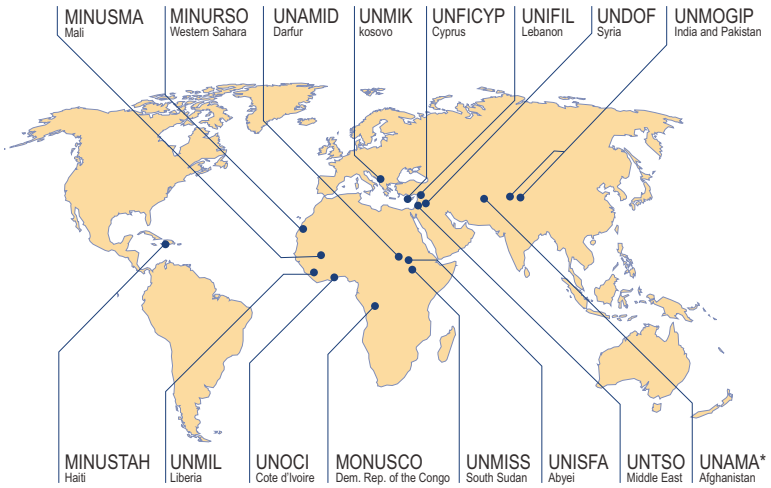

Map No. 4259 Rev. 18.1(E) UNITED NATIONS
June 2013

*Political mission

Department of Field Support
Cartographic Section

১৯৪৮ সাল থেকে এ পর্যন্ত ৩,১১৬ জন শান্তিরক্ষী কর্মরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন।

বর্তমান সময়ের বিরোধ অভ্যন্তরীণ হলেও সেগুলো আন্তঃদেশীয় সম্পৃক্ততা, এলাকাভিত্তিক ষড়যন্ত্র, অর্থনৈতিক স্বার্থ অথবা বৈদেশিক ইন্ধনদাতার মাধ্যমে আরও জটিল

হয়ে ওঠে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সাম্প্রতিক সময়ে আফ্রিকায় বিরোধের কারণে গৃহযুদ্ধ ও অবৈধ প্রাকৃতিক সম্পদ পাচার, যেমন হীরে, কলটান (সেলফোন ও অন্যান্য ইলেকট্রিক যন্ত্র তৈরিতে ব্যবহৃত হয়) ও সোনা (যা অস্ত্র ব্যবসাকে ত্বরান্বিত করে) প্রকট হওয়ায় সন্ত্রাসবাদ, মাদক পাচার, উদ্বাস্তু অভিবাসন এবং পরিবেশের অবস্থার অবনতি একটি মারাত্মক সংকটের সৃষ্টি করেছে। এর মোকাবেলায় সমন্বিত বহুমুখী উদ্যোগের কোনো বিকল্প নেই। হীরে বিক্রির মাধ্যমে বিরোধ ও মানবাধিকার লঙ্ঘন রোধে সাধারণ পরিষদ ২০০০ সালে 'কিম্বারলি প্রসেস সার্টিফিকেশন স্কিম (KPCS)' প্রবর্তন করে। কেপিসিএস-এর মূল লক্ষ্য চলমান বাজারে 'ব্লাড ডায়মন্ড (শ্রমিক শ্রেণির মৃতদেহের ওপর দিয়ে আনা হীরা)' চালান হওয়া রোধ করা।

সর্বজনীন সংগঠন হওয়াতে জাতিসংঘের প্রয়োজনীয় কার্যক্রমগুলো বিরোধ ঠেকাতে চমৎকার বৈধতা দান করে। বিরোধে সংশ্লিষ্ট নয় এমন শান্তিরক্ষীরা স্থানীয় বিষয়গুলোর ওপর সর্বজনীন তথা বৈশ্বিক দৃষ্টি আকর্ষণ করার পাশাপাশি যুদ্ধরত দলগুলোর মাঝে আলোচনায় বসার উৎসাহ প্রদান করতে পারে এবং নতুন একটি সম্ভাবনার দুয়ার উন্মোচন হতে পারে। কোনো কাজ সফল করার পেছনে পূর্বশর্ত হিসেবে প্রয়োজন বিরোধী শক্তিগুলোর শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিভেদ সমাধান করার আন্তরিক ইচ্ছা, একটি নির্ভরযোগ্য শান্তিচুক্তি, আন্তর্জাতিক মহল থেকে দৃঢ় রাজনৈতিক সহযোগিতা এবং কাজ সফল করার জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক সহযোগিতা ও মানবসম্পদ। সর্বোপরি, শান্তিরক্ষা একটি রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার অংশ হতে হবে, এর কোনো বিকল্প ব্যবস্থা নেই।

আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় বিগত কর্মসূচি ও কর্মকাণ্ড থেকে শিক্ষা নিয়েছে এবং বিভিন্ন এলাকায় জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রম শক্তিশালী করার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। মহাসচিবের ২০০০ সালে তৈরি প্যানেল অন পিস অপারেশন প্রতিবেদনের লক্ষ্য ছিল প্রতি বছর একটি করে নতুন বহুমুখী নিয়মতান্ত্রিক শান্তিরক্ষা মিশন চালু করা। এর ফলাফল হিসেবে ২০১০ সালে সমাপ্ত দশকে আমরা ১১টি শান্তিরক্ষা কার্যক্রম চালু অথবা ত্বরান্বিত হতে দেখেছি, যার সাথে যুক্ত রয়েছে আফগানিস্তান ও ইরাক সংশ্লিষ্ট কিছু বিশেষ রাজনৈতিক মিশনও।

মহাসচিব বান কি-মুনের উৎসাহ ও পরিকল্পনা অনুযায়ী ২০০৭ সালে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা পরিচালনা কার্যক্রমে মাঠ পর্যায়ে সহায়তা বিভাগ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে একটি বৃহৎ পুনর্গঠন সংগঠিত হয়। যেখানে শান্তিরক্ষা কার্যক্রম বিভাগ, রাজনৈতিক বিষয়ক বিভাগ শান্তিরক্ষা কার্যক্রম, বিশেষ রাজনৈতিক ও শান্তি নির্মাণ মিশনে যথাক্রমে রাজনৈতিক এবং নির্বাহী পরিচালনার দিকনির্দেশনা প্রদান করে থাকে, ডিএফএস জাতিসংঘের সব মাঠ পর্যায়ের শান্তি কার্যক্রমের ক্ষেত্রে আর্থিক, পণ্য সরবরাহ, তথ্য, যোগাযোগ ও প্রযুক্তি, মানবসম্পদ এবং সাধারণ প্রশাসনে আন্তরিক সহযোগিতা ও পথপ্রদর্শন করে।

শান্তিরক্ষা কার্যক্রম পরিবর্তনশীল অবস্থার সাথে তাল মিলিয়ে প্রতিনিয়ত নতুনভাবে আত্মপ্রকাশ করছে। বিগত বছরগুলোতে শান্তিরক্ষীদের মাধ্যমে সম্পাদিত কাজগুলোর মধ্যে রয়েছে :

- যুদ্ধবিরতি এবং বিরোধী দলগুলোর মাঝে দূরত্ব বজায় রাখা : বিরোধী দলগুলোর মাঝে সীমিত চুক্তির ওপর ভিত্তি করে সংযোগ তৈরির মাধ্যমে এই কার্যক্রমে আলোচনার জন্য সহায়ক পরিবেশ তৈরি করা হয়;
- জনসেবামূলক কার্যক্রম রক্ষা : বিভিন্ন দ্বন্দ্বে সাধারণ জনতাকে রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করা হয়ে থাকে; এই অবস্থায় শান্তিরক্ষীরা

জনসেবামূলক কাজগুলো যাতে সুষ্ঠুভাবে হয় সে বিষয়ে সুরক্ষা দিয়ে থাকে;

- একটি সামগ্রিক শান্তিচুক্তি সম্পাদন ও বাস্তবায়ন : সামগ্রিক শান্তিচুক্তির ওপর ভিত্তি করে সম্পাদিত জটিল ও বহুমাত্রিক কার্যক্রম জনসেবামূলক সহযোগিতার জন্য বিভিন্ন কাজে সাহায্য করতে পারে; যেমন–মানবিক সাহায্য, মানবাধিকার রক্ষা, নির্বাচন নিরীক্ষণ এবং অর্থনৈতিক পুনর্গঠন;
- গণতান্ত্রিক নীতি, সুশাসন এবং অর্থনৈতিক উন্নতির ওপর ভিত্তি করে সহযোগিতা করার মাধ্যমে দেশ কিংবা অঞ্চলকে একটি স্থিতিশীল রাষ্ট্রে পরিণত করা এবং
- বেসামরিক জনগণকে রক্ষা : সাধারণ জনগণ, মহিলা ও শিশুরা প্রায়ই এই সমসাময়িক বিরোধের শিকার হয়।

আঞ্চলিক এবং সমষ্টিগত নিরাপত্তা সংস্থার সাথে সহযোগিতা

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষার জন্য আঞ্চলিক সংস্থা ও অন্যান্য ব্যক্তিদের সাথে সহযোগিতা করে এবং বিভিন্ন কৌশলের আশ্রয় নিয়ে থাকে, যা সনদের অষ্টম অধ্যায়ে উল্লেখ্য আছে। এটি হাইতিতে অবস্থিত 'অর্গানাইজেশন অফ আমেরিকান স্টেটস'-এর সাথে একাত্মভাবে কাজ করেছে। এছাড়া আরও কিছু সংস্থার নাম বললে বলতে হয় সাবেক যুগোস্লাভিয়ায় অবস্থিত ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এবং কঙ্গো, লাইবেরিয়া ও সিয়েরা লিওনে অবস্থিত পশ্চিম আফ্রিকান স্টেটসের অর্থনৈতিক সংঘ, পশ্চিম সাহারা, গ্রেট লেক এলাকা ও দারফুরে অবস্থিত আফ্রিকান ইউনিয়ন; জাতিসংঘের সামরিক পর্যবেক্ষকরা জর্জিয়া, লাইবেরিয়া, সিয়েরা লিওন এবং তাজিকিস্তানের আঞ্চলিক সংঘের শান্তিরক্ষীদের সাথে কার্যকরী সহযোগিতা করেছে; উত্তর আটলান্টিক চুক্তি সংস্থা আফগানিস্তান ও কসোভোতে জাতিসংঘের কর্মীদের সাথে কাজ করেছে। এটি একটি প্রশংসনীয় উন্নয়নের সূচনা, যেখানে লক্ষণীয় যে শান্তিরক্ষা কর্মাকাণ্ড কোনো একক উদ্যোগ বা উদ্যোক্তা দ্বারা সফল হয় না। এমনকি জাতিসংঘও একা অসহায়। শান্তিরক্ষায় আঞ্চলিক উদ্যোক্তাদের চেষ্টায় নিজেদের পরিকল্পনা, পরিচালনা ও তা বজায় রাখা শান্তিরক্ষার ক্ষেত্রে গভীর মাত্রা যোগ করেছে এবং অভ্যন্তরীণ বিরোধপ্রসূত জটিল সমস্যা মোকাবেলায় আঞ্চলিক উদ্যোগ ও সহযোগিতা তুলনামূলক বেশি সফলতা আনে।

প্রয়োগ (Enforcement)

জাতিসংঘ সনদের সপ্তম অধ্যায় অনুযায়ী আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা ফিরিয়ে আনা ও রক্ষার জন্য নিরাপত্তা পরিষদ যথাযথ ব্যবস্থা প্রয়োগ করতে পারে। এই আইনের মাত্রা অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা থেকে আন্তর্জাতিক সামরিক কর্মকাণ্ড পর্যন্ত বিস্তৃত।

নিষেধাজ্ঞা (Sanctions)

কূটনৈতিক পদক্ষেপ ব্যর্থ হওয়ায় এবং শান্তি হুমকির সম্মুখীন হওয়ায় নিরাপত্তা পরিষদ বাধ্যতামূলকভাবে নিষেধাজ্ঞাকে হাতিয়ার হিসেবে অবলম্বন করেছে। সাম্প্রতিককালে এসব নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে বেশ কিছু এলাকায়; যেমন—আফগানিস্তান, কোরিয়া, ইরিত্রিয়া, ইথিওপিয়া, হাইতি, ইরান, ইরাক, লাইবেরিয়া, লিবিয়া, রুয়ান্ডা, সিয়েরা লিওন,

সোমালিয়া, সুদান, সার্বভৌম এঙ্গোলার জাতীয় ইউনিয়ন এবং সাবেক যুগোস্লাভিয়া। এই নিষেধাজ্ঞার মাঝে আছে ব্যাপক অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক নিষেধাজ্ঞা, অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা, ভ্রমণ ও খেলাধুলার ওপর নিষেধাজ্ঞা। এছাড়াও আর্থিক ও কূটনৈতিক নিষেধাজ্ঞাও বিদ্যমান।

নিষেধাজ্ঞা আরোপের মূল লক্ষ্য হলো, কোনো রাষ্ট্র বা সত্তাকে বল প্রয়োগ ব্যতিরেকে নিরাপত্তা পরিষদ নির্ধারিত বিষয়াদি মেনে চলতে বাধ্য করা। নিষেধাজ্ঞা নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্ত সফল প্রয়োগের হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে।

জাতিসংঘের সর্বজনীন চরিত্র একে নিষেধাজ্ঞা জারি ও প্রয়োগে উপযুক্ত সংস্থা হিসেবে গড়ে তুলেছে। অবশ্য অনেক রাষ্ট্র এবং মানবিক উন্নয়ন সংস্থা বৃদ্ধ, প্রতিবন্ধী, শরণার্থী অথবা মা ও শিশুদের মতো দুর্বল জনগোষ্ঠীর ওপর এসব নিষেধাজ্ঞার বিরূপ প্রভাব নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। এছাড়া উদ্বেগের আরো কারণ হতে পারে আরোপিত নিষেধাজ্ঞা অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক লেনদেন সংশ্লিষ্ট তৃতীয় অথবা প্রতিবেশী রাষ্ট্রের ওপর অর্থনীতি, সামাজিক এমনকি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। কেননা, নিষেধাজ্ঞার ফলে নিষিদ্ধ রাষ্ট্রের সাথে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক লেনদেন বাধাগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

নিষেধাজ্ঞার ধরন, গঠন ও প্রয়োগ পদ্ধতির উন্নতি সাধন প্রয়োজন বলে ক্রমান্বয়ে দাবি উঠছে। নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাবে মানবিক দিকের ওপর আরও গুরুত্ব আরোপ করে অথবা নিষেধাজ্ঞার প্রয়োগ পদ্ধতিকে আরও ভালোভাবে মূল্যায়ন করার মাধ্যমে নিষেধাজ্ঞার নেতিবাচক প্রভাবগুলো হ্রাস করা সম্ভব। তথাকথিত 'স্মার্ট নিষেধাজ্ঞা' ক্রমেই সমর্থন ও জনপ্রিয়তা অর্জন করছে, যা জনগণের বদলে ক্ষমতাসীনদের ওপর চাপ প্রয়োগ করে থাকে, যাতে করে মানবিক মূল্য কম দিতে হয়। স্মার্ট নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে সেই অভিজাতদের সম্পদ বাজেয়াপ্ত ও অর্থনৈতিক লেনদেন বন্ধ করা যেতে পারে, যাদের অনৈতিক কর্মকাণ্ড ঝামেলা সৃষ্টির কারণ।

সামরিক হস্তক্ষেপ অনুমোদন (Authorizing Military Action)

যখন শান্তিরক্ষা কর্মকাণ্ড ব্যর্থ হয়, তখন নিরাপত্তা পরিষদ জাতিসংঘ সনদের ৭নং অধ্যায়ের আওতায় সদস্য রাষ্ট্রগুলো দ্বারা আরো শক্তিশালী কর্মসূচি গ্রহণে অনুমোদন দিতে পারে। নিরাপত্তা পরিষদ সংকট নিরসনে সদস্য রাষ্ট্রগুলোকে সামরিক পদক্ষেপসহ সব ধরনের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়ার অনুমোদন দিয়ে রেখেছে। এভাবে জাতিসংঘের এই অঙ্গ সংগঠনটি ইরাকের আক্রমণের পর কুয়েতের সার্বভৌমত্ব পুনরুদ্ধার করেছিল (১৯৯১), সোমালিয়ায় মানবিক ত্রাণ অপারেশন পরিচালনা করার জন্য নিরাপদ অবস্থা সৃষ্টি করেছিল (১৯৯২); রুয়ান্ডায় বেসামরিক জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছিল (১৯৯৪); হাইতির সরকার পুনরুদ্ধার করেছিল (১৯৯৪); আলবেনিয়ায় মানবাধিকার কর্মকাণ্ড রক্ষা করেছিল (১৯৯৭); পূর্ব তিমুরে শান্তি ও নিরাপত্তা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছিল (১৯৯৯ ও ২০০৬) এবং লিবিয়ায় বেসামরিক জনগণকে রক্ষা করেছিল (২০১১)। নিরাপত্তা পরিষদ দ্বারা অনুমোদিত হলেও এসব কর্মকাণ্ড পুরোপুরি অংশগ্রণকারী দেশগুলো দ্বারা পরিচালিত ছিল। এগুলো নিরাপত্তা পরিষদ দ্বারা অনুমোদিত ও মহাসচিব কর্তৃক পরিচালিত কোনো শান্তিরক্ষাকারী অপারেশন ছিল না।

শান্তি স্থাপন (Peacebuilding)

শান্তি স্থাপন বলতে যুদ্ধাবস্থা থেকে শান্তির পথে অগ্রসরমান দেশ বা অঞ্চলকে জাতিসংঘের সাহায্য করাকে বোঝায়। একটি শান্তি স্থাপনকারী প্রক্রিয়া সাধারণত শুরু হয় যুদ্ধরত দলগুলোর মধ্যে একটি শান্তিচুক্তির মাধ্যমে, যা জাতিসংঘের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকে জাতিসংঘের জন্য একটা দীর্ঘমেয়াদি কূটনৈতিক ভূমিকা, যার মাধ্যমে সে নিশ্চিত করে যেন সব সমস্যা অস্ত্রের মাধ্যমে না হয়ে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমাধান হয়। এর মধ্যে আরো অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে শান্তিরক্ষাকারী প্রেরণ, উদ্বাস্তুদের প্রত্যাবর্তন ও পুনঃপ্রতিষ্ঠা, নির্বাচন পর্যালোচনা এবং যুদ্ধরত দলগুলোর নিরস্ত্রীকরণ, অব্যাহতি ও পুনঃপ্রতিষ্ঠা। শান্তি স্থাপনকারী পদক্ষেপের মূলে আছে একটি বৈধ রাষ্ট্র গঠন, যার প্রচেষ্টা থাকবে শান্তিপূর্ণভাবে সমস্যা সমাধান করতে পারা, নাগরিকদের নিরাপত্তা বিধান করা এবং মানবাধিকারের প্রতি সম্মান ও সমর্থন নিশ্চিত করা। শান্তিরক্ষার বিধানে প্রয়োজন জাতিসংঘের অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর এক সুবিশাল অংশের অংশগ্রহণ, যেমন বিশ্বব্যাংক, আঞ্চলিক অর্থনৈতিক সংস্থা, বেসরকারি সংগঠন এবং আঞ্চলিক নাগরিক গোষ্ঠীগুলো। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা ও শান্তি গঠন কর্মকাণ্ড বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা, কম্বোডিয়া, এল সালভাদর, গুয়াতেমালা, কসোভো, লাইবেরিয়া এবং মোজাম্বিক খুবই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। এছাড়াও সম্প্রতি আফগানিস্তান, ইরাক, লিবিয়া ও সিয়েরা লিওনে শান্তিরক্ষা ও শান্তি গঠন মিশন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ইথিওপিয়া ও ইরিত্রিয়ায় জাতিসংঘ মিশন আন্তঃরাষ্ট্রীয় শান্তি স্থাপন পরিচালনা করে।

শান্তি স্থাপনের কাঠামো

পিস বিল্ডিং কমিশন, পিস বিল্ডিং ফান্ড ও পিস বিল্ডিং সাপোর্ট অফিসের সমন্বয়ে জাতিসংঘ শান্তি স্থাপন কাঠামো গঠিত।

শান্তি স্থাপন কমিশন

এটি জাতিসংঘের ৩১ সদস্য বিশিষ্ট আন্তঃসরকারি উপদেষ্টামণ্ডলী, যুদ্ধাবস্থা থেকে শান্তির পথে অগ্রসরমান দেশগুলোকে সাহায্য করে থাকে। শান্তির পক্ষে কাজ করে এসব সংস্থা ও ব্যক্তি, দাতা, অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান এবং সুশীল সমাজ– এদের সবাইকে নিয়ে এই কমিশন কাজ করে।

শান্তি স্থাপন তহবিল

এই তহবিল সংঘাত-পরবর্তী শান্তি স্থাপনের জন্য একটি বহু বছর স্থায়ী স্বেচ্ছাসেবী তহবিল। শান্তি স্থাপন কার্যক্রম শুরু করার জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ দ্রুত হস্তান্তর করার লক্ষ্যে উদ্যোগ নিয়ে থাকে। ২০১২ সালের শেষ নাগাদ এই তহবিলের আর্থিক অঙ্গীকার ছিল ৫২৭ মিলিয়ন ডলারের বেশি। ২০১২ সালের নভেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত উচ্চ পর্যায়ের সভায় আরও ৭৭ মিলিয়ন ডলার অনুদান হিসেবে পাওয়া গিয়েছে।

শান্তি স্থাপনকারী সহায়তা দপ্তর

শান্তি স্থাপনকারী সহায়তা দপ্তর শান্তি স্থাপন কমিশনকে সহযোগিতা করে, শান্তি স্থাপন তহবিলের যথাযথ ব্যয় নিশ্চিত করে এবং জাতিসংঘ সংস্থাগুলোকে শান্তি স্থাপনের কাজে সমন্বয় করার ক্ষেত্রে মহাসচিবকে সহযোগিতা করে।

চলমান রাজনৈতিক ও শান্তি গঠনকারী মিশনগুলো ৩১ মে ২০১৩ পর্যন্ত ৩,৮২৫ জন শান্তিরক্ষাকারী কর্মী নিম্নবর্ণিত ১৩টি রাজনৈতিক ও শান্তি স্থাপনকারী মিশনে কাজ করেছিল :

- মধ্যপ্রাচ্যে জাতিসংঘের বিশেষ সমন্বয়কারীর অফিস (ইউনেস্কো ১৯৯৯; ৫৮ জন বেসামরিক);
- পশ্চিম আফ্রিকার জন্য মহাসচিবের বিশেষ প্রতিনিধির অফিস (ইউএনওডব্লিউএ ২০০১; ৩৯ জন বেসামরিক ও ৩ জন সামরিক উপদেষ্টা);
- আফগানিস্তানে জাতিসংঘ সহায়তা মিশন (ইউএনএএমএ ২০০২; ১৭৩৪ বেসামরিক, ২০ সামরিক উপদেষ্টা, ৫ জন পুলিশ ও ৬৬ জন জাতিসংঘ স্বেচ্ছাকর্মী);
- ইরাকে জাতিসংঘ সহায়তা মিশন (ইউএনএএমআই ২০০৩; ইরাক, জর্ডান ও কুয়েতে নিয়োজিত ৮১৬ বেসামরিক, ২৭২ সেনাদল, পাঁচ সামরিক উপদেষ্টা ও চারজন পুলিশ);
- লেবাননের জন্য জাতিসংঘের বিশেষ সমন্বয়কারীর অফিস (ইউএনএসসিওএল ২০০৭; ৮১ বেসামরিক);
- মধ্য এশিয়ার জন্য প্রতিরোধ কূটনীতি বিষয়ক জাতিসংঘের আঞ্চলিক কেন্দ্র (ইউএনআরসিসিএ ২০০৭; ২৯ বেসামরিক);

চলমান রাজনৈতিক এবং শান্তিস্থাপনকারী মিশন

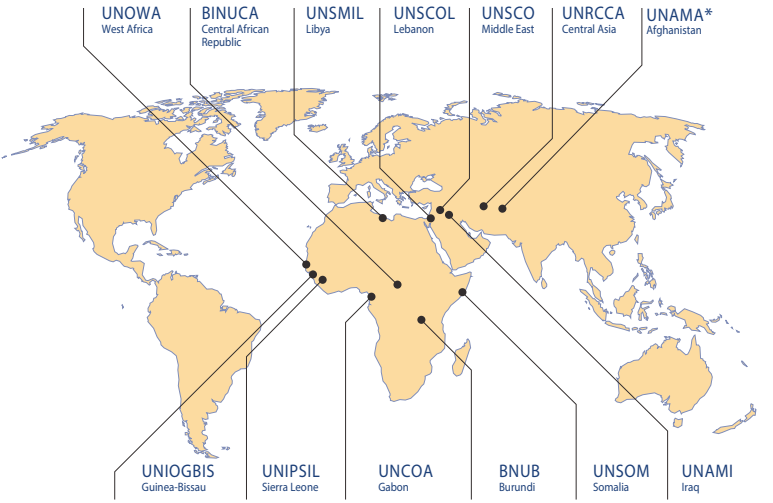

Map No. 4147 Rev. 40(E) UNITED NATIONS June 2013 * Mission directed by the Department of Peacekeeping Operations Department of Field Support Cartographic Section

- সিয়েরা লিওনে জাতিসংঘের পিস বিল্ডিং অফিস (ইউএনআইপিএসআইএল ২০০৮; ৫৫ বেসামরিক, ছয় পুলিশ, সাত জাতিসংঘ স্বেচ্ছাকর্মী);
- মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্রে জাতিসংঘের ইন্টিগ্রেটেড পিস বিল্ডিং অফিস (বিআইএনইউসিএ ২০১০; ১৪৪ বেসামরিক, ২ সামরিক উপদেষ্টা, দুই পুলিশ, দুই জাতিসংঘ স্বেচ্ছাকর্মী);
- জাতিসংঘের বুরুন্ডি অফিস (বিএনইউবি ২০১১; ১০৫ বেসামরিক, ১ সামরিক উপদেষ্টা, ৪ পুলিশ, ৪ জাতিসংঘ স্বেচ্ছাকর্মী);
- জাতিসংঘের মধ্য আফ্রিকার আঞ্চলিক অফিস (ইউএনওসিএ ২০১১; ২৫ বেসামরিক, ১ সামরিক উপদেষ্টা);
- লিবিয়ায় জাতিসংঘের সাপোর্ট মিশন (ইউএনএসএমআইএল ২০১১; ২১০ বেসামরিক, ৭ পুলিশ, ৩ জাতিসংঘ স্বেচ্ছাকর্মী);
- সোমালিয়ায় জাতিসংঘ সহায়তা মিশন (ইউএনসওএম ২০১৩)।

নির্বাচনকালীন সহায়তা

নির্বাচনকালীন সময়ে জাতিসংঘ কারিগরি সহায়তাসহ অনেক সহযোগিতা করে থাকে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক পরিদর্শকদের সমন্বয়ও করে থাকে। সাধারণত পরিদর্শকরা ভোটারদের নিবন্ধীকরণ, ভোটের প্রচারণা এবং নির্বাচনী সংস্থাগুলোর কাজ পর্যবেক্ষণ করে থাকে। তাদের নিবন্ধনের ধরন ও মাত্রা সরকারের অনুরোধ, শান্তিচুক্তি অথবা সাধারণ পরিষদ বা নিরাপত্তা পরিষদের নির্দেশের ওপর নির্ভর করে। সংঘাত-পরবর্তী অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে তারা বড় পরিসরে রাজনৈতিক বা সাধারণ নেতাদের সাথে কাজ করে।

জাতিসংঘ ১০০-এরও বেশি দেশকে উপদেশমূলক, লজিস্টিকস, প্রশিক্ষণ, নাগরিক শিক্ষা, কম্পিউটারের প্রয়োগ ও স্বল্পমেয়াদি পরিদর্শন বিষয়ে সাহায্য প্রদান করেছে।

রাজনৈতিক বিষয়ক নির্বাচনী সহায়তা বিভাগ (Electoral Assistance Division in the Department of Political Affairs) হলো জাতিসংঘ ব্যবস্থার প্রধান কেন্দ্র। এই বিভাগটিকে শান্তিরক্ষা ও শান্তি প্রক্রিয়া ধরে রাখার জন্য সহায়তা ও নির্দেশনা প্রদানের জন্য শান্তি আলোচনায় বারবার ডাকা হয়ে থাকে। ইউএনডিপি, নির্বাচনে কারিগরি সহায়তা প্রদান, নির্বাচনী স্থাপত্য তৈরিসহ মাঠে জাতিসংঘের নির্বাচনী সহায়তা সমন্বয় করে থাকে। OHCHR নির্বাচনী অফিসারদের প্রশিক্ষণ, নির্বাচনী আইন ও প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠা এবং মানবাধিকার ও নির্বাচন সংশ্লিষ্ট তথ্য সম্পর্কিত কার্যাবলির জন্য নির্দেশনা প্রদানে সাহায্য করে।

১৯৮৯ সালে নামিবিয়ার স্বাধীন হওয়ার ব্যাপারে জাতিসংঘ যেভাবে নির্বাচনী প্রক্রিয়া তদারকি ও বাস্তবায়ন করে তা ছিল সংস্থাটির একটি বড় অর্জন। একইভাবে বিভিন্ন দেশের সরকারের আহ্বানে নিম্নলিখিত দেশগুলোর নির্বাচনে সহায়তা দিয়েছে; নিকারাগুয়া-১৯৯০, অ্যাঙ্গোলা-১৯৯২, ক্যাম্বোডিয়া-১৯৯৩, এল সালভাদর, সাউথ আফ্রিকা এবং মোজাম্বিক-১৯৯৪, পূর্ব স্লাভোনিয়া (ক্রোয়েশিয়া)-১৯৯৭, সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক-১৯৯৮-৯৯, আফগানিস্তান-২০০৪-৫-১০, ইরাক-২০০৫-১০, লাইবেরিয়া-২০০৫-১১, হাইতি-২০০৬-১০, ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অব কঙ্গো-২০০৬ এবং কোটে দ্য লাভোয়া-২০১০-১১।

১৯৯৩ সালে ইরিত্রিয়াতে যে গণভোট অনুষ্ঠিত হয় সেটাতে জাতিসংঘ পরিদর্শক হিসেবে ছিল। পূর্ব তিমুরের ২০০১-২০০২ সালে নির্বাচন অনুষ্ঠানে জাতিসংঘ সাহায্য করে এবং এর পরবর্তীকালে স্বাধীনতা লাভের পর দেশটির নাম হয় তিমুর-লেস্তে এবং এর ২০০৭ নির্বাচনে জাতিসংঘ ভূমিকা রেখেছিল। ২০১০ সালে সুদানে জাতিসংঘ মিশন (UNMIS) দেশটির নির্বাচন অনুষ্ঠানে সাহায্য করে, যেটা ছিল ২০ বছরের মধ্যে প্রথম। ২০১১ সালে দক্ষিণ সুদানে গণভোট অনুষ্ঠিত হওয়ার পরে দেশটি স্বাধীনতা লাভ করে।

উন্নয়নের মাধ্যমে শান্তি স্থাপন

সংঘাত এড়ানোর অন্যতম উপায় হচ্ছে ভারসাম্য বজায় রেখে সার্বিক উন্নয়ন সাধন। জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি, জাতিসংঘ শিশু তহবিল, বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি ও জাতিসংঘ শরণার্থী বিষয়ক হাইকমিশনারসহ বহু সংখ্যক সংস্থা পুনর্গঠন স্তরে অবদান রাখে, যা স্থানচ্যুত মানুষের সুযোগ সৃষ্টির জন্য জাতীয় ও আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর আস্থা পুনঃস্থাপন করে।

জাতিসংঘ শরণার্থীদের পুনর্বাসন, স্থলমাইন অপসারণ, অবকাঠামোগত মেরামত, সম্পদের প্রবাহ ও অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার কার্যক্রম পুনরুজ্জীবিত করতে সাহায্য করে থাকে।

শান্তির লক্ষ্যে কার্যক্রম

জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা এবং শান্তি নির্মাণ মিশন সারা বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে আছে। এর মধ্যে রয়েছে আফ্রিকা, এশিয়া (মধ্যপ্রাচ্যসহ), দক্ষিণ আমেরিকা, ইউরোপ ইত্যাদি। ঐতিহাসিক বর্ণনাসহ চলমান অপারেশনগুলো সম্পর্কে এখানে আলোচনা করা হলো। চলমান শান্তিরক্ষা মিশনের পূর্ণ লিস্টটি দেখতে ২৪৫নং পৃষ্ঠা দেখুন।

আফ্রিকা

সবসময়ই জাতিসংঘের মূল দৃষ্টির একটি ক্ষেত্র ছিল আফ্রিকা। প্রলম্বিত সংঘর্ষ ও দীর্ঘস্থায়ী বিরোধের ফলে যে চ্যালেঞ্জের উদ্ভব হয়েছিল জাতিসংঘ উদ্ভাবনীমূলক পন্থায় ও সর্বশক্তি দিয়ে এর মোকাবেলা করে। ২০০০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত সহস্রাব্দ ঘোষণায় বিশ্ব নেতৃবৃন্দ শান্তি ও উন্নয়নের সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণে আফ্রিকাকে পূর্ণ সমর্থনের আশ্বাস প্রদান করে।

গ্রেট লেক এলাকা

বুরুন্ডি : ১৯৯৩-২০০৩ দশকে গৃহযুদ্ধে বুরুন্ডিতে প্রায় ২৫০,০০০ থেকে ৩০০,০০০ মানুষ মারা যায় এবং কয়েক লাখ মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়ে। ২০০৩ সালে তিনটি বিবদমান দলের অস্ত্রবিরতি চুক্তি সম্পন্ন হয়। ৩৫০০ সৈন্য নিয়ে গঠিত আফ্রিকান ইউনিয়ন আফ্রিকান মিশন ইন বুরুন্ডি (এএমআইবি) নামে মিশনটি প্রেরণ করে। এর কিছুদিনের মধ্যে একজন হুটু প্রেসিডেন্ট এবং একজন টুটসি ভাইস প্রেসিডেন্ট শপথ গ্রহণ করেন। কিন্তু এর ফলে সংঘাত চলতেই থাকে। সাউথ আফ্রিকা ও অন্যান্য দেশের সহায়তায় ২০০৩-এর নভেম্বরে একটি অস্ত্রবিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বুরুন্ডির সংকট সমাধানে আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টায় সে

দেশের জাতিসংঘ কার্যালয় অংশগ্রহণ করে। বুরুন্ডিতে দীর্ঘকাল ধরে অভ্যন্তরীণ সংঘাত চলছিল, যার পরিণতিতে ১৯৯৩ সালে এক অভ্যুত্থানের প্রচেষ্টায় সে দেশের গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত প্রথম প্রেসিডেন্ট যিনি একজন হুটু এবং তার ৬ জন মন্ত্রী নিহত হন। এর ফলে উপজাতীয় সংঘর্ষ শুরু হয়, যেখানে পরবর্তী তিন বছরে অন্তত দেড় লাখ মানুষ মারা যায়।

২০০৭ সালে ইউনাইটেড নেশনস অপারেশন ইন বুরুন্ডিকে (UNOB) পরিবর্তন করে ইউনাইটেড ইন্টিগ্রেটেড অফিস ইন বুরুন্ডি (BINUB) করা হয়। এই সংস্থাটি বিভিন্ন ধরনের সহযোগিতা যেমন : পুলিশকে ট্রেনিং, সামরিক বাহিনীকে শক্তিশালী করা, মানবাধিকার রক্ষা, বিচার ও আইন বিষয়ক পুনর্গঠন, দারিদ্র্য হ্রাস, অর্থনৈতিক উন্নতি, এসব বিষয়ে সহযোগিতা করে।

২০১১ সালের জানুয়ারিতে জাতিসংঘ বুরুন্ডি অফিসকে (BNUB) BINUB প্রতিস্থাপিত করে। ২০১৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে নিরাপত্তা পরিষদ BNUB-এর ম্যান্ডেট ২০১৪-এর ১৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বর্ধিত করে এবং এটি জাতীয় কর্মীদের মধ্যে সংলাপের পাশাপাশি দ্বন্দ্ব-আক্রান্ত জনগোষ্ঠী পুনঃপ্রতিষ্ঠা, জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করা, যুদ্ধ দায়মুক্তি রোধ, মানবাধিকার রক্ষা, নারী ও যুব সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সহায়তা এবং বুরুন্ডির আঞ্চলিক একত্রীকরণকে বর্ধিত করতে এ সরকারকে সরাসরি সহায়তা করে।

কঙ্গো গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র : ১৯৯৪ সালে রুয়ান্ডায় ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের পর সেখানে নতুন সরকার গঠন করা হলে প্রায় ১২ লাখ রুয়ান্ডি হুটু পূর্ব জায়ারের কিভু প্রদেশে পালিয়ে যায়। এদের কেউ কেউ গণহত্যায় অংশ নিয়েছিল; অন্যদিকে কিভুতে উপজাতি টুটসিদের বাস ছিল। সেখানে ১৯৯৬ সালে এক বিদ্রোহ শুরু হয়। লরেন্ট দিজারে কাবিলার নেতৃত্বে পর্বতবাসী জায়ারি টুটসিরা প্রেসিডেন্ট মবুতু সেসে সেকোর হুটু সমর্থক সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। কাবিলার জায়ারে/কঙ্গো মুক্তির গণতান্ত্রিক বাহিনী (ADFL) রুয়ান্ডা ও উগান্ডার সাহায্যে ১৯৯৭ সালে রাজধানী কিনশাশা দখল করে নেয় এবং কঙ্গো প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে। এই গৃহযুদ্ধের পরিণতিতে সাড়ে চার লাখ মানুষ শরণার্থী ও গৃহচ্যুত হয়।

কঙ্গোলিজ র‍্যালি ফর ডেমোক্রেসি (RCD) ১৯৯৮ সালে কিছু অঞ্চলে কাবিলা সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু করে এবং এক সপ্তাহের মধ্যে বিদ্রোহীরা দেশের বৃহদাঞ্চল দখল করে নেয়। অ্যাঙ্গোলা, চাদ, কেনিয়া, নামিবিয়া ও জিম্বাবুয়ের প্রেসিডেন্টগণ কাবিলাকে সামরিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। অ্যাঙ্গোলার সৈন্যরা দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের কয়েকটি শহর পুনর্দখল করে এবং অ্যাঙ্গোলা, নামিবিয়া ও জিম্বাবুইয়ের সৈন্যদের সাহায্যে বিদ্রোহীদের কিনশাশার দিকে অগ্রযাত্রা থামিয়ে দেয়া হয়। অবশ্য বিদ্রোহীরা পূর্বাঞ্চলে তাদের আধিপত্য বজায় রাখে। কঙ্গোলিজ র‍্যালি ফর ডেমোক্রেসি নামে এই বিদ্রোহী আন্দোলনকে সমর্থন করে রুয়ান্ডা ও উগান্ডা। নিরাপত্তা পরিষদ যুদ্ধবিরতি ও বিদেশি সৈন্য প্রত্যাহারের আহ্বান জানায় এবং দেশগুলোকে অনুরোধ করে অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করার জন্য। ১৯৯৯ সালের কঙ্গো, অ্যাঙ্গোলা, নামিবিয়া, রুয়ান্ডা, উগান্ডা এবং জিম্বাবুয়েকে সাথে নিয়ে লুসাকা অস্ত্রবিরতি চুক্তি স্বাক্ষর করে। আরসিডি আগস্ট মাসে এই চুক্তি স্বাক্ষর করে।

চুক্তি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিরাপত্তা পরিষদ পরবর্তীকালে ইউনাইটেড নেশনস্ মিশন ইন দ্য ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অব দি কঙ্গো (MONUC) স্থাপন করে।

২০০১ সালের জানুয়ারিতে প্রেসিডেন্ট কাবিলা নিহত হন। তার স্থলাভিষিক্ত হন তার ছেলে জোসেফ। ঐ বছরের অক্টোবর মাসে ইথিওপিয়ার আদ্দিস আবাবাতে দীর্ঘ প্রতীক্ষিত আন্তঃকঙ্গোলিস সংলাপ শুরু হয়। কঙ্গো থেকে রুয়ান্ডার সৈন্য সরিয়ে নেয়ার ব্যাপারে ২০০২-এর জুলাই মাসে কঙ্গো এবং রুয়ান্ডার মধ্যে চুক্তি সম্পন্ন হয়; কিন্তু অক্টোবরে আবার নতুন করে সংঘাত শুরু হলে দেশটির স্থিতিশীলতা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়। সেই বছরের শেষ দিকে যুদ্ধরত দলগুলো জাতিসংঘ ও সাউথ আফ্রিকার মধ্যস্থতায় একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনে সম্মত হয়। নিরাপত্তা পরিষদ MONUC-এর সৈন্য সংখ্যা ৮৭০০-তে উন্নীত করে। এদিকে দক্ষিণ কিভুতে নতুন করে যুদ্ধ শুরু হয়, যার ফলে ব্যাপক হারে শরণার্থী সমস্যা সৃষ্টি হয়। পরিশেষে ২০০৩-এর মে মাসে ইতুরি অঞ্চলের জন্য বিবদমান দলগুলো একটি অস্ত্রবিরতি চুক্তি স্বাক্ষর করে। এই চুক্তি অনুসারে নিরাপত্তা পরিষদ একটি ইন্টারিম ইমার্জেন্সি মাল্টিন্যাশনাল ফোর্স (IEMF) ইতুরি প্রদেশের রাজধানী ভুনিয়াতে পাঠায়। পরবর্তীকালে প্রেসিডেন্ট জোসেফ কাবিলার নেতৃত্বে ক্ষমতা ভাগাভাগির ভিত্তিতে একটি সরকার গঠিত হয়। পরিষদ MONUC-এর সামরিক শক্তি ১০৮০০-তে উন্নীত করে। সনদের ৭ নম্বর অধ্যায় অনুযায়ী পরিষদ এই মিশনকে ইতুরি এবং উত্তর ও দক্ষিণ কিভুতে শক্তি প্রয়োগ করার জন্য ক্ষমতা প্রদান করে।

২০০৬ সালের জুলাইতে দেশটির ইতিহাসে ৪৬ বছর পর একটি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে ৫০০ আসনবিশিষ্ট একটি জাতীয় পরিষদ গঠিত হয়। অক্টোবরে জোসেফ কাবিলা দেশটির প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। উত্তর কিভুতে সৈন্য বিদ্রোহীদের মধ্যে সংঘাত নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এবং গোমা শহরে RCD-এর অগ্রসর ঠেকাতে ২০০৮ সালের অক্টোবরে জাতিসংঘ সাঁজোয়া যান ব্যবহার করার অনুমতি দেন। গোমা থেকে উত্তর কিভু পর্যন্ত এলাকাতে শান্তিকর্মী নিয়োগ করা হয়। নভেম্বর মাসে নিরাপত্তা পরিষদ অতিরিক্ত ৩০৮৫ শান্তিরক্ষাকর্মী ঐ অঞ্চলে পাঠায়, যাতে ক্রমবর্ধমান বেসামরিক মানুষের ওপর আক্রমণ, যৌন নিপীড়ন এবং শিশুদের যোদ্ধা হিসেবে ব্যবহার বন্ধ করা যায়।

২০১০ সালের জুলাই মাসে MONUC পরিবর্তন করে ইউনাইটেড নেশনস অর্গানাইজেশন স্ট্যাবিলাইজেশন মিশন ইন দি ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অব দি কঙ্গো (MONUSCO) করা হয়। MONUSCO-এর অধীনে দেয়া হয় ১৯৮১৫ জন সৈন্য, ৭৬০ জন সামরিক পরিদর্শক, ৩৯১ জন পুলিশ এবং ১০৫০ জন ফর্মড পুলিশ ইউনিট সদস্য। MONUSCO-এর দায়িত্ব ছিল সরকারের ক্ষমতায়ন, কারিগরি ও লজিস্টিকস সমর্থন দেয়া এবং কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত করা। ২০১৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আদ্দিস আবাবাতে ১১টি দেশের প্রতিনিধি, আফ্রিকান ইউনিয়ন, ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স অন দ্য গ্রেট লেক রিজিয়ন, সাউদার্ন আফ্রিকান ডেভেলপমেন্ট কমিউনিটি, জাতিসংঘের মহাসচিব, কঙ্গো এবং ঐ অঞ্চলের জন্য শান্তি, নিরাপত্তা এবং সহযোগিতার ফ্রেমওয়ার্ক স্বাক্ষর করে। নিরাপত্তা পরিষদ শান্তিরক্ষার কাজকে শক্তিশালী করার জন্য 'ইন্টার ভেনসন ব্রিগেড' তৈরি করে।

মধ্য আফ্রিকা প্রজাতন্ত্র

মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্রের দ্বন্দ্ব শুরু হয় যখন ১৯৯০-এর মাঝামাঝিতে সৈন্যরা পর্যায়ক্রমিক বিদ্রোহ শুরু করে, জাতিসংঘ মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্রের রাজধানী ব্যাংগুইতে নিরাপত্তা জোরদারে সাহায্য করার জন্য ১৯৯৮ সালে জাতিসংঘ ইউনাইটেড নেশনস মিশন

ইন দ্য সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক (MINURCA) প্রতিষ্ঠা করে। জাতিসংঘ ১৯৯৯ সালে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে সহায়তা প্রদান করে। ২০০০ সালের ফেব্রুয়ারিতে MINURCA-এর পরিবর্তে পিস বিল্ডিং সাপোর্ট অফিস (BONUCA) গঠিত হয়।

মার্চ ২০০৩ সালে বিদ্রোহী মিলিটারি দল নির্বাচিত রাষ্ট্রপতিকে ক্ষমতাচ্যুত করে, নিরাপত্তা পরিষদ যার নিন্দা জানায় এবং ব্যাংগুই কর্তৃপক্ষকে একটি জাতীয় সংলাপের মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত করার পরিকল্পনা প্রকাশের জন্য চাপ সৃষ্টি করে। একটি জাতীয় সংলাপের পরবর্তীকালে ২০০৫ সালে জাতীয় সংসদ ও রাষ্ট্রপতির নির্বাচন হয়। চূড়ান্ত পর্যায়ে ফ্রাঁসোয়া বোজিজি, যিনি সেনাবিদ্রোহে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তিনিই রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। ২০০৬ সালের মাঝামাঝিতে নবনির্বাচিত জাতীয় সংসদের প্রথম নিয়মিত অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।

২০০৮ সালে সরকার এবং তিন বিদ্রোহী দলের মধ্যে বৈশ্বিক শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরে অনুপ্রাণিত করতে পিস বিল্ডিং সাপোর্ট অফিস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটি ২০০৮ সালের ডিসেম্বরে সরকার, বিদ্রোহী দলগুলোর নেতা, নির্বাসিত বিরোধীদলীয় রাজনীতিকবৃন্দ, সুশীল সমাজ এবং অন্য অংশীদারদের মধ্যে রাজনৈতিক সংলাপের পথ সুগম করে। এই সংলাপ জাতীয় সংহতি, নিরস্ত্রীকরণ অনুষ্ঠানের শুরু, অব্যাহতি ও যোদ্ধাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং রাষ্ট্রপতি ও সাংবিধানিক নির্বাচনের জন্য আহ্বান করা হয়। ২০০৯ সালে BONUCA-এর পরিবর্তে ইউনাইটেড নেশনস ইন্টিগ্রেটেড পিস বিল্ডিং অফিস ইন দ্য সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক (BINUCA) স্থাপিত হয়। শান্তি প্রতিষ্ঠা সংস্থা নিরাপত্তা পরিষদের অধীনে শান্তি ও জাতীয় সংহতি সুদৃঢ় করে, গণতন্ত্রের ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করে আইনের শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করে, আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক সাহায্য সচল করার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় পুনর্গঠন এবং পুনরুদ্ধারের কাজ করে। সংস্থাটি মানবাধিকার বিষয় সম্পর্কিত গণসচেতনতামূলক প্রচারণা চালায়। ২০১২ সালের শেষ দিকে সেলেকা নামে পরিচিত একটি বিদ্রোহী জোট দেশের একটি বড় অংশ দখল করে নেয়। জানুয়ারি ২০১৩ সালে মধ্য আফ্রিকার ইকোনমিক কমিউনিটি অব সেন্ট্রাল আফ্রিকান স্টেটস-এর তত্ত্বাবধানে গ্যাবনের রাজধানী লিব্রাভিলে সমস্যাগুলোর সমাধানের জন্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ২৪ জানুয়ারি নিরাপত্তা পরিষদ BONUCA-এর কার্যক্রম ৩১ জানুয়ারি, ২০১৪ পর্যন্ত বর্ধিত করে।

পশ্চিম আফ্রিকা

২০০১ সালে জাতিসংঘ মহাসচিব পশ্চিম আফ্রিকার দেশগুলোর অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যা ও উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতার মাধ্যমে সমাধান করার জন্য পশ্চিম আফ্রিকা বিষয়ক মহাসচিবের বিশেষ প্রতিনিধির অফিস প্রতিষ্ঠা করার সিদ্ধান্ত নেন। ডাকার ও সেনেগালের ওপর ভিত্তি করে পশ্চিম আফ্রিকার দেশসমূহের জাতিসংঘের দপ্তর (UNOWAS) ২০০২ সালে কার্যকরী হয়। এই দপ্তর ছিল জাতিসংঘের প্রথম আঞ্চলিক শান্তিরক্ষী অফিস। এটি প্রধান উন্নয়ন ইস্যুগুলোর ক্ষেত্রে জাতিসংঘ প্রধান অফিস এবং উপ-আঞ্চলিক সংস্থাগুলোর সাথে যোগাযোগ বৃদ্ধির মাধমে পশ্চিম আফ্রিকার দেশগুলোর মধ্যে কার্যকরী ভূমিকা ও বিশেষ দায়িত্ব পালন করে।

বিশেষ প্রতিনিধি নিবিড়ভাবে আইভরি কোস্ট ও লাইবেরিয়ার সংঘাত দূর করার জন্য আন্তর্জাতিকভাবে সচেষ্ট ছিল। জাতিসংঘের এই দপ্তরটি যুক্ত ছিল সীমান্তবর্তী সমস্যার

সাথে যেমন : শিশু সৈনিক, ক্ষুদ্রাস্ত্রের ব্যবহার, নিরাপত্তা বিভাগ পুনর্গঠন, গণতন্ত্রীকরণ, অর্থনৈতিক সংযুক্তি, যুবকদের বেকার সমস্যা দূরীকরণ, সীমান্তব্যাপী সহযোগিতা। সংস্থাটি প্রাক্তন সৈনিকদের নিরস্ত্রীকরণ, বিচ্ছিন্নকরণ ও পুনঃএকত্রীকরণ সংশ্লিষ্ট সমন্বিত কর্মসূচি গ্রহণের জন্য আঞ্চলিক সভার আয়োজন করে থাকে।

দুই দেশের সীমান্ত সমস্যায় ২০০২ সালের আন্তর্জাতিক আদালতের রায় কার্যকরের জন্য নাইজেরিয়া ও ক্যামেরুনের প্রেসিডেন্টের অনুরোধে মহাসচিব একজন বিশেষ প্রতিনিধি নিয়োগ দেন, যিনি ক্যামেরুন-নাইজেরিয়ার যৌথ কমিশনের সভাপতি। চাদ লেক থেকে বাকাসি পেনিনসুলা পর্যন্ত বিস্তৃত ১৬০০ কিলোমিটার স্থল সীমানা এবং গায়ানা উপসাগরের সমুদ্রসীমানাকে কেন্দ্র করে দুই দেশের সম্পর্কে তিক্ততা সৃষ্টি হয়েছিল। মহাসচিবের নিবিড় মধ্যস্থতায় ২০০৬ সালে দুই দেশের প্রেসিডেন্ট বাকাসি পেনিনসুলভা সীমান্তে দ্বন্দ্ব নিরসনের এক চুক্তি করে। মধ্য আগস্টে নাইজেরিয়া তাদের সব সেনা ক্যামেরুনে ফিরিয়ে নিয়ে যায়। ২০০৭ সালে উভয় দেশ তাদের সমুদ্র সীমানা ঠিক করতে রাজি হয় এবং এভাবে তাদের কোর্টের চার বিভাগের আদেশ সম্পন্ন হয়। মিশ্র কমিশনের সাহায্যে তাদের স্থল সীমানা নির্ধারণের মাধ্যমে অবস্থার আরও উন্নয়ন হতে থাকে।

আইভরি কোস্ট

২০০২ সালের সেপ্টেম্বরে আইভরি কোস্টের সেনাবাহিনী সেনা অভ্যুত্থান ঘটায় এবং দেশের উত্তরাঞ্চল দখল করে নেয়। সেনা অভ্যুত্থান দেশকে দুই ভাগে ভাগ করে এবং সরকারের প্রেসিডেন্ট লাউরেন্ত জিবাগো শুধু দক্ষিণাঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ পান। যুদ্ধের ফলে বিশাল জনগোষ্ঠী স্থানান্তরিত হয়। দ্য ইকোনমিক কমিউনিটি অব ওয়েস্ট আফ্রিকান স্টেটস্ (ECOWAS) আইভরি কোস্টের সরকার এবং দেশটির একটি বিদ্রোহী গ্রুপের মধ্যে যুদ্ধবিরতি চুক্তি পরিবীক্ষণের জন্য শান্তিরক্ষা মিশনের ব্যবস্থা করেছিল। ২০০৩ সালের জানুয়ারিতে সরকার ও বিদ্রোহী গ্রুপগুলো গোলাগুলি বন্ধ করতে সম্মত হয়। মার্চে একটা শান্তিচুক্তি করা হয় এবং প্রেসিডেন্ট জিবাগো একটা জাতীয় সমন্বিত সরকার প্রতিষ্ঠা করে। দুই মাস পরে আর্মি এবং তিনটি বিদ্রোহী গ্রুপের সমন্বয়ে গঠিত ফোর্স নভেলাস অস্ত্রবিরতিকরণ চুক্তি স্বাক্ষর করে। পরবর্তীকালে জাতিসংঘ চুক্তিগুলোর প্রয়োগের জন্য আইভরি কোস্টে একটা নতুন মিশন ইউনাইটেড নেশনস মিশন ইন কোতে ডিভয়ার (আইভরি কোস্ট) (MINUCI) গঠন করে। সেপ্টেম্বরে সম্মিলিত ফোর্স রাষ্ট্রপতি জিবাগোর নিযুক্ত প্রতিরক্ষা ও অভ্যন্তরীণ প্রতিরক্ষা মন্ত্রীকে বাতিল করে এবং সরকার উৎখাতের চেষ্টা চালায়। তারা আরও প্রতিবাদ তোলে যে, প্রেসিডেন্ট তার জাতীয় সমন্বিত সরকার ও প্রধানমন্ত্রীকে যথেষ্ট ক্ষমতা দেননি।

সেক্রেটারি জেনারেলের অনুমতিক্রমে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে ২০০৪ সালের প্রথম দিকে নিরাপত্তা পরিষদ আইভরি কোস্টে জাতিসংঘের মিশন ইউনাইটেড নেশনস অপারেশন ইন কোতে ডিভয়ার (আইভরি কোস্ট) (UNOCI) শুরু করে। ECOWAS ইকোওয়াস ও মিনোচি থেকে দায়িত্ব নিয়ে নতুন মিশনকে সহযোগিতা করার জন্য সর্বোচ্চ ৬,২৪০ জন ফরাসি সৈন্য ও বিশাল পরিসরের ম্যানডেটের ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়।

২০০৫ সালের এপ্রিলে জাতিসংঘের স্বীকৃত ফরাসি বাহিনী এবং জাতিসংঘের মিশনের শান্তিকর্মীরা সরকার ও বিদ্রোহী দলগুলোর মধ্যে অস্ত্রবিরতিকরণ কার্যক্রমে প্রধান ভূমিকা পালন করে। জুনে নিরাপত্তা পরিষদ পরিস্থিতি খারাপ হওয়া থেকে বাঁচাতে আইভরি

কোস্টের মিশনের ব্যাপ্তি বৃদ্ধি করে।

২০০৭ সালের মার্চে প্রেসিডেন্ট জিবাগো এবং বিদ্রোহী দলের সেক্রেটারি জেনারেল গুইলিয়াম সোরো 'ওয়াগাডুগো এগ্রিমেন্ট' স্বাক্ষর করেন। এই চুক্তির ফলে স্থায়ী সরকার গঠন, স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ প্রেসিডেন্ট নির্বাচন, বিদ্রোহী গ্রুপগুলোকে সেনাবাহিনীতে যুক্তকরণ, জোন অফ কনফিডেন্স দূরীকরণ, যা কিনা সরকার নিয়ন্ত্রিত দক্ষিণ এবং বিদ্রোহী নিয়ন্ত্রিত উত্তরকে আলাদা করে রেখেছিল।

২০১০ সালের নভেম্বরে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, যাতে স্বাধীন নির্বাচন কমিশন আলাসসানে উয়াত্তারাকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। শাসনতান্ত্রিক কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট এই ফলকে অবৈধ ঘোষণা করেন এবং বলেন যে জিবাগোই জয়ী। জিবাগো ও উয়াত্তরা উভয়ই নিজেকে জয়ী দাবি করেন এবং প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। জাতিসংঘ, আফ্রিকান ইউনিয়ন, পশ্চিম আফ্রিকার দেশগুলোর অর্থনৈতিক গোষ্ঠী, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ও বেশিরভাগ দেশ উয়াত্তারাকে প্রেসিডেন্ট হিসেবে মেনে নেয় এবং জিবাগোকে ক্ষমতা ছেড়ে দিতে অনুরোধ করে। মি. জিবাগো অস্বীকার করেন এবং শান্তিরক্ষীদের দেশ ছেড়ে চলে যেতে বলেন। নিরাপত্তা পরিষদ ইউএনওসিআই-এর স্থায়িত্বকাল জুলাই ২০১১ পর্যন্ত বর্ধিত করে এবং আরও ২০০০ অতিরিক্ত শান্তিরক্ষী পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়। বিশ্বব্যাংক দেশটিতে সব ঋণ বন্ধ করে দেয় এবং জিবাগো ও তার সহযোগীদের বিরুদ্ধে ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়।

এপ্রিল ২০১১-তে প্রেসিডেন্ট উয়াত্তারা অনুগত সেনাবাহিনী ইউএনওসিআই ও ফরাসি সৈন্যদের সমন্বয়ে পরিচালিত সামরিক অভিযানের মাধ্যমে মিস্টার জিবাগোকে গ্রেফতার করে এবং সরকারের অধীনে রাখা হয়। সাংবিধানিক কাউন্সিল ফলাফলের পুনর্বিবেচনার মাধ্যমে ২০১০ সালের ফলাফলকে বাতিল করে মিস্টার উয়াত্তারাকে প্রেসিডেন্ট হিসেবে পুনর্বহাল করে। নভেম্বরে উয়াত্তারা রাষ্ট্রপতি হিসেবে ক্ষমতা গ্রহণ করেন। নভেম্বর মাসে ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল কোর্ট মানবতাবিরোধী অপরাধের জন্য জিবাগোর বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করে এবং আইভরিয়ান কর্তৃপক্ষ তাকে দি হেগে অবস্থিত আইসিসি অন্তরীণ কেন্দ্রে হস্তান্তর করে।

২০১২-তে ইউএনওসিআই-এর শান্তিরক্ষীরা অজ্ঞাত অস্ত্রধারীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়। এই সময় দক্ষিণ-পশ্চিম আইভরি কোস্টে অভিযান পরিচালনা করে এবং ৭ জন সৈনিক মারা যায়। জুলাইতে সিকিউরিটি কাউন্সিল ৮,৮৩৭ জন সৈন্যসহ ইউএনওসিআই-এর সময়সীমা ২০১৩ সালের ৩১ জুলাই পর্যন্ত বৃদ্ধি করে।

লাইবেরিয়া

আট বছরের টানা গৃহযুদ্ধের পর ১৯৯৭ সালে লাইবেরিয়াতে একটা গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকার ক্ষমতায় আসে এবং লাইবেরিয়াতে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী সহায়তা অফিস ইউনাইটেড নেশনস পিস বিল্ডিং সাপোর্ট অফিস ইন লাইবেরিয়া (UNOL) বসানো হয়। যা হোক, ১৯৯৯ সালে লাইবেরিয়া সরকারি বাহিনী এবং লাইবেরিয়ান ইউনাইটেড ফর রিকনসিলিয়েশন অ্যান্ড ডেমোক্রেসির (LURD) মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। ২০০৩ সালে দি মুভমেন্ট ফর ডেমোক্রেসি ইন লাইবেরিয়া (MODEL) নামক নতুন সশস্ত্র বাহিনী আবির্ভূত হয়। মে মাসের মধ্যে বিদ্রোহী গ্রুপগুলো দেশের ৬০% শতাংশের বেশি অংশ দখল নেয়। ECOWAS-এর সৌজন্যে উভয় দল ঘানার আকরায় এক শান্তি আলোচনায় বসে, যেখানে

সিয়েরা লিওনে জাতিসংঘের বিশেষ কোর্ট প্রেসিডেন্ট চার্লস্ টেইলরকে ১০ বছরের গৃহযুদ্ধের জন্য অপরাধী বলে অভিযুক্ত করে। শান্তি প্রক্রিয়া থেকে প্রেসিডেন্ট নিজেই সরে আসেন। দুই সপ্তাহ পর সরকার, LURD ও MODEL প্রেসিডেন্ট টেইলরকে ছাড়া ৩০ দিনের মধ্যে শান্তিচুক্তির জন্য অস্ত্রবিরতি চুক্তি করে এবং অন্তর্বর্তী সরকারের দাবি জানায়। চুক্তি সত্ত্বেও যুদ্ধ চলতে থাকে এবং ইকোওয়াস ১০০০ সৈন্য নিয়োগ করে।

আগস্টের মধ্যভাগে প্রেসিডেন্ট পদত্যাগ করেন এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট মোসেম ব্লাহ অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান হন। কিছুদিন পর মহাসচিবের বিশেষ প্রতিনিধি ভূখণ্ডে তাদের আওতায় মানবিক সাহায্য বাধাহীনভাবে বিতরণ, সাহায্যকারী কর্মীদের নির্বিঘ্নে প্রবেশান্তে কার্য সম্পাদনের বিষয়ে দলগুলোর সাথে নিরাপত্তা চুক্তি স্বাক্ষর করে। দলগুলো বিশদ শান্তি চুক্তিতে স্বাক্ষর করে।

২০০৩ সালের সেপ্টেম্বরে নিরাপত্তা পরিষদ ইকোওয়াস থেকে ১৫,০০০ সৈন্য ও ১,০০০ সাধারণ পুলিশ নিয়ে লাইবেরিয়াতে UNOL-এর পরিবর্তে ইউনাইটেড নেশনস মিশন ইন লাইবেরিয়া (UNMIL) প্রতিষ্ঠা করে। এর আদেশ ছিল : অস্ত্রবিরতিকরণ চুক্তি পর্যবেক্ষণ, নিরস্ত্রীকরণে সহায়তা প্রদান, শান্তিপূর্ণ কার্যক্রম রোধ, সব সশস্ত্র বাহিনীর একত্রীকরণ, জরুরি স্থাপনা তৈরিতে সরকারকে নিরাপত্তা প্রদান, কর্মীদের রক্ষা এবং মানবাধিকার রক্ষা করা। ২০০৫ সালের অক্টোবরে নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছ নির্বাচন অনুষ্ঠান করাও এর দায়িত্ব ছিল। কর্মসূচি অনুযায়ী ৩৫০০ ইকোওয়াস কর্মীকে জাতিসংঘ ব্লু হেলমেটের মাধ্যমে 'রিহ্যাটেড' করা হয়েছিল। অক্টোবরে গুয়দে ব্র্যান্তের নেতৃত্বে জাতীয় অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ক্ষমতায় আসে এবং পুরনো প্রেসিডেন্ট ব্লাহ শান্তিরক্ষীদের কাছে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র সমর্পণ করেন।

২০০৪ সালে মনভিয়াতে লাইবেরিয়া মিশনের সদর দপ্তরে এক অনুষ্ঠানে সব যোদ্ধাগোষ্ঠী দল ভেঙে ফেলে। ১৫ বছর সংঘাতের পর ২০০৫ সালের অক্টোবরে জাতিসংঘের সহায়তায় লাইবেরিয়ার জনগণ প্রথম যুদ্ধ-পরবর্তী নির্বাচন করে এবং ইলিয়েন জন্সনকে প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত করে। ২০০৬ সালের ফেব্রুয়ারির শেষ দিকে ৩,০০,০০০ অভ্যন্তরীণ স্থানান্তরিত লাইবেরিয়ান জনগণ তাদের বাড়িতে ফিরে আসে।

২০০৭ সালে লাইবেরিয়া জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী তহবিল থেকে সাহায্য পাওয়ার উপযোগী হয়ে ওঠে। তহবিল দেয়া হয়েছিল শান্তি প্রতিষ্ঠা, নিরাপত্তা উন্নয়ন এবং সীমান্ত সমস্যা দূরীকরণের জন্য। ২০০৯ সালে এই প্রকল্পের কাজ শুরু হয়।

২০১২ সালের সেপ্টেম্বরে নিরপত্তা পরিষদ লাইবেরিয়া মিশনের স্থায়িত্বকাল ২০১৩ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বর্ধিত করে। সেক্রেটারি জেনারেলের অনুরোধে এটা ২০১৫ সালের মধ্যে এই মিশনের শক্তি ৩,৭৫০-এ কমিয়ে আনতে সম্মত হয়। কাউন্সিল পুলিশের শক্তি ১,৭৯৫-তে বৃদ্ধি করে তিনটি অতিরিক্ত ইউনিটের মাধ্যমে। মিশনের ভবিষ্যৎ পুনঃকার্যক্রমের জন্য ভূখণ্ডের সরকার কর্তৃক নিরাপত্তা উন্নয়ন কার্যক্ষমতা দায়িত্ব গ্রহণের লক্ষ্যে এই মিশনের নিরাপত্তা কার্যক্রম হতে সরকারি বাহিনীর পর্যাপ্ত দক্ষতা অর্জনের মূল্যায়ন করে পরবর্তী মিশন কার্যক্রম গ্রহণ করা।

গিনি-বিসাউ

২০০৯ সালের জুনে প্রাথমিকভাবে ইউনাইটেড নেশনস ইন্টিগ্রেটেড পিস বিল্ডি অফিস ইন গিনি-বিসাউ (UNIOGBIS) ২০১০ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ৩১ ডিসেম্বর ১২ মাসের

জন্য প্রতিষ্ঠা করা হয়। জাতিসংঘ শান্তি স্থাপনকারী এই অফিসটি শান্তি প্রতিষ্ঠা সহায়তা কার্যালয় গিনি-বিসাউতে প্রতিষ্ঠা করে, যেটা বাস্তবায়ন করে ১৯৯৯ সালে সংঘর্ষের সময়। ২০১০ সালের এপ্রিলে পুনরায় অশান্তি শুরু হয় যখন সেনাপ্রধানসহ প্রধানমন্ত্রী কার্লোস গোমেজ জুনিয়রকে সৈন্যরা গৃহবন্দী করে। এই কঠিন সংকটপূর্ণ সময়ে UNIOGBIS গিনি-বিসাউতে বহুমাত্রিক ইউএন পিস বিল্ডিং কমিশনকে বহুমাত্রিক শান্তিরক্ষা কর্মসূচিতে সাহায্য করে। তার মধ্যে ছিল জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর শক্তি বৃদ্ধি, যাতে তারা শাসনতন্ত্রের মধ্য থেকে কাজ করতে পারে এবং আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়। দক্ষ ও কার্যকর আইন প্রয়োগকারী সংস্থা প্রতিষ্ঠায় সহায়তা এবং অপরাধের বিচারের ব্যবস্থা প্রয়োগ; নিরাপত্তা ব্যবস্থার সংস্কারে কৌশলগত দিকগুলোর বাস্তবায়নে উন্নয়ন ও সমন্বয়ের সহায়তা প্রদান, সাধারণ মানবাধিকারের বিষয়াদি সমুন্নত এবং নারীর ক্ষমতায়ন সুরক্ষা করা। UNIOGBIS-এ কাজ করার জন্য আফ্রিকান ইউনিয়ন, পর্তুগিজ ভাষাভাষী দেশগুলোর কমিউনিটি, ইকোওয়াস, ইইউ ও অন্যান্য অংশীদারকে সহায়তা করে।

২০১২ সালের ১২ এপ্রিল গিনি বিসাউয়ের সেনাবাহিনীর কিছু সদস্য একটি অভ্যুত্থান সংঘটিত করে এবং অন্তর্বর্তীকালীন প্রেসিডেন্ট রাইমান্ডু পেরেরা, প্রধানমন্ত্রী এবং সেনাবাহিনীর চিফ অব জেনারেল স্টাফ জেনারেল এন্টিনিও ইন্ডজায়িকে গ্রেফতার করে এবং আটকে রাখে। একই বছর মার্চে অনুষ্ঠেয় প্রথম দফা নির্বাচনের ফলাফল প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী নয়জনের মধ্যে পাঁচজন কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় সৃষ্ট অস্থিরতার ফলে সামরিক অভ্যুত্থানটি ঘটে।

নিরাপত্তা পরিষদ এই অভ্যুত্থানকে নিন্দা জানায় এবং সব সাজাভুক্ত অফিসারকে নিঃশর্ত মুক্তি দাবি করেছিল। ২৭ এপ্রিল সামরিক জান্তা ও ইকোওয়াসের আলোচনায় সামরিক জান্তা ইকোওয়াস বাহিনীকে গিনি-বিসাউতে নিয়োজিত করতে এবং আন্তর্বর্তী রাষ্ট্রপতি পেরেরা এবং প্রধানমন্ত্রীকে মুক্তি দিতে রাজি হয়েছিল, যারা ইকোওয়াসের প্রতিনিধিদের সাথে আবিদজানে চলে যায়। ২০১৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে নিরাপত্তা পরিষদ UNIOGBIS ক্ষমতা ২০১৩ সালের ৩১ মে পর্যন্ত বর্ধিত করেছিল।

সিয়েরা লিওন

১৯৯১ সালে দি রিভ্যুলোশনারি ইউনাইটেড ফ্রন্ট সিয়েরা লিওন এর সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে, কিন্তু ১৯৯২ সালে ওই দেশের নিজস্ব আর্মি সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে। ১৯৯৫ সালে মহাসচিব এমন একজন বিশেষ দূত নিযুক্ত করেন যিনি আফ্রিকান ইউনিটি সংস্থা এবং ইকোওয়াসের সাথে কর্মরত ছিলেন এবং তিনি তাদের সাথে আলোচনা করেন এবং গণতান্ত্রিক শাসন ফিরিয়ে আনার জন্য কাজ করেন। ১৯৯৬ সালে অনুষ্ঠিত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে যখন RUF অংশগ্রহণ করেনি, তখন আর্মি বিজয়ী প্রার্থী আহমেদ তেজান কাবাহকে ক্ষমতা হস্তান্তর করে। বিশেষ দূত তখন RUF এবং সরকারের মধ্যে ১৯৯৬ সালের 'আবিদযান শান্তিচুক্তি' নিয়ে আলোচনায় বসতে সাহায্য করে। ১৯৯৭ সালে অভ্যুত্থানের পরে সেনাবাহিনী একটা শাসক জান্তা গঠন করার জন্য RUF-এর সাথে যোগ দেয়। প্রেসিডেন্ট কাবাহ নির্বাসিত হয়, এবং নিরাপত্তা পরিষদ তেল এবং অস্ত্রের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। এই নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করার জন্য ইকোওয়াসকে দায়িত্ব দেয়।

১৯৯৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বিদ্রোহী ও জান্তা বাহিনীর আক্রমণের প্রেক্ষিতে দ্য ইকোনমিক কমিউনিটি অব ওয়েস্ট আফ্রিকান স্টেটস্ মনিটরিং গ্রুপ (ECOMOG)

সামরিক অভিযান চালায় যা শাসক জান্তাদের পতনের কারণ হিসেবে পরিগণিত হয়। প্রেসিডেন্ট কাবাহ অফিসে ফিরে আসে এবং কাউন্সিল অবরোধ উঠিয়ে নেয়। জুনে সিকিউরিটি ফোর্সের সীমাবদ্ধতা, বিদ্রোহীদের নিরস্ত্রীকরণ এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা তদারকি করার জন্য কাউন্সিল সিয়েরা লিওনে জাতিসংঘের একটি মিশন প্রতিষ্ঠা করে। ECOMOG-এর ছত্রছায়ায় নিরস্ত্র UNOMSIL দল মানবতা লঙ্ঘন এবং নিষ্ঠুরতার ওপর একটা প্রতিবেদন করে।

বিদ্রোহী দলগুলো খুব দ্রুত আবার দেশের অর্ধেকের বেশি ভূখণ্ডের ওপর দখল নেয় এবং ১৯৯৯ সালের জানুয়ারিতে মুক্তঅঞ্চল এবং রাজধানীতে ঢুকে পড়ে। ওই মাসের পরে ECOMOG এর সৈন্যদল পুনরায় মুক্তঅঞ্চলের দখল নেয় এবং সরকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে। ওই যুদ্ধে ৭,০০,০০০ মানুষ বাস্তচ্যুত হয় এবং ৪,৫০,০০০ মানুষ উদ্বাস্তুতে পরিণত হয়। পশ্চিম আফ্রিকান দেশগুলোর সাথে বিশেষ প্রতিনিধি পরামর্শ করে এবং বিদ্রোহীদের সাথে আলোচনার একটা কূটনৈতিক প্রচেষ্টা চালায়। জুলাই মাসে আলোচনা 'লউম শান্তিচুক্তি' দ্বারা যুদ্ধ বন্ধ করে এবং জাতীয় ঐক্যের একটা সর্বজন গৃহীত সরকার গঠন করে।

নিরাপত্তা পরিষদ ১৯৯৯ সালে সিয়েরা লিওনে নিরস্ত্রিকরণ, সামরিক কর্মকাণ্ড থেকে বিরতি ও ৪৫,০০০ সৈন্য একত্র করার জন্য UNOMSIL-এর পরিবর্তে একটা বিশাল ইউনাইটেড নেশনস্ মিশন ইন সিয়েরালিওন (UNAMSIL) নামে একটি মিশন পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে। ২০০০ সালের ফেব্রুয়ারিতে ECOMOG-এর প্রত্যাহারের ঘোষণায় UNAMSIL-এর শক্তি বৃদ্ধি পেয়ে ১১,০০০ সেনাবাহিনী সদস্য হয়। এপ্রিলে RUF জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী বাহিনীকে হামলা করে এবং এতে চারজন শান্তিরক্ষী বাহিনীর সদস্য নিহত হয় ও ৫০০ জন জাতিসংঘ কর্মী বন্দি হয়। মে মাসে ব্রিটিশ আর্মি একটা দ্বিপক্ষীয় চুক্তির অধীনে এর রাজধানী এবং বিমানবন্দরকে সুরক্ষিত করে RUF নেতা ফোদে সানুকোকে গ্রেফতারে সহায়তা করে। ওই মাসের শেষে প্রায় অর্ধেক জাতিসংঘ কর্মী বন্দিমুক্ত হয়। কাউন্সিল UNAMISIL-এর শক্তি ১৩,০০০ বৃদ্ধি করে শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্য এবং জুলাইয়ে এ মিশনটি বাকি বন্দিকে মুক্ত করে। আগস্টে এ কাউন্সিল একটি বিশেষ কোর্টের মাধ্যমে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার শুরু করে।

সিয়েরা লিয়ন বিষয়ক জাতিসংঘের এই মিশনটি ২০০১ সালের নভেম্বরের মধ্যে সারা দেশের সব অঞ্চলে এর প্রসারতা প্রতিষ্ঠা করে এবং ২০০২ সালের জানুয়ারির মধ্যে নিরস্ত্রীকরণ সম্পন্ন হয়। ২০০২ সালের মে মাসে প্রেসিডেন্ট ও পার্লামেন্ট নির্বাচনের পর মিশন দেশের সর্বত্র সরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্ব দেয়, পুরনো আর্মিদের পুনঃসমন্বয় করে এবং IDPs পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও ফিরে আসা লোকদের পুনরায় বাসস্থানের ব্যবস্থা করে। IDP-দের ডিসেম্বরে এবং ফিরে আসা ২,৮০,০০০ সিয়েরা লিওনের উদ্বাস্তু পুনর্বাসন ২০০৪ সালের জুলাইয়ে শেষ হয়। একটা সত্যবাদিতা ও পুনর্মিলিত কমিশন এবং সিয়েরা লিওনের বিশেষ কোর্ট ২০০২ সালের মাঝের দিকে কাজ শুরু করে।

যখন ২০০৫ সালের ডিসেম্বরে সিয়েরা লিয়ন বিষয়ক জাতিসংঘের এই মিশনটি উঠিয়ে নেয়া হয়, তখন দেশটি মৌলিক সুযোগ-সুবিধায় অগ্রগতি ও ক্রমবর্ধমান স্থায়িত্বের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। এটা ২০০৬ সালের জানুয়ারি মাসে ইউএন ইন্টিগ্রেটেড অফিস ইন সিয়েরা লিওনের এই মিশনটি কার্যভার গ্রহণ করে। এটাই প্রথম শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সিয়েরা লিওনে জাতিসংঘের সংযুক্ত অফিস।

সিয়েরা লিওনের উন্নতি আরও একধাপ এগিয়ে যায় যখন জাতিসংঘ শান্তি প্রতিষ্ঠা কমিশন বুরুন্ডির সাথে এর প্রথম কার্যক্রম স্বাক্ষর করে। ২০০৭ সালের মার্চে কমিশনের সুপারিশে সেক্রেটারি জেনারেল বান কি-মুন গত অক্টোবরে সংঘাতপূর্ণ দেশের উন্নতির জন্য সংগৃহীত তহবিল থেকে ৩৫ মিলিয়ন ডলার সিয়েরা লিওনকে দেন।

২০০৭ সালের জুলাই মাসে প্রেসিডেন্ট ও পার্লামেন্ট নির্বাচনের জন্য প্রচারণা শুরু হয়। ভোট ও হিসাব পদ্ধতির ওপর UNIOSIL-এর অংশগ্রহণে ৪৯ জেলার অফিসারদের প্রশিক্ষণ দেয় ৩৭,০০০ ভোট কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের উদ্দেশে। প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নির্বাচনটি বেশিরভাগ ভোটারের উপস্থিতিতে আগস্টে সম্পন্ন হয়। নির্বাচনে আরনেস্ট বাই করমা প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। তিনি ২০০৭ সালের নভেম্বরে ক্ষমতা গ্রহণ করেন।

২০০৮ সালের আগস্ট মাসে নিরাপত্তা পরিষদ UNIOSIL থেকে United Nations Integrated Peacebuilding office in Sierra Leone (UNIPSIL) প্রতিষ্ঠা করে। UNIPSIL-এর ৭০ জন সদস্য প্রত্যন্ত অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠা, পুলিশ এবং সিকিউরিটি ফোর্সকে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। এই সংস্থা মানবাধিকার রক্ষা এবং বিভিন্ন গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান তৈরি করতে সাহায্য করে থাকে।

২০১২ সালের ১৭ নভেম্বর প্রেসিডেন্ট পার্লামেন্ট এবং স্থানীয় নির্বাচনে UNIPSIL সাহায্য করেন। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর তৃতীয়বার নির্বাচনে সিয়েরা লিওনের জনগণের এবং এই সংস্থার বড় সাফল্য বলে মনে করা হয়। প্রেসিডেন্ট করমা আবারও নির্বাচিত হন এবং ফেব্রুয়ারিতে ক্ষমতা গ্রহণ করেন। মার্চে সিকিউরিটি কাউন্সিল UNIPSIL-এর কার্যক্রম প্রসারিত করে ৩১ মার্চ ২০১৪ পর্যন্ত বর্ধিত করে এবং সিদ্ধান্ত হয় যে, সরকারের মতামত ও ভূখণ্ডের অবস্থা বিবেচনা করে UNIPSIL-এর সিয়েরা লিওন ত্যাগ করবে।

মালি

২০১২ সালে মালি আন্তর্জাতিক উদ্বেগের কারণ হয়ে দাড়ায়। মধ্য জানুয়ারিতে দি তাওরেগ মুভমেন্ট ন্যাশনাল পউর লা লিবারেশন দে ইয়াজাওয়াদ (MNLA) এবং আরও কিছু ইসলামিক সশস্ত্র গ্রুপ আনসার দ্বীন, আল কায়েদা, আনসার দ্বীন আল-কায়েদা ইন দি ইসলামিক মাগরিব (AQIM), মুভমেন্ট পউর ল'ইউনিসিতে' লে জিহাদসহ (MUJAO) মালির চাকরিচ্যুত সেনাসদস্য দেশের উত্তরে সরকারি বাহিনীর ওপর হামলা করে। একটা সামরিক জান্তা ক্ষমতা দখল করে সরকারি সংস্থাগুলো বন্ধ করে দেয় এবং সংবিধান রহিত করে। ২৭ মার্চ বারকিনা ফাসোর প্রেসিডেন্ট হিসেবে ব্লেইসকোমপাউরকে কারকিনা ইকোওয়াস নিয়োগ দেয় সংকটের মধ্যস্থতা করার জন্য। ৬ এপ্রিল ইকোওয়াস এবং সামরিক জান্তা একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে, যার ফলে প্রেসিডেন্ট আমাদাও তুউমানি তুউরেকে ৮ এপ্রিলের মধ্যে ক্ষমতা ছেড়ে দেওনক্যুঅনদা ত্রাওরেকে অন্তর্বর্তীকালীন প্রেসিডেন্ট হিসেবে নিয়োগ দেয়। ১৭ এপ্রিল চেইক মাদিবকে অন্তর্বর্তীকালীন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয়।

এপ্রিলে এমএনএলএ কিদাল, গাও এবং টিম্বাক্টু থেকে সরকারি বাহিনীকে হটিয়ে দেয় এবং এপ্রিলে আযাওয়াদ অঞ্চল নিয়ে একটা স্বাধীন দেশ ঘোষণা করে। পরে উত্তরের সশস্ত্র গ্রুপগুলোর মধ্যে আদর্শগত অবস্থান খারাপ হয়ে পড়ে এবং ১৮ নভেম্বর আনসার দ্বীন ও মুভমেন্ট পউর ল'ইউনিসিতে লে জিহাদ, কিদাল, গাও ও টিম্বাক্টু প্রধান শহর থেকে

MNLA-কে তাড়িয়ে দেয়। ওই গ্রুপগুলো মালির দুই-তৃতীয়াংশের ওপর নিয়ন্ত্রণ নেয়। প্রায় ৪,৩০,০০০ লোক ঐ সংকটের ফলে স্থানান্তরিত হয়।

সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা রক্ষা এবং আঞ্চলিক একতা রক্ষার জন্য জাতিসংঘ জাতীয় কর্তৃত্ব ও আঞ্চলিক অংশীদারদের সাথে কাজ করছে। ২০১২ সালের ডিসেম্বরে নিরাপত্তা পরিষদ এক বছরের জন্য একটি অন্তর্বর্তীকালীন আফ্রিকান সহায়তা সংস্থা অনুমোদন করে। অন্যান্য কাজের মধ্যে এই সংস্থা মালির প্রতিরক্ষা বাহিনীকে আঞ্চলিক নিয়ন্ত্রণে সহায়তা, মালির সরকারকে সশস্ত্র গ্রুপগুলোকে নির্মূলে সহায়তা এবং জনগণের প্রতিরক্ষা, মানবাধিকার রক্ষা ও শরণার্থীদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে সহায়তা করবে। সেক্রেটারি জেনারেল মালির রাজনৈতিক এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য একটি বহুমুখী জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার জন্য বলেন।

২০১৩ সালের জানুয়ারির প্রথম ভাগে আনসার দ্বীন, আল-কায়েদা ইন দি ইসলামিক মাগরিব এবং মুভমেন্ট পউর ল'ইউনিসিতে লে জিহাদ কিদাল দক্ষিণ দিকে এগিয়ে আসতে থাকে। কন্না শহরের দখলের পর দেশটির সরকার ফ্রান্সের কাছে মালির সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য সাহায্য চায়। ১১ জানুয়ারি ফ্রান্স মিলিটারি অপারেশন শুরু করে এবং আফ্রিকান সহায়তা সংস্থার সাথে আফ্রিকান ফোর্সের যৌথ মিশন ত্বরান্বিত করে। মাসের শেষে বেশিরভাগ উত্তরের অঞ্চলগুলো রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে এবং অধিকাংশ সন্ত্রাসী শক্তি মুখ থুবড়ে পড়ে। ২৯ জানুয়ারি মালি সরকার ক্ষমতা হস্তান্তরের একটা পথ ঘোষণা করে। মার্চে আলোচনা ও একত্রীকরণ কার্যক্রম গঠন করা হয়। তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃপক্ষ ২১ জুলাই আইনসভা এবং ৭ জুলাই প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিষয়ে অঙ্গীকার করে।

২১ জানুয়ারি মালির জাতিসংঘ অফিস মালির রাজধানী বামাকোতে স্থাপন করা হয়। মালির একত্রীকরণের জন্য এই অফিস সশস্ত্র গ্রুপগুলোর সাথে আলোচনা করে নির্বাচনের পথ সৃষ্টি করতে সহায়তা করেছিল। এপ্রিলে জাতিসংঘ অফিস মিনুসমা নামে একটা সহায়তা সংস্থা চালু করে। মালির জাতিসংঘ অফিসকে মিনুসমার সাথে একীভূত করা হয় এবং ১ জুলাই মিনুসমা দায়িত্ব নেয়। মিনুসমা ১১,২০০ সৈন্য এবং ১,৪৪০ জন পুলিশ নিয়ে গঠিত হয়। এটার নির্দেশ ছিল জনগণের স্থায়িত্বকরণ, জাতিসংঘ ও সাধারণ জনগণের নিরাপত্তা প্রতিরক্ষা এবং মানবাধিকার সংরক্ষণ। এটা সমগ্র দেশে সরকারের শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য সহায়তা, পরিবর্তনকালীন সময়ের কার্যক্রমে রোড ম্যাপ, সংস্কৃতি সংরক্ষণ, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য সহায়তা করে।

মধ্য ও পূর্ব আফ্রিকা

কেন্দ্রীয় আফ্রিকার জন্য জাতিসংঘ আঞ্চলিক কার্যালয় লিভার ভিল গ্যাবোনে স্থাপন করে, যেটা সদস্য দেশগুলোকে দুই বছরের জন্য সহায়তা প্রদান করবে এবং উপ-আঞ্চলিক সংগঠনগুলো শান্তি প্রতিষ্ঠার সংঘাত দূর করবে।

মহাসচিবের পক্ষে UNOCA-এর মূল মিশন উপ-আঞ্চলিক দেশগুলোর স্বাভাবিক কার্যক্রম, বিশেষ করে সংঘাত নিরসন এবং শান্তি প্রতিষ্ঠা, কেন্দ্রীয় আফ্রিকা দেশগুলোর অর্থনৈতিক কমিউনিটিকে সাহায্য ও সহযোগিতা করা এবং অন্যান্য আঞ্চলিক সংস্থাগুলোর সাথে কাজ করে শান্তি ও স্থায়িত্ব প্রতিষ্ঠাসহ আঞ্চলিক শান্তি ও নিরাপত্তা বিষয়ে মহাসচিবকে পরামর্শ দেয়ার ক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং জাতিসংঘ ও অন্য অংশীদারদের উপ-আঞ্চলিক

ধারাবাহিকতা বজায় রেখে সমন্বিতভাবে কাজ করার জন্য যোগসূত্র স্থাপন করা। আবু মুসা, মহাসচিবের UNOCA প্রধান বিশেষ দূত, যিনি কার্যালয়ের কার্যক্রমের জন্য ছয়টি অগ্রাধিকার হিসেবে চিহ্নিত করেন–

- ECCAS-সহ অন্যান্য আঞ্চলিক সংস্থাগুলোকে কারিগরি সহায়তা প্রদান, যাতে পূর্ব সতর্কীকরণ ব্যবস্থা উন্নয়নে সক্ষম হয়;
- উপ-অঞ্চলগুলোতে সংঘাত দূর এবং শান্তি প্রক্রিয়া ব্যবস্থাপনা সফল করার জন্য প্রচেষ্টা ত্বরান্বিত করা;
- লর্ডস রেজিস্ট্রেন্স আর্মির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য জাতিসংঘ এবং আঞ্চলিক শক্তির সমন্বয় সাধন;
- বেকার সমস্যা দূর করা যা ঐ অঞ্চলের উপ-অঞ্চলগুলোর বড় সমস্যা হিসেবে বিবেচিত।
- গায়না উপসাগর এবং অভ্যন্তরীণ সীমান্ত সমস্যা দূর করার জন্য আঞ্চলিক পদক্ষেপ গ্রহণ।
- ইউনাইটেড নেশন স্ট্যান্ডিং অ্যাডভাইসরি কমিটিকে (United Nation Standing Advisory Committee) সহায়তা প্রদান, যেটা মে, ২০১১ থেকে UNSAC-এর সাচিবিক দায়িত্ব পালন করে।

২০১২ সালের আগস্টে নিরাপত্তা পরিষদ UNOCA-এর স্থায়িত্ব ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ পর্যন্ত বর্ধিত করে।

সুদান এবং দক্ষিণ সুদান

১৯৫৬ সালের ১ জানুয়ারি স্বাধীন হওয়ার সময় থেকেই সুদান গৃহযুদ্ধকবলিত ছিল। ১৯৮৩ সালে সরকার এবং Sudan People's Liberation Movement/Agency/Army-SPLM/A নামক একটি দক্ষিণের বিদ্রোহী গ্রুপের সাথে যুদ্ধ শুরু হয় সম্পদ, ক্ষমতা, রাষ্ট্রীয় ধর্মের কার্যক্রম ও স্বচিন্তার কারণ থেকে। ২০০৫ সালের জানুয়ারিতে শান্তিচুক্তির আগ পর্যন্ত প্রায় ২০ লাখ মানুষ মারা যায়, ৪০ লাখ মানুষ গৃহহীন হয় এবং ছয় লাখ মানুষ দেশ ছেড়ে চলে যায়। কম্প্রিহেনসিভ পিস এগ্রিমেন্টের (CPA) অধীনে সাড়ে ছয় বছর শাসন করবে এবং চুক্তির কারণে সুদানের মানুষের একত্রীকরণের জন্য ভোট প্রদান করবে অথবা গণভোটের মাধ্যমে আলাদা হওয়ার বিষয়াদি আন্তর্জাতিকভাবে পর্যবেক্ষণ করা হবে।

২০০৫ সালের মার্চ মাসে নিরাপত্তা পরিষদ সুদানে CPA-এর প্রয়োগে সহায়তা, মানবাধিকার রক্ষা, সমন্বয় এবং মাইন রাখা বন্ধ করার জন্য UNMIS নামে একটি শাখা খোলে। এটার আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজের মধ্যে ছিল জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, সাধারণ জনগণকে রক্ষা এবং অরক্ষিত জনগণকে সুরক্ষিত করা। ২০০৫ সালের সেপ্টেম্বরে জাতীয় ঐক্যের সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

২০১১ সালে দক্ষিণ সুদান সুদানের অংশ হয়ে থাকবে, নাকি স্বাধীন হবে এর ওপর গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। দক্ষিণ সুদানের গণভোট কমিশন এই গণভোট আয়োজন করে, যেখানে জাতিসংঘ কারিগরি এবং আইনগত সহায়তা প্রদান করে। এই ভোটে স্বাধীনতার পক্ষে ৯৮.৮ শতাংশ ভোট পড়ে। ৯ জুলাই CPA-এর ক্ষমতা শেষ হওয়ার পর রিপাবলিক অব সাউথ সুদানকে একটি স্বাধীন দেশ হিসেবে ঘোষণা করা হয়। সালভা কীর দক্ষিণ সুদানের রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ নেন এবং দেশের অস্থায়ী সংবিধানে স্বাক্ষর করেন।

UNMIS শাসন শেষ হয় ৯ জুলাই এবং সেদিনই নিরাপত্তা পরিষদ UNMISS (United Nations Mission in the Republic of South Sudan) প্রতিষ্ঠা করে। নতুন মিশনের উদ্দেশ্য ছিল সরকারের শাসনব্যবস্থায় দক্ষতা বৃদ্ধি ও গণতন্ত্রায়নের মাধ্যমে দক্ষিণ সুদানের উন্নয়ন সাধনে সাহায্য করা এবং পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর সাথে সরকারের সম্পর্কোন্নয়ন করা। UNMISS গঠিত হয়ছিল ৭০০০ মিলিটারি এবং ৯০০ সিভিল পুলিশের মাধ্যমে।

১৪ জুলাই ২০১১ সাধারণ পরিষদ দক্ষিণ সুদানকে জাতিসংঘের ১৯৩তম সদস্য দেশ ঘোষণা করে।

আফ্রিকান ইউনিয়ন উচ্চতর পর্যায়ের বাস্তবায়ন প্যানেলের মাধ্যমে সুদান এবং দক্ষিণ সুদানের মধ্যে বিভিন্ন অমীমাংসিত বিষয়ের নিষ্পত্তি করে। এ প্রচেষ্টা মন্দের দিকে যায় ২০১২ সালের মার্চে এবং ফলাফল দুই দেশের সীমান্তে বাড়তে থাকে সংঘাত। এ সংঘর্ষ আরও বেড়ে যায়, এপ্রিল যখন SPLA তেল সমৃদ্ধ হেজিলিগ (Heglig) দখল করে এবং সুদানের তেল উৎপাদন ৫০ শতাংশ কমে যায়। জাতিসংঘের চাপে দক্ষিণ সুদান ঘোষণা করে ২০ এপ্রিলের মধ্যে নিঃশর্তভাবে SPLA হেজিলিগ হতে সরে যাবে।

জুলাই, ২০১২ সালে নিরাপত্তা পরিষদের UNMISS মেয়াদ ১৫ জুলাই, ২০১৩ পর্যন্ত বৃদ্ধি করে।

আবেয়ি অঞ্চল

২০১০-এর শেষ দিকে আবেয়ি অঞ্চলে দক্ষিণ সুদানে স্ব-অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য গণভোটের জন্য চাপ সৃষ্টি করা হয়। এ চাপে ২০১১ সালে বেশ রক্তক্ষয়ী ঘটনার সৃষ্টি হয় এবং দক্ষিণ উত্তরে সেনাবাহিনী গঠিত হয়। একটি স্বতঃস্ফূর্ত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল অনুর্বর অঞ্চলে যে তারা সুদানের সাথে সংযুক্ত হতে আদৌ চায় কিনা; কিন্তু তা পিছিয়ে যায় গণতন্ত্র

শিশুরা উত্তর দারফুরের আবু সাউক শিবিরে, যেটা কিনা বাস্তুহারা মানুষের জন্য নির্মিত, নতুন দশটা শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ উপলক্ষে উল্লাস করছে। শ্রেণীকক্ষগুলো UNAMID নির্মাণ করেছে। (১৮ এপ্রিল, ২০১২, জাতিসংঘ ছবি/অ্যালবার্ট গঞ্জালেজ ফারান)

এবং বাসস্থান ইস্যুতে। সাময়িক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয় ২০০৫-এর বিশদ শান্তি চুক্তি, ২০১১-এর Kedugly চুক্তি এবং অনুর্বর চুক্তির মাধ্যমে। যদিও চুক্তিগুলোর যথাযথ প্রয়োগ করা সম্ভব হয়নি এবং বিভিন্ন দলের মধ্যে দ্বন্দ্ব লেগে যায়। নিরাপত্তা ব্যবস্থার আরও অবনতি ঘটে ১৯ মে, যখন সুদান সেনাবাহিনী দাকুরা নামক স্থানে UNMIS-এর সৈন্য বহনকারী কনভয়ের ওপর আক্রমণ করে। ২১ মে SAF আবেয়ি শহরকে দখল করে নিলে সুদান সরকার আবেয়ি প্রশাসনকে বাতিল করে দেয়। যখন সহিংসতা বৃদ্ধি পেল তখন প্রায় ১,০০,০০০-এর বেশি সাধারণ মানুষ দক্ষিণের দিকে চলে যায়।

জুনে সুদান সরকার এবং SPLM একটি সাময়িক ব্যবস্থার চুক্তি স্বাক্ষর করে, যাতে আবেয়ি অঞ্চলে প্রশাসন ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়। চুক্তিতে বলা হয়, প্রধান নির্বাহী হবে SPLM-এর পক্ষ থেকে এবং ডেপুটি নির্বাহী হবে সুদান সরকারের পক্ষ থেকে। যৌথ মিলিটারি পর্যবেক্ষক দ্বারা আবেয়ি (অনুর্বর) অঞ্চল থেকে সব সৈন্য ও অস্ত্র সরিয়ে নেয়া এবং একটি আবেয়ি পুলিশ সার্ভিস প্রতিষ্ঠা করা হবে। জাতিসংঘ একটি অন্তর্বর্তী নিরাপত্তা ফোর্স তাদের সব ব্যবস্থা কার্যক্রম ও এলাকায় শান্তি প্রতিষ্ঠা করার জন্য বলে।

২৭ জুন ২০১১-তে নিরাপত্তা পরিষদ UNISFA কে প্রাথমিকভাবে ৬ মাস মেয়াদে প্রতিষ্ঠিত করে, যার উদ্দেশ্য ছিল অনুর্বর অঞ্চলে SAF ও SPLA-এর পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন করা, অনুর্বরের সংশ্লিষ্ট সংস্থায় অংশগ্রহণ, খনির কাজে ও কারিগরি সহায়তা ও উপদেশ দেয়া, মানবাধিকার সাহায্য দেয়া এবং পুলিশের সাথে তেল স্থাপনাগুলোতে নিরাপত্তা সহায়তা দেয়া। ২৯ জুনে উভয়পক্ষ সীমান্ত সুরক্ষার একটি চুক্তি সই করে। সম্মিলিত রাজনৈতিক ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা, যা একটি অসামরিক সীমান্ত এলাকা প্রতিষ্ঠিত করবে এবং তারা UNSIFA -এর কাছে আন্তর্জাতিক সীমান্ত পর্যবেক্ষণ মিশন দাবি করে। ডিসেম্বরে নিরাপত্তা পরিষদ UNSIFA কার্যক্রম বর্ধিত করে, তাতে সীমান্ত শিথিলতাকরণ যুক্ত করে।

মে ২০১২-তে পরিষদ সুদানের বাকি সামরিক সদস্য ও পুলিশ পুনরায় আবেয়ি অঞ্চলে নিয়োগ দেয়ার দাবি জানায়, যাতে সুদান ও দক্ষিণ সুদান প্রশাসনিক ও পুলিশ সার্ভিসের গঠন আবেয়ি এলাকাতে নিশ্চিত করতে পারে। পরিষদ নভেম্বরে UNSIFA তাদের কার্যক্রম মে ২০১৩ পর্যন্ত বর্ধিত করে।

দারফুর

জাতিগত, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উত্তেজনা দীর্ঘদিন ধরেই জ্বালানি সংঘাতের সাথে জড়িত হয়ে আছে সুদানের এই দারফুর অঞ্চলে। সরকার, SLMA, জাস্টিস অ্যান্ড ইকুয়ালিটি মুভমেন্ট (JEM), জানজাউইদ ও অন্যান্য মিলিটারির মধ্যে তিন বছর ধরে চলা প্রচণ্ড সংঘাতে অটের নেতৃত্বে মে ২০০৬-এ দারফুর শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ চুক্তিতে ক্ষমতা ও সম্পদ ভাগাভাগি, সাময়িক অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা ও নিরাপত্তা বিধান এর কথা উল্লেখ করা হয়। নিরাপত্তা পরিষদ ২০০৬-এর আগস্টে দারফুরে UNMIS-এর কার্যক্রম আরও বিস্তৃতি করার নির্দেশ দেয়। সুদান সরকার জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনীকে এ অঞ্চলে না দেয়ার জন্য আপত্তি জানায়।

অতঃপর মাসব্যাপী আলোচনার পর ২০০৭ সালের জুলাই মাসে কাউন্সিল দারফুরের পরিস্থিতি বুদ্ধিমত্তার সাথে মোকাবেলা করার জন্য 'আফ্রিকান ইউনিয়ন-ইউনাইটেড

নেশনস হাইব্রিড অপারেশন (ইউএনএএমআইডি)' প্রতিষ্ঠা করে, যা ছিল প্রথম মিশ্র শক্তিবাহিনী জাতিসংঘকে অন্তর্ভুক্ত করে এবং সর্ববৃহৎ ইউএন শান্তিরক্ষা অপারেশন।

২০০৭ সালের এপ্রিলে, আইসিসি একজন সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং একজন যানজাউইদ মিলিশিয়া নেতার বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধ ও মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করে। এ ঘটনায় সুদান সরকারের প্রতিক্রিয়া ছিল, আইসিসির সুদান নাগরিকদের ওপর কোনো আইনগত অধিকার নেই এবং তারা উক্ত দু'জনকে হেগের কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে। ২০০৮ সালে আইসিসি প্রসিকিউটর সুদানের রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধ ও মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে অভিযোগ দায়ের এবং ২০০৯ সালের মার্চে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করে। প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে ২০১০ সালের মার্চে আরও তিন দফা গণহত্যার অভিযোগ দাখিল হয়।

পরিপূর্ণভাবে ইউএনএএমআইডি বাস্তবায়ন সম্ভব হতে দেয়নি সরকারের সহযোগিতার অভাব, সৈন্য ও পুলিশ বাহিনীর প্রস্তুতিতে বিলম্ব, সেই সাথে এলাকাজুড়ে থাকা অজস্র প্রতিকূলতা। তবে অপ্রতুল সম্পদ থাকা সত্ত্বেও মিশন বেসামরিক নাগরিকদের সুরক্ষা দান করেছে, আর্তমানবতার সেবামূলক সহযোগিতা করেছে এবং এমন একটি পরিবেশ তৈরিতে সহায়তা করেছে, যেখানে শান্তি স্থাপন করা সম্ভব। সরকারি বাহিনী ও বিদ্রোহীদের মাঝে বিরোধ, সেই সাথে উপজাতীয় গোত্রগুলোর মাঝে কোন্দল সেখানকার মানবিক পরিস্থিতিকে শোচনীয় করে তুলেছিল। পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটায় জাতিসংঘ শান্তিরক্ষীদের ওপর আক্রমণ এবং জাতিসংঘ কর্মী ও সহায়তাকারীদের অপহরণ ও নির্যাতন।

২০১১ সালের ১৪ জুলাই সুদান সরকার ও লিবারেশন অ্যান্ড জাস্টিস মুভমেন্ট 'দোহা ডকুমেন্ট ফর পিস ইন দারফুর' শান্তি চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করে। চুক্তিপত্রটি বর্তমান দারফুরে শান্তি স্থাপন প্রক্রিয়ার কাঠামো হিসেবে বিদ্যমান। এতে সংঘাত এর মূল কারণ এবং পরিণতি, ক্ষমতা ও সম্পদের সুষম বণ্টন, মানবাধিকার, ন্যায়বিচার প্রভৃতি বিষয় অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইউএনএএমআইডি টেকনিক্যাল এক্সপার্টদের নিয়োগ করে এ কাজে এবং তারা চুক্তিপত্রটির প্রচারণা চালায় ও অস্বাক্ষরকারী সংগঠনগুলোকে উদ্বুদ্ধ করে চুক্তিনামায় স্বাক্ষরের জন্য। এটি চুক্তিনামায় উল্লিখিত যুদ্ধবিরতি কমিশন গঠন করে ও কাতারের দোহায় বাস্তবায়ন কমিশনে অংশগ্রহণ করে। মহাসচিব দোহা শান্তিচুক্তিকে পশ্চিম সুদানের ৮ বছরের সংঘাত সমাপ্তির ভিত্তি হিসেবে স্বাগত জানান।

২০১২ সালের জুলাইতে নিরাপত্তা পরিষদ ইউএনএএমআইডির ম্যান্ডেট ৩১ জুলাই, ২০১৩ পর্যন্ত বাড়ায় এবং দারফুরের সর্বাধিক নিরাপত্তা ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চল এ মিশনের শক্তি বৃদ্ধি করে।

সোমালিয়া

সোমালিয়ার মানুষ ১৯৯১ সাল থেকেই অরাজকতার সঙ্গে বসবাস করছে, যখন সরকার উৎখাত করা হয়েছিল এবং গৃহযুদ্ধের সূচনা হয়েছিল। যা দেশটিকে ভাগ করে দিয়েছিল প্রতিদ্বন্দ্বী সেনাপ্রধানদের মাঝে। অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ ও বিস্ফোরক জাতিসংঘের নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করে সোমালিয়ার সীমান্তজুড়ে অবাধে বিস্তার লাভ করছিল। যখন মহাসচিব আয়োজিত আলোচনা রাজধানীতে যুদ্ধবিরতির সূচনা করে, মোগাদিসু, এপ্রিল ১৯৯২ সালে সোমালিয়ায় জাতিসংঘের অপারেশন ইউনাইটেড নেশনস অপারেশন ইন

সোমালিয়া (UNOSOM-I) প্রতিষ্ঠা করে। এর উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধবিরতি পর্যবেক্ষণ করা, জাতিসংঘের কর্মীদের সরঞ্জাম সরবরাহ, সুরক্ষা ও নিরাপত্তা প্রদান। তবে অবনতিশীল নিরাপত্তা পরিস্থিতির জন্য কাউন্সিল ডিসেম্বরে সদস্য প্রদেশগুলোকে মানবিক সহায়তা নিশ্চিত করার জন্য একটি ইউনিফাইড টাস্কফোর্স (UNITAF) গঠন করার অনুমতি দেয়।

UNITAF-এর প্রচেষ্টা তথা শান্তি পুনরুদ্ধার সম্পন্ন করার জন্য ১৯৯৩ সালের মার্চে কাউন্সিল UNOSOM-I গঠন করে। কিন্তু অভ্যন্তরীণ গোত্র সংঘাতের জন্য মার্চ ১৯৯৫ সালে অপারেশনটি প্রত্যাহার করা হয়।

সোমালি নেতাদের, নাগরিক সংগঠন এবং সংশ্লিষ্ট রাজ্যের ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমে শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করার জন্য ১৯৯৫ সালের এপ্রিলে মহাসচিব ইউনাইটেড নেশনস পলিটিক্যাল অফিস ফর সোমালিয়া (UNPOS) স্থাপন করে। UNPOS ২০০০ সালে জিবুতি (Djibouti) উদ্যোগে সমর্থন জানায়, যা পরবর্তীকালে অন্তর্বর্তীকালীন জাতীয় সরকার গঠন করে। কিন্তু তার কর্তৃত্ব পরবর্তীকালে দক্ষিণের সোমালি নেতাদের এবং উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে 'সোমালিল্যান্ড ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের Puntland' আঞ্চলিক প্রশাসকদের দ্বারা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়।

২০০২ সালে ইন্টার গভর্মেন্টাল অথরিটি অন ডেভেলপমেন্ট (IGAD) দ্বারা আয়োজিত জাতীয় সম্প্রীতি সম্মেলন, যুদ্ধবিগ্রহ বন্ধ এবং জাতীয় কাঠামো ও নীতির ওপর চুক্তিনামা আনয়ন করে। সোমালি নেতৃবৃন্দ দুটি ট্রানজিশনাল ফেডারেল ইনস্টিটিউশনস (TFIs) : ট্রানজিশনাল ফেডারেল গভর্মেন্ট (TFG) আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সোমালিয়ার ফেডারেল সরকার এবং একটি ট্রানজিশনাল ফেডারেল পার্লামেন্ট (TFP) প্রতিষ্ঠার ওপর একমত হয়। টিএফপি ও টিএফজি ২০০৪ সালে গৃহীত অন্তর্বর্তীকালীন ফেডারেল সনদে বর্ণিত হয়। সনদের পাঁচ বছর মেয়াদি রূপরেখায় একটি নতুন সংবিধান প্রতিষ্ঠা এবং জাতীয় নির্বাচনের পর একটি প্রতিনিধিত্বশীল সরকার গঠন অন্তর্ভুক্ত ছিল। Puntland সভাপতি আবদুল্লাহি ইউসুফ আহমেদ, অক্টোবর ২০০৪ সালে টিএফজি সভাপতি নির্বাচিত হন এবং সমস্ত ২৫ প্রার্থী তাঁকে সমর্থন এবং তাদের বেসামরিক অস্ত্রধারীদের উঠিয়ে নেয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। যদিও ২০০৬ সালের মে মাসের মাঝে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও কাউন্টার টেররিজমের মিত্রবাহিনী ও শরিয়া আদালতের মিলিশিয়া মোগাদিসুতে পরস্পরের সাথে যুদ্ধরত ছিল। জুলাই মাসে ইসলামি আদালতের প্রতি অনুগত বাহিনীর বাইদোয়া শহরের দিকে অগ্রসর হয়। ডিসেম্বর ২০০৬ সালে নিরাপত্তা পরিষদ IGAD আট সদস্য রাষ্ট্রদের সোমালিয়ায় একটি সুরক্ষা এবং প্রশিক্ষণ মিশনের প্রতিষ্ঠা করতে অনুমোদন দেয়। মোগাদিসু থেকে ফেব্রুয়ারি ২০০৭ সালে শত সহস্র মানুষ যুদ্ধ এড়াতে পালানোর পর পরিষদ সোমালিয়াতে একটি ব্যাপক অপারেশন আফ্রিকান ইউনিয়ন মিশন (AMISOM) প্রতিষ্ঠা করতে অনুমোদন দেয় IGAD মিশনের প্রতিস্থাপক হিসেবে। এএমআইএসওএমকে একটি নিরাপদ পরিবেশ তৈরি করতে প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা গ্রহণ করার ক্ষমতা দেয়া হয়। কাউন্সিল এএমআইএসওএমের মেয়াদ কয়েকবার বর্ধিত করে এবং একটি সম্ভাব্য জাতিসংঘের অপারেশনের জন্য পূর্বপরিকল্পনা অনুমোদন করা হয়। উক্ত অপারেশনের প্রয়োজনীয় রসদ ও কারিগরি সহায়তা প্রদানের জন্য ২০০৯ সালে, এএমআইএসওএমের জন্য ইউনাইটেড নেশনস সাপোর্ট অফিস ফর এএমআইএসওএম (UNSOA) নাইরোবিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। ২০১০ সালের শেষ দিক পর্যন্ত মহাসচিব বান

কি-মুন দাবি করেছিলেন যে, নিরাপত্তা পরিস্থিতি বিবেচনায় নতুন করে জাতিসংঘ মিশন নিয়োগ দেয়া সম্ভব ছিল না। তাই জাতিসংঘের দৃষ্টি নিবদ্ধ করে টিএফজি বিরোধী গ্রুপের মাঝে সংলাপে উৎসাহিত করা এবং এএমআইএসওমকে শক্তিশালী করার কাজে।

২০০৬ সালে ইসলামি কোর্টস ইউনিয়ন (ICU) দক্ষিণের অনেকাংশের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে। টিএফজি, ইথিওপিয়া সেনাদল এবং জিবিডি শান্তিরক্ষী সহকারীর সঙ্গে একত্রে আইসিইউ-কে উচ্ছেদ করতে সক্ষম হয়; কিন্তু নিজেরাই সংঘাতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। তখন প্রাথমিক কিছু গ্রুপ আল শাবাবসহ একত্র হয়ে বিভেদের সুযোগ নিয়ে টিএফজি বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং ইথিওপিয়ার সামরিক উপস্থিতি বিরোধিতা করে। ২০০৮-এর মাঝে-আল শাবাব বাইদোআসহ গুরুত্বপূর্ণ এলাকার নিয়ন্ত্রণ লাভ করে। ডিসেম্বর, ২০০৮ সালে, প্রেসিডেন্ট আবদুল্লাহি ইউসুফ আহমদ পদত্যাগ করেন। ২০০৯ সালের জানুয়ারি মাসে, শরীফ আহমাদ সভাপতি এবং ওমর আবদি রাশিদ আলি শেরমার্ক প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নির্বাচিত হন। একই মাসে, ইথিওপিয়ান সেনাদল প্রত্যাহার করে নেয়া হয়। টিএফজি, জিবিডি বাহিনী দ্বারা সমর্থিত, ২০০৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে দক্ষিণের নিয়ন্ত্রণকে পুনরায় দখল করতে পাল্টা আক্রমণ শুরু করে। এ সংঘাত ২০১০ সাল পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।

এ সংঘর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে সোমালিয়া উপকূলে জলদস্যুদের অভ্যুত্থান ঘটে। নিরাপত্তা পরিষদ সমস্যা সমাধানে পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং ২০০৮ সালে একটি বহুজাতিক জোট এডেন উপসাগরে একটি মেরিটাইম সিকিউরিটি পেট্রোল অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করে। ২০১১ সালে জলদস্যুতার হার মাত্রাতিরিক্ত হারে বেড়ে গেলেও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ও বেসরকারি খাতের যৌথ প্রচেষ্টায় ২০১২ সালে তা অনেকখানি হ্রাস পায়।

২০১১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আল-শাবাবের বিরুদ্ধে একটি বড় মাপের সামরিক আক্রমণ পরিচালনা করা হয় এবং টিএফজি বাহিনী এএমআইএসওএম দ্বারা সমর্থিত মোগাদিসুতে উল্লেখযোগ্য অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ লাভ করে। আগস্টের মাঝে টিএফজি-এর রাজধানীর ৯০ শতাংশের ওপর নিয়ন্ত্রণ ছিল। ফলস্বরূপ, ২০১২ সালের ২৪ জানুয়ারিতে সোমালিয়ার মহাসচিবের বিশেষ প্রতিনিধি তার অফিস মোগাদিসুতে স্থাপন করতে সক্ষম হন।

সোমালিয়ার আট বছরের রাজনৈতিক রূপান্তর একটি নতুন ফেডারেল পার্লামেন্ট প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সফলভাবে ২০১২ সালের ২৪ জানুয়ারিতে শেষ হয়। সংসদের রাষ্ট্রপতি নির্বাচন হন হাসান শেখ মাহমুদ। রূপান্তরের সমাপ্তিকে সাফল্যমণ্ডিত করতে UNPOS পর্যাপ্ত রাজনৈতিক সমর্থন জোগায়। যদিও হস্তক্ষেপ ও হুমকির অভিযোগ পাওয়া যায়, তবুও এটি সোমালিয়ার ২০ বছরের সংকটের মাঝে দেশের ভেতরে অনুষ্ঠিত সর্বাধিক স্বচ্ছ ও প্রতিনিধিপূর্ণ নির্বাচন। তবে মোগাদিসুর নিরাপত্তা পরিস্থিতির উন্নতি হলেও তা অনিশ্চয়তাপূর্ণ ছিল। সোমালি জাতীয় নিরাপত্তা বাহিনী এবং এএমআইএসওএম শহরের দখল বজায় রাখলেও নিয়মিতভাবে আল শাবাবের আক্রমণের শিকার হতো।

২০১৩ সালের মার্চে নিরাপত্তা পরিষদের আফ্রিকান ইউনিয়নের সদস্যদের অনুমোদন প্রদান করে ২০১৪ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এএমআইএসওম পরিচালনা করার জন্য। মিশনটির উদ্দেশ্য ছিল রাজ্য সরকারকে সহযোগিতা করা, আল শাবাব ও অন্যান্য সশস্ত্র বাহিনীর হাত থেকে রক্ষা, উদ্ধারকৃত শহরগুলোতে পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা, রাজ্য সরকার ও শান্তি ও পুনর্মিলনি প্রক্রিয়ায় জড়িত কর্মীদের সুরক্ষা এবং মানবিক সহায়তা বিধানে

নিরাপত্তা নিয়ম তৈরি ইত্যাদি। পরিষদ মহাসচিবের মূল্যায়নের সাথে একমত হয় যে, UNPOS তার উদ্দেশ্য পূরণ করেছে এবং একে বিলুপ্ত করা উচিত। এর পরিবর্তে নতুন বিস্তৃত রাজনৈতিক অভিযান যত দ্রুত সম্ভব শুরু করা উচিত। এরই ধারাবাহিকতায় কাউন্সিল মে মাসে প্রাথমিকভাবে ১২ মাসের জন্য ইউনাইটেড নেশনস এসিসট্যান্স মিশন ইন সোমালিয়া (UNSOM) প্রতিষ্ঠিত করে। ২ জুন UNPOS-এর মেয়াদ শেষ হওয়ার পর ৩ জুন থেকে এটি কার্যকর করা হয়। এ মিশনের লক্ষ্যমাত্রা ছিল রাজ্য সরকারকে শান্তি ও সম্প্রীতি রক্ষায় উপযুক্ত সহায়তা প্রদান এবং রাজ্য সরকার ও এএমআইএসওএমকে কৌশলগত পরামর্শ প্রদান। এছাড়াও UNSOM-এর লক্ষ্য ছিল রাজ্য সরকারকে আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থাগুলোর মাঝে সমন্বয় সাধন এবং মানবাধিকার, নারীশক্তির মূল্যায়ন, শিশু সুরক্ষা, যৌন ও লিঙ্গভেদে সহিংসতা, ন্যায়বিচার ইত্যাদি খাতে রাজ্য সরকারের শক্তি বৃদ্ধিতে সহায়তা করা। এটি পর্যবেক্ষণ, সাহায্য, তদন্ত ও প্রতিরোধ করা, সেই সাথে মানবাধিকার ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের লঙ্ঘন হলে বা নারী ও শিশু নির্যাতনের বেলায় কাউন্সিলের কাছে অভিযোগ জানানো।

আমেরিকা অঞ্চল

জাতিসংঘ মধ্য আমেরিকায় শান্তি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আগ্রহী ছিল; কোস্টারিকা, এল সালভাদর, গুয়াতেমালা, হন্ডুরাস, নিকারাগুয়া এমনি কয়েকটি দেশের নাম যেখানে জাতিসংঘের সবচেয়ে কঠিন ও সাফল্যপূর্ণ অভিযানের অন্তর্গত কিছু মিশন অনুষ্ঠিত হয়। হাইতিতে শান্তি ও নিরাপত্তা মিশন এখনো চলমান।

হাইতি

২০০৪ সালের জানুয়ারিতে হাইতি যখন দ্বিশততমবার্ষিকী উদযাপন করছিল, তীব্র রাজনৈতিক অচলাবস্থা দেশের স্থিতিকে হুমকির মুখে ফেলে দিয়েছিল। সরকার ও সরকারবিরোধী মিলিশিয়াদের মাঝে সংঘাত ক্রমবর্ধমান সহিংসতার সৃষ্টি করছিল, যা ২০০১ সাল থেকে দ্বিতীয় মেয়াদে দায়িত্ব পালন করা প্রেসিডেন্ট জাঁ-বার্ট্রান্ড আরিস্তিদকে পদত্যাগ ও দেশত্যাগে বাধ্য করে। নতুন প্রেসিডেন্ট বনিফেস আলেক্সান্দ্রের অনুরোধের প্রেক্ষিতে নিরাপত্তা পরিষদ অতি দ্রুত একটি বহুজাতিক অস্থায়ী বাহিনী নিয়োগ করে। জাতিসংঘ পরিচালিত সেনাদলও জলদি মোতায়েন করা হয়। ২০০৪ সালের এপ্রিলে কাউন্সিল ইউনাইটেড নেশনস স্ট্যাবিলাইজেশন মিশন ইন হাইতি (মিনুস্তাহ) প্রতিষ্ঠা করে নিরাপদ স্থিতিশীল পরিবেশে শান্তিপূর্ণ ও নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করতে। পরবর্তী বছরগুলোতে মিনুস্তাহর লক্ষ্য, অপারেশন এর প্রক্রিয়া এবং অনুমোদিত শক্তি, হাইতির উদ্ভূত রাজনৈতিক, নিরাপত্তা ও আর্থসামাজিক পরিস্থিতির ওপর ভিত্তি করে অনেকবার কাউন্সিল দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে।

২০১০ সালের জানুয়ারিতে ভয়াবহ দুর্ঘটনার পর কাউন্সিল মিনুস্তাহর শক্তিমাত্রা আরও বৃদ্ধি করে, যাতে উদ্ধার কাজ ও স্থিতিশীল অবস্থা নির্মাণে সহায়তা করতে পারে। মিনুস্তাহ, জাতিসংঘের কান্ট্রি টিম ও মানবিক সাহায্য সমন্বয় অফিসের সাথে একত্রে মানবিক এবং

পুনরুদ্ধার তৎপরতা চালায়। জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক অংশীদারদের সাথে সমন্বয় করে হাইতিতে নির্বাচন সংক্রান্ত সাহায্য পাঠানোর ব্যবস্থা করে।

২০১১ সালের ২০ মার্চে অনুষ্ঠিত হাইতির রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে মাইকেল মারটেল্লি বিজয় লাভ করে। প্রথমবারের মতো হাইতির ইতিহাসে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নির্বাচিত প্রেসিডেন্টের হাতে অপরপক্ষ শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করে। ২০১২ সালের অক্টোবরে নিরাপত্তা পরিষদ হাইতির গত ২ বছরের তুলনামূলক উন্নত পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে মিনুস্তাহের মেয়াদ ২০১৩ সালের ১৫ অক্টোবর পর্যন্ত বর্ধিত করে এবং এর শক্তিবল কমিয়ে ৬২৭০ জন কর্মী ও ২৬০১ জন পুলিশ করা হয়।

এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগর

মধ্যপ্রাচ্য

শুরু থেকেই জাতিসংঘ মধ্যপ্রাচ্যের ব্যাপারে সচেতন ছিল। জাতিসংঘ একটি শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তির জন্য নীতি প্রণয়ন ও বিভিন্ন শান্তিরক্ষা অভিযান প্রেরণ করেছে। অন্তর্নিহিত রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানে একটি যথাযথ বিস্তারিত ও দীর্ঘস্থায়ী সমাধানের জন্যও সাহায্য করে যাচ্ছে।

সমস্যার সূত্রপাত ফিলিস্তিনকে নিয়ে, এটি ১৯২২ সালে যুক্তরাজ্য প্রশাসনের অধীনে আনা সাবেক অটোমান অঞ্চলের মধ্যে অন্যতম। এসব অঞ্চল ধীরে ধীরে স্বাধীনতা পেলেও ফিলিস্তিন ছিল ব্যতিক্রম। সেখানে প্রশাসনিক সাহায্য-সহায়তা ও পরামর্শের সাথে ব্রিটিশ ম্যান্ডেটে ১৯১৭ সালে বেলফোর ঘোষণা অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ফিলিস্তিনকে ইহুদি মানুষের জন্য একটি জাতীয় আবাসস্থল হিসেবে প্রতিষ্ঠার জন্য সমর্থন প্রকাশ করে। ১৯২২ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত সময়ে বৃহদায়তন ইহুদি অভিবাসীরা (প্রধানত পূর্ব ইউরোপ থেকে) জায়গা নেয়। আরবদের স্বাধীনতার দাবি ও অভিবাসন প্রতিরোধের জন্য আন্দোলন ১৯৩৭ সালে বিদ্রোহের জন্ম দেয়, উভয়পক্ষের সহিংসতা অব্যাহত থাকে।

১৯৪৭ সালে যুক্তরাজ্য ফিলিস্তিনের সমস্যা জাতিসংঘের কাছে হস্তান্তর করে। ফিলিস্তিনের জনসংখ্যা প্রায় দুই বিলিয়ন–দুই তৃতীয়াংশ আরব আর এক তৃতীয়াংশ ইহুদি।

২৯ নভেম্বর, ১৯৪৭ সালে ৫৭ সদস্যের সাধারণ পরিষদে ফিলিস্তিনের জন্য জাতিসংঘের বিশেষ কমিটি পরিকল্পনা করে ১৯৪৮ সালে ব্রিটিশ ম্যান্ডেট শেষ হওয়ার পর ফিলিস্তিন বিভাজনের জন্য। প্রস্তাবনা অনুযায়ী একটি আরব এবং একটি ইহুদি রাষ্ট্র তৈরি জেরুজালেমকে সাথে নিয়ে, যা পরিচালিত হবে জাতিসংঘের পক্ষ থেকে ট্রাস্টিশিপ দ্বারা। পরিকল্পনাটি ফিলিস্তিনি আরবদের, আরব রাষ্ট্রগুলো এবং অন্যান্য রাজ্যের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। ফিলিস্তিন সমস্যা দ্রুত বিস্তৃত হয়ে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো ও ইসরায়েলের মাঝে বিবাদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ১৪ মে ১৯৪৮ সালে যুক্তরাজ্য ম্যান্ডেট প্রত্যাহার করে নেয় আর ইসরায়েলের ইহুদি সংগঠন ইসরায়েলকে দখল করে নেয়। পরদিন ফিলিস্তিনি আরবরা আরব রাষ্ট্রগুলোর সহায়তায় নতুন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে লড়াই ঘোষণা করে। সামরিক মোকাবেলা নিরাপত্তা পরিষদের হস্তক্ষেপে স্থগিত করা হয় এবং একটি মধ্যস্থ তত্ত্বাবধানকারী নিযুক্ত করা হয় সাধারণ পরিষদ দ্বারা। এটি ছিল সামরিক পর্যবেক্ষকদের একটি দল, যারা জাতিসংঘের যুদ্ধবিরতি ঘোষণা পর্যবেক্ষণ সংগঠন (ইউএনটিএসও) হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।

সংঘাতের ফলে, প্রায় ৭৫০০০০ ফিলিস্তিনি আরবরা তাদের ঘরবাড়ি ও জীবিকা হারিয়ে উদ্বাস্তুতে পরিণত হয়। তাদের সাহায্য করার জন্য, সাধারণ পরিষদের ১৯৪৯ সালে, নিকট প্রাচ্যে জাতিসংঘের ত্রাণ ও পূর্ত সংস্থা ফিলিস্তিন শরণার্থীদের জন্য (ইউএনআরডব্লিউএ) প্রতিষ্ঠা করা হয়, যা আজও সাহায্য ও আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা রক্ষায় অবদান রাখছে। বর্তমানে ৫ মিলিয়ন ফিলিস্তিনি উদ্বাস্তু জর্ডান, লেবানন, গাজা, সিরিয়া, আরব প্রজাতন্ত্র, জেরুজালেম ইত্যাদি দেশে ইউএনআরডব্লিউএ সেবা থেকে উপকৃত হয়েছে।

অমীমাংসিত দ্বন্দ্বের কারণে আরব-ইসরায়েলি যুদ্ধের ১৯৫৬, ১৯৬৭ ও ১৯৭৩ সালে আবার সূত্রপাত হয়। প্রতিটি সময় নেতৃস্থানীয় সদস্য রাষ্ট্ররা জাতিসংঘের মধ্যস্থতা এবং শান্তিরক্ষা মিশনের জন্য সাহায্য চেয়েছে। ১৯৫৬ সালের দ্বন্দ্ব প্রথম পূর্ণাঙ্গ শান্তিরক্ষা বাহিনী-জাতিসংঘের জরুরি বাহিনীর (ইউএনইএফাই) স্থাপন দেখছে, যা শান্তি ও স্থিতিশীলতার জন্য প্রভূত অবদান রেখেছে।

১৯৬৭ সালের যুদ্ধ হয় ইসরায়েল ও আরব রাষ্ট্র জর্ডান ও সিরিয়ার মধ্যে। এ সময় ইসরায়েল সিনাই উপদ্বীপ, গাজা, জর্দান নদীর পশ্চিম তীর, পূর্ব জেরুজালেম ও সিরিয়ার গোলান হাইটের কিছু অংশসহ দখল করে। নিরাপত্তা পরিষদ যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানায় এবং পরবর্তীকালে ইজিপ্ট ইসরায়েল যুদ্ধবিরতি পর্যবেক্ষক নিয়োগ করে।

কাউন্সিল রেজুলেশনের ২৪২(১৯৬৭) মাধ্যমে একটি যথাযথ এবং দীর্ঘস্থায়ী শান্তির জন্য নীতি নির্ধারণ করে, যার নাম : 'সাম্প্রতিক সংঘাতে অধিকৃত অঞ্চল হতে সশস্ত্র বাহিনী প্রত্যাহার' এবং 'সব দাবি বা যুদ্ধরত অবস্থার অবসান এবং সব রাজ্যের সার্বভৌমত্ব, অখণ্ডতা এবং নিজ এলাকায় প্রতিটি রাষ্ট্রের রাজনৈতিক স্বাধীনতা, নিরাপদ ও স্বীকৃত সীমার মধ্যে শান্তিতে বাস করতে তাদের অধিকারের প্রতি সম্মান'। রেজুলেশন এছাড়াও অভিবাসন সমস্যার একটি পরিপূর্ণ নিষ্পত্তির প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে।

ইসরায়েল, মিসর ও সিরিয়ার মধ্যে ১৯৭৩ সালের যুদ্ধের পর নিরাপত্তা পরিষদে ৩৩৮ (১৯৭৩) বিধি প্রণয়ন করে, যা রেজল্যুশনের ২৪২ (১৯৬৭) নীতি পুনর্ব্যক্ত করে এবং একটি দীর্ঘস্থায়ী শান্তিচুক্তির জন্য আলোচনার কথা বলে। এই বিধিমালাই মধ্যপ্রাচ্যে সামগ্রিক নিষ্পত্তির ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।

১৯৭৩ সালের যুদ্ধবিরতি পর্যবেক্ষণ করতে নিরাপত্তা পরিষদ দুটি শান্তিরক্ষী বাহিনী প্রতিষ্ঠা করে। এদের মাঝে অন্যতম জাতিসংঘ বিবাদ পর্যবেক্ষণ বাহিনী (ইউএনডিওএফ), তারা ইসরায়েল ও সিরিয়ার মাঝে বিবাদ পর্যবেক্ষণ করে। অন্যটি ছিল ইউএনইএফটু, যা ইসরায়েল ও ইজিপ্টের মাঝে যুদ্ধবিরতি পর্যবেক্ষণ করে।

পরবর্তী বছরে সাধারণ পরিষদ মধ্যপ্রাচ্যে একটি আন্তর্জাতিক শান্তি সম্মেলনের আহ্বান করে জাতিসংঘের পৃষ্ঠপোষকতায়। ১৯৭৪ সালে পরিষদ থেকে প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশনকে (পিএলও) পর্যবেক্ষক হিসেবে অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানানো হয়। পরের বছর এটি ফিলিস্তিনি নাগরিকদের অবিচ্ছেদ্য অধিকার আদায়ে কমিটি গঠন করে এবং সাধারণ পরিষদের অন্তর্ভুক্ত সংগঠন হিসেবে ফিলিস্তিন নাগরিকদের অধিকার সমর্থন এবং একটি শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তির জন্য কাজ করতে থাকে।

যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় মিসর ও ইসরায়েলের মধ্যে সমঝোতা, ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি (১৯৭৮) এবং মিসর-ইজিপ্ট শান্তি চুক্তির (১৯৭৯) জন্ম দেয়। ফলে ইসরায়েল সিনাইয়ের দখল ইজিপ্টকে ফিরিয়ে দেয়। ইসরায়েল ও জর্দান ১৯৯৪ সালে শান্তি চুক্তি করে।

মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রক্রিয়া (১৯৮৭-২০১৩) : ১৯৮৭ সালে ফিলিস্তিন স্বাধীনতা ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য ফিলিস্তিন বিদ্রোহ শুরু করে পশ্চিম তীর ও গাজা দখলকৃত এলাকাগুলোতে। ১৯৮৮ সালে প্যালেস্টাইন ন্যাশনাল কাউন্সিল ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের ঘোষণা দেয়, যা সাধারণ পরিষদের স্বীকৃতি লাভ করে। এছাড়াও পরিষদ জাতিসংঘ ব্যবস্থার মধ্যে পিএলও নামের পরিবর্তে ফিলিস্তিন উপাধি ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নেয়। সেপ্টেম্বর ১৯৯৩ সালে মাদ্রিদ এবং পরবর্তী নরওয়ের মধ্যস্থতায়, ইসরায়েল ও পিএলও নিম্নলিখিত আলোচনায় পারস্পরিক স্বীকৃতি প্রতিষ্ঠা এবং অন্তর্বর্তী স্বয়ং সরকার ব্যবস্থার ওপর নীতিমালা স্বাক্ষর করেন। জাতিসংঘ গাজার সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির জন্য কর্মীবাহিনী নিয়োগ করে। এছাড়াও জাতিসংঘের সহায়তার জন্য বিশেষ সমন্বয়কারী নিযুক্ত করা হয় মধ্যপ্রাচ্যে এ শান্তি প্রক্রিয়ায় সহায়তার জন্য, যার মেয়াদকাল ছিল ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত।

গাজা উপত্যকা ও জেরিকোতে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষকে (পিএ) ইসরায়েলের ক্ষমতা হস্তান্তর শুরু হয়। এক বছর পরে ইসরায়েল এবং পিএলও পশ্চিমতীরের ফিলিস্তিনি স্বশাসন একটি চুক্তিনামায় স্বাক্ষর করে, যার অন্তর্ভুক্ত ছিল ইসরায়েলি সেনা প্রত্যাহার এবং একজন নির্বাচিত ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষের কাছে ফিলিস্তিনের ক্ষমতা হস্তান্তর। ১৯৯৬ সালে ইয়াসির আরাফাত পিএলও-এর সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৯৯ সালে একটি অন্তর্বর্তী চুক্তির ফলে পশ্চিমতীর থেকে ইসরায়েলি সৈন্য প্রত্যাহার করা হয়, চুক্তির অন্তর্গত ছিল বন্দি বিনিময় চুক্তি, পশ্চিমতীর ও গাজার মাঝে নিরাপদ যাতায়াত এবং স্থায়ী অবস্থা ইস্যুতে আলোচনা। উচ্চপর্যায়ের শান্তি আলোচনা যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় শুরু হলেও ২০০০ সালের দিকে মাঝপথেই শেষ হয়ে যায়। অমীমাংসিত ইস্যুর মাঝে ছিল জেরুজালেমের অবস্থা, ফিলিস্তিনি অভিবাসী প্রশ্ন, নিরাপত্তা সীমান্ত প্রভৃতি বিষয়।

রোডম্যাপ : ২০০০ সালের সেপ্টেম্বরে সহিংসতার হার নতুন করে বেড়ে যায়। নিরাপত্তা পরিষদের বারবার সহিংসতার অবসানের জন্য এবং দুটি পৃথক রাষ্ট্র ইসরায়েল ও ফিলিস্তিন হিসেবে নিরাপদ ও স্বীকৃত সীমান্তের অধীনে পাশাপাশি বসবাসের আহ্বান জানায়। ক্রমবর্ধমান আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টা চালানো হয় দু'পক্ষকে মধ্যস্থতা টেবিলে নিয়ে আসার জন্য। এ প্রক্রিয়া পরিচালিত হয় মধ্যপ্রাচ্য কোয়ার্টেট (ইউরোপীয় ইউনিয়ন, রাশিয়ান ফেডারেশন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং জাতিসংঘ নিয়ে গঠিত) এর মাধ্যমে।

এ সংঘাতকে ২০০৫ সালের মাঝে শেষ করার জন্য কোয়ার্টেট ২০০৩ সালের এপ্রিল মাসে একটি রোডম্যাপ উপস্থাপন করে, যা বাস্তবায়নে দু'পক্ষের সমান্তরাল সহযোগিতা প্রয়োজন। এটি মধ্যপ্রাচ্য সংঘাতের সমাধানে একটি বিস্তৃত নিষ্পত্তির ব্যাপারেও পরিকল্পনা করে। নিরাপত্তা পরিষদ রোডম্যাপকে ১৫১৫ (২০০৩) বিধিমালার আওতায় অন্তর্ভুক্ত করে এবং দুই পক্ষ তা মেনে নেয়। তা সত্ত্বেও ২০০৩ সালের শেষ দিকে ব্যাপক সহিংসতা পরিলক্ষিত হয়। জাতিসংঘ বিশেষ সমন্বয়ক বলেন, কোনো পক্ষই অপরদিকের কথা বিবেচনা করেনি।

২০০৫ সালে ইসরায়েল এককভাবে গাজা অঞ্চল থেকে তাদের সেনাবাহিনী ও স্থাপনা সরিয়ে নেয়। ২০০৫-এ প্যালেস্টাইন প্রেসিডেন্ট ইয়াসির আরাফাত মারা যাওয়ার পর জাতিসংঘের কারিগরি ও আইনগত সহায়তায় অনুষ্ঠিত নির্বাচনে মাহমুদ আব্বাস নির্বাচিত হয়ে তার স্থান পূরণ করেন। ফেব্রুয়ারিতে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী এরিয়েল শ্যারন ও

প্রেসিডেন্ট আব্বাস মিসরে মিলিত হন এবং সংঘাত বন্ধের পদক্ষেপ ঘোষণা করেন। তারা জুনে আবারও মিলিত হন এবং সেপ্টেম্বরের মধ্যেই ইসরায়েলের উচ্ছেদ সম্পন্ন হয়। এই গুরুত্বপূর্ণ দিক ছাড়াও আরও দুটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে যায় জানুয়ারি ২০০৬-এ, যা রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ব্যাপক পরিবর্তন আনে। প্রধানমন্ত্রী শ্যারন স্ট্রোক করে কোমাতে চলে যান এবং অন্যদিকে বিধানসভা নির্বাচনে প্যালেস্টানীয়রা হামাস বিদ্রোহীদের নির্বাচিত করে।

কোয়ার্ট্রেট ও অন্যদের আপত্তি থাকা সত্ত্বেও হামাস সরকারিভাবে ইসরায়েলের অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিল না। তখনকার ইসরায়েলি সরকার এহুদ ওলমার্টের নেতৃত্বে এমন এক অবস্থান নেয়, যার ফলে পুরো প্যালেস্টাইন এলাকা সন্ত্রাসী অঞ্চল বলে পরিগণিত হয় এবং তাদের ট্যাক্স আয় বাজেয়াপ্ত করা হয়। সহিংসতা বাড়তে থাকে, সেই সাথে বাড়তে থাকে গাজা থেকে ইসরায়েলে রকেট লঞ্চার নিক্ষেপণ ও ইসরায়েলের বড় ধরনের বিপরীত হামলা। আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থাগুলো হামাস নেতৃত্বাধীন সরকারকে অর্থ সহায়তা দিতে দিতে ফতুর হয়ে যেতে থাকে, যতদিন না হামাস সংঘাত কমায় ও ইসরায়েলের অস্তিত্ব স্বীকার করে নেয় চুক্তির মাধমে। উত্তরাঞ্চল ও গাজায় মানবিক পরিস্থিতি ক্রমশ খারাপ হতে থাকে।

মে ২০০৭-এ হামাস ও প্যালেস্টাইন নিরাপত্তা বাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষে ৬৮ জন মারা যায় ও প্রায় ২০০-এর ওপর আহত হয়। যার ফলে সরকারের নিয়ন্ত্রণে আসে উত্তরাঞ্চল ও হামাসের নিয়ন্ত্রণে চলে যায় গাজা। গাজা থেকে ইসরায়েলের দক্ষিণাঞ্চলে রকেট হামলা বৃদ্ধি পায়, যা সামরিক বাহিনী ও তাদের স্থাপনাতে ইসরায়িলি হামলা বয়ে আনে। ২০০৮-এর শেষ দিকে গাজা থেকে ইসরায়েলে রকেট বৃষ্টির ফলে ইসরায়েল ঐ এলাকাতে সামরিক স্থল অভিযানের মাত্রা চরমে পৌছায়। এই অভিযানের ফলে গাজার মানবিক অবস্থা দিন দিন খারাপের দিকে যেতে থাকে, অবকাঠামোর চরম ক্ষতিসাধন করে যেখানে জাতিসংঘের অবকাঠামো ছিল, শত শত বেসামরিক মানুষ মারা যায় যাদের অধিকাংশই ফিলিস্তিনের অধিবাসী।

২০০৯ এর শুরুর দিকে নিরাপত্তা সংসদ ১৮৬০(২০০৯) নীতিমালা গ্রহণ করে এবং তৎক্ষণাৎ অস্ত্রবিরতি ও গাজা থেকে ইসরায়েলি সৈন্য সরিয়ে নেয়ার আহবান জানায় যাতে সহিংসতা ও সন্ত্রাসী কার্যক্রম কমে যায়। জাতিসংঘের মহাসচিব মধ্যপ্রাচ্য সফরে যান যাতে অস্ত্রবিরতি রক্ষিত হয়। কূটনৈতিক তৎপরতা বৃদ্ধির ফলে ইসরায়েল এককভাবেই অস্ত্রবিরতি ঘোষণা করে এবং এর পর হামাসও অস্ত্রবিরতি ঘোষণা দেয়।

ঐ একই মাসে জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিশন সংঘর্ষের কারণে একটি অনুসন্ধানের অনুমতি দেয় এবং কিছুদিন পরেই দক্ষিণ আফ্রিকার সাবেক বিচারপতি রিচার্ড গোল্ডস্টোনকের অনুসন্ধান দলের প্রধান হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। সেপ্টেম্বরে প্রকাশিত এক রিপোর্টে সুপারিশ করা হয় যেন নিরাপত্তা কাউন্সিল ইসরায়েল ও গাজার অথরিটির অনুসন্ধান অথরিটি মনিটর করে। রিপোর্টের শেষে বলা হয় যে উভয়পক্ষই মানবতাবিরোধী অপরাধ করছে। দুই মাস পরে জাতিসংঘের সাধারণ সভায় ৬৪/১০ ধারায় গোল্ডস্টোনের রিপোর্ট অনুমোদন করা হয় এবং মহাসচিবকে অনুরোধ করা হয় 'যেন এই রেজুলেশনটা বাস্তবায়ন করা হয় যাতে করে নিরাপত্তা পরিষদের দ্বারা আরও কর্মসূচি বিবেচনা করা যায়।' পুনরায় জুন ২০০৯-এ মধ্যপ্রাচ্য কোয়ার্ট্রেট ইসরায়েল ও প্যালেস্টাইনকে তাদের রোডম্যাপ মেনে চলার আহ্বান জানায়।

মার্চ ২০১০ কোয়ার্ট্রেট ইসরায়েলকে সব বসতি স্থাপন কার্যক্রম বন্ধ করতে বলে এবং তাদের একক কোনো সিদ্ধান্ত আন্তর্জাতিক মর্যাদা পাবে না বলে জানিয়ে দেয়। কিন্তু এটা বোঝা যাচ্ছিল যে, জেরুজালেম ইস্যু অমীমাংসিতই থেকে যাচ্ছে। সেপ্টেম্বরে যুক্তরাষ্ট্র ইসরায়েল-প্যালেস্টাইন সরাসরি এক বছর মেয়াদি আলোচনা চালু করে। প্যালেস্টাইনের উত্তরাঞ্চলে ইসরায়েলি বসতি স্থাপন স্থগিতের মাধমে আলোচনা শেষ হয়। বসতি স্থাপন বন্ধ না রাখলে প্যালেস্টাইন আলোচনায় বসতে অসম্মতি জানায়।

সেপ্টেম্বর ২০১১-তে কোনো রকম দেরি বা পূর্বশর্ত ছাড়াই ইসরায়েল-প্যালেস্টাইন দ্বিপক্ষীয় আলোচনা শুরুর আহ্বান জানায় কোয়ার্ট্রেট এবং আলোচনা শুরুর জন্য প্রয়োজনীয় বিশ্বাস স্থাপনে কাজ করার কথা জানায়। অক্টোবর ২০১১-তে ইউনেস্কো সাধারণ অধিবেশনে প্যালেস্টাইনকে তাদের সদস্য করে নেয়। এপ্রিল ২০১২-তে আমানে ইসরায়েল-প্যালেস্টাইনের মধ্যে গবেষণামূলক আলোচনা হয় কোয়ার্ট্রেটে আয়োজনে। যাহোক, নভেম্বরে আবার নতুন করে ইসরায়েল-গাজা সহিংসতা শুরু হয়। এটি শেষ হয় মিসরের সহায়তায় অস্ত্রবিরতির মাধ্যমে।

২৯ নভেম্বর ২০১২-তে ১৯৩ সদস্যের জাতিসংঘ সাধারণ সভায় ১৩৮টি দেশের ভোটের মাধম্যে প্যালেস্টাইন পর্যবেক্ষক এর মর্যাদা পায়, যদিও সদস্য হতে পারেনি। ৯টি রাষ্ট্র বিরোধিতা করে আর ৪১টি রাষ্ট্র অনুপস্থিত থাকে সেই সভায়। সব অর্জিত অধিকার, সুবিধা আর এর সব আইন প্যালেস্টাইনবাসীর জন্য প্রযোজ্য হবে।

লেবানন

এপ্রিল ১৯৭৫ থেকে অক্টোবর ১৯৯০ পর্যন্ত স্থায়ী গৃহযুদ্ধে ছিন্নভিন্ন হয় লেবানন। ইতিমধ্যে দক্ষিণ লেবানন সংঘর্ষ-ভূমিতে পরিণত হয়, যার একদিকে ছিল প্যালেস্টাইনি দলগুলোর অন্যদিকে ইসরায়েলি বাহিনী ও তাদের স্থানীয় সহায়ক শক্তি। প্যালেস্টাইনি কমান্ডো বাহিনী কর্তৃক ইসরায়েলে পরিচালিত হামলার পর ইসরায়েল ১৯৭৮ সালে দক্ষিণ লেবানন আক্রমণ করে। কমান্ডো বাহিনী প্রত্যাহারের জন্যে নিরাপত্তা পরিষদ ইসরায়েলের প্রতি আহ্বান জানায়। ইসরায়েলি বাহিনীর প্রত্যাহার নিশ্চিত করা, আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা ফিরিয়ে আনা এবং সংশ্লিষ্ট এলাকায় লেবানন সরকারের কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠায় সাহায্য করার উদ্দেশ্যে পরিষদ লেবাননে অন্তর্বর্তীকালীন জাতিসংঘ বাহিনী (UNIFIL) গঠন করে।

এই বাহিনীর উদ্দেশ্য ছিল লেবানন থেকে ইসরায়েলকে উচ্ছেদ, আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা এবং ঐ অঞ্চলে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় লেবানন সরকারকে সহায়তা প্রদান। দক্ষিণ লেবানন ও ইসরায়েল-লেবানন সীমান্ত বরাবর প্রচণ্ড গুলিবিনিময়ের পর ১৯৮২ সালে ইসরায়েলি বাহিনী পুরোশক্তি নিয়ে লেবানন ভূখণ্ডের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে। ইসরায়েলি বাহিনী বৈরুত পর্যন্ত পৌঁছে শহর অবরোধ করে। ১৯৮৫ সালে সে দেশের অধিকাংশ অঞ্চল থেকে ইসরায়েল সৈন্য প্রত্যাহার করে তবে দক্ষিণ লেবাননের একটি ভূখণ্ড তাদের নিয়ন্ত্রণে রাখে। সেখানে ইসরায়েলি বাহিনী ও তাদের লেবাননি সহযোগিতা এবং অঞ্চলটির অংশবিশেষে ইউনিফিলও মোতায়েন ছিল। বিভিন্ন লেবাননি দল এবং ইসরায়েলি ও সহযোগীদের মধ্যে শত্রুতা অব্যাহত থাকে। নিরাপত্তা পরিষদের ১৯৭৮ সালের প্রস্তাব অনুযায়ী ২০০০ সালের মে মাসে ইসরায়েল তার সৈন্য প্রত্যাহার করে;

জাতিসংঘ এতে সহযোগিতা করে জুন মাসে মহাসচিব প্রত্যাহারের সম্পূর্ণতা যাচাই করে। ইসরায়েলি প্রত্যাহারের পর নিরাপত্তা পরিষদ সেখানে লেবাননের কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠায় মহাসচিবের কর্ম পরিকল্পনা অনুমোদন করে। পরিষদ সব পক্ষকে আহ্বান জানায় তারা যেন পরিস্থিতি স্থিতিশীল করতে জাতিসংঘকে সহযোগিতা করে।

২০০৫ সালে লেবাননি প্রধানমন্ত্রী রফিক হারিরি গুপ্তচর কর্তৃক হত্যার শিকার হলে উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়। নভেম্বরে এই হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের বিচারের জন্য নিরাপত্তা কাউন্সিলের সহযোগিতায় একটি বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়। এপ্রিলে লেবানন থেকে সিরিয়ান সামরিক সৈন্য সম্পদ ও ইন্টিলিজেন্স অপারেশনের উচ্ছেদ নিশ্চিত করে জাতিসংঘ। মে ও জুনের মধ্যে জাতিসংঘের সহায়তায় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ২০০৫ ও ২০০৬ সালজুড়ে থেমে থেমে চলা ইসরায়েল ও হিজবুল্লাহর লড়াইয়ের সাথে চলতে থাকে ব্লু লাইনের লঙ্ঘনও। ২০০৬ সালে দুই ইসরায়েলি সৈন্য হিজবুল্লাহ কর্তৃক আটক হলে ইসরায়েলি বিমান লেবাননে হামলা চালায় আর হিজবুল্লাহ তাদের হামলা আরও বেগবান করে। ৩৪ দিনব্যাপী চলা এই সংঘর্ষ শেষ হয় আগস্টে। নিরাপত্তা কাউন্সিল রেজুলেশন ১৭০১ (২০০৬)-এর মাধ্যমে দু'পক্ষের শত্রুতার আশু অবসানের আহ্বান জানায়।

১৯৭৮ সাল থেকে UNFIL-এর ২৯৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। UNIFIL অবিস্ফোরিত দশ লাখ বোমার টুকরা নিয়ে সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছিল।

২০০৯ সালে ইসরায়েল লেবাননে ব্যবহৃত ক্লাস্টার বোমার তথ্য UNFIL-এর কাছে হস্তান্তর করে, যার জন্য জাতিসংঘ বারবার অনুরোধ করে আসছিল।

২০০৯ ও ২০১২ সালের মাঝে ব্লু-লাইন লঙ্ঘনের ব্যাপারে লেবানন ও ইসরায়েল দুই দেশই অভিযোগ করে। নভেম্বর ২০১২ সালে মহাসচিব রিপোর্ট করে দলগুলো রেজুলেশন ১৭০১ (২০০৬) মানার ব্যাপারে মুখে স্বীকৃতি জানালেও তা বাস্তবায়নে কোনো বাস্তব অগ্রগতি অব্যাহত ছিল না।

লেবানন ও সিরিয়ার মধ্যে ২০০৮ সালের অক্টোবরে কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। মহাসচিব জুন ২০০৯ সালের সংসদীয় নির্বাচনের শান্তিপূর্ণ পরিবেশকে স্বাগত জানান। সাদ হারিরির জোট, হিজবুল্লাহর নেতৃত্বাধীন জোটের বিরুদ্ধে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। নবনির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী হারিরি ২০১১ সালের নভেম্বরে একটি জাতীয় ঐক্যের সরকার গঠন করেন। ঐক্য সরকার ক্ষমতায় আসার পর ধসে পড়ে যখন হিজবুল্লাহ এবং তার মিত্ররা ২০০৫ সালে সংঘটিত রফিক হারিরি এবং অন্যদের হত্যার তদন্তের ওপর বাকবিতণ্ডার প্রেক্ষিতে মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেন। ৫ দিন পর লেবাননের স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল প্রসিকিউটর রফিক হারিরির মৃত্যুর ওপর গোপন তদন্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করেন। ২০১২ ও ২০১৩ সালের শুরুর দিকে ট্রাইব্যুনালের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে তা বাতিল করে দেয়। প্রি-ট্রায়াল বিচারক ২০১৪ সালের ১৩ জানুয়ারিকে নতুন ট্রায়ালের দিন হিসেবে ঘোষণা করেন।

সিরিয়া

২০১১ সালের মার্চে সিরিয়ায় সরকারি দল ও সশস্ত্র বিদ্রোহী দলের মাঝে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। ফলে প্রায় ১,০০,০০০ মানুষ মারা যায় আর দুই মিলিয়ন দেশত্যাগে বাধ্য হয়। ২০১২ সালের এপ্রিলে জাতিসংঘ ইউএন সুপারভিশন মিশন ইন সিরিয়া প্রতিষ্ঠা করে সব দলের

মাঝে সশস্ত্র সহিংসতা বন্ধে এবং সংঘাত নিরসনে কফি আনান প্রবর্তিত ছয় দফা পরিকল্পনার বাস্তবায়ন। ক্রমবর্ধমান সশস্ত্র সহিংসতা ২০১২ সালের জুনে মিশনকে তার কার্যক্রম স্থগিত করতে বাধ্য করে। এক মাস পর নিরাপত্তা পরিষদ ৩০ দিনের জন্য বাড়ানোর নির্দেশ দেয় এবং যদি ভারী অস্ত্র প্রয়োগ বন্ধ করে দুই পক্ষ তবেই মিশনের মেয়াদ পুনরায় বাড়ানো হবে বলে জানানো হয়। যেহেতু শর্তাবলি অমান্য করা হয় তাই এর মিশনের মেয়াদ ২০১২ সালের ১৯ আগস্ট শেষ হয়।

২০১২ সালের ২৫ মার্চ নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত আনানের বিশেষ দূতের প্রস্তাবিত ছয় দফা পরিকল্পনা সিরীয় সরকার বাস্তবায়নে অঙ্গীকার করে। এই পরিকল্পনায় সিরীয় সরকারকে জরুরিভাবে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ, সব দলকে জনসাধারণের রক্ষা ও দেশের স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য অস্ত্রের সংঘাত বন্ধ করা অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই লক্ষ্যে সিরীয় সরকারকে সেনাবাহিনীর চলাচল বন্ধ এবং জনসাধারণের কেন্দ্রে ভারী অস্ত্র ব্যবহার বন্ধ এবং ঐ সব কেন্দ্র হতে সেনাবাহিনীকে ফিরিয়ে আনার প্রয়োজন হয়।

সংকট উত্তরণে সিরিয়া সরকারের যেসব পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন ছিল তার অন্তর্গত ছিল সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, মানবিক সহায়তা, শান্তিপূর্ণভাবে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, বন্দিদের মুক্তি প্রভৃতি।

আগস্ট ২০১২ সালে জয়েন্ট স্পেশাল এনভয় কফি আনান বলেন যে, তিনি মেয়াদ শেষ হওয়ার পর আবার দায়িত্ব নিতে চান না। একই মাসে মহাসচিব বান কি-মুন আরব লীগের মহাসচিব নাবিল আল আরাবির সাথে সিরিয়ার জন্য তাদের যৌথ প্রতিনিধি হিসেবে ও যুদ্ধরত পক্ষের বিবাদ মেটাতে প্রচেষ্টার অংশ হিসাবে লাখদার ব্রাহিমিকে নিয়োগের ঘোষণা দেন।

আফগানিস্তান

সেপ্টেম্বর, ১৯৯৫ সালে তালেবান জোট আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলে গৃহযুদ্ধ শুরু করে। প্রেসিডেন্ট বুরহানুদ্দিন রাব্বানি পালিয়ে দেশের উত্তরাংশে 'নর্দান এলায়েন্সে' যোগদান করেন। ১৯৯৮ সালের আগস্টে নাইরোবি, কেনিয়া দারুস-সালাম, তানজানিয়ায় আমেরিকান দূতাবাসে সন্ত্রাসীদের বোমা হামলায় নিরাপত্তা পরিষদ উদ্বেগের পুনরাবৃত্তি করে। এটি তালেবানকে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসীদের আশ্রয়স্থল প্রদান এবং তাদের প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণ বন্ধ করার দাবি জানায়। তালেবান সারা দিতে অস্বীকৃতি জানায়।

১৯৯৯ সালের অক্টোবরে কাউন্সিল তালেবান সরকারের কাছে ওসামা বিন লাদেনকে হস্তান্তর করার নির্দেশ দেয়। ওসামাকে মার্কিন দূতাবাসে বোমা হামলার দায়ে অভিযুক্ত করা ছিল।

২০১১ সালের সেপ্টেম্বরে বিন লাদেনের সংগঠন আল কায়েদা চারটি বাণিজ্যিক বিমান ছিনতাই করে যুক্তরাষ্ট্র থেকে। যার দুটি নিউইয়র্ক শহরের ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে, একটি পেন্টাগনে এবং চতুর্থটি পেনসিলভানিয়ার একটি মাঠে বিধ্বস্ত হয় যাত্রীরা ছিনতাইয়ে বাধা দিলে প্রায় ৩০০০ মানুষ নিহত হয়। যুক্তরাষ্ট্র সরকার তালেবানকে চরমপত্র দেয় বিন লাদেনকে হস্তান্তর এবং আফগানিস্তানে সন্ত্রাসী অপারেশন বন্ধ করতে অথবা একটি ব্যাপক সামরিক হামলার ঝুঁকি নিতে। তালেবানরা তা প্রত্যাখ্যান করে। অক্টোবরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্য বাহিনী তালেবান সামরিক স্থাপনা ও

আফগানিস্তানে বিন লাদেনের ট্রেনিং ক্যাম্পের বিরুদ্ধে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা পরিচালনা করে। বোমা হামলার দুই সপ্তাহ পর সামরিক বাহিনী মোতায়েন করা হয়। নিরাপত্তা পরিষদ আফগান জনগণের তালেবানি শাসন প্রতিস্থাপনের প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানায়। আর জাতিসংঘ আফগান দলগুলোর মধ্যে সংলাপের প্রচেষ্টা চালায় একটি ব্যাপকভিত্তিক সম্মিলিত সরকার গঠনের জন্য। জার্মানির বনে আফগান রাজনৈতিক নেতাদের মাঝে জাতিসংঘ আয়োজিত সভায় কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এর প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে আফগান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার প্রতিষ্ঠা করা হয়। নিরাপত্তা পরিষদ আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা সহযোগিতা বাহিনী (ইসাফ) প্রতিষ্ঠা করে আফগান কর্তৃপক্ষকে কাবুল ও এর আশপাশের অঞ্চলে নিরাপত্তা বজায় রাখতে সহায়তা করার জন্য। সে মাসের শেষে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত প্রেসিডেন্ট রাব্বানি নতুন অন্তর্বর্তীকালীন আফগান সরকারের প্রধান হামিদ কারজাইয়ের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন এবং প্রথম ইসাফ বাহিনীকে আফগানিস্তানে নিযুক্ত করা হয়।

জানুয়ারি ২০০২-এ আফগানিস্তান পুনর্গঠনে সহায়তা সম্পর্কিত একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনের কাছ থেকে ৪.৫ বিলিয়নের অঙ্গীকার পায়। নিরাপত্তা কমিশন তালেবান শাসন ব্যবস্থার পতনকে আশাজনক পরিবর্তন হিসেবে দেখে এবং এর নিষেধাজ্ঞাগুলো পরিবর্তন করে আল কায়েদা ও এর সমর্থকদের লক্ষ্য করে। মার্চে এই পরিষদ আফগানিস্তানে জাতিসংঘ সহায়তা মিশন (ইউএনএএমএ) প্রতিষ্ঠা করে, যা বন চুক্তি অনুযায়ী জাতিসংঘের ওপর অর্পিত বিষয়গুলো যেমন মানবাধিকার, আইনের শাসন ও লিঙ্গ সমস্যা সম্পর্কিত কর্মকাণ্ড সম্পন্ন করে। এছাড়াও মহাসচিবের বিশেষ প্রতিনিধি দ্বারা পরিচালিত এই ইউএনএএমএ অন্তর্বর্তীকালীন কর্তৃপক্ষ ও এদের উত্তরাধিকারীদের নিয়ে মানবিক কার্যাবলির পাশাপাশি জাতীয় ঐক্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট হয়। ইউএনএএমএর আদেশপত্র এরপর থেকে প্রতি বছর বৃদ্ধি করা হয়।

জুনে আফগানিস্তানের সাবেক রাজা জহির শাহ কর্তৃক নয় দিনব্যাপী জরুরি লয়া জিরগা (একটি ঐতিহ্যবাহী সম্মেলন যেখানে উপজাতীয় গুরুজনরা একসাথে বসে সমস্যা সমাধান করে থাকেন) খোলা হয়, যাতে তিনি হামিদ কারজাইকে মনোনীত করেন দেশের নেতৃত্ব দেয়ার জন্য। ফলে মি. কারজাই আফগানিস্তানের রাষ্ট্রপ্রধান হন আগামী দুই বছরের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার পরিচালনা করতে। জানুয়ারি ২০০৪-এ সাংবিধানিক লয়া জিরগা একটি রচনাকে আফগানিস্তানের সংবিধান হিসেবে গ্রহণ করতে একমত হন। একই বছর অক্টোবরে ৮ মিলিয়নের বেশি আফগান ভোট দিতে যায় এবং হামিদ কারজাইকে দেশের প্রথম নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি হিসেবে মনোনীত করে। ২০০৫-সেপ্টেম্বরের অনেক ভয়াবহ আক্রমণের মুখেও আফগান জনগণ তাদের জাতীয় সমাবেশ ও সাময়িক কাউন্সিল মনোনীত করেন। ডিসেম্বরের শেষ দিকে সংসদ উদ্বোধন করা হয়।

২০০৬-এর জানুয়ারিতে লন্ডনে একটি উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকের মাধ্যমে শুরু হয় আফগানিস্তান কম্প্যাক্ট। একটি পাঁচ বছর মেয়াদি পরিকল্পনা যেন গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে একত্রীকরণ, নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, মাদক নিয়ন্ত্রণ, অর্থনৈতিক প্রগতি, আইনের শাসন, আফগান জনগণের মৌলিক সেবা প্রদান ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ এবং মানবাধিকার সংরক্ষণ সম্ভব হয়। পরবর্তী মাসে নিরাপত্তা পরিষদ এই কম্প্যাক্টকে আফগান জনগণ ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি সুসম্পর্ক গড়ে তোলার গঠনরূপে

উপস্থাপনা করে। ২০০৮-এর জুনে আন্তর্জাতিক সম্মেলন আফগানিস্তানকে সমর্থন দেয়ার জন্য ৬৭টি দেশের এবং ১৭টি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি একত্র করে। কম্প্যাক্টটি বাস্তবায়নের জন্য প্রায় ২০ বিলিয়ন অর্থায়নের প্রস্তাব করা হয়, যার ভেতর অন্তর্ভুক্ত ছিল ২০০৯ ও ২০১০-এর নির্বাচনের প্রস্তুতিতে সাহায্য প্রদান। এই নির্বাচনেই আবার রাষ্ট্রপতি কারজাই পুনর্নির্বাচিত হন।

২০০৮ ও ২০০৯-এ সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ে। ২০০৯-এর অক্টোবরে কাবুলে অবস্থিত একটি ইউএন গেস্ট হাউসে তালেবান আক্রমণে পাঁচ বিদেশি জাতিসংঘ কর্মী ও তিনজন আফগান নিহত হন। ২০১০-এর জানুয়ারিতে মহাসচিব আফগান রাষ্ট্রপতি এবং ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী আফগানিস্তানে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন যৌথ উপস্থাপনা করেন, যেখানে নিরাপত্তার খাতিরে দায়দায়িত্ব আফগান কর্তৃপক্ষের ওপর হস্তান্তর করার বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান করা হয়। জুলাইয়ে জাতিসংঘ ও আফগান সরকার যৌথ উপস্থাপিত একটি সম্মেলনে তারা আফগান অঞ্চলগুলোকে ২০১৪-এর মধ্যে আইএসএএফ নিয়ন্ত্রণ থেকে জাতীয় নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে হস্তান্তরের বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করে। এই সম্মেলন আরো আলোচনা করে বহুবিধ বিষয় যেমন সুশাসন, বিচার বিভাগের সুষ্ঠুতা, মানবাধিকার এবং মাদক চোরাচালানে চলমান সমস্যা নিয়ে।

২০১১-এর ২০ সেপ্টেম্বর প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রাব্বানি আত্মঘাতী বোমা হামলায় নিহত হন। এই হত্যা যা ছিল পূর্ববর্তী আর কিছু গুরুত্বপূর্ণ হত্যাকণ্ডের চূড়ান্ত পর্যায়, অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অবস্থার চরম অবনতি ঘটে।

২০১২ সালের অক্টোবরে ব্রাসেলসে ন্যাটো ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রীদের এক মিটিংয়ে ISAF-কে ২০১৪-পরবর্তী সময়ের প্রশিক্ষণ মিশন শুরু করতে বলা হয়। ১৫ নভেম্বর আফগানিস্তান এবং যুক্তরাষ্ট্র নিরাপত্তা ও কৌশলগত এক দ্বিমুখী চুক্তির জন্য আলোচনায় বসে। ২০১৩ সালের মার্চে সিকিউরিটি কাউন্সিল জাতিসংঘকে আফগানিস্তানের জাতীয় নিরাপত্তা, সরকার, ন্যায়বিচার, আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও জাতীয় মাদক নিয়ন্ত্রণ কৌশলে সহায়তা করতে বলে।

ইরাক

১৯৯০ সালে ইরাকের কুয়েত আগ্রাসনের পর ২০০৩ সাল পর্যন্ত সাদ্দাম হোসেনের শাসনকালের খারাপ পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা এক ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে। ১৯৯০ সালের আগস্টে ইরাকের প্রতি বাণিজ্য ও তেল নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে এবং কুয়েত থেকে ইরাকি সৈন্য প্রত্যাহারের দাবি জানায়। ১৯৯১ সালের ১৬ জানুয়ারি জাতিসংঘের নিয়ন্ত্রণ আথবা নির্দেশনা ছাড়াই কাউন্সিলের অনুমতিতে বহুজাতিক এক সৈন্যদল ইরাক আক্রমণ করে। ফেব্রুয়ারিতে ইরাকের কুয়েত থেকে সৈন্য অপসারণের মাধ্যমে শত্রুতা শেষ হয়।

কাউন্সিল সিদ্ধান্ত নেয় যে, ইরাকের বিধ্বংসী অস্ত্র নির্মূল করা উচিত এবং নিরস্ত্রীকরণের উদ্দেশে বিনা অনুমতিতে পরিদর্শনের ক্ষমতাসম্পন্ন জাতিসংঘের বিশেষ কমিটি (UNSCOM) গঠন করে এবং পারমাণবিক কেন্দ্রগুলোতে একই ধরনের কাজের জন্য আন্তর্জাতিক অটোমেটিক শক্তি সংস্থা IAEA-কে দায়িত্ব দেয়। ইরাকের কুয়েত আক্রমণের ফলে তাদের যে জাতীয় ও বাণিজ্যিক ক্ষতি হয় তা পূরণ করার জন্য কাউন্সিল জাতিসংঘের

ক্ষতিপূরণ কমিশন (United Nations Compensation Commission) গঠন করে ইরাকের তেল বিক্রির টাকা থেকে ক্ষতিপূরণ দেয়ার জন্য।

UNSCOM এবং IAEA ইরাকে নিষিদ্ধ পারমাণবিক, রাসায়নিক ও জীবাণু অস্ত্রের বিশাল সন্ধান পায়। ১৯৯৮ সালে ইরাক কাউন্সিলকে তেল নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতে বলে এবং ঘোষণা দেয়, তাদের কোনো নিষিদ্ধ অস্ত্র নেই। অক্টোবরে ইরাক UNSCOM-এর প্রধান মিশনে সহযোগিতা করতে অস্বীকৃতি জানায়। একই মাসে যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য ইরাকে বিমান হামলা শুরু করে।

১৯৯৯ সালের ডিসেম্বরে UNSCOM-এর বদলে কাউন্সিল ইউনাইটেড নেশনস মনিটরিং ভেরিফিকেশন অ্যান্ড ইন্সপেকশন কমিশন (united nations monitoring verification and inspection commission-UNMOVIC) গঠন করে। ২০০২ সালের নভেম্বরে কাউন্সিল ইরাককে পরিদর্শন ক্ষমতা বাড়িয়ে একটা ফাইনাল প্রস্তাব দেয় তাদের সিদ্ধান্ত মতো কাজ করার। জাতিসংঘ পরিদর্শক ফিরে আসে এবং UNMOVIC-এর চেয়ারম্যান ও IAEA-এর প্রধানের পক্ষ থেকে বারবার মধ্যস্থতা করার জন্য কাউন্সিলকে বলা হচ্ছিল। সমঝোতার মাঝামাঝিতে এবং নিরাপত্তা পরিষদের ফ্রেমওয়ার্কের বাইরে স্পেন, ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্র ১৭ মার্চ ২০০৩-এর মধ্যে সম্পূর্ণভাবে অস্ত্রবিরতি করার সময়সীমা বেঁধে দেয়। সামরিক অভিযান আসন্ন দেখে মহাসচিব ১৭ মার্চে জাতিসংঘের কর্মীদের প্রত্যাহার করে নেন। তিন দিন পরে ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে অভিযান শুরু হয়। সাদ্দাম হুসাইনের পতনের মধ্য দিয়ে মে মাসে নিরাপত্তা পরিষদ রেজুলেশন-১৪৮৩ (২০০৩) গ্রহণ করে, যাতে বলা হয়, ইরাকি জনগণ নিজেরাই তাদের রাজনৈতিক ভাগ্য নির্ধারণ করবে। এটা যৌথবাহিনীকে সমস্ত প্রশাসনিক ক্ষমতা, দায়িত্ব দেয় যতক্ষণ না আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত কোনো সরকার শপথ না নেয়।

এটা আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞাগুলোও তুলে ফেলে এবং জাতিসংঘের ইরাক অপারেশন পুনরায় চালু করার একটি আইনগত ভিত্তি তৈরি করে।

২০০৩-এর আগস্টে নিরাপত্তা পরিষদ আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত স্বাধীন ও সার্বভৌম ইরাকি সরকার গঠনের উদ্দেশ্যে ইউনাইটেড নেশন্স অ্যাসিস্ট্যান্স মিশন ফর ইরাক (UNAMI) প্রতিষ্ঠা করে। ১৯ আগস্টে বাগদাদে অবস্থিত জাতিসংঘ সদর দপ্তর একটি সন্ত্রাসবাদী আক্রমণের শিকার হয়, যাতে ২২ জন নিহত ও আরো ১৫০ জন আহত হয়। নিহতদের মধ্যে ১৫ জন জাতিসংঘ কর্মকর্তা, যাদের সাথে মিশন প্রধান সারজিও ভিয়েরা ডি মেলোও একজন। এরপর মহাসচিব ইরাক থেকে প্রায় সব জাতিসংঘের ব্যক্তিবর্গ প্রত্যাহার করেন, শুধু কিছু ইরাকি কর্মকর্তা ছাড়া যাদেরকে রাখা হয় অত্যাবশ্যকীয় ত্রাণ ও স্বাস্থ্যসেবা সংবলিত কাজ সম্পাদনা করার জন্য। ইরাকের নিরাপত্তা ও স্থিরতা বজায় রাখতে সর্ব প্রকারের কর্মসূচি গ্রহণের উদ্দেশ্যে অক্টোবরে পরিষদ একটি আন্তঃরাষ্ট্রীয় ফোর্স গঠন করে। নভেম্বরে ইরাকি গভর্নিং কাউন্সিল অ্যান্ড দ্য কোয়ালিশন প্রভিশনাল অথরিটি ২০০৪-এর জুনের মধ্যে ইরাকে সার্বভৌমত্ব ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে একমত হয়।

সার্বভৌমত্বে ফিরে পাওয়ার ব্যাপারে জাতিসংঘের সহায়তা চেয়ে ইরাকি গভর্নিং কাউন্সিল ও সি পি এ অনুরোধ সাপেক্ষে মহাসচিব ২০০৫ এর জানুয়ারিতে সুষ্ঠু নির্বাচন করতে কী কী প্রয়োজন তা নিরূপণ করতে একটি নির্বাচন সহায়তা দল পাঠান। তিনি তার ইরাক বিষয়ে বিশেষ উপদেষ্টাকেও এ বিষয়ে ইরাকিদের সহায়তা করতে আদেশ দেন। মে মাসে ইরাকি

গভর্নিং কাউন্সিল আইয়াদ আলাউইকে প্রধানমন্ত্রী মনোনীত করে। পরবর্তী মাসে নিরাপত্তা কমিশন একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের গঠন অনুমোদন করে। ২০০৪-এর ২৮ জুন আনুষ্ঠানিকভাবে সিপিএর থেকে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয়।

গুরুতর নিরাপত্তা সমস্যা থাকা সত্ত্বেও ২০০৪-এর জুনে প্রতিষ্ঠিত ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইলেক্টোরাল কমিশন অফ ইরাক জাতিসংঘের সহায়তায় ১৮ মাসের মধ্যে দুটি জাতীয় নির্বাচন, একটি সাংবিধানিক গণভোট পরিচালনা করে। ২০০৫-এর শুরুতে লাখ লাখ মানুষ একটি সাময়িক জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নেয়, যার দায়িত্ব ছিল একটি সংবিধানের খসড়া প্রণয়ন করা। এই সাময়িক জাতীয় সংসদের প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় মার্চে। এর রাষ্ট্রপতি দেশের সংবিধানের ওপর আস্থা গঠনের উদ্দেশ্যে জাতিসংঘের সহায়তা কামনা করে। অক্টোবরে ইরাকের সংবিধান জাতীয়ভাবে গৃহীত হয়। সংসদীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ডিসেম্বরে। ২০০৬-এর জুনের মধ্যে নতুন সরকার গঠিত হয়। সফল রাজনৈতিক পরিবর্তন সত্ত্বেও দেশের নিরাপত্তা অবস্থার অবনতি হয়। ২০০৭-এর শেষ অবধি প্রায় ২.২ মিলিয়ন ইরাকি দেশ ছেড়ে পালায়। জাতিসংঘ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এই রিফিউজি সমস্যা মোকাবিলায়।

এরপরও কিছু ইতিবাচক উন্নয়নশীল ঘটনাও ঘটেছে। ২০০৭ এর মার্চে ইন্টারন্যাশনাল কম্প্যাক্ট উইদ ইরাক গঠিত হয়, যাতে বিশ্ব নেতারা বিলিয়ন ডলার প্রদান করে ইরাকের পাঁচ বছর মেয়াদি শান্তি ও উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে। জুনে নিরাপত্তা পরিষদ আনুষ্ঠানিকভাবে ইউএনএমওভিআইসি এবং আইএইএ ম্যান্ডেটগুলো বাতিল করে। ২০০৮-এর আগস্টে জাতিসংঘ ও ইরাকি সরকার ইউনাইটেড নেশন্স অ্যাসিস্ট্যান্স স্ট্র্যাটেজি ফর ইরাক ২০০৮-১০ স্বাক্ষর করে, যা সংজ্ঞায়িত করে ইরাকের ভবিষ্যৎ তিন বছরের পুনর্গঠন, উন্নয়ন এবং মানবিক প্রয়োজনগুলোর ক্ষেত্রে জাতিসংঘের সহায়তাকে।

UNAMI-এর সহায়তায় মার্চ ২০১০-এ পার্লামেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সুপ্রিম কোর্ট নির্বাচন-ফলাফল অনুমোদন করে এবং নিরাপত্তা পরিষদ সব রাজনৈতিক নেতাদের প্রতিনিধি সরকার গঠনে অংশগ্রহণের আহ্বান জানায়। সংসদ ডিসেম্বরে নুরী-আল-মালিকির নতুন সরকার সর্বসম্মতক্রমে অনুমোদন করে, যেটাতে কুর্দ, শিয়া এবং সুন্নি অন্তর্ভুক্ত ছিল। মে ২০১০-এ ইরাক ও UNAMI দেশের পাঁচ বছরের জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা জাতিসংঘের উন্নয়ন সহায়তা ছকে ২০১১-১৪ সময়ের জন্য প্রণয়ন করে।

২০০৮ সালে জাতিসংঘ ও ইরাকের মধ্যে স্ট্যাটাস ফোর্স চুক্তির আওতায় ১৮ ডিসেম্বর ২০১১ সালে যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনী ইরাক থেকে সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাহার করে নেয়। জুলাই ২০১২ সালে নিরাপত্তা পরিষদ UNAMI-এর মেয়াদ ৩১ জুলাই ২০১৩ পর্যন্ত বর্ধিত করে।

ভারত-পাকিস্তান

কাশ্মীর প্রশ্নে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যকার বিরোধের ফলে তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক অব্যাহতভাবে খারাপ হয়ে রয়েছে। এই সমস্যার শুরু চল্লিশের দশকে যখন রাজকীয় রাষ্ট্র জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য ১৯৪৭ সালের ভারতীয় স্বাধীনতা আইনে ও বিভক্তি পরিকল্পনাধীনে স্বাধীনতা লাভ করে এবং ভারত বা পাকিস্তান যে কোনো রাষ্ট্রে যোগদানের অধিকার পায়। রাজ্যের হিন্দু মহারাজা অধিকাংশ মুসলমান অধ্যুষিত কাশ্মীরের ভারতভুক্তিতে সম্মতি জানায়।

নিরাপত্তা পরিষদে বিষয়টি প্রথম আলোচিত হয় ১৯৪৮ সালে। যখন ভারত অভিযোগ উত্থাপন করে যে, পাকিস্তানের সমর্থন ও অংশগ্রহণে উপজাতীয় জনগণ ও অন্যরা কাশ্মীর আক্রমণ করেছে এবং সেখানে ব্যাপক যুদ্ধ চলছে। পাকিস্তান এ অভিযোগ অস্বীকার করে ও কাশ্মীরের ভারতভুক্তিকে অবৈধ ঘোষণা করে। ১৯৪৯ সাল থেকে ভারত-পাকিস্তান জাতিসংঘ সামরিক পর্যবেক্ষক গ্রুপ (UNMOGIP) কাশ্মীরে যুদ্ধবিরতি পর্যবেক্ষণ করছে।

২০০৩-এ ইন্ডিয়ার প্রধানমন্ত্রী ও পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি তাদের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কোন্নয়নে ক্রমান্বয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। নভেম্বরে জম্মু ও কাশ্মীরের মধ্যবর্তী লাইন অফ কন্ট্রোলে পাকিস্তান একটি যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবনা করে। ইন্ডিয়া ভালোভাবে এতে সমর্থন জানায়। এই প্রচেষ্টাগুলো পৌঁছায় ২০০৪-এর একটি সম্মেলনে, যা ভারতের প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপায়ি পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি পারভেজ মোশাররফ ও প্রধানমন্ত্রী জাফরুল্লাহ খান জামালির মধ্যে ইসলামাবাদে দ্বিপক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। লাইন অফ কন্ট্রোল বরাবর একটি বাস সার্ভিস চালু হয়, যা ছিল শান্তির একটি শক্তিশালী সংকেত। যদিও দিল্লি-লাহোর 'ফ্রেন্ডশিপ এক্সপ্রেস'-এর ওপর একটি আক্রমণ হয় ২০০৭-এর ফেব্রুয়ারিতে, যেখানে ৬৭ জন নিহত ও ২০ জন আহত হয়। মহাসচিব তার একটি বক্তব্যে এই আক্রমণের তীব্র নিন্দা জানান এবং আক্রমণকারীদের শাস্তির দাবি জানান।

২০০৮-এর নভেম্বরে ভারতের অর্থনৈতিক কেন্দ্র মুম্বাই শহরজুড়ে পাকিস্তানপন্থি লস্কর-ই তাইয়েবা নামে একটি চরমপন্থি সন্ত্রাসী দল একঝাঁক সমন্বিত সন্ত্রাসী হামলা চালায়। এই আক্রমণ যা আন্তর্জাতিক ঘৃণার উদ্ভব তিন দিন ধরে চলে এবং এতে ১৭৩ জন মানুষ নিহত হয় ও ৩০০ জন আহত হয়। ইন্ডিয়ান আর্মড ফোর্সেস দ্বারা পরিচালিত একটি অপারেশনে আক্রমণকারীরা নিহত হয় এবং একজন জীবিত ধরা পড়ে। যদিও পাকিস্তান এই আক্রমণে নিন্দা জ্ঞাপন করে; কিন্তু এর পর এই দুই প্রতিবেশীর সম্পর্ক আবার খারাপ হতে থাকে। নিরাপত্তা কাউন্সিল এবং মহাসচিব এই আক্রমণে তীব্র নিন্দা জানান এবং এর পেছনের হোতাদের বের করে শাস্তি দেয়ার জন্য সব রাষ্ট্রকে ভারতকে সাহায্য করার অনুরোধ করে।

মধ্য এশিয়া

২০০৭-এর ডিসেম্বরে দ্য ইউনাইটেড নেশন্স রিজিয়নাল সেন্টার ফর প্রিজারভেশন ডিপ্লোমেসি ফর সেন্ট্রাল এশিয়ার উদ্বোধন হয়। সন্ত্রাসবাদ, ড্রাগ চোরাচালান, সংঘবদ্ধ অপরাধ, পরিবেশগত অবনতিসহ অনেক সমস্যা সমাধানে এসব অঞ্চলের সরকারগুলোকে সাহায্য করার জন্য প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই সেন্টারটি সরকারগুলোকে অনেক বিষয়ে সাহায্য প্রদান করে থাকে; যেমন– বিরোধ নিরসন, সংলাপ পরিচালনা এবং বিভিন্ন অন্য সাহায্য-সহযোগিতা বিষয়ে আন্তর্জাতিক সাহায্য ত্বরান্বিত করা। সেন্টারটি মধ্য এশিয়ায় অবস্থিত সব জাতিসংঘ অঙ্গ সংগঠনসহ বিভিন্ন আঞ্চলিক সংগঠনের সাথে একত্রে কাজ করে। এর প্রধান লক্ষ্যের মধ্যে ছিল ২০১২-১৪-এর মধ্যে সীমান্ত বিপদগুলো, ড্রাগ চোরাচালান, চরমপন্থা, সন্ত্রাসবাদ, সংঘবদ্ধ অপরাধ প্রভৃতির সমাধানসহ জাতীয় উন্নতি ও আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা অর্জন এবং প্রাকৃতিক সম্পদগুলোর ব্যবস্থাপনা করা।

কম্বোডিয়া

ফরাসি সাম্রাজ্য থেকে ১৯৫০-এ মুক্তির পর ১৯৬০ ও ১৯৭০ সালে কম্বোডিয়া-ভিয়েতনাম যুদ্ধের ফলাফলে কিছুটা সমস্যায় ভোগে। এছাড়াও দেশটি বেসামরিক বিবাদ ও গণহত্যার সর্বগ্রাসী পলপট শাসনাবস্থায় জর্জরিত হয়। ১৯৭৫ থেকে ১৯৭৯-এর 'খেমারুজ' শাসনামলে বহু কুখ্যাত 'কিলিং ফিল্ডস'গুলোতে প্রায় দুই মিলিয়ন মানুষ খুন, অসুখ ও অনাহারে মারা যায়। ১৯৯৩ সালে জাতিসংঘের ট্রান্সটরি অথরিটি ইন কম্বোডিয়ার সহযোগিতায় দেশটিতে তার প্রথম গণতান্ত্রিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। তারপর থেকে জাতিসংঘের সংগঠনগুলো সরকারকে শক্তিশালী করতে ও উন্নয়ন ঘটাতে সহযোগিতা করে আসছে।

২০০৩ সালে সরকারের সাথে জাতিসংঘের একটি চুক্তি হয়, যার মাধ্যমে জাতিসংঘ সরকারকে খেমারুজ শাসনামলে সংঘটিত অপরাধগুলোর বিচার করতে সাহায্য করে। ২০০৫-এ এক্সট্রা অর্ডিনারি চেম্বারস ইন দ্য কোর্টস অফ কম্বোডিয়া (ECCC) প্রতিষ্ঠিত হয়, যা জুলাই ২০০৭ বেশ কিছু ব্যক্তিকে বন্ধ করে মানবাধিকারবিরোধী প্রথম চার্জ গঠন করে। ২০০৮-এ প্রথমবারের মতো ওই শাসনামলে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া কম্বোডিয়ানরা তাদের উকিলদের সহযোগিতায় বিচার কাজে অংশগ্রহণ করে।

২০১০-এর জুলাইয়ে ECCC-এর সম্মুখে বিচারে প্রথম ব্যক্তি কাইং গুয়েক ইয়াভ ১৯৪৯-এর জেনেভা কনভেনশনবিরোধী মানবাধিকার লঙ্ঘনের অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়। ২০১২-এর ফেব্রুয়ারিতে সুপ্রিম কোর্ট চেম্বার তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়, যা ছিল আইন অনুযায়ী সর্বোচ্চ শাস্তি।

গণতান্ত্রিক কাম্পুচিয়া শাসনামলের চারটি সবচেয়ে অগ্রজ ব্যক্তি লেং সারি, লেং থারিথ, খিউ শাম্ফান এবং নুয়ান চি ২০১০ সালে দোষী সাব্যস্ত হয়। ২০১২-এর সেপ্টেম্বরে ট্রাইয়াল চেম্বার লেং থারিথকে বিচারের অযোগ্য ঘোষণা করে এবং সাময়িক আটকাবস্থা থেকে মুক্তি দেয়।

মিয়ানমার

১৯৯০ থেকে যখন মিয়ানমারের সামরিক নেতৃত্ব গণতান্ত্রিক নির্বাচনের ফলাফল অমান্য করে, তখন থেকেই জাতিসংঘ সেখানে পুনরায় গণতান্ত্রিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে এবং মানবাধিকার পরিস্থিতি উন্নয়নে জাতীয় ঐক্যের মাধ্যমে সহায়তা করার প্রস্তাব দেয়। এবং মানবাধিকার অবস্থা উন্নয়নে কাজ করে চলছে। ১৯৯৩ সালে সাধারণ পরিষদ দ্রুত গণতন্ত্রে ফিরে যাওয়ার অনুরোধ করে মহাসচিবকে সরকারকে সাহায্য করতে আহ্বান জানায়। তার অফিসগুলো ব্যবহার করে মহাসচিব বিশেষ প্রতিনিধি দল পাঠিয়ে এ বিষয়ে সব দলের সাথে সংলাপ পরিচালনা করেন।

পরিষদ ১৯৯৩ থেকে প্রতিবছর মহাসচিবের এই ম্যান্ডেটগুলোকে নবায়ন করে আসছে। এই ম্যান্ডেটগুলোর দ্বারা জাতিসংঘ চারটি প্রধান অঞ্চলে অগ্রগতি সাধনের চেষ্টা করে। এগুলো হলো : রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তি, সর্বব্যাপী রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড, সীমান্ত অঞ্চলগুলোতে সংঘাতের অবসান এবং মানবিক সাহায্য প্রদানের নিমিত্তে আরো সুবিধাজনক পরিবেশ সৃষ্টি করা।

২০০৯ সালে সরকারের আমন্ত্রণে মহাসচিব দেশটি পরিদর্শনে যান। তিনি সেখানে বিরোধীদলীয় অং সান সু চিসহ সব রাজনৈতিক বন্দির মুক্তির অনুরোধ জানান এবং

সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে উপযুক্ত সংলাপের মধ্য দিয়ে সমস্যার সমাধান ও সুষ্ঠু নির্বাচনের অবস্থা তৈরির ব্যাপারে পরামর্শ দেন। যদিও সে বছরের আগস্টেই অং সান সু চিকে তিন বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেয়া হয়, যা পরে ১৮ মাসের গৃহবন্দিত্বে কমিয়ে আনা হয়। এই বিচারে মহাসচিব সমালোচনার সম্মুখীন হয়।

২০১০-এর মার্চে নির্বাচন সংবলিত নতুন আইন অনুমোদন করে। এর মাধ্যমে সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা দলের নির্বাচনে অংশগ্রহণে বাধা প্রদান করার মাধ্যমে অং সান সু চি কে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত করে। মহাসচিব মন্তব্য প্রকাশ করেন যে, এই নতুন আইন আন্তর্জাতিক আকাঙ্ক্ষা পূরণে ব্যর্থ হয়েছে।

মে মাসে সাইক্লোন নার্গিস ইরাউয়াড্ডি ও ডেল্টা অঞ্চল লণ্ডভণ্ড করে দেয় এবং হাজার হাজার মানুষকে মৃত্যুমুখে ফেলে দেয়। এটা হিসাব করা হয় যে, ১.২ মিলিয়ন থেকে ১.৯ মিলিয়ন মানুষ এতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ইউএন সংগঠনগুলো সাহায্য প্রদানের চেষ্টা করে; কিন্তু সরকার শুধু সীমিত সাহায্য গ্রহণের অনুমতি দেয়। মহাসচিব এই অগ্রহণযোগ্য আচরণে ক্ষোভ প্রকাশ করেন এবং মিয়ানমার গিয়ে সরকারকে আন্তর্জাতিক সাহায্য গ্রহণের অনুরোধ জানান। এর ফলে সরকার মানবাধিকার কর্মী গ্রহণে অনুমতি দেয়। সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, ত্রাণ কর্মকাণ্ড পরিচালিত হবে অ্যাসোসিয়েশন অফ সাউথ ইস্ট এশিয়ান নেশনস (ASEAN) দ্বারা, যার ফলে ত্রিপক্ষীয় ASEAN-UN-Myanmar মেকানিজম গঠিত হয়।

২০১০ এর নভেম্বরে মিয়ানমারে ২০ বছরে প্রথম এবং ৬০ বছরে তৃতীয় বহুদলীয় নির্বাচন সম্পর্কে মহাসচিবের মন্তব্য ছিল যে, এটি যথেষ্টরূপে সর্বব্যাপী ও স্বচ্ছ হয়নি। এছাড়াও তিনি আবারো সব রাজনৈতিক বন্দির মুক্তি দাবি করেন। ১৩ নভেম্বর অং সান সু চি গৃহবন্দিত্ব থেকে মুক্তি লাভ করেন।

২০১১-এর ১৯ আগস্ট নতুন প্রেসিডেন্ট ইউ থেইন সেইন অং সান সু চির সাথে দেখা করে সমঝোতামূলক আলোচনা করেন। অক্টোবরে মহাসচিব বেশ কিছু সংখ্যক রাজনৈতিক বন্দির মুক্তিতে সন্তোষ প্রকাশ করে অভিবাদন জানান।

২০১২-এর এপ্রিলে এনএলডিসহ বেশ কিছু রাজনৈতিক দল সংসদীয় উপনির্বাচনে অংশগ্রহণ করে, যাতে অং সান সু চি একটি আসনে জয় লাভ করেন। জাতিসংঘের একটি দল এই নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করে। ৩০ এপ্রিল জাতিসংঘ ও সরকার একটি চুক্তি সই করে, যার মাধ্যমে জাতিসংঘ মিয়ানমারের ২০১৪ আদমশুমারিতে সাহায্য করার অঙ্গীকার করে। এটি ছিল সে দেশে ৩০ বছরে প্রথম আদমশুমারি। এসব ঘটনার পরবর্তীকালে অক্টোবরে মহাসচিব আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য মিয়ানমার কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানান। কারণ উত্তর রাখাইনে গোষ্ঠীগত সংঘাত চরম পর্যায়ে উপনীত হয়।

২০১৩ সালের জানুয়ারিতে মহাসচিব বিমান হামলার ওপর একটি রিপোর্ট করেন এবং বলেন এই হামলা কেচিন স্টেটের কর্তৃপক্ষকে ঐ এলাকায় সংঘাত হতে পারে এবং সাধারণ মানুষের জীবনের ঝুঁকিপূর্ণ কাজ থেকে বিরত থাকতে বলে। মার্চে ইউনিয়ন শান্তিরক্ষী কমিটি ও স্বাধীন কেচিন সংস্থাকে অস্ত্রবিরতিকরণ চুক্তির জন্য স্বাগতম জানায় এবং একটি সঠিক ও নিরপেক্ষ সমাধানের জন্য উভয় পক্ষকে উৎসাহিত করে।

তিমুর-লেস্তে

২০০২ সালে সাবেক নির্ভরশীল ভূখণ্ড স্বশাসিত পূর্ব তিমুর জাতিসংঘের সহায়তায় বহু বছর ধরে সংগ্রামের পর তিমুর-লেস্তে নামক দেশ হিসেবে ঘোষণা দেয়। এর রাজ্যসভা পরবর্তীকালে এই বছরের সেপ্টেম্বর সংসদ হিসেবে স্বীকৃতি পায় এবং জাতিসংঘের ১৯১তম দেশ হিসেবে সদস্য হয়। স্বাধীনতার ঘোষণার পর থেকে নিরাপত্তা পরিষদ পূর্ব তিমুরকে সাহায্য করে এর প্রশাসনিক উন্নয়ন, নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নতি, পুলিশ বাহিনী গঠন এবং বাইরে ও অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তায় কাজ করার জন্য জাতিসংঘের একটি মিশন শুরু করে।

২০০৫ সালে তিমুর-লেস্তে জাতিসংঘের অফিস (UNOTIL) দ্বারা UNMISET-কে প্রতিস্থাপিত করা হয়, যার কাজ ছিল সরকারি সংস্থার উন্নয়ন ও গণতন্ত্রসহ মানবাধিকার রক্ষার জন্য পুলিশ ও সীমান্ত রক্ষী বাহিনীকে প্রশিক্ষণ প্রদান।

২০০৬ সালে ৬০০ সেনা সদস্য একটি সংঘাতময় পরিস্থিতি সৃষ্টি করে, যা মে মাসে ব্যাপক আকার ধারণ করে। সরকার সংকটপূর্ণ এলাকায় আন্তর্জাতিক পুলিশ ও আর্মি নিয়োগের অনুরোধ জানায়। একটি রাজনৈতিক সমাধানের জন্য সেক্রেটারি জেনারেল তার স্পেশাল বাহিনীকে নিযুক্ত করেন। রাজনৈতিক নেতাদের সাথে আলোচনায় জুলাইতে একটি নতুন সরকার গঠিত হয়। পরের মাসে পরিষদ সরকারকে স্থায়িত্ব রক্ষা, সামাজিক ও গণতান্ত্রিক সরকার পরিচালনা ও বিদ্রোহীদের সাথে আলোচনায় সাহায্য করার জন্য United Nations Integrated Mission in Timur-Leste (UNMIT) নামে একটি নতুন মিশন শুরু করে। সেই থেকে দেশে স্থিতিশীল পরিবেশ বিরাজ করে এবং ২০০৭ সালে শান্ত ও নিরাপদ পরিবেশে প্রেসিডেন্ট ও পার্লামেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ২০০৮ সালের প্রথমে কিছু আর্মি অফিসার তিমুর-লেস্তের প্রেসিডেন্ট ও মিনিস্টারকে আক্রমণ করে। সিকিউরিটি কাউন্সিল এই ঘটনায় দোষীদের ন্যায়বিচারের দাবি জানায়।

তিমুর কর্তৃপক্ষের অনুরোধে নিরাপত্তা পরিষদ ২০১১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আগত ২০১২ সালের প্রেসিডেন্ট ও পার্লামেন্ট নির্বাচনে সাহায্যের জন্য UNMIT-কে অনুরোধ জানায়।

২০১২ সালের ৭ জুলাই পার্লামেন্ট এবং ১৭ মার্চ ও ১৬ এপ্রিল দুই দফায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের জন্য জাতীয় নির্বাচন কমিশনকে সাহায্য করে। নির্বাচনে বিপুলসংখ্যক ভোটার ভোট দেয় এবং ফলাফল সব প্রার্থীর জন্য গ্রহণযোগ্য হয়। ২০ মে তাউর মাতান রুয়াক প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ গ্রহণ করে এবং নতুন পার্লামেন্ট ৩০ জুলাই কার্যকর হয়। UNMIT ২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত এর কার্যক্রম শেষ করে।

ইউরোপ

সাইপ্রাস

গ্রিক সাইপ্রিয়ট ও টার্কিশ সাইপ্রিয়টদের মধ্যে বারবার যুদ্ধ রোধে এবং আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে ১৯৬৪ সালে ইউনাইটেড নেশন্স পিসকিপিং ফোর্স ইন সাইপ্রাস (UNFICYP) প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৭৪ সালে গ্রিক সাইপ্রিয়ট এবং কিছু গ্রিস সমর্থিত উপাদান কর্তৃক সংগঠিত ক্যুর ফলাফলে টার্কিশ সেনাবাহিনী হস্তক্ষেপ করে এবং দ্বীপটি স্বাভাবিকভাবে দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে।

সেই বছর থেকে ইউএনএফআইসিঅয়াইপি একটি শান্তি চুক্তি রক্ষা করছে, যা ১৬ আগস্ট ১৯৭৪ থেকে কার্যকর। এটি সাইপ্রাস ন্যাশনাল গার্ড ও টার্কিশ সাইপ্রিয়ট ফোর্সেসের মধ্যবর্তী লাইনে একটি নিরাপদ অঞ্চলও বজায় রাখে। কোনো রাজনৈতিক মধ্যস্থতার অনুপস্থিতিতে ইউএনএফআইসিঅয়াইপি এখনো দ্বীপে তাদের অবস্থান বজায় রেখেছে।

মহাসচিব তার অফিসের মাধ্যমে দুই পক্ষের নেতাদের মধ্যে বোধগম্য সমঝোতার খোঁজে ১৯৯৯ ও ২০০০ সালে নৈকট্য আলাপ করেন এবং ২০০২ থেকে আরো সরাসরি আলোচনা শুরু করেন। তিনি এই দুই পক্ষের মধ্যে ব্যবধান কমাতে ব্যাপক বিস্তৃত একটি প্রস্তাবনাও পেশ করেন। কিন্তু কোনো চুক্তি করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। ২০০৩ সালে এই আলোচনা বন্ধ করা হয়। সেই বছরের এপ্রিলে প্রায় তিন দশক পরে প্রথমবারের মতো টার্কিশ সাইপ্রিয়ট কর্তৃপক্ষ গ্রিক সাইপ্রিয়টদের জন্য উত্তরে এবং টার্কিশ সাইপ্রিয়টদের জন্য দক্ষিণে পাবলিক ভ্রমণের জন্য ক্রসিং পেইন্টস খুলে দেয়। জাতিসংঘ এজেন্সিগুলো রাস্তাগুলোর উন্নয়ন ঘটায় এবং নিরাপত্তা পরিষদের (UNFICYP) নীতিমালা আরো বৃদ্ধি করে, যাতে করে জনগণের নিরাপদ যাতায়াত সম্ভব হয়। সাত মাস পর প্রায় সেখানে দুই মিলিয়ন ক্রসিং সম্ভব হয়েছিল।

মহাসচিব এই নতুন পদক্ষেপকে স্বাগত জানান, তিনি আরো বলেন, এটা কোনো সুদূরপ্রসারী সমঝোতার বিকল্প হতে পারে না। ২০০৪-এ গ্রিক সাইপ্রিয়ট ও টার্কিশ সাইপ্রিয়ট নেতারা জামিনদার রাষ্ট্র গ্রিস, টার্কিশ এবং যুক্তরাজ্যসহ নিউইয়র্কে মহাসচিবের বিস্তারিত প্রস্তাবনা অনুযায়ী পুনরায় আলোচনা শুরু করেন। ছয় মাসের আলোচনার পরে যখন ঐকমত্য দৃষ্টিসীমার বাইরে, তখন মহাসচিব হস্তক্ষেপ করেন। সাইপ্রাস সমস্যার একটি সম্পূর্ণ সমাধান করতে একটি গ্রিক সাইপ্রিয়ট অঞ্চল এবং একটি টার্কিশ সাইপ্রিয়ট অঞ্চল দ্বারা একটি ইউনাইটেড সাইপ্রাস রিপাবলিক গঠনের ডাক দেন। গ্রিক সাইপ্রিয়ট অংশের ৭৬ শতাংশ ভোটার এই প্ল্যানের বিরোধিতা করেন এবং টার্কিশ সাইপ্রিয়ট অংশের ৬৫ শতাংশ ভোটার এর সমর্থন করেন। উভয় সম্প্রদায়ের সম্মতি ছাড়া এই প্ল্যানটি বাস্তবায়িত হতে পারে না। সুতরাং সাইপ্রাস ইউরোপীয় ইউনিয়নে প্রবেশ করে একটি বিভক্ত এবং সামরিক দ্বীপ হিসেবে।

২০০৬ সালে গ্রিক সাইপ্রিয়ট এবং টার্কিশ সাইপ্রিয়ট নেতারা মুখোমুখি মিলিত হন ইউ এন আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল ফর পলিটিক্যাল অ্যাফেয়ার্সের সাথে। তারা বাই-জোনাল, বাই-কমিউনাল ফেডারেশন হিসেবে সাইপ্রাসের মিলিত হওয়ার বিষয়ে একমত হন। তারা আবার ২০০৭-এ সাইপ্রাসে অবস্থিত মহাসচিবের বিশেষ দূতের দাপ্তরিক বাসস্থানে মিলিত হয়ে দ্রুত এ সংবলিত কার্যক্রম শুরুর বিষয়ে একমত হন।

গ্রিক সাইপ্রিয়ট ও টার্কিশ সাইপ্রিয়ট নেতাদের মধ্যে শেষ ধাপের আলোচনা শুরু হয় ২০০৮-এর চুক্তির পর, যারা আরও সিদ্ধান্ত নেন যে পুরনো শহর নিকোসিয়ার কেন্দ্রে লেড্রা স্ট্রিটে তারা একটি ক্রসিং খুলবেন, যা এ যাবৎকাল ধরে সাইপ্রাসের বিভক্তির একটি প্রতীকরূপে বিরাজ করছিল।

সে বছরের শেষ দিকে সমঝোতা শুরু হয় এবং বিচার-বিশ্লেষণ পেশ করা হয় উভয়পক্ষের নেতাদের, তাদের প্রতিনিধিদের, বিশ্লেষকদের। বিভিন্ন পক্ষ থেকে যেখানে তারা তাদের বিভিন্ন মিল ও অমিলগুলো উল্লেখ করে নানা বিষয়ে তাদের অবস্থান নিরূপণ করেছেন।

এক্সিকিউটিভ, প্রোপার্টি ও সিটিজেনশিপ নির্বাচনের বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করতে ২০১২ সালের জানুয়ারিতে গ্রিক ও তুরস্কের নেতারা মহাসচিবের সাথে নিউইয়র্কে দেখা করেন। মহাসচিব বলেন, শক্তিশালী ও প্রগাঢ় আলাপ হওয়া সত্ত্বেও শুধু সীমিত উন্নতি অর্জন সম্ভব হয়েছে। তিনি নেতাদের এ ব্যাপারে দ্রুত সর্বশেষ সিদ্ধান্ত নিতে অনুরোধ করেন।

বলকান অঞ্চল

কসোভো : ১৯৮৯ সালে যুগোস্লাভ ফেডারেল প্রজাতন্ত্র কসোভোর স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বাতিল করে; এটি দক্ষিণ যুগোস্লাভিয়ার একটি প্রদেশ, যা সার্বদের জন্য ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু অধিবাসীদের ৯০ শতাংশ জাতিগতভাবে আলবেনীয়। কসোভোর আলবেনীয়রা এর সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করে এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের সন্ধানে সার্বীয় রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ও কর্তৃপক্ষকে বয়কট করে। স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র বিদ্রোহের আহ্বান নিয়ে ১৯৯৬ সালে আত্মপ্রকাশিত কসোভো মুক্তিসেনা সার্বপ্রশাসনের সহযোগী সার্ব কর্মকর্তা ও আলবেনীয়দের আক্রমণ করলে উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়। এর প্রতিক্রিয়ায় সার্ব কর্তৃপক্ষ গণগ্রেফতারের পথ বেছে নেয়। এতে পরিস্থিতি আরও বিস্ফোরণোন্মুখ হয়ে ওঠে। ১৯৯৮ সালের মার্চে আবার সংঘর্ষ হয়, যখন সার্বীয় পুলিশ কসোভো মুক্তিসেনা সন্ধানের ভান করে ড্রেনিকা অঞ্চলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কসোভোয় শান্তি ও স্থিতিশীলতা বিকাশে সহায়তার জন্য যুগোস্লাভিয়ার বিরুদ্ধে অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও অবস্থার অবনতি ঘটে এবং কেএলএ ও সার্বীয় নিরাপত্তা বাহিনীর মধ্যে প্রকাশ্য যুদ্ধ শুরু হয়।

১৯৯৯ সালে যুগোস্লাভিয়াকে দেয়া সতর্কবাণীর পরে ন্যাটো যুগোস্লাভিয়ায় আকাশ আক্রমণ শুরু করে। যুগোস্লাভ বাহিনী কেএলএর বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযান চালায়। পাশাপাশি যুগোশ্লাভিয়া জাতিগত আলবেনীয়দের কসোভো থেকে গণহারে বিতাড়ন শুরু করে। এর ফলে সাড়ে ৮ লাখ মানুষ শরণার্থীতে পরিণত হয়। শরণার্থীদের সহায়তায় জাতিসংঘ শরণার্থী হাইকমিশনার ও অন্যান্য মানবিক সংস্থা আলবেনিয়া ও সাবেক মেসিডোনিয়া প্রজাতন্ত্রে ছুটে যায়। জুন মাসে যুগোস্লাভিয়া জি-৮ (৭টি শিল্পোন্নত দেশ ও রাশিয়া)-এর প্রস্তাবিত একটি শান্তি পরিকল্পনা গ্রহণ করে। নিরাপত্তা পরিষদ এই পরিকল্পনা অনুমোদন করে ও কসোভোতে বেসামরিক ও নিরাপত্তা রক্ষী মোতায়েনের সিদ্ধান্ত নেয়। পরিষদ শত্রুতা অবসানের জন্য একটি আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাকে এলএর বেসামরিকীকরণ ও শরণার্থী প্রত্যাবর্তনে সহায়তার জন্য সদস্য দেশগুলোকে ক্ষমতা দেয় এবং মহাসচিবকে একটি অন্তর্বর্তীকালীন আন্তর্জাতিক বেসামরিক প্রশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য অনুরোধ করে; যার অধীনে এই প্রদেশের মানুষ যথেষ্ট স্বায়ত্তশাসন ও স্ব-স্ব সরকার পেতে পারে। কসোভোতে যুগোস্লাভ বাহিনী প্রত্যাহারের পর ন্যাটো তার বিমান হামলা অভিযান স্থগিত করে এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থার জন্য ৫০ হাজার সদস্যের শক্তিশালী বহুজাতিক বাহিনী (KFOR) প্রদেশে প্রবেশ করে।

কসোভোয় জাতিসংঘ অন্তর্বর্তী প্রশাসনিক মিশন (UNMIK) ও তাদের কার্যক্রম প্রতিষ্ঠা করে। জটিলতা ও কর্মপরিধি বিবেচনায় এই মিশন ছিল অভূতপূর্ব। নিরাপত্তা পরিষদ কসোভোর ভূখণ্ড ও জনসংখ্যার কর্তৃত্ব আনমিক-এর ওপর অর্পণ করে। এর মধ্যে ছিল সব আইনগত ও প্রশাসনিক ক্ষমতা এবং পাশাপাশি বিচার পরিচালনা। যুদ্ধের সময় পালিয়ে যাওয়া আনুমানিক সাড়ে ৮ লাখ শরণার্থীর মধ্যে অন্তত ৮ লাখ ৪১ হাজার ফিরে

আসে। এই দায়িত্ব পালনের পর আনমিক স্বাভাবিক অবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক পুনর্গঠন নিশ্চিতকরণে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করে। ১৯৯৯ সালের সেপ্টেম্বরে কেএলএর বেসামরিকীকরণ সম্পন্ন হয়েছে এবং সুশীল সমাজের সদস্যদের পুনঃসংহত করার কাজ অব্যাহত রয়েছে। যুদ্ধবিরতির পর এই মাসে প্রায় দুই লাখ ১০ হাজার অ-আলবেনীয় কসোভোবাসী সার্বিয়া ও মন্টেনিগ্রোর উদ্দেশে কসোভো ত্যাগ করেছে। বাদবাকি অ-আলবেনীয়দেরকে এফওআর দ্বারা বেষ্টিত বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন ছিটমহলে বসবাস করতো।

২০০১ সালে সাবেক যুগোস্লাভিয়ার জন্য আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল সাবেক যুগোস্লাভ প্রেসিডেন্ট স্লোবদান মিলোসেভিক এবং অন্য চারজনকে কসোভো আলবেনিয়ান বেসামরিক জনগণের ওপর সরাসরি আক্রমণের সময় মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের দোষে দোষী সাব্যস্ত করে। মিলোসেভিক বন্দি অবস্থায় প্রাকৃতিক কারণে মারা যান। তিনি বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা, ক্রোয়েশিয়া এবং কসোভোয় গণহত্যা, মানবাধিকার লঙ্ঘন, যুদ্ধাপরাধসহ মোট ৬৬টি মামলায় অপরাধী হিসেবে গণ্য ছিলেন।

২০০১ সালে নিরাপত্তা পরিষদের অস্ত্র নিষেধাজ্ঞাও তুলে নেয়। নভেম্বরে ১২০-সদস্যের একটি কসোভো অ্যাসেমব্লি নির্বাচিত হয়, যা ২০০২ সালে এ অঞ্চলের প্রথম রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত করে। ডিসেম্বরে ইউএনএমআই-কে আঞ্চলিক সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের ওপর দায়দায়িত্বের পরিবর্তন সম্পন্ন করে। যদিও এটি নিরাপত্তা, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, সংখ্যালঘিষ্ঠদের অধিকার প্রভৃতির ওপর নিয়ন্ত্রণ রেখেছিল।

২০০৬-এ মহাসচিবের বিশেষ দূত দলগুলোর সাথে এবং উচ্চপর্যায়ের সার্বিয়ান ও কসোভো নেতাদের সাথে চার দফা আলোচনা চালায়; কিন্তু কসোভোর এথনিক আলবেনিয়ান সরকার এবং সার্বিয়া একে অপরের বিরুদ্ধেই থেকে যায়। ২০০৭-এর ফেব্রুয়ারিতে তিনি তার শেষ পরিকল্পনা পেশ করেন একটি আপস প্রস্তাব হিসেবে; কিন্তু তারপর দলগুলো তাদের অবস্থান পরিবর্তন করতে নারাজ। তিনি বলেন, এক্ষেত্রে একমাত্র উপায় হচ্ছে কসোভোর স্বাধীনতা, যা সার্বিয়া বরাবরই মেনে নিচ্ছিল না। এই বছরের শেষ দিকে মহাসচিব ইউরোপীয় ইউনিয়ন, রাশিয়া এবং যুক্তরাষ্ট্রকে নিয়ে একটি ত্রিপক্ষীয় দল গঠনের চুক্তি স্বাগত জানান, যা এরপর থেকে কসোভোর ভবিষ্যৎ নিয়ে আলাপ-আলোচনা করে। যদিও দলগুলো কোনো সমঝোতায় আসতে ব্যর্থ হয়।

২০০৮-এ কসোভো অ্যাসেমব্লি স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র গ্রহণ করে। ২০১০-এ আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল ঘোষণা করে যে, এর মাধ্যমে সে কোনো আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গ করেনি। সেপ্টেম্বরের মধ্যে কসোভো ১৯২টি জাতিসংঘ সদস্যের মধ্যে ৭০টি দ্বারা স্বীকৃতি পায়, যেখানে সার্বিয়া এটাকে এর একটি অংশ হিসেবে দেখে। একই সময়ে মহাসচিব এটা নিশ্চিত করেন যে, বেলগ্রেড ও প্রিস্টিনার মধ্যে আলোচনায় অবদান রাখতে জাতিসংঘ ইইউর পাশাপাশি সদা প্রস্তুত আছে। মার্চ ও এপ্রিলে ব্রাসেলসে সম্মেলনের মধ্য দিয়ে এ আলোচনা শুরু হয় ২০১১ সালে। দক্ষিণ কসোভোয় নতুন করে সংঘাত শুরু হওয়া সত্ত্বেও পরবর্তীকালে এ সম্মেলন চলতে থাকে ২০১২ পর্যন্ত।

১৯ অক্টোবর ২০১২-তে ব্রাসেলসে ইউরোপীয় ইউনিয়ন পৃষ্ঠপোষকতায় সার্বিয়ার প্রধানমন্ত্রী ইভিকা ডাকিক এবং কসোভোর হাশিম থাকিরের মধ্যে প্রথম উচ্চ পর্যায়ের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। মার্চ ২০১৩ পর্যন্ত এই দুই প্রধানমন্ত্রী সাতবার আলোচনায় বসেন।

নিরস্ত্রীকরণ (Disarmament)

জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার পর থেকেই আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় একটি কেন্দ্রীয় বিষয় ছিল বহুপক্ষীয় নিরস্ত্রীকরণ ও অস্ত্র সীমিতকরণের লক্ষ্য অর্জন। পর্যায়ক্রমে পরমাণু অস্ত্র হ্রাস ও এর চূড়ান্ত নির্মূল, রাসায়নিক অস্ত্র ধ্বংস, জীবাণু অস্ত্রের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জোরদার করা প্রভৃতি কার্যক্রমকে সংস্থার কাজের মধ্যে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে। কেননা এগুলো মানবজাতির জন্য বৃহৎ হুমকির সৃষ্টি করেছে। বহু বছর ধরে লক্ষ্য অপরিবর্তিত থাকলেও রাজনৈতিক বাস্তবতা ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির পরিবর্তনের ফলে বক্তব্য ও আলোচনার পরিবর্তন ঘটেছে।

আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এখন ক্ষুদ্র ও হালকা অস্ত্রের অতিরিক্ত ও অস্থিতিশীল প্রসার এবং ব্যাপকহারে স্থলমাইন মোতায়েনের বিষয়টিকে আরও গভীরভাবে বিবেচনা করছে। এটি সমাজের আর্থিক ও সামাজিক ভিত্তিকেই হুমকির মুখোমুখি করছে এবং নারী ও শিশুসহ বেসামরিক নাগরিকদের হত্যা ও গুমের পথ প্রশস্ত করছে। সামরিক উদ্দেশ্যে আন্তঃমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র প্রযুক্তির প্রসারের বিরুদ্ধে একটি বহুপক্ষীয় সংলাপের মাধ্যমে প্রথা গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা এবং তথ্য ও টেলিযোগাযোগ প্রযুক্তি বিকাশের ফলে আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়ার সম্ভাবনা নিরূপণের কাজও জাতিসংঘ শুরু করেছে।

যুক্তরাষ্ট্রে ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের মর্মান্তিক ঘটনার পরে এবং এর পরবর্তীকালে বিভিন্ন দেশে আরও অন্যান্য সন্ত্রাসী আক্রমণের ফলাফলে এটা প্রতীয়মান হয়, যে কোনো অরাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসী সংস্থার হাতে গণবিধ্বংসী অস্ত্র যে কোনো সময় চলে যেতে পারে। এমন আক্রমণ আরো ভয়াবহ হতে পারতো, যদি সন্ত্রাসীরা রাসায়নিক, জৈবিক বা নিউক্লিয়ার অস্ত্র ব্যবহার করতে সক্ষম হতো। এসব বিষয় মাথায় রেখে সাধারণ পরিষদ ২০০২ সালে প্রথমবারের মতো রেজুলিউশন (৫৭/৮৩) গ্রহণ করে, যাতে করে সন্ত্রাসীদের হাতে এসব অস্ত্র যাওয়া রোধ করা যায় এবং অস্ত্র পাচার বন্ধ হয়।

জাতিসংঘ চার্টারের এনফোর্সমেন্ট প্রভিশন অনুযায়ী কাজ করে কাউন্সিল সম্পূর্ণ ঐকমত্যে রেজুলিউশন ১৫৪০ (২০০৪) গ্রহণ করে, যাতে করে সব রাষ্ট্র যে কোনো অ-রাষ্ট্রীয় সংস্থাকে গণবিধ্বংসী অস্ত্র অর্জন থেকে বিরত রাখতে সচেষ্ট থাকবে। রেজুলিউশন রাষ্ট্রগুলোর ওপর আরও সুদূরপ্রসারী বাধ্যবাধকতা আরোপ করে, যেন এসব অস্ত্রের প্রসার রোধে তারা তাদের অভ্যন্তরীণ পদক্ষেপ জোরদার করে। এই ধারায় সাধারণ পরিষদ ইন্টারন্যশনাল কনভেনশন ফর দ্য সাপ্রেশন অ্যাক্ট অফ নিউক্লিয়ার টেরোরিজম গ্রহণ করে, যা ২০০৭ থেকে কার্যকর হয়।

এসব ক্ষেত্রে জাতিসংঘের অপরিহার্য ভূমিকা হচ্ছে নতুন প্রথা গড়ে তোলা এবং পুরনো চুক্তিগুলো জোরদার করতে সদস্য দেশগুলোকে সহায়তা করা।

নিরস্ত্রীকরণ কাঠামো (Disarmament Machinery)

জাতিসংঘ সনদ এবং সাধারণ পরিষদের সিদ্ধান্তবলে নিরস্ত্রীকরণ সংক্রান্ত জাতিসংঘ কাঠামো প্রতিষ্ঠিত জাতিসংঘ সনদ অনুযায়ী 'নিরস্ত্রীকরণ পরিচালনা ও অস্ত্র নিয়ন্ত্রণসহ আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখার ক্ষেত্রে সহযোগিতার সাধারণ নীতিমালা'

(ধারা-১১) বিবেচনার মুখ্য দায়িত্ব সাধারণ পরিষদের ওপর ন্যস্ত। নিরস্ত্রীকরণের বিষয় বিবেচনার জন্য পরিষদের দুটি সংশ্লিষ্ট সংস্থা রয়েছে। একটি নিরস্ত্রীকরণ ও আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা কমিটি (প্রথম কমিটি) নিয়মিত অধিবেশন চলাকালে এর সভা হয় এবং পরিষদের আলোচ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত নিরস্ত্রীকরণ সংক্রান্ত সব বিষয় বিবেচনা করে। দ্বিতীয়টি জাতিসংঘ নিরস্ত্রীকরণ কমিশন—এটি বিশেষায়িত আলোচনা সভা যেখানে শুধু সুনির্দিষ্ট বিষয়ে আলোকপাত করা হয়।

দ্য কনফারেন্স অন ডিজআর্মামেন্ট হচ্ছে আন্তর্জাতিক কমিউনিটির ডিজআর্মামেন্ট চুক্তি সম্পর্কিত একমাত্র বহুপক্ষীয় আপস ফোরাম। এই কনফারেন্স বায়োলজিক্যাল উইপন্স ফোরাম, দ্য কেমিক্যাল উইপন্স কনভেনশন, দ্য কম্প্রিহেনসিভ নিউক্লিয়ার টেস্ট ব্যান ট্রিটি এবং দ্য ট্রিটি অন দ্য নন-প্রোলিফারেশন অফ নিউক্লিয়ার উইপন্স বিষয়গুলোতে আপস করেছে। যদিও ১৯৯৭ থেকে এই কনফারেন্সের সদস্যদের মধ্যে ঐকমত্যের অভাবে কোনো কর্মপদ্ধতি অনুযায়ী কাজ করতে ব্যর্থ হয়েছে। যেহেতু এই কনফারেন্স জাতীয় নিরাপত্তাজনিত খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নিয়ে কাজ করে তাই এটা ঐকমত্য ছাড়া কাজ করতে পারে না। এতে আছে একটি সীমিত ৬৫টি রাষ্ট্রের সদস্যপদ এবং সাধারণ পরিষদের সাথে একটি বিশেষ সম্পর্ক। যদিও এই কনফারেন্সের নিজের মতো করেই আইন ও এজেন্ডা তৈরি করে। তারপরও এটি পরিষদের কাছ থেকে পরামর্শ নেয় এবং এর কাছে বার্ষিক রিপোর্ট পেশ করে।

দ্য ইউনাইটেড নেশন্স অফিস ফর ডিজআর্মামেন্ট অ্যাফেয়ার্স (UNODA) নিরস্ত্রীকরণ বিষয়গুলোতে পরিষদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করে। দ্য ইউনাইটেড নেশন্স ইনস্টিটিউট ফর ডিজআর্মামেন্ট রিসার্চ নিরস্ত্রীকরণ ও আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা বিষয়ক বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে স্বাধীন গবেষণা পরিচালনা করে। দ্য অ্যাডভাইসরি বোর্ড অন ডিজআর্মামেন্ট ম্যাটারস মহাসচিবকে অস্ত্র সীমিতকরণ ও নিরস্ত্রীকরণ বিষয়ে পরামর্শ দেয় এবং UNIDIR-এর বোর্ড অফ ট্রাস্টিস হিসেবে কাজ করে। এছাড়াও ইউনাইটেড নেশন্স ডিজআর্মামেন্ট ইনফরমেশন প্রোগ্রাম পরামর্শগুলোর বাস্তবায়নের জন্য উপদেশ প্রদান করে।

বহুপক্ষীয় নিরস্ত্রীকরণ ও অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ চুক্তিগুলো

বহুপক্ষীয় ও আঞ্চলিক ফোরামে আলোচনার ফলে নিরস্ত্রীকরণ ও অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে গৃহীত উল্লেখযোগ্য চুক্তিগুলোর একটি বিবরণ :

- **১৯২৫ জেনেভা প্রটোকল :** প্রথম রাসায়নিক ও জৈবিক অস্ত্র ব্যবহার নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়।
- **১৯৫৯ অ্যান্টার্কটিকা চুক্তি :** মহাদেশের অসামরিকীকরণের ব্যবস্থা করা হয় এবং অঞ্চলটিতে সব ধরনের অস্ত্র পরীক্ষা নিষিদ্ধ করা হয়।
- ১৯৬৩ বায়ুমণ্ডল, মহাশূন্য ও পানির নিচে পরমাণু অস্ত্র পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণ চুক্তি (আংশিক অস্ত্র পরীক্ষা নিষিদ্ধ চুক্তি) : ভূগর্ভে পারমাণবিক পরীক্ষা সীমাবদ্ধ রাখা।
- ১৯৬৭ লাতিন আমেরিকা ও ক্যারিবীয় অঞ্চলে পরমাণু অস্ত্র নিষিদ্ধকরণ চুক্তি (ল্যাটেলোমকো চুক্তি) : এলাকার দেশগুলোতে পরমাণু অস্ত্র পরীক্ষা, ব্যবহার, তৈরি, মজুত অথবা সংগ্রহ নিষিদ্ধ করে।
- ১৯৬৭ চাঁদ ও অন্যান্য উপগ্রহসহ মহাশূন্যে অভিযান ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রগুলোর তৎপরতা তদারকি নীতি সংক্রান্ত চুক্তি (মহাশূন্য চুক্তি) : মহাশূন্যের শুধু শান্তিপূর্ণ

ব্যবহারের ম্যান্ডেট দিয়ে মহাশূন্যে পরমাণু অস্ত্র মোতায়েন ও নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

- ১৯৬৮ পরমাণু অস্ত্র বিস্তার রোধ চুক্তি (এনপিটি) : অপারমাণবিক দেশগুলো কখনোই পারমাণবিক অস্ত্র অর্জন করবে না– এ অঙ্গীকার; বিনিময়ে পারমাণবিক দেশগুলোতে অস্ত্র প্রতিযোগিতা ও নিরস্ত্রীকরণ প্রক্রিয়া শুরু করার সংলাপ এসব দেশে পারমাণবিক প্রযুক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারে প্রবেশাধিকার ও সহায়তা এবং পারমাণবিক দেশ থেকে অপারমাণবিক দেশে পরমাণু অস্ত্র প্রসারে সহায়তা না করা।
- ১৯৭১ সমুদ্র তলদেশ, সমুদ্রপৃষ্ঠ ও উপভূমি অঞ্চলে পরমাণু অস্ত্র ও অন্যান্য গণবিধ্বংসী অস্ত্র বসানো নিষিদ্ধকরণ চুক্তি (সমুদ্র তলদেশ চুক্তি) : সমুদ্রপৃষ্ঠে বা তলদেশে পারমাণবিক ও ব্যাপক ধ্বংসকারী অস্ত্র মোতায়েন নিষিদ্ধ করা হয়।
- ১৯৭২ জীবাণু (জৈবিক) অস্ত্র কনভেনশন (বিডব্লিউসি) : জীবাণু ও রাসায়নিক অস্ত্র উন্নয়ন, উৎপাদন ও মজুদ নিষিদ্ধ ও সরবরাহ ব্যবস্থাসহ সেগুলোর ধ্বংস।
- ১৯৮০ কতিপয় প্রচলিত অস্ত্রের ব্যবহার নিষিদ্ধকরণ কনভেনশন (সিসিডব্লিউ) : এতে ব্যাপকভাবে আহত করে অথবা বাছবিচারহীন প্রতিক্রিয়া রয়েছে এমন প্রচলিত অস্ত্র নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এটি চুক্তির ছত্রছায়ারূপে বিবেচিত, যাতে নতুন চুক্তি যুক্ত হতে পারে। ২০০০ সাল পর্যন্ত এর চারটি প্রটোকল রয়েছে। প্রথম প্রটোকলে মানবদেহে সহজে শনাক্ত করা যায় না– এমন অস্ত্রের টুকরা ব্যবহার নিষিদ্ধ করার কথা বলা হয়েছে। দ্বিতীয় প্রটোকলে (সংশোধিত ১৯৯৫) মাইন, বুবি ট্র্যাপ, আগ্নেয়াস্ত্র প্রভৃতির ব্যবহার সীমিত রাখা হয়েছে। তৃতীয় প্রটোকলে অগ্নিপ্রজ্বলন করে এমন অস্ত্র নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং চতুর্থ প্রটোকলে লেসার অস্ত্র নিষিদ্ধ করা হয়েছে।
- ১৯৮৫ দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় পরমাণু অস্ত্রমুক্ত অঞ্চল চুক্তি (রারোটোঙ্গা চুক্তি) : এই অঞ্চলের ভেতরে কোনো ধরনের পারমাণবিক বিস্ফোরণ, অস্ত্র উৎপাদন, সংগ্রহ মজুত বা পরীক্ষা এবং সাগরে পারমাণবিক বর্জ্য ফেলা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।
- ১৯৯০ ইউরোপে প্রচলিত সৈন্যবাহিনী বিষয়ক চুক্তি (CFF) : আটলান্টিক মহাসাগর থেকে উড়াল পর্যন্ত অঞ্চলে বিভিন্ন প্রচলিত অস্ত্রের সংখ্যা সীমাবদ্ধ করেছে।
- ১৯৯৩ রাসায়নিক অস্ত্র কনভেনশন (CWC) : রাসায়নিক অস্ত্রের উন্নয়ন, উৎপাদন, মজুত ও ব্যবহার নিষিদ্ধ করা ও এসব ধ্বংস করার ব্যবস্থা রয়েছে।
- ১৯৯৫ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া পরমাণু অস্ত্রমুক্ত অঞ্চল চুক্তি (ব্যাংকক চুক্তি) : অঞ্চলের চুক্তির পক্ষভুক্ত দেশের ভূখণ্ডে পারমাণবিক অস্ত্র উন্নয়ন ও মোতায়েন নিষিদ্ধ করেছে।
- ১৯৯৬ আফ্রিকায় পরমাণু অস্ত্রমুক্ত অঞ্চল (পেলিনদাবা চুক্তি) : আফ্রিকা মহাদেশে পরমাণু অস্ত্র উন্নয়ন ও মোতায়েন নিষিদ্ধ করেছে।
- ১৯৯৬ সমন্বিত পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণ চুক্তি (CTBT) : সব ধরনের ও সব পরিবেশে বিশ্বব্যাপী পারমাণবিক পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।
- ১৯৯৭ মাইন নিষিদ্ধকরণ চুক্তি : ব্যক্তিবিধ্বংসী মাইন ব্যবহার, মজুদ, উৎপাদন ও স্থানান্তর নিষিদ্ধ করেছে এবং সেগুলো ধ্বংসের বিধান রয়েছে।
- ২০০৫ ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন ফর দ্য সাপ্রেশন অফ অ্যাক্টস অফ নিউক্লিয়ার টেরোরিজম (নিউক্লিয়ার টেরোরিজম কনভেনশন) : নির্দিষ্ট নিউক্লিয়ার টেরোরিজম বিশেষায়িত করে, সম্ভাব্য লক্ষ্যগুলোকে রক্ষা করে, দোষীদের বিচার করে এবং দেশগুলোর মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি করে।

- ২০০৬ সেন্ট্রাল এশিয়া নিউক্লিয়ার উইপন ফ্রি জোন ট্রিটি : পাঁচ মধ্য এশীয় অঞ্চল—কাজাখস্তান, কিরগিজিস্তান, তাজিকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান এবং উজবেকিস্তান নিয়ে গঠিত।
- ২০০৮ কনভেনশন অন ক্লাস্টার মিউনিশন্স (সিসিএম) : এসব যুদ্ধোপকরণের উৎপাদন, উন্নয়ন, অর্জন, সংরক্ষণ এবং হস্তান্তর নিষিদ্ধ করে।
- ২০১০ সেন্ট্রাল আফ্রিকান কনভেনশন ফর দ্য কন্ট্রোল অফ স্মল আর্মস অ্যান্ড লাইট উইপন্স (কিনশাশা কনভেনশন) : সব ক্ষুদ্রাস্ত্রের উৎপাদন, হস্তান্তর এবং অর্জন আবদ্ধ করে। অস্ত্র চিহ্নিতকরণ নিশ্চিত করে, অস্ত্র ব্যবসায়ীদের কর্মকাণ্ড তত্ত্বাবধান করে, রাষ্ট্রগুলোতে অস্ত্র প্রবেশের পথ কমায়।
- ২০১৩ আর্মস ট্রেড ট্রিটি (এটিটি) : আন্তর্জাতিক অস্ত্র বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করে।

গণবিধ্বংসী অস্ত্র (Weapons of mass destruction)

পরমাণু অস্ত্র

অব্যাহত চেষ্টার মাধ্যমে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ কয়েকটি চুক্তি সম্পাদনে সক্ষম হয়েছে যার লক্ষ্য পরমাণু অস্ত্র ভাণ্ডার হ্রাস; কয়েকটি অঞ্চল ও পরিবেশে (যেমন মহাশূন্য, সমুদ্র তলদেশ) পারমাণবিক অস্ত্রের বিস্তার রোধ, এর প্রসার সীমাবদ্ধ করা ও পরীক্ষা বন্ধ করা। কিন্তু এসব অর্জন সত্ত্বেও পরমাণু অস্ত্র ও এর প্রসার শান্তির প্রতি মুখ্য হুমকিরূপে বিরাজমান এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি ব্যাপক চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দিয়েছে।

এই অঞ্চলগুলোতে বিবেচনাধীন বিষয়গুলো হলো নিউক্লিয়ার অস্ত্রের সংখ্যা কমানো, অপারমাণবিক অঞ্চল গঠনের সম্ভাবনা তৈরি করা এবং মিসাইল ও মিসাইল ডিফেন্স সিস্টেম তৈরি বন্ধ করা।

পারমাণবিক অস্ত্র সম্পর্কিত দ্বিপক্ষীয় চুক্তি। পারমাণবিক অস্ত্র ধারণ করার জন্য অনেক আন্তর্জাতিক সম্মেলন হয় বিভিন্ন ফোরামে এবং এটা পরিষ্কাররূপে বোঝা যায় যে, পারমাণবিক শক্তিধর রাষ্ট্রগুলো আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা বজায় রাখার ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব রাখে। শীতল যুদ্ধের (কোল্ড ওয়ার) সময় ও এর পরে প্রধান দুই শক্তি কিছু চুক্তি করে, যাতে করে পারমাণবিক যুদ্ধের ঝুঁকি উল্লেখযোগ্য হারে কমে আসে।

বহুপক্ষীয় পারমাণবিক অস্ত্র চুক্তি ও অবিস্তার। দ্য ট্রিটি অন দ্য নন-প্রলিফারেশন অফ নিউক্লিয়ার ওয়েপন্স (এনপিটি), সব বহুপক্ষীয় চুক্তিগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বিশ্বজনীন, ১৯৬৮-এ খোলা হয় স্বাক্ষর গ্রহণের জন্য এবং কার্যকর করা হয় ১৯৭০-এ। এতে সর্বমোট ১৯০টি দেশ যোগদান করে। এনপিটি হচ্ছে বৈশ্বিক পারমাণবিক অবর্ধনশীল অঞ্চলের এবং পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণের ভিত্তি। জানুয়ারি ২০০৩-এ গণতান্ত্রিক কোরিয়া প্রজাতন্ত্রের ট্রিটি থেকে বের হয়ে আসার সিদ্ধান্ত–যা ছিল ৩৩ বছরে প্রথম। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের জন্য ছিল অনেক বড় চিন্তার বিষয়।

এনপিটি সদস্যগুলোর ২০০৫-এর রিভিউ কনফারেন্সে অংশগ্রহণকারীরা কোনো উল্লেখযোগ্য মতামতে পৌঁছাতে ব্যর্থ হয়। পাঁচ বছর পরে, যদিও ২০১০-এর রিভিউ কনফারেন্স পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণ বিষয়ে ২২ পয়েন্টের একটি কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করে। যাতে পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণ, নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, পারমাণবিক পরীক্ষণ বিষয়ক

জোটবদ্ধ পদক্ষেপ বর্ণিত হয়। সম্মেলনটি ২০১২ সালে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো দ্বারা অংশগ্রহণকৃত আরো একটি সম্মেলন পরিচালনা করে, যাতে করে ওই অঞ্চলে একটি পারমাণবিক অস্ত্রমুক্ত অঞ্চল গঠন সম্ভব হয়। রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে এই সম্মেলনটি যদিও মধ্যপ্রাচ্যে অনুষ্ঠিত হতে পারেনি। ২০১২ সালের নভেম্বর মাসে মহাসচিব বান কি-মুন আশ্বস্ত করেন যে, তিনি ২০১৩ সালের শুরুতে একটি সম্মেলন সংগঠনের জন্য সাহায্য করবেন।

এনপিটি-এর অধীনে বাধ্যবাধকতাগুলো যাচাই করতে সদস্য রাষ্ট্রগুলো ইন্টারন্যাশনাল অ্যাটমিক এনার্জি এজেন্সি দ্বারা গঠিত রক্ষাকবচগুলো মেনে চলতে বাধ্য। ২০১২ সালের শেষ নাগাদ ১৭৯টি দেশের সাথে এই রক্ষাকবচ চুক্তি সম্পন্ন হয়। এনপিটিসহ দ্য ট্রিটিস অফ ব্যাংকক, পেলিন্দাবা, রারটঙ্গা, তলাতেলকো এবং মধ্য এশিয়ার একটি পারমাণবিক অস্ত্রমুক্ত অঞ্চল এসব রক্ষাকবচ মেনে চলতে হয়।

১৯৯৬ সালে সাধারণ পরিষদের একটি বিশাল অংশ কম্প্রিহেন্সিভ নিউক্লিয়ার টেস্ট ব্যান ট্রিটি গ্রহণ করে সব পারমাণবিক পরীক্ষণ বেআইনি ঘোষণা করে। ১৯৫৪ সালে প্রকৃতরূপে প্রস্তাবিত হলেও এটা গৃহীত হতে চার দশক লেগে যায়, যা ১৯৬৩ সালে গৃহীত আংশিক নিষেধাজ্ঞা সব পরিবেশের জন্য সম্প্রসারিত করে। জুলাই ১৯৪৫ সালে যখন যুক্তরাষ্ট্র প্রথম পারমাণবিক বোমা পরীক্ষা করে এবং ১৯৯৬ যখন সিটিবিটি স্বাক্ষরিত হয়, এ সময়কালের মধ্যে প্রায় ২০০০ সালের বেশি পারমাণবিক বিস্ফোরণ নথিভুক্ত হয়। তখনও সিটিবিটি কার্যকর হয়নি। যেহেতু ২০১৩ সালের জানুয়ারিতে ১৮৩টি রাষ্ট্র সিটিবিটি স্বাক্ষর করে এবং ১৫৯টি তাদের অবস্থান নিশ্চিত করে। চুক্তিটির পরিশিষ্ট-২-এ উল্লিখিত ৪৪টি দেশের নিশ্চিত অবস্থান নিশ্চিত হওয়ার ১৮০ দিন পরে কার্যকর হবে। এই পরিশিষ্ট-২-এ দেশগুলো হলো সেসব দেশ, যারা ১৯৯৪ ও ১৯৯৬-এ সংঘটিত সিটিবিটি সংলাপে অংশগ্রহণ করে এবং সে সময় যাদের নিউক্লিয়ার পাওয়ার রিঅ্যাক্টর বা রিসার্চ রিঅ্যাক্টর ছিল। জানুয়ারি ২০১৩ পর্যন্ত ৮টি পরিশিষ্ট-২-এ উল্লিখিত দেশ এই চুক্তির বাইরে ছিল। এগুলো হলো : চীন, উত্তর কোরিয়া, মিসর, ইন্ডিয়া, ইরান, ইসরায়েল, পাকিস্তান এবং যুক্তরাষ্ট্র।

সর্বশেষ সম্মেলনটিতে রাষ্ট্রগুলো চূড়ান্ত ঘোষণা গ্রহণ করে, যাতে চুক্তিটির অতি শীঘ্র বাস্তবায়ন ও বিশ্বজনীনতা সৃষ্টির জন্য ১০টি পরিকল্পনা বর্ণনা করা হয়। ১৯৯৭ সালে স্থাপিত প্রভিশনাল টেকনিক্যাল সচিবালয়ে এখন কাজ চলছে একটি আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা তৈরির জন্য, যাতে করে চুক্তিটি যখন চালু হয় তখন তা সচল থাকে। সম্পন্ন অবস্থায় এই পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থায় ৩৩৭টি পর্যবেক্ষণ সুবিধা থাকবে আরও থাকবে একটি অনধিকার প্রবেশমূলক অনসাইট পরিদর্শন শাসনব্যবস্থা, যা শুধু বলবৎ হবে চুক্তিটি চালু হলে।

নিউক্লিয়ার অস্ত্রমুক্ত অঞ্চলসমূহ। অবস্থার উন্নতির সময়ে ১৯৬৭ সালে ট্রিটি ফর দ্য প্রহিবিশন অফ নিউক্লিয়ার ওয়েপন্স ইন লাতিন আমেরিকা অ্যান্ড দ্য ক্যারিবিয়ান চুক্তিবদ্ধ হয়। যার ফলে প্রথমবারের মতো কোনো জনবহুল অঞ্চল নিউক্লিয়ার অস্ত্রমুক্ত হিসেবে ঘোষিত হয়। ২০০২ সালে কিউবার অনুসমর্থনের মাধ্যমে এই নিউক্লিয়ার অস্ত্রমুক্ত অঞ্চলের মধ্যে এ এলাকার সব রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্তি ঘটে। এর পরবর্তীকালে আরো চারটি অতিরিক্ত মুক্তাঞ্চল গঠিত হয় যেগুলো হলো– দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগর (ট্রিটি অফ

রারোতঙ্গা, ১৯৮৫), দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া (ট্রিটি অফ ব্যাংকক, ১৯৯৫), আফ্রিকা (ট্রিটি অফ পেলিন্দাবা, ১৯৯৬), মধ্য এশিয়া (সেন্ট্রাল এশিয়া নিউক্লিয়ার উইপন ফ্রি জোন ট্রিটি, ২০০৬)। মধ্য ইউরোপ ও দক্ষিণ এশিয়াসহ মধ্যপ্রাচ্যেও নিউক্লিয়ার অস্ত্রমুক্ত অঞ্চল করার প্রস্তাবনা করা হয়। প্রতিটি রাষ্ট্র কর্তৃক এক একটি নিউক্লিয়ার অস্ত্রমুক্ত অঞ্চল হিসেবে গড়ে তোলার ধারণা স্বীকার করা হয়, যখন সাধারণ পরিষদ মঙ্গোলিয়ার নিউক্লিয়ার অস্ত্রমুক্তির স্বঘোষণা সমর্থন করে।

পারমাণবিক অস্ত্র বিস্তার রোধ

আন্তর্জাতিক অ্যাটোমিক এনার্জি এজেন্সি সকল বেসামরিক পারমাণবিক প্রোগ্রামের নিরাপত্তা ও প্রতিবিধান নিশ্চিতকারক পরিদর্শক, উপদেষ্টা ও ফ্যাসিলিটেটর হিসেবে কাজ করে। রাষ্ট্রগুলোর সাথে চুক্তির মাধ্যমে আইএইএ সর্ব প্রকার নিউক্লিয়ার ফ্যাসিলিটির উপাদান, যন্ত্রপাতি, প্রযুক্তি ইত্যাদি নিয়মিতভাবে পরিদর্শন করে। এসব কিছুই একসাথে নিশ্চিত করে যে, রাষ্ট্রগুলো চুক্তি অনুযায়ী সব ধরনের নিয়ম মেনে তাদের শান্তিপূর্ণ নিউক্লিয়ার কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

আইএইএ বিশেষজ্ঞরা ১৭৯ রাষ্ট্রে শত শত পরিদর্শন কার্যক্রম চালায়, যাতে করে নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থাগুলো ও চুক্তিগুলো নিশ্চিত করা যায়। তাদের লক্ষ্য হচ্ছে এটা নিশ্চিত করা যে, রাষ্ট্রগুলোর সর্বমোট ৯০০-এর মতো পারমাণবিক ব্যবস্থা শুধু শান্তিপূর্ণভাবে ব্যবহার হয়ে আসছে। এসব বার্ষিক পরিদর্শনের মাধ্যমে আইএইএ আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা বজায় রাখতে ও যে কোনো প্রকারের পারমাণবিক অপব্যবহার রোধে ব্যাপক অবদান রাখে।

আইএইএর মধ্যে অনেক ধরনের নিরাপত্তামূলক চুক্তি অন্তর্ভুক্ত আছে। এনপিটিসহ পারমাণবিক অস্ত্রমুক্ত অঞ্চলগুলোর সাথে সম্পর্কযুক্ত চুক্তিগুলো নির্দেশনা দেয় যে, যেন সব অপারমাণবিক রাষ্ট্রও তাদের সমস্ত পারমাণবিক জ্বালানি চক্র সংবলিত কর্মকাণ্ডের বর্ণনা আইএইএর কাছে জমা দেয়। চুক্তিগুলো শুধু একক সুবিধাগুলোর নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। আইএইএর নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থাগুলো পারমাণবিক বৃদ্ধি রোধে একটি অত্যাবশ্যকীয় অংশ এবং এটা এনপিটি বাস্তবায়নে একটি অপরিহার্য ভূমিকা পালন করে।

২০১০ সালে নিরাপত্তা পরিষদ পূর্ববর্তী চুক্তি অনুযায়ী দেশটির শান্তিপূর্ণ পারমাণবিক প্রোগ্রাম পরিচালনায় ব্যর্থতার কারণে ইরানের ওপর আরো নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। পরিষদ একটি অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা সময় বর্ধিত করে এবং অর্থনৈতিক ও যোগাযোগ অবস্থার ওপর সীমাবদ্ধতা আরোপ করে। পরিষদ মহাসচিবের কাছে আরো সুপারিশ করে, যেন নিষেধাজ্ঞা পর্যবেক্ষণ ও বাস্তবায়নের জন্য একটি বিশেষজ্ঞ প্যানেল গঠন করা হয়। একটি ভূগর্ভস্থ পারমাণবিক পরীক্ষা চালানোর কারণে ২০১৩-এর মার্চে নিরাপত্তা পরিষদ উত্তর কোরিয়ার ব্যবসা-বাণিজ্যের ওপর আরো কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। এছাড়াও নির্দিষ্ট বিদেশি ভ্রমণকারীদের ওপরও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়, ২০০৬ ও ২০০৯-এর পারমাণবিক পরীক্ষা চালানোর পর প্রথমবারের মতো উত্তর কোরিয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয় যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র সংবলিত যন্ত্রপাতির আমদানিতে অবরোধ। নিষেধাজ্ঞা আরো কঠোর করে তোলা হয় যখন তথ্যানুযায়ী দেশটি ২০১৩-এর জানুয়ারিতে এর পশ্চিম উপকূল থেকে একটি দূরপাল্লার উনহা-৩ রকেট

উৎক্ষেপণ করে। ইরান ও উত্তর কোরিয়ার ওপর দেখাশোনা করার জন্য দুটি নিষেধাজ্ঞা কমিটি গঠন করা হয়েছে।

রাসায়নিক ও জীবাণু অস্ত্র (Chemical and Biological Weapons)

১৯৯৭ সাল থেকে কার্যকর রাসায়নিক অস্ত্র কনভেনশন (CWC) এমন একটি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছে, যা ১৯২৫ সালে জেনেভা প্রটোকল অনুযায়ী বিষাক্ত গ্যাস নির্মিত অস্ত্র নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে শুরু হয়েছিল। এই কনভেনশনের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক অস্ত্র নিয়ন্ত্রণের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো একটি কঠোর আন্তর্জাতিক যাচাই ব্যবস্থার (যার মধ্যে রয়েছে রাসায়নিক স্থাপনা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহতা ও নিয়মিত বৈশিষ্টিক পরিদর্শন) অধীনে চুক্তি স্বাক্ষরকারী দেশগুলো মানছে কিনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এ উদ্দেশ্যে নেদারল্যান্ডসের দি হেগে স্থাপিত রাসায়নিক অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা সংস্থা (ওপিসিডব্লিউ) খুবই কর্মঠ ভূমিকা পালন করছে। মার্চ ২০১৩ পর্যন্ত ১৮৮ দেশ যা বৈশ্বিক জনগণের প্রায় ৯৮ শতাংশ ও পিসিডব্লিউ যোগ দান করে।

১৯৭২-এর বায়োলজিক্যাল অ্যান্ড টক্সিন ওয়েপন্স কনভেনশন, যা ১৯৭৫-এ কার্যকর হয়, সেটি কোনো যাচাইকরণ প্রক্রিয়া প্রদান করে না। সদস্য রাষ্ট্রগুলো প্রতিবছর তাদের বেশি ঝুঁকিপূর্ণ জৈবিক গবেষণার বিষয়গুলো পরস্পরের সাথে বিনিময় করে। ২০০৬ সালে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর ষষ্ঠ পর্যালোচনা সম্মেলন একটি বাস্তবায়ন সহায়তা ইউনিট গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়, যার মাধ্যমে সদস্য রাষ্ট্রগুলো কনভেনশন বাস্তবায়নে শক্তি অর্জন করবে। নিউক্লিয়ার অবর্ধন ও রাসায়নিক অস্ত্র চুক্তিগুলোর মতো, যারা যথাক্রমে আইইএ এবং ও পিসিডব্লিউ দ্বারা সমর্থিত, তাদের মতো বায়োলজিক্যাল ওয়েপন্সগুলোর কোনো প্রাতিষ্ঠানিক সমর্থন ছিল না। কনভেনশনের সদস্য রাষ্ট্রগুলোর সম্মেলন নিয়মিতভাবে জাতিসংঘে অনুষ্ঠিত হয়। সপ্তম রিভিউ কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয় ২০১১ সালে।

প্রচলিত অস্ত্র, আস্থা তৈরি ও স্বচ্ছতা

ক্ষুদ্রাস্ত্র, হালকা অস্ত্র ও বাস্তব নিরস্ত্রীকরণ : শীতল যুদ্ধের পরে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় রাষ্ট্র অভ্যন্তরীণ সংঘাতের মুখোমুখি হয়, যেখানে ক্ষুদ্রাস্ত্র খুবই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। যদিও সংঘাতের মূল কারণ নয়, তারপরও এসব অস্ত্র সংঘাত বৃদ্ধি করে, সংঘাতে শিশুর ব্যবহার বৃদ্ধি করে, মানবিক সাহায্যে ব্যাঘাত ঘটায় এবং সংঘাত-পরবর্তী পুনর্গঠন ও উন্নয়নে ব্যাঘাত ঘটায়।

পৃথিবীতে শত শত মিলিয়ন লাইসেন্স করা অস্ত্র আছে। এর মধ্যে মাত্র প্রায় তিন ভাগের দুই ভাগ আছে বেসামরিক জনগণের কাছে আর বাদবাকি আছে সামরিক ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার কাছে। অন্যান্য ধরনের ক্ষুদ্রাস্ত্রের হিসাব এখনও ঠিকমতো বোঝা যায় না।

অবৈধ অস্ত্র বাণিজ্য রোধ আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক ও জাতীয় বিষয়ের ওপর নিয়ন্ত্রণ রক্ষার্থে অতীব প্রয়োজনীয় একটি পদক্ষেপ।

২০০১ সালে জাতিসংঘে অবৈধ ক্ষুদ্রাস্ত্র সম্পর্কিত সব বিষয় নিয়ে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এর ফলাফলস্বরূপ সদস্য রাষ্ট্রগুলো একমত হন যে, নিবন্ধিত অস্ত্র প্রস্তুতকারকরা যেন তাদের তৈরি অস্ত্রে তাদের চিহ্ন ব্যবহার করে, তারা যেন তাদের অস্ত্র

তৈরি, সংরক্ষণ ও স্থানান্তরের নির্ভরযোগ্য হিসাব সংরক্ষণ করে, তারা যেন অবৈধ অস্ত্র চোরাচালান রোধে সাহায্য-সহযোগিতা করার যোগ্যতা বৃদ্ধি করে, সব বাজেয়াপ্ত অবৈধ অস্ত্র যেন নষ্ট করে ফেলা হয়। এর ফলে সব অস্ত্র চোরাচালানবিরোধী সরকারি কর্মকাণ্ড ব্যাপক বৃদ্ধি পায়। সেই প্রোগ্রামের পাঁচ বছরের মধ্যে প্রায় ১৪০টি দেশ অবৈধ অস্ত্র চোরাচালানের ওপর প্রতিবেদন করে, যেখানে তাদের মধ্যে তিনভাগ জানায় যে তারা অবৈধ অস্ত্র বাজেয়াপ্ত করতে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। আন্তঃরাষ্ট্রীয় অস্ত্র চোরাচালান রোধে রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে বর্ধিত পরিমাণে আঞ্চলিক সাহায্য-সহযোগিতা পরিলক্ষিত হয়েছিল। ২০০৬ সালে জাতিসংঘের প্রধান কার্যালয়ে দুই সপ্তাহব্যাপী একটি অনুষ্ঠানে সরকারি, আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংগঠনগুলো থেকে ২০০-এর বেশি প্রতিনিধি যোগদান করে, যেখানে তারা তাদের কর্মপদ্ধতি ও বাস্তবায়ন পুনঃপর্যালোচনা করেন। জাতিসংঘে আরো একটি পর্যালোচনা কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয় ২০১২ সালে।

যেহেতু শিশু, স্বাস্থ্য, উদ্বাস্তু ও উন্নয়নসহ অনেক বিষয়ে অবৈধ অস্ত্র চোরাচালানের ব্যাপ্তি জাতিসংঘের সমস্যা সৃষ্টি করে, তাই এ সম্পর্কিত বিষয় যেমন ক্ষুদ্রাস্ত্র, অস্ত্র সহিংসতা, অস্ত্র বাণিজ্য ও গোলাবারুদ মজুত ব্যবস্থাপনা প্রভৃতির সমন্বয় সাধন নিশ্চিত করতে ১৯৯৮ সালে কো-অরডিনেটিং অ্যাকশন অন স্মল আর্মস গঠন করা হয়।

ছবির বর্ণনা : কঙ্গোতে জাতিসংঘের মাইন অ্যাকশন কো-অরডিনেটিং সেন্টারের সাথে চুক্তিবদ্ধ একটি দল গোমার একটি আবাসিক অঞ্চলে পড়ে থাকা অবিস্ফোরিত গ্রেনেড ধ্বংসের কাজে নিয়োজিত। (২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৩, জাতিসংঘ ছবি/সিলভেইন, লিচটি)

অস্ত্র বাণিজ্য চুক্তি : প্রায় সব ধরনের বৈশ্বিক বাণিজ্যই কোনো না কোনো নীতিমালা দ্বারা পরিচালিত হয়; কিন্তু অস্ত্র বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এরূপ কোনো নীতিমালা নেই। সরকারগুলোর কাছ থেকে এটা আশা করা হয় যে, তারা তাদের অস্ত্র সংক্রান্ত বাণিজ্যে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করবে। এর অর্থ, কোনো অস্ত্র সংক্রান্ত লেনদেনের সময় তারা

অবশ্যই এটা খেয়াল রাখবে যে, তাদের সেই লেনদেন যেন কোনো সংঘাতকে সহযোগিতা না করে বা কোনো মানবাধিকার লঙ্ঘনের কাজে ব্যবহৃত না হয়।

২০০৬ থেকে দেশগুলো জাতিসংঘে এ বিষয়সমূহ নিয়ে আলোচনা করছে। ২০১২-তে তারা জাতিসংঘের প্রধান কার্যালয়ে একত্র হয়ে এ বিষয়ে অস্ত্র বাণিজ্য চুক্তি করার ক্ষেত্রে একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এই সম্মেলনটি যদিও কোনো চুক্তি সংবলিত নথিপত্র তৈরি করতে সক্ষম হয়নি। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ ২০১২-তে শুরু হওয়া এই অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করার জন্য ২০১৩-এর মার্চে আবার এটিটি-এর ওপর একটি শেষ সম্মেলন পরিচালনা করে এবং ২ এপ্রিল ২০১৩-তে অস্ত্র বাণিজ্য চুক্তি গ্রহণ করে। এটা স্বাক্ষরিত হওয়ার জন্য ৩ জুন ২০১৩-তে খোলা হয়।

ব্যক্তিবিরোধী মাইন : বিশ্বব্যাপী ব্যক্তিবিরোধী মাইনের ক্রমবিস্তার ও যত্রতত্র ব্যবহার বিশেষ দৃষ্টিদানের দাবিদার। ১৯৯৫ সালে কয়েকটি প্রচলিত অস্ত্র কনভেনশনের (তথাকথিত অমানবিক অস্ত্র কনভেনশন) পুনর্মূল্যায়নের ফলে সংশোধনী প্রটোকল-২ গৃহীত হয়, যাতে কয়েক জাতের অস্ত্র ব্যবহার হয়। আত্মবিধ্বংসী ও ডিটেক্টঅ্যাবল এবং স্থলমাইন হস্তান্তর সীমিত করা হয়। মার্চ ২০১৩ পর্যন্ত ৯৮টি দেশ এই প্রটোকল দ্বারা আবদ্ধ। এই কনভেনশনটির পাঁচটি প্রটোকল আছে, যা স্থলমাইন নিষিদ্ধ করার পাশাপাশি আরো নিষিদ্ধ করে অনির্ধারণযোগ্য টুকরা, আগ্নেয়াস্ত্র, আচ্ছন্নকারী লেজার, যুদ্ধের বিস্ফোরক অবশিষ্টাংশগুলো।

এ ধরনের একটি গুরুতর মানবিক সংকটের ক্ষেত্রে এ কার্যক্রম যথেষ্ট নয়–এ বিবেচনা থেকে একদল সমমনা দেশ একটি চুক্তির বিষয়ে আলোচনা করে, যাতে ব্যক্তিবিধ্বংসী স্থলমাইন সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ হবে। এর ফলে ব্যক্তিবিধ্বংসী মাইনের ব্যবহার, মজুত, উৎপাদন ও হস্তান্তর নিষিদ্ধকরণ এবং সেগুলো ধ্বংস সংক্রান্ত কনভেনশন গৃহীত হয়, যা ১৯৯৭ সালে স্বাক্ষরের জন্য উন্মুক্ত এবং ১৯৯৯ সালে কার্যকর করা হয়। ২০১৩-এর মার্চ মাস পর্যন্ত ১৬১টি দেশ এর সদস্য হয়।

এসব ব্যবস্থার ফলে অস্ত্র মজুতের ধ্বংস, আক্রান্ত দেশগুলোর মাইন দূরীকরণ এবং ক্ষতিগ্রস্তের সংখ্যা কমানো সম্ভব হয়েছে। ২০১১-তে স্থলমাইন ও বিস্ফোরণ ঘটিত ঘটনা থেকে সর্বমোট ৪,২৮৬টি নতুন হতাহতের ঘটনা নথিবদ্ধ হয়, যা ২০০৯ ও ২০১০-এর সংখ্যার মতোই। মাঠ পর্যায়ে মাইন বিষয়ক কাজে ১৪টি জাতিসংঘ সংস্থা, কর্মসূচি, বিভাগ এবং তহবিল চলমান আছে।

জাতিসংঘ মাইন অ্যাকশন সেবাসমূহ (UNMAS) জাতিসংঘের মধ্যে চলমান সব মাইন সম্পর্কিত কার্যাবলিগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন করে। এটা পলিসি ও মানদণ্ড তৈরি করে, ঝুঁকি পর্যালোচনা করে, ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় মানুষকে নিরাপদে থাকার প্রশিক্ষণ দেয়, সম্পদগুলোকে গতিশীল করে তোলে, ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য করে, মজুদ ধ্বংস করে, বৈশ্বিক নিষেধাজ্ঞা জারি করে এবং মাইন-ব্যান কনভেনশন উন্নীত করে। যদিও ডিমাইনিং ও মাইন রিস্ক বিষয়ক শিক্ষাদানের বেশিরভাগ কাজই করে থাকে বিভিন্ন এনজিওগুলো তারপরও বাণিজ্যিক ঠিকাদার এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে সেনাবাহিনীরাও মানবিক মাইন অ্যাকশন সার্ভিসেস প্রদান করে থাকে।

এক্সপ্লোসিভ রেমন্যান্টস অফ ওয়ার এবং ব্যক্তিবিরোধী মাইন ব্যতীত অন্যান্য মাইন। ব্যক্তিবিরোধী মাইন রোধে অনেক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়ে থাকলেও, অনেক

বেসামরিক লোক মারা যায় বা আহত হয় অন্যান্য বিস্ফোরক দ্বারা। এসব জনগণের জন্য অনেক ঝুঁকির কারণ হয় যদি না এই বিপদ ভালোমতো বোঝা না যায়। এসব ছোট পরিসরেও অনেক তীব্র ক্ষতির কারণ হতে পারে। যেমন একটি ক্ষুদ্র মাইন পারে পুরো একটি রাস্তা বন্ধ করে দিয়ে স্বাভাবিক জীবনযাপনে ব্যাপক বিঘ্ন ঘটাতে। ব্যক্তিবিরোধী আইনের অন্য দিকগুলোর সাথে যুক্ত হয়ে এসবের মানবিক প্রভাব খুবই গুরুতর হতে পারে।

সিসিডব্লিউর প্রটোকল V অনুযায়ী যুদ্ধে জড়িত দেশগুলো এ আর ডব্লিউ পরিষ্কার ও বিনষ্ট করতে, পদক্ষেপ নিতে এবং এসবের ব্যবহার নথিবদ্ধ করতে বাধ্য। তারা বেসামরিক জনগণের এবং মানবাধিকার সংস্থাগুলোর সুরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বাধ্য। প্রটোকল v ২০০৬ থেকে কার্যকর হয়।

প্রচলিত অস্ত্র রেজিস্টার : অস্ত্র হস্তান্তরের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি এবং এর মাধ্যমে রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে পরস্পর আস্থা বৃদ্ধি ও নিরাপত্তার লক্ষ্যে ১৯৯১ সালে সাধারণ পরিষদ প্রচলিত অস্ত্র সংক্রান্ত জাতিসংঘ রেজিস্টার প্রতিষ্ঠা করে। এই রেজিস্টারটি জাতিসংঘ নিরস্ত্রীকরণ বিষয়ক দপ্তর দ্বারা পরিচালিত। এই ব্যবস্থায় সরকারগুলো স্বেচ্ছায় অন্য দেশের কাছে হস্তান্তরিত মুখ্য ক্ষুদ্রাস্ত্রের হিসাব— যেমন, ট্যাংক, যুদ্ধজাহাজ, গোলন্দাজ ও ক্ষেপণাস্ত্র প্রদান করে। জাতিসংঘ সরকারি দলিল হিসেবে এসব তথ্য সংকলন করেছে এবং বার্ষিক ভিত্তিতে প্রকাশ করেছে; জাতিসংঘ ওয়েবসাইটের মাধ্যমে সাধারণ মানুষও এ তথ্য জানতে পারছে। ১৯৯১ থেকে ২০১২-এর মধ্যে ১৭৩টি দেশ এই রেজিস্টারের কাছে এক বা একাধিকবার তথ্য প্রকাশ করেছে। ২০১৩-এর জানুয়ারি পর্যন্ত ইউএনওডি এ ৫১টি জাতীয় রিপোর্ট পেয়েছে। এটা পরিমাপ করা হয় যে বিশ্বের ৯৫ শতাংশ অস্ত্রের বাণিজ্য রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

সামরিক ব্যয়জনিত স্বচ্ছতা। সামরিক ব্যাপারে স্বচ্ছতা আনার আর একটি ব্যবস্থা হচ্ছে সামরিক ব্যয়ের প্রমিত প্রতিবেদনের জাতিসংঘ ব্যবস্থা, যা ১৯৮০ সালে চালু করা হয়। সামরিক ব্যক্তি, অপারেশনস ও পরিচালনা, সংগ্রহ ও নির্মাণ এবং গবেষণা ও উন্নয়ন—এসব বিষয় এই ঐচ্ছিক ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত। জাতিসংঘ এসব তথ্য সংগ্রহ করে এবং তা প্রকাশ করে। এর শুরু থেকে ২০১২-এর জুলাই পর্যন্ত ৩০টি দেশ এই ব্যবস্থার কাছে রিপোর্ট পেশ করেছে।

মহাকাশে অস্ত্র প্রতিযোগিতা রোধ : আন্তর্জাতিক অঙ্গনে মহাশূন্য সংক্রান্ত বিষয়টি দুটি পৃথক দিক থেকে বিবেচনা করা হচ্ছে : একটি মহাশূন্য প্রযুক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহার সংক্রান্ত এবং অন্যটি পরিবেশে অস্ত্র প্রতিযোগিতা রোধ সংক্রান্ত। এসব বিষয় সাধারণ পরিষদ, মহাশূন্যের শান্তিপূর্ণ ব্যবহার সংক্রান্ত কমিটি ও সংশ্লিষ্ট সংস্থা এবং নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে আলোচিত হয়েছে। এসব আলোচনার ফলে বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক চুক্তি প্রস্তুত করা সম্ভব হয়েছে। এতে মহাশূন্যের সামরিক ও শান্তিপূর্ণ ব্যবহার— উভয় দিকই রয়েছে।

মহাকাশের বেসামরিকীকরণের গুরুত্ব অনুধাবন করে নিরস্ত্রীকরণ সংক্রান্ত সাধারণ পরিষদের প্রথম বিশেষ অধিবেশনে (১৯৭৮) এ বিষয়ে আন্তর্জাতিক সংলাপের আহ্বান জানানো হয়। ১৯৮২ সাল থেকেই নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের আলোচ্যসূচিতে রয়েছে 'মহাশূন্যে অস্ত্র প্রতিযোগিতা রোধ' সংক্রান্ত বিষয়টি কিন্তু এখন পর্যন্ত এক্ষেত্রে একটি

বহুপক্ষীয় চুক্তির দিকে সামান্যই অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয়েছে, যার কারণ সদস্যদের মধ্যে অব্যাহত মতপার্থক্য।

নিরস্ত্রীকরণ ও উন্নয়নের মধ্যে সম্পর্ক : সাধারণ নিরস্ত্রীকরণের ফলে যে সম্পদ উদ্বৃত্ত হয় তাকে কার্যকর নিয়ন্ত্রণে আন্তর্জাতিক উন্নয়ন কার্যক্রমে, বিশেষ করে স্বল্প উন্নত দেশগুলোতে ব্যবহারের বিষয়ে সদস্য দেশগুলোর মধ্যে দীর্ঘদিন ধরেই আলোচনা চলছে। ১৯৮৭ সালে নিরস্ত্রীকরণ ও উন্নয়নের মধ্যে সম্পর্ক বিষয়ে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন হয় এবং একটি কর্মসূচিও গ্রহণ করা হয়। নিরস্ত্রীকরণের দ্বারা অর্জিত সম্পদের একাংশ অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের কাজে লাগানোর জন্য সাধারণ পরিষদ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে আহ্বান জানায়, যাতে করে উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে ব্যবধান কমিয়ে আনা সম্ভব হয়।

নিরস্ত্রীকরণের আঞ্চলিক উদ্যোগ : আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক পর্যায়ে নিরস্ত্রীকরণ প্রচেষ্টাকে জাতিসংঘ সমর্থন করে। নিজ নিজ অঞ্চলে পারস্পরিক আস্থা ও নিরাপত্তা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে উৎসাহিত করাই এর লক্ষ্য। শান্তি ও নিরস্ত্রীকরণ বিষয়ক আঞ্চলিক কেন্দ্র ১৯৯৩ সালে নিরস্ত্রীরণ কমিশন গৃহীত বৈশ্বিক নিরাপত্তার পটভূমিতে আঞ্চলিক উদ্যোগের বাস্তবায়নে এটা দিকনির্দেশনা ও পরামর্শ সহায়তাও প্রদান করে। আঞ্চলিক নিরস্ত্রীকরণের বিকাশে জাতিসংঘ অঞ্চলের সরকারগুলো ও বেসরকারি সংস্থাগুলোর সঙ্গে কাজ করে, যার মধ্যে রয়েছে আফ্রিকান ঐক্য সংস্থা, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, ইউরো আটলান্টিক পার্টনারশিপ কাউন্সিল, আরব লীগ, আমেরিকার রাষ্ট্রগুলোর সংস্থা, অর্গানাইজেশন অফ ইসলামিক কোঅপারেশন, দ্য অর্গানাইজেশন ফর সিকিউরিটি অ্যান্ড কোঅপারেশন ইন ইউরোপ, দ্য স্টাবিলিটি প্যাক্ট ফর সাউথ ইস্টার্ন ইউরোপ এবং এছাড়াও অনেক আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক এনজিও।

নিরস্ত্রীকরণ তথ্য ও শিক্ষা কার্যক্রম : নিরস্ত্রীকরণ তথ্য কার্যক্রমের রূপরেখায় জাতিসংঘ তথ্য কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এই কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে প্রকাশনা, বিশেষ অনুষ্ঠান, সভা, সেমিনার, প্যানেল আলোচনা, প্রদর্শনী ও ওয়েবসাইট। ১৯৭৯ সালে এর প্রকাশের পর থেকে সাধারণ পরিষদে গৃহীত জাতিসংঘ নিরস্ত্রীকরণ বৃত্তি কর্মসূচি ১৬০টি দেশের প্রায় ৮৬০ সরকারি কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে, যারা এখন স্ব-স্ব সরকারে নিরস্ত্রীকরণের ক্ষেত্রে গুরুদায়িত্ব পালন করছে।

নিরস্ত্রীকরণে জেন্ডার প্রেক্ষিত : বর্তমান সময়ে যুদ্ধ ক্ষেত্রের চেহারা পরিবর্তন হয়েছে। কেননা মহিলা ও মেয়েরা ক্রমাগত হারে বিভিন্ন সংঘাতের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আসছে, শিকার এবং শিকারি উভয়ভাবেই। জাতিসংঘ অস্ত্র সংগ্রহ ও বিনষ্টকরণ, ডিমাইনিং, তথ্য সংগ্রহকারী মিশন পরিচালনা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং শান্তি প্রক্রিয়াসহ নিরস্ত্রীকরণের সব দিকেই লিঙ্গ প্রেক্ষিতটা অনুধাবনের ওপর জোর দিয়ে আসছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ক্ষুদ্রাস্ত্রের ওপর একটি লিঙ্গ প্রেক্ষিত বিবেচনা করবে কীভাবে এর প্রসার মেয়েদের ওপর প্রভাব ফেলে এবং এর ক্ষতিকর দিক থেকে বাঁচতে কী করা যায়। ২০০০ সালের অক্টোবরে সাধারণ পরিষদ তার বিশিষ্ট রেজুলেশন ১৩২৫ (২০০০)-এর মাধ্যমে নিরস্ত্রীকরণ, অব্যাহতি ও পুনঃপ্রতিষ্ঠা বিষয়ক পরিকল্পনায় নিয়োজিত সবাইকে মহিলা যোদ্ধা ও তাদের ওপর নির্ভরশীলদের প্রয়োজনের দিকে বিশেষ নজর দিতে উৎসাহিত করে।

মহাকাশের শান্তিপূর্ণ ব্যবহার

মহাশূন্য যাতে শান্তিপূর্ণ কাজে ব্যবহৃত হয় এবং এ কার্যক্রম দ্বারা অর্জিত লাভে যাতে সব জাতি অংশীদার হতে পারে, তা নিশ্চিত করাই জাতিসংঘের উদ্দেশ্য। ১৯৫৭ সালে মনুষ্য নির্মিত প্রথম উপগ্রহটি উৎক্ষেপণের পরপরই জাতিসংঘ প্রথম আগ্রহ প্রকাশ করে। তারপর মহাকাশ প্রযুক্তির অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এই আগ্রহ অব্যাহতভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে। আন্তর্জাতিক মহাকাশ আইন প্রণয়ন করে এবং মহাকাশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার বিকাশ ঘটিয়ে এ ক্ষেত্রে জাতিসংঘ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে।

এ ক্ষেত্রে আন্তঃসরকারি কার্যক্রমের কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে মহাকাশের শান্তিপূর্ণ ব্যবহার সংক্রান্ত জাতিসংঘ কমিটি। সাধারণ পরিষদ দ্বারা ১৯৫৯ প্রতিষ্ঠিত এই কমিটি মহাকাশের শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার সুযোগ-সুবিধা মূল্যায়ন করে থাকে। এছাড়া বিভিন্ন কর্মসূচি উদ্ভাবন করে ও জাতিসংঘ কারিগরি সহায়তায় নির্দেশনা প্রদান, গবেষণা ও তথ্য-প্রচারে উৎসাহ দেয় এবং আন্তর্জাতিক মহাকাশ আইন উন্নয়নে অবদান রাখে। এই কমিটিতে ৭৪টি সদস্য দেশ ও বেশ কিছু আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান আছে।

আইনগত বিধান

বিজ্ঞান ও কারিগরি বিষয়ক উপ-কমিটি মহাকাশ সংক্রান্ত প্রযুক্তি ও গবেষণার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে কাজ করে।

আইন বিষয়ক উপ-কমিটি মহাশূন্য সংক্রান্ত দ্রুত পরিবর্তিত পরিস্থিতি উপযোগী করে আইনগত রূপরেখা গড়ে তুলতে কাজ করে।

উক্ত কমিটি ও উপ-কমিটিগুলো বছরে একবার মিলিত হয় এবং সাধারণ পরিষদে উত্থাপনের বিষয়াদি, এদের কাছে উপস্থাপিত প্রতিবেদন এবং সদস্য দেশগুলো কর্তৃক উত্থাপিত বিষয়াদি বিবেচনা করে। ঐকমত্যের ভিত্তিতে এই কমিটি কাজ করে এবং সাধারণ পরিষদে সুপারিশমালা পেশ করে।

আইনগত বিধান আইন বিষয়ক কমিটি উপ-কমিটিতে আলাপ-আলোচনার পর পাঁচটি আইনগত দলিল প্রণয়ন করা হয়। এর সবগুলোই বলবৎ হয়েছে। এগুলো হচ্ছে–

- চাদ এবং অন্যান্য মহাজাগতিক বস্তুসহ মহাশূন্যে আবিষ্কার ও তার ব্যবহারের জন্য রাষ্ট্রগুলোর তৎপরতা পরিচালনার নীতিমালা সংক্রান্ত ১৯৬৬ সালের চুক্তি : এতে বলা হয়, উন্নয়নের মাত্রা নির্বিশেষে সব দেশের কল্যাণেই মহাশূন্য আবিষ্কার কার্যক্রম পরিচালিত হবে। বলা হয়, মহাকাশ হবে সমগ্র মানবজাতির এলাকা যে কোনো জাতির অধিকারভুক্ত হবে না; সব রাষ্ট্রের জন্য এর আবিষ্কার কার্যক্রম উন্মুক্ত থাকবে এবং কেবল শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হবে।
- নভোচারীদের উদ্ধার, প্রত্যাবর্তন এবং মহাশূন্যে উৎক্ষিপ্ত বস্তুর প্রত্যাবর্তন সংক্রান্ত ১৯৬৭ সালের চুক্তি : এতে মহাশূন্যযানের চালকদের দুর্ঘটনা বা জরুরি অবতরণ পরিস্থিতিতে সাহায্য করার ব্যবস্থা এবং মহাশূন্য যান কিংবা তার কোনো অংশ উৎক্ষেপণকারী দেশটির আঞ্চলিক সীমানার বাইরে পড়লে তা ঐ দেশকে ফেরত দেয়ার পদ্ধতি লিপিবদ্ধ রয়েছে।

- মহাশূন্যযান দ্বারা সৃষ্ট ক্ষয়ক্ষতির আন্তর্জাতিক দায়দায়িত্ব সংক্রান্ত ১৯৭১ সালের কনভেনশন : এতে বলা হয়েছে কোনো দেশের মহাশূন্যযান দ্বারা পৃথিবীপৃষ্ঠের চলন্ত বিমানের, এমনকি অন্য দেশের মহাশূন্যযানের, ব্যক্তির বা সম্পত্তির, অথবা সমুদ্রবক্ষে অনুরূপ কোনোকিছুর ক্ষয়ক্ষতি ঘটলে সে ক্ষতির জন্য উৎক্ষেপণকারী দেশটিই দায়ী হবে;
- মহাশূন্যে উৎক্ষিপ্তযানের তালিকাভুক্ত সংক্রান্ত ১৯৭৪ সালের কনভেনশন : এতে বলা হয়েছে উৎক্ষেপণকারী দেশগুলোকে তাদের উৎক্ষিপ্ত মহাশূন্যযানের তালিকা সংরক্ষণ করতে হবে। এতে উৎক্ষিপ্ত প্রতিটি মহাশূন্য বস্তু সম্পর্কে জাতিসংঘকে তথ্য সরবরাহ করতে হবে। তাছাড়া চুক্তির বিধান অনুযায়ী মহাকাশ দফতর কেন্দ্রীয়ভাবে জাতিসংঘের একটি রেজিস্ট্রি খাতায় এসব অন্তর্ভুক্তি করবে। সব উৎক্ষেপণকারী দেশ ও ইউরোপীয় মহাকাশ এজেন্সি এ ক্ষেত্রে তথ্য সরবরাহ করবে;
- চাঁদ এবং মহাকাশের অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহে কার্যক্রম পরিচালনা সংক্রান্ত ১৯৭৯ সালের চুক্তি : এতে ১৯৯৬ সালের চুক্তিতে নির্ধারিত চাঁদ ও অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহ সম্পর্কিত নীতিমালাই আরো সুনির্দিষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এছাড়া মহাশূন্যে আবিষ্কার ও তা থেকে প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণের ব্যাপারে ভবিষ্যতে আইন-কানুনের ভিত্তিও স্থাপন করেছে এই চুক্তি।

কমিটি এবং এর আইন সংক্রান্ত উপ-কমিটির কাজের ভিত্তিতে সাধারণ পরিষদ মহাকাশ কার্যক্রম সম্পর্কিত কিছু নীতিমালা গ্রহণ করে, যার মধ্যে রয়েছে–

- ১৯৮২ সালে সাধারণ পরিষদ রাষ্ট্রগুলো কর্তৃক সরাসরি আন্তর্জাতিক টেলিভিশন সম্প্রচারের জন্য কৃত্রিম ভূ-উপগ্রহ ব্যবহারের পরিচালন নীতিমালা গ্রহণ করে। এ ধরনের ব্যবহারের আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক তাৎপর্য বিবেচনা করে পরিষদ স্বীকার করে যে, এসব কার্যকলাপ তথ্য ও জ্ঞানের বিনিময় ও প্রসারের বিকাশ ঘটাবে, উন্নয়ন সহায়ক হবে এবং হস্তক্ষেপ না করার নীতিমালাসহ রাষ্ট্রের সার্বভৌম অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা জানাবে।
- ১৯৮৬ সালে গৃহীত মহাকাশ থেকে পৃথিবীর দূর অনুধাবন সম্পর্কিত নীতিমালায় বলা হয়, এ ধরনের কার্যক্রম পরিচালিত হতে হবে সব দেশের কল্যাণে, নিজস্ব প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর সব রাষ্ট্র ও জনগোষ্ঠীর সার্বভৌমত্বের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে এবং সেই সাথে অন্যান্য রাষ্ট্রের অধিকার ও স্বার্থের প্রতি নজর দিতে হবে। দূর অনুধাবনকে পৃথিবীর প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষা এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে মানবজাতিকে রক্ষার কাজে লাগাতে হবে।
- ১৯৯২ সালে গৃহীত মহাকাশে পারমাণবিক শক্তি উৎসের ব্যবহার সংক্রান্ত নীতিমালা : এতে স্বীকার করা হয়, মহাকাশে কিছু কার্যক্রমের জন্য এর ব্যবহার অপরিহার্য; কিন্তু এর ব্যবহার করতে হবে ব্যাপক নিরাপত্তা যাচাইয়ের ভিত্তিতে। এই নীতিমালায় পারমাণবিক শক্তি উৎসগুলোর নিরাপদ ব্যবহারের জন্য নির্দেশনা এবং কোনো মহাকাশ বস্তুর অকার্যকরতার ফলে পৃথিবীতে তেজস্ক্রিয় পদার্থ পুনঃপ্রবেশের সম্ভাবনা আছে এমন বিপজ্জনক বিষয় অবহিতকরণের বিধান আছে।

- ১৯৯৬ সালে গৃহীত সব রাষ্ট্র, বিশেষত উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলোর স্বার্থে মহাকাশের অভিযান ও ব্যবহার সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ঘোষণা : এতে বলা হয়, সমতা ও পারস্পরিক গ্রহণযোগ্য প্রক্রিয়ার ভিত্তিতে রাষ্ট্রগুলো আন্তর্জাতিক মহাকাশ সহায়তা কার্যক্রমে তাদের অংশগ্রহণ সংক্রান্ত সব বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারে এবং এ সহযোগিতা এমনভাবে পরিচালিত হবে, যা সর্বোচ্চ কার্যকর ও যথাযথ হিসেবে পরিগণিত হবে।

মহাকাশ বিষয়ক দপ্তর

ভিয়েনাভিত্তিক জাতিসংঘ মহাকাশ বিষয়ক কার্যালয় মহাকাশের শান্তিপূর্ণ ব্যবহার সংক্রান্ত কমিটির সচিবালয়ের দায়িত্ব পালন করে এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোকে উন্নয়নের জন্য মহাকাশ প্রযুক্তি ব্যবহারে সহায়তা করে। আন্তর্জাতিক মহাকাশ তথ্য ব্যবস্থার মাধ্যমে এই কার্যালয় সদস্য দেশগুলোকে মহাকাশ সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ করে। জাতিসংঘ মহাকাশ প্রয়োগ কর্মসূচির মাধ্যমে এই কার্যালয় পাইলট প্রকল্প পরিচালনায় সদস্য রাষ্ট্রগুলোকে কারিগরি পরামর্শ সেবা দেয় এবং দূর অনুধাবন, উপগ্রহ যোগাযোগ, উপগ্রহ আবহাওয়াবিদ্যা ও মৌলিক মহাকাশ বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে।

অফিসটি হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল চার্টার 'স্পেস অ্যান্ড মেজর ডিজাস্টারস' নামক একটি পদ্ধতির অংশ, যার মাধ্যমে জাতিসংঘের সংস্থাগুলো যে কোনো দুর্যোগ মোকাবেলায় উপগ্রহ চিত্রের জন্য অনুরোধ করতে পারে। অফিসটি ইন্টারন্যাশনাল কমিটি অন গ্লোবাল নেভিগেশন স্যাটেলাইট সিস্টেমস নামক একটি অনানুষ্ঠানিক কাঠামোর সচিবালয় হিসেবে বেসামরিক উপগ্রহনির্ভর অবস্থান নির্ণয়, পরিচালনা, সময় নির্ধারণ ও অন্যান্য মূল্য সংযোজন সেবা প্রদানসহ স্যাটেলাইট নেভিগেশন সিস্টেমের অন্তক্রিয়া ও সঙ্গতি পর্যালোচনা করে দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নের জন্য সাহায্য প্রদান করে, বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে।

মহাশূন্য বিষয়ক অফিসটি ইউনাইটেড নেশন্স প্লাটফর্ম ফর স্পেস বেসড ইনফরমেশন ফর ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ইমার্জেন্সি রেসপন্স (ইউএন স্পাইডার) রক্ষণাবেক্ষণ করে। সাধারণ পরিষদ কর্তৃক ২০০৬ সালের ডিসেম্বরে প্রতিষ্ঠিত এই ইউএন স্পাইডার সব দেশকে যে কোনো দুর্যোগ মোকাবেলায় সব ধরনের মহাশূন্য বিষয়ক তথ্যাদি দিয়ে সামগ্রিক সাহায্য করে থাকে। এটা আরও সাহায্য করে দুর্যোগ মোকাবেলায় কীভাবে আরো বেশি পরিমাণ দেশকে তাদের দুর্যোগকালীন পরিকল্পনা, ঝুঁকি কমানো ও অন্যান্য পদ্ধতিগত ব্যাপারে মহাকাশ বিষয়ক তথ্যাদি দিয়ে সাহায্য করা যায়।

অফিসটি আঞ্চলিক মহাকাশ গবেষণা ও শিক্ষা বিষয়ক কেন্দ্রগুলোকে কারিগরি সাহায্য দিয়ে থাকে। এই কেন্দ্রগুলো সদস্য রাষ্ট্রের সাথে মহাকাশ বিষয়ক সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে কাজ করে। তারা দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নের উদ্দেশ্যে মহাকাশ বিজ্ঞানী ও গবেষকদের তাদের মহাকাশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক দক্ষতা ও জ্ঞান বৃদ্ধিতে সাহায্য করে থাকে। এখানে চারটি আঞ্চলিক কেন্দ্র আছে। দুটি আফ্রিকান কেন্দ্র অবস্থিত মরক্কো ও নাইজেরিয়াতে; প্যাসিফিক অঞ্চলের কেন্দ্র অবস্থিত ভারতে; পশ্চিম এশিয়ার

কেন্দ্র অবস্থিত জর্ডানে এবং যুগ্ম লাতিন আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ান কেন্দ্রে অবস্থিত মেক্সিকো ও ব্রাজিলে।

মহাশূন্য বিষয়ক দপ্তরটি ইন্টার-এজেন্সি মিটিং অন আউটার স্পেস অ্যাক্টিভিটিস নামক একটি সংস্থার সচিবালয় হিসেবে কাজ করে, যা ১৯৭৫ সাল থেকে প্রতিবছর মিলিত হয়; যাতে করে জাতিসংঘরে সংস্থাগুলোর মধ্যে সমন্বয়, তাদের কর্মকাণ্ডের মধ্যে সমন্বয় ও নতুন পদক্ষেপ গ্রহণ সম্ভব হয়। এই বৈঠকগুলো মহাসচিবের জাতিসংঘের মহাশূন্য বিষয়ক কর্মকাণ্ডের সমন্বয় সম্পর্কিত প্রতিবেদনে প্রকাশিত হয়।

সম্মেলনসমূহ : জাতিসংঘ এ পর্যন্ত মহাশূন্যে পর্যবেক্ষণ ও শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলনের আয়োজন করে, যার সবগুলোই ভিয়েনাতে অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমটি ১৯৬৮ সালে অনুষ্ঠিত হয়, পর্যবেক্ষণ করে মহাকাশ গবেষণা ও পর্যবেক্ষণের ব্যবহারিক উপযোগিতা। দ্বিতীয় সম্মেলনটি (ইউনিস্পেস '৮২) পর্যবেক্ষণ করে মহাকাশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অবস্থা, বিবেচনা করে মহাকাশ প্রযুক্তির উন্নয়ন ও প্রয়োগ এবং আন্তর্জাতিক মহাকাশ সহযোগিতা বিষয়ক আলোচনা করে। ইউনিস্পেস-৩ অনুষ্ঠিত হয় ১৯৯৯, যা বর্ণনা করে কিছু কর্মকাণ্ড যার লক্ষ্য ছিল : বৈশ্বিক পরিবেশ রক্ষা ও প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ, মানবিক নিরাপত্তা রক্ষা ও উন্নয়নের লক্ষ্যে মহাকাশ প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি, মহাকাশের পরিবেশ রক্ষা, মহাকাশ প্রযুক্তি ও গবেষণায় উন্নয়নশীল দেশগুলোর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি এবং প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন, বিশেষ করে যুবসমাজের মধ্যে। ইউনিস্পেস-৩ আরো প্রস্তাব করে একটি বৈশ্বিক পদ্ধতির, যা দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতি প্রশমন, ত্রাণ ও প্রতিরোধ ব্যবস্থা পরিচালনা করবে; শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটাবে এবং পৃথিবীর নিকটবর্তী বস্তু বিষয়ক আন্তর্জাতিক সমন্বয় সাধন করবে।

২০০৪ সালে সাধারণ পরিষদ একটি পাঁচ বছর মেয়াদি পর্যালোচনা পরিচালনা করে যা ইউনিস্পেস-৩-এর পরামর্শগুলোর প্রয়োগ ও অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করে।

পরিষদ কর্তৃক প্রস্তাবিত একটি কর্মপদ্ধতি দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নের লক্ষ্যে আরো পদক্ষেপের আহ্বান জানায়। ইউনিস্পেস-৩-এর বাস্তবায়নের ফলে ইউএন স্পাইডার এবং ইন্টারন্যাশনাল কমিটি অন গ্লোবাল নেভিগেশন স্যাটেলাইট সিস্টেম প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়।

উপনিবেশবাদের অবসান

প্রায় ১০০টি দেশ যা পূর্বে কলোনিয়াল শাসনব্যবস্থা বা ন্যাসরক্ষা ব্যবস্থায় ছিল ১৯৪৫ সালে প্রতিষ্ঠানের জন্মের পর থেকে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্ররূপে জাতিসংঘে যোগদান করে। এছাড়াও আরও অনেক অঞ্চল স্বাধীনতা অর্জন করে রাজনৈতিক সম্পর্কে বা অন্যান্য স্বাধীন রাষ্ট্রের সাথে যুক্ত হয়ে। জাতিসংঘ এসব নির্ভরশীল অঞ্চলের স্বাধীনতা অর্জনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। জাতিসংঘ মিশনগুলো বিভিন্ন নির্বাচন তত্ত্বাবধান করেছে, যার মাধ্যমে টগোল্যান্ড (১৯৫৬ ও ১৯৬৮), পশ্চিম সোমাউ (১৯৬১), নামিবিয়া (১৯৮৯) এবং সর্বশেষ তিমুর লেস্তে (২০০২) স্বাধীনতা অর্জন করে। ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে এ বিশাল অর্জনের পরেও প্রায় দুই মিলিয়ন মানুষ এখনো ঔপনিবেশিক শাসনের অধীনে বসবাস করে। এসব পরাধীন অঞ্চলগুলোকে স্বাধীন করার লক্ষ্যে জাতিসংঘ এর প্রচেষ্টা এখনো চালিয়ে যাচ্ছে। ।

জাতিসংঘের ডিকলোনাইজেশন কার্যক্রমগুলো 'সমান অধিকার এবং আত্মনিয়ন্ত্রণ'-এর চার্টার মূলনীতি এবং চার্টারের চ্যাপ্টার ১১ ১২ ও ১৩ (যা স্বাধীন মানুষের স্বার্থ নিয়ে আলোচনা করে) থেকে উদ্ভূত। ১৯৬০ সাল থেকে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ডিক্লারেশন অন দ্য গ্রান্টিং অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স টু কলোনিয়াল কান্ট্রিস অ্যান্ড পিপুল দ্বারা বিশেষভাবে পরিচালিত, যা ডিক্লারেশন অন ডিকলোনাইজেশন নামেও পরিচিত। এর মাধ্যমে সদস্য রাষ্ট্রগুলো কলোনিয়ালিজমের দ্রুত অবসান ঘোষণা করে। ১৯৬০ সালে সাধারণ পরিষদের ১৫৪১ (১৫) রেজুলেশন অ-স্বশাসিত অঞ্চলগুলোকে নিজস্ব সরকার দেয়ার ব্যাপারে তিনটি বিকল্প পথ দেখায় :

- গণতান্ত্রিক উপায়ে উক্ত অঞ্চলের জনগণের ইচ্ছা ও মতামতের ভিত্তিতে অন্য কোনো প্রতিনিধিত্বশীল শক্তি বা স্বাধীন অঞ্চলের সাথে মুক্তভাবে যুক্ত হওয়া।
- অন্য কোনো প্রতিনিধিত্বশীল শক্তি বা স্বাধীন রাষ্ট্রের সাথে সম্পূর্ণ সমতার ভিত্তিতে একত্র হওয়া।
- স্বাধীনতা লাভ করা।

আন্তর্জাতিক অছি সিস্টেম

চার্টারের চ্যাপ্টার ১২ অনুযায়ী আস্থা অঞ্চলগুলো দেখাশোনা করার জন্য জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক অছি সিস্টেম প্রতিষ্ঠা করে। এই সিস্টেমটি প্রয়োগ হয় সেসব অঞ্চলের ওপর, যা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের পরে এবং যেসব অঞ্চল শত্রু দেশ থেকে পৃথক হয় দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পর পর। এই সিস্টেমের উদ্দেশ্য ছিল এই অঞ্চলগুলোর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন এবং তাদেরকে ক্রমান্বয়ে নিজ নিজ শাসন ব্যবস্থা ফিরিয়ে দেয়া।

ন্যাসরক্ষা কাউন্সিল গঠিত হয় চার্টারের চ্যাপ্টার ১৩ অনুযায়ী, যাতে করে এটা নিশ্চিত করা সম্ভব হয় যে, আস্থা অঞ্চলগুলোর রক্ষণাবেক্ষণে নিয়োজিত সরকারগুলো চার্টারের লক্ষ্য অর্জনে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

জাতিসংঘের প্রথম বছরগুলোতে ১১টি অঞ্চল এই ন্যাসরক্ষা সিস্টেমের অন্তর্ভুক্ত হয়। ক্রমান্বয়ে এই ১১টি অঞ্চলই স্বাধীন হয় বা কোনো না কোনো স্বাধীন দেশের সাথে যুক্ত হয়। এদের মধ্যে সবশেষে এরূপ করে আস্থা অঞ্চল প্যাসিফিক আইল্যান্ড (পালাউ), যা যুক্তরাষ্ট্রের দ্বারা পরিচালিত ছিল। নিরাপত্তা পরিষদ ১৯৯৪ সালে এর ট্রাস্টিশিপ চুক্তি বাতিল করে, যখন এটা ১৯৯৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে মুক্তভাবে যুক্ত হয়। পালাউ ১৯৯৪ সালে স্বাধীন হয় এবং জাতিসংঘে যোগদান করে এর ১৮৫তম সদস্য হিসেবে। এর মাধ্যমে যখন আর কোনো অঞ্চল বাকি না থাকে তখন ন্যাসরক্ষা সিস্টেমের ঐতিহাসিক কাজ সম্পন্ন করে।

অস্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল

অস্বায়ত্তশাসিত কার্যকরী অঞ্চল জাতিসংঘের দলিল যা অস্বায়ত্তশাসিত কার্যকরী অঞ্চলের ন্যাসরক্ষা ব্যবস্থা নামেও পরিচিত। দলিলের ১১তম অধ্যায়–অস্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল সংক্রান্ত ঘোষণা, যেখানে বলা হয় যে এই শাসনের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলগুলো জানে 'এই অঞ্চলের বাসিন্দাদের পবিত্র বিশ্বাস।' তারা তাদের এই দায়িত্ব পালনে বিশ্বাস রাখে।

শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক, সামাজিক, শিক্ষা ওই সব মানুষের জন্য প্রশাসনিক ক্ষমতা নিশ্চিত করে। তাদের আত্মউন্নয়নের ব্যবস্থা করে এবং সরকারি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করে। প্রশাসনিক ক্ষমতার দায়ভার থাকে নিয়মিত মহাসচিবের কাছে অর্থনৈতিক সামাজিক এবং শিক্ষাব্যবস্থার অবস্থার অনুলিপি প্রদান করা।

১৯৪৬ সালে আট সদস্য দেশ—অস্ট্রেলিয়া, বেলজিয়াম, ডেনমার্ক, ফ্রান্স, নেদারল্যান্ডস নিউজিল্যান্ড, যুক্তরাজ্য এবং যুক্তরাষ্ট্র এসব অ-স্বায়ত্তশাসিত দেশগুলোর দায়িত্ব নেয়। এরকম ৭২টি অঞ্চল ছিল, তাদের মধ্যে ৮টি ১৯৫৯-এর আগেই স্বাধীন হয়ে যায়। ১৯৬৩ সালে পরিষদ ৬৪টি অঞ্চলের সংশোধিত লিস্ট প্রদান করে ১৯৬০-এর পুনর্বাসন ঘোষণার প্রয়োগের জন্য। এখন এমন ১৬টি অঞ্চল ফ্রান্স, নিউজিল্যান্ড, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের শাসনের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

২০০৫ সালে টোকেলাউর জাতীয় প্রতিনিধি জেনারেল ফোনো প্রথমে একটি খসড়া চুক্তির অনুমোদন দেয় টোকেলাউ ও নিউজিল্যান্ডের মধ্যে একটি স্বাধীন সংস্থার এবং পরবর্তীকালে একটি খসড়া সংবিধানের অনুমোদন প্রদান করে। ২০০৬ সালের গণভোটে ৬০ ভাগ টোকেলাউর ভোটার একটি স্বাধীন সংস্থার পক্ষে ভোট দেয় এবং যা ছিল দুই-তৃতীয়াংশের কম। দ্বিতীয় গণভোট অনুষ্ঠিত হয় ২০০৭ সালে, যাতে মাত্র ১৬ ভোট কম ছিল। পরবর্তীকালে ২০১২ সালের জুনে জাতিসংঘের সাধারণ সভা জানায়, ২০০৮-এ জেনারেল ফোনোর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী টোকেলাউ তাদের ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্য যে কোনো সিদ্ধান্ত স্থগিত করে এবং নিউজিল্যান্ড ও টোকেলার সাধারণ সেবা এবং অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে ওই দ্বীপের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করবে।

ঔপনিবেশিক দেশ ও মানুষের স্বাধীনতার ঘোষণা

পরাধীন অঞ্চলের মানুষের স্বাধীন হওয়ার আকাঙ্ক্ষা ১৯৬০ সালে জাতিসংঘ খুব ধীরে ধীরে সাধারণ পরিষদের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সামনে তুলে আনে ঔপনিবেশিক দেশ ও মানুষের স্বাধীনতার ঘোষণার দলিল দ্বারা। এই দলিল ঘোষণা করে যে, অন্য দেশ থেকে আসা শাসকগোষ্ঠী নিয়মের বাইরে গিয়ে পরাধীন নাগরিকদের পরাজিত এবং প্রভাব বিস্তারসহ মানবাধিকার লঙ্ঘন করে, যা আন্তর্জাতিক শান্তি ও সৌহার্দ্যের পরিপন্থী। এতে আরও বলা হয়, যেসব অঞ্চল এখনও স্বাধীনতা কিংবা বিশ্বস্ত ও নিজেদের নির্বাচিত সরকার পায়নি তাদের কোনো শর্ত বা সংরক্ষণশীলতা ছাড়া এবং স্বাধীনভাবে তাদের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটিয়ে সব ক্ষমতা তাদের সরকারের হাতে তুলে দিতে হবে কোনো ধর্ম বা অন্য কিছুর বিভক্তি না ঘটিয়ে যাতে তারা তাদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ও মুক্তি উপভোগ করতে পারে। ১৫৪১ ধারা অনুযায়ী, পরিষদ তিনটা নিয়মসম্মত রাজনৈতিক সমাধান তুলে ধরে, যেমন সম্পূর্ণ নিজেদের সরকার, কোনো স্বাধীন রাষ্ট্রের মুক্ত রাজ্য অথবা কোনো স্বাধীন দেশের সাথে যুক্ত হওয়া।

অঞ্চলগুলো যারা ঔপনিবেশিক দেশ থেকে ক্রমাগত জনগণের স্বাধীনতা প্রদানের ঘোষণার প্রয়োগ হয়ে আসছে :

অঞ্চল	শাসক কর্তৃপক্ষ
আফ্রিকা	
পশ্চিম সাহারা	-
প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল	
আমেরিকান সামোয়া	যুক্তরাষ্ট্র
গুয়াম	যুক্তরাষ্ট্র
নিউ ক্যালেডোনিয়া	ফ্রান্স
পিটকাইরিন	যুক্তরাজ্য
টোকেলাউ	নিউজিল্যান্ড
আটলান্টিক মহাসাগর, ক্যারিবীয় ও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল	
অ্যাঙ্গোলা	যুক্তরাজ্য
বারমুডা	যুক্তরাজ্য
টার্ক ভার্জিন আইল্যান্ড	যুক্তরাজ্য
কায়মান আইল্যান্ড	যুক্তরাজ্য
ফকল্যান্ড আইল্যান্ড	যুক্তরাজ্য
জিব্রালটার	যুক্তরাজ্য
মন্টসেররাত	যুক্তরাজ্য
সেইন্ট হেলেনা	যুক্তরাজ্য
তুরক্স অ্যান্ড কাইকাস আইল্যান্ড	যুক্তরাজ্য
ইউনাইটেড স্টেট ভার্জিন আইল্যান্ড	যুক্তরাষ্ট্র

১৯৬১ সালে পরিষদের প্রয়োগ ও ঘোষণা পরীক্ষা এবং প্রয়োগের ওপর সুপারিশের জন্য একটি বিশেষ কমিটি গঠন করে। সাধারণত একে বলা হয়, স্পেশাল কমিটি অন ডিকলোনাইজেশন যার পূর্ণ নাম হলো–'Special Committee on the Situation with Regard to the Implementation of the Declaration on the granting of Independence to Colonial Countries and Peoples'.

এই কমিটি প্রতি বছর মিলিত হয় এবং আঞ্চলিক প্রতিনিধিদের অনুরোধ শোনে, ওইসব অঞ্চলে পরিদর্শক পাঠায় এবং অঞ্চলের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষার অবস্থার ওপর বার্ষিক সেমিনারের আয়োজন করে।

পশ্চিম সাহারা : ১৯৭৬ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি, স্পেন মহাসচিবকে জানায় যে এটা সাহারা অঞ্চলে এর উপস্থিতি তুলে নেবে এবং সেসব অঞ্চলের প্রশাসনিক ক্ষমতা ওই অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত স্বল্পমেয়াদি প্রশাসনকে হস্তান্তর করবে। ১৯৯০ সালে সাধারণ পরিষদ পুনরায় নিশ্চিত করে যে, পশ্চিম সাহারার প্রশ্নে উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে প্রশ্ন যা পশ্চিম সাহারার মানুষদের দ্বারা সম্পূর্ণ থাকা।

নিউ ক্যালেডোনিয়া : ১৯৮৬ সালের ২ ডিসেম্বর সাধারণ পরিষদ মনস্থির করে যে, নিউ ক্যালেডোনিয়া একটা অস্বায়ত্তশাসিত কার্যকরী অঞ্চল।

এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের ঘোষণার পর প্রায় ৮০ মিলিয়ন মানুষের ৬০টি ঔপনিবেশিক অঞ্চল স্বাধীনতার মাধ্যমে নিজস্ব মত প্রকাশের সুযোগ পায় এবং স্বতন্ত্র দেশ হিসেবে জাতিসংঘে যোগদান করে। পরিষদ সব প্রশাসনিক ক্ষমতা প্রদান করে সব পদক্ষেপ নেয়ার জন্য ওই সব পরাধীন অঞ্চলের মানুষদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদানের উদ্দেশে। ওই ঘোষণা প্রয়োগের জন্য এটা সেসব অঞ্চল থেকে সব মিলিটারি বেস অপসারণের জন্য বলে। কারণ যাতে বিদেশি অর্থনীতি বা উন্নয়নে বাধাদানকারীদের সব কর্মকাণ্ড বন্ধ হয়।

এই কারণে ১৯৯৯ সালে নিউ ক্যালেডোনিয়ার জন্য স্বাক্ষরিত চুক্তির পর টোকেলাউ কমিটির সাথে নিউজিল্যান্ড তাদের সাহায্য বৃদ্ধি করে। সাম্প্রতিক বছরে কমিটির কাজে কোনো প্রশাসনই অংশগ্রহণ করেনি। যুক্তরাষ্ট্র ঘোষণা করে যে, এটা প্রশাসনের নিচে এর কাজ সম্পর্কে সচেতন রয়েছে এবং জাতিসংঘের অধীনে দলিলের দায়ীদের সাথে দেখা করে যাবে। যুক্তরাজ্য বারবার বলতে থাকে যে, যখন অধিকাংশ অঞ্চল স্বাধীনতা চায় তখন কিছু কিছু অঞ্চল এর সাথেও থাকতে চায়।

উপনিবেশবাদ উৎপাটনের প্রথম দশক (১৯৯১-২০০০) পার হওয়ার পর জাতিসংঘ দ্বিতীয় দশক (২০০১-২০১০) ঘোষণা করে এবং এই সদস্য রাষ্ট্রগুলোকে প্রচেষ্টা দ্বিগুণের জন্য উৎসাহিত করে। ঘোষণার উদ্দেশ্য পূরণ কিংবা জাতিসংঘের দলিলের সাথে পশ্চিম সাহারার মতো অঞ্চলের উপনিবেশবাদ দূর করার জন্য পরিষদ জেনারেল সেক্রেটারির ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে। ৬৫/১১৯ ধারা অনুযায়ী পরিষদ একটা তৃতীয় দশক (২০১১-২০২০) ঘোষণা করে।

নামিবিয়া

১৯৯০ সালে জাতিসংঘ নামিবিয়াকে স্বাধীনতার জন্য সাহায্য করে। একটা সমস্যা এই অঞ্চলের স্বাধীনতার জন্য শান্তিপূর্ণ পথ নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় প্রচেষ্টায় জটিলতা সৃষ্টি করে। নামিবিয়া, যা সাধারণত দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা নামে পরিচিত, এটা ছিল জাতিপুঞ্জের আদেশ পদ্ধতির ভেতর একটা আফ্রিকান অঞ্চল।

১৯৪৬ সালে সাধারণ পরিষদ দক্ষিণ আফ্রিকাকে ন্যাস রক্ষা সিস্টেমের অধীনে এই অঞ্চল দেখাশোনা করতে বলে। দক্ষিণ আফ্রিকা আপত্তি জানায় এবং ১৯৪৯ সালে জাতিসংঘকে জানায় যে, এই অঞ্চল সম্পর্কে সে আর কোনো তথ্য দেবে না। কারণ লীগের পতনের পরে সেই আদেশ আর বহাল ছিল না। সাধারণ পরিষদ মন্তব্য করে যে, দক্ষিণ আফ্রিকা তার দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছে এবং ১৯৬৬ সালে সে আদেশ বাতিল করে এই অঞ্চলের দায়িত্ব ইউনাইটেড নেশন্স কাউন্সিল ফর সাউথ ওয়েস্ট আফ্রিকার ওপর ন্যস্ত করে, যা ১৯৬৮ সালে নাম পরিবর্তন করে কাউন্সিল ফর নামিবিয়া হয়। ১৯৭৬ সালে নিরাপত্তা পরিষদ আর্জি জানায় যে, দক্ষিণ আফ্রিকা যেন জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে এই অঞ্চলের নির্বাচন মেনে নেয়। সাধারণ পরিষদ জানায় যে, স্বাধীনতা বিষয়ক আলোচনা অবশ্যই সাউথ ওয়েস্ট আফ্রিকা পিপলস অর্গানাইজেশনকে সঙ্গে নিয়ে হতে হবে। কারণ এটি নামিবিয়ান জনগণের একমাত্র প্রতিনিধি।

১৯৭৮ সালে কানাডা, ফ্রান্স, জার্মান প্রজাতন্ত্র, যুক্তরাজ্য এবং যুক্তরাষ্ট্র নিরাপত্তা পরিষদের কাছে একটি নিষ্পত্তির প্রস্তাব করে, যেখানে জাতিসংঘের পৃষ্ঠপোষকতায় একটি গণপরিষদ নির্বাচনের কথা বলা হয়। কাউন্সিল এই প্রস্তাবের বাস্তবায়নে

মহাসচিবের উপদেশ অনুমোদন করে, যেখানে নামিবিয়ার জন্য একটি বিশেষ প্রতিনিধি নিয়োগের সুপারিশ করে এবং ইউনাইটেড নেশন্স ট্র্যাজিশন অ্যাসিস্ট্যান্স গ্রুপ গঠন করে। মহাসচিব এবং তার বিশেষ প্রতিনিধিদের বছরে একাধিক আলোচনা ছাড়াও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় ১৯৮৮ সালে শেষ পর্যন্ত সাউদার্ন আফ্রিকায় শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়, যার মাধ্যমে দক্ষিণ আফ্রিকা নির্বাচনের দ্বারা নামিবিয়ার স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে মহাসচিবকে সাহায্য করতে সম্মত হয়।

যে অপারেশনের মাধ্যমে নামিবিয়া স্বাধীন হয় তা শুরু হয়েছিল ১৯৮৯ সালে। ইউনাইটেড নেশনস ট্র্যানজিশন অ্যাসিস্ট্যান্স গ্রুপ সমস্ত নির্বাচন কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ করেছিল। নির্বাচনটি যদিও নামিবিয়ান কর্তৃপক্ষ দ্বারাই পরিচালিত হয়েছিল। এটি এসডব্লিউএপিও দক্ষিণ আফ্রিকার মধ্যে শান্তি চুক্তি পর্যবেক্ষণ করেছিল, সব সামরিক কার্যক্রম বন্ধ করেছিল, মসৃণ নির্বাচনী কার্যক্রম নিশ্চিত করেছিল এবং সাথে সাথে স্থানীয় পুলিশও পর্যবেক্ষণ করেছিল।

গণপরিষদের নির্বাচন এসডব্লিউএপিও জয়লাভ করে এবং মহাসচিব এটাকে অবাধ ও নিরপেক্ষ হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন। নির্বাচনের পরে দক্ষিণ আফ্রিকা তার অবশিষ্ট সৈন্য প্রত্যাহার করে। গণপরিষদ একটি সংবিধান তৈরি করে, যা ১৯৯০-এর ফেব্রুয়ারিতে অনুমোদিত হয় এবং নির্বাচিত এসডব্লিউএপিও-এর নেতা স্যাম নুজমা পাঁচ বছরের জন্য প্রেসিডেন্ট হন। মার্চে নামিবিয়া স্বাধীনতা লাভ করে। মহাসচিব প্রথম প্রেসিডেন্টের শপথ গ্রহণ পরিচালনা করেন। ঐ বছর এপ্রিলেই নামিবিয়া জাতিসংঘে যোগদান করে।

তিমুর লেস্তে

জাতিসংঘের আরো একটি সফলতার কাহিনী হলো তিমুর লেস্তের স্বাধীনতা অর্জন, যা পূর্বে পূর্ব তিমুর নামে পরিচিত ছিল। জাতিসংঘের একটি প্রধান অপারেশন তিমুর লেস্তের স্বাধীনতা অর্জনকালীন পরিস্থিতি তদারক করে। পূর্ব তিমুরের জনগণের স্বাধীনতার পক্ষে ভোট প্রদানের ফলে এটি ১৯৯৯ সালে স্বাধীনতা লাভ করে।

তিমুর আইল্যান্ড অবস্থিত অস্ট্রেলিয়ার উত্তরে ইন্দোনেশিয়া গঠনকারী দ্বীপ শৃঙ্খলের দক্ষিণ-মধ্যাঞ্চলে। এর পশ্চিম অংশ ছিল একটি ডাচ উপনিবেশ এবং পরে ইন্দোনেশিয়ার অংশ হয়, যখন এটি স্বাধীনতা অর্জন করে। পূর্ব তিমুর ছিল একটি পর্তুগিজ উপনিবেশ।

১৯৬০ সালে সাধারণ পরিষদ পূর্ব তিমুরকে অ-স্বশাসিত অঞ্চলের তালিকাভুক্ত করে। ১৯৭৪ সালে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার বুঝতে পেরে পর্তুগাল একটি সাময়িক সরকার গঠন করার উদ্যোগ নেয় পূর্ব তিমুরের অবস্থা নিরূপণের জন্য। ১৯৭৫ সালে গৃহযুদ্ধ শুরু হলে পর্তুগাল সরে আসে এবং স্বীকার করে যে, সে অবস্থা নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হয়েছে।

একটি পূর্ব তিমুরীয় অংশ নিজেদের একটি স্বাধীন দেশ হিসেবে ঘোষণা করে আর আরেকটি ইন্দোনেশিয়ার অংশ হিসেবে নিজেদের স্বাধীনতা ঘোষণা করে।

ডিসেম্বর মাসে ইন্দোনেশিয়ার সেনাবাহিনী পূর্ব তিমুরে অবতরণ করে এবং একটি অস্থায়ী সরকার গঠন করে। পর্তুগাল ইন্দোনেশিয়া সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে এবং নিরাপত্তা পরিষদে বিষয়টি উত্থাপন করে, যার ফলে নিরাপত্তা পরিষদ ইন্দোনেশিয়ার প্রতি তার সামরিক বাহিনী তুলে নেয়ার আহ্বান করে ও সব রাষ্ট্রের প্রতি পূর্ব তিমুরের জনগণের

অধিকার ও আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রতি সম্মান করতে আহ্বান জানায়। ১৯৭৬ সালে অস্থায়ী সরকার ইন্দোনেশিয়া সঙ্গে একীভূত হওয়ার বিষয়ে একটি নির্বাচন করে। ইন্দোনেশিয়া একটি আইন প্রণয়ন করে, যা স্বাধীনতাবিরোধী সশস্ত্র আন্দোলনকে সমর্থন করে। ১৯৮৩ সালে, মহাসচিব ইন্দোনেশিয়া ও পর্তুগালের সঙ্গে আলোচনা শুরু করেন। কিন্তু এটা মহাসচিবের কার্যকরী অফিসের মাধ্যমে ১৯৯৯ সালে একটি চুক্তিতে পৌঁছানো সম্ভব হয়, যা একটি জনপ্রিয় আলোচনার পথ সুগম করে।

সেই চুক্তিগুলোর ভিত্তিতে পূর্ব তিমুরে জাতিসংঘ মিশন ভোটার রেজিস্ট্রেশন এবং একটি সরকারি নির্বাচনের ব্যবস্থা করে। যাই হোক, আগস্ট ১৯৯৯, যখন ৪৫০,০০০ নিবন্ধিত ভোটারের ৭৮.৫ শতাংশ ইন্দোনেশিয়ার মধ্যে স্বায়ত্তশাসন প্রত্যাখ্যাত করেন, স্বাধীনতা-বিরোধিতা মিলিশিয়া নিয়মানুগ ধ্বংস এবং সহিংসতার একটি প্রচারণা চালু করে যাতে অনেক হত্যাকাণ্ড হয় এবং ২০০,০০০-এর মতো তিমুরের জনগণ তাদের ঘরবাড়ি ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়। ফলপ্রসূ আলোচনার পর ইন্দোনেশিয়া জাতিসংঘের অনুমোদিত বহুজাতিক বাহিনী মোতায়েনের ব্যাপারে রাজি হয়। সেপ্টেম্বর মাসে সনদের সপ্তম অধ্যায়ের অধীনে নিরাপত্তা পরিষদে পূর্ব তিমুরে আন্তর্জাতিক বাহিনী পাঠানো অনুমোদিত হয়, যা শান্তি ও নিরাপত্তা পুনঃস্থাপন করে ওই ব্যবস্থা নেয়ার পরপরই অক্টোবরে পূর্ব তিমুর জাতিসংঘ অন্তর্বর্তীকালীন প্রশাসন প্রতিষ্ঠিত করে এবং সম্পূর্ণ নির্বাহী ও স্বাধীনতা দেশের ক্রান্তিকালীন আইন প্রণয়নকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে।

আগস্ট ২০০১ সালে পূর্ব তিমুরের যোগ্য ৯১ শতাংশের বেশি ভোটার ৮৮ সদস্যের গণপরিষদের নির্বাচনে ভোট দিতে যায়। নির্বাচিত গণপরিষদের দায়িত্ব হলো একটি নতুন সংবিধান প্রণয়ন এবং ভবিষ্যতে নির্বাচনের কাঠামো প্রতিষ্ঠা ও পূর্ণ স্বাধীনতার পথ তৈরি করা। মার্চ ২০০২-এ গণপরিষদ ওই অঞ্চলের প্রথম সংবিধান স্বাক্ষরও বলবৎ করে। পরের মাসে ৮২.৭ শতাংশ ভোটে জয়ের পর জানানা গুসমাও প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত হন। ২০ মে ২০০২ সালে এ অঞ্চলটি স্বাধীনতা লাভ করে। সংবিধান-সভা জাতীয় সংসদে রূপান্তরিত হয় এবং নতুন দেশের নাম গৃহীত হয় তিমুর লেস্তে। একই বছরের সেপ্টেম্বর মাসে দেশটি জাতিসংঘের ১৯১তম সদস্য রাষ্ট্র হয়।

পূর্ব তিমুর হতে সফলভাবে আলাদা হলেও স্বাধীন তিমুর লেস্তের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান এবং অগ্রগামী আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য জাতিসংঘের দায়বদ্ধতা থেকে যায়।

পশ্চিম সাহারা

জাতিসংঘ পশ্চিম সাহারা বিষয়ে একটি চলমান বিতর্ক মোকাবেলা করছিল ১৯৬৩ সাল থেকেই। সাহারা একটি আফ্রিকার উত্তর-পশ্চিম উপকূলে আলজেরিয়া, মৌরিতানিয়া এবং মরক্কো সীমান্তজুড়ে অবস্থিত অঞ্চল।

পশ্চিম সাহারা ১৮৮৪ সালে একটি স্প্যানিশ উপনিবেশে পরিণত হয়। ১৯৬৩ সাল থেকেই মৌরিতানিয়া এবং মরক্কো দু'পক্ষই এটার মালিকানা দাবি করতে থাকে। আন্তর্জাতিক আদালত ১৯৭৫-এ একটি মতামতের ভিত্তিতে সাধারণ পরিষদের অনুরোধে মৌরিতানিয়া ও মরক্কোর সার্বভৌমত্বের দাবি প্রত্যাখ্যান করেন।

১৯৭৬ সালে স্পেন থেকে পশ্চিম সাহারা আলাদা হওয়ার পর থেকেই জাতিসংঘ ওই অঞ্চলে স্থিতিশীলতার চেষ্টা করে যাচ্ছিল। মরক্কো (ওই অঞ্চলের সাথে পুনরায় যুক্ত

হয়েছিল) এবং পপুলার ফ্রন্ট ফর দ্য লিবারেশন অব Saguia el-Hamra and Río de Oro যা আলজেরিয়া সমর্থিত, এদের মধ্যে ঐ অঞ্চলে সংঘর্ষ চলমান ছিল। ১৯৭৯ সালে আফ্রিকান ইউনিটি অর্গানাইজেশন (ওএইউ) একটি গণভোট আয়োজন করে, যাতে ওই অঞ্চলের মানুষ তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার প্রয়োগ করে। ১৯৭৬ সালে Polisario কর্তৃক ঘোষিত 'সাহারাউই আরব ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক' ১৯৮২ সালে ২৬টি ওএইউ সদস্য রাষ্ট্র মেনে নেয়। ১৯৮৪ সালে ওএইউ সামিটে এসডিএআর অংশ নিলে মরক্কো ওএইউ থেকে নিজেদের প্রত্যাহার করে নেয়।

মহাসচিব এবং ওএইউ চেয়ারম্যানের যৌথ কার্যকরী দপ্তরের মিশন ১৯৮৮ সালে অস্ত্রবিরতির আহ্বান করে এবং একটি গণভোটের প্রস্তাব করে, যাতে ওই অঞ্চল মরক্কোর সাথে একীভূত হওয়া বা স্বাধীনতার সিদ্ধান্ত নিতে পারে। এই প্রস্তাব উভয় পক্ষই নীতিগতভাবে মেনে নেয়। ১৯৯১ সালে রেজলিউশন ৬৯০ (১৯৯১) দ্বারা নিরাপত্তা পরিষদ পশ্চিম সাহারায় গণভোটের জন্য জাতিসংঘ মিশন MINURSO গঠন করে এবং এর উদ্দেশ্য ছিল মহাসচিবের বিশেষ প্রতিনিধিকে সংগঠনের সব বিষয়ে এবং পশ্চিম সাহারা জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের একটি গণভোটের ব্যাপারে সাহায্য করা। ১৯৭৪ সালে স্পেনীয় আদমশুমারিতে থাকা সব ১৮ বছর বা তার বেশি বয়সী জনগণের ভোটাধিকার থাকবে—তারা ওই অঞ্চলে থাকুক বা না থাকুক। একটি শনাক্তকরণ কমিশন আদমশুমারির তালিকা হালনাগাদ করবে এবং ভোটার চিহ্নিত করবে। অঞ্চলটির বাইরে বসবাসকারী শরণার্থীদের চিহ্নিত করার জন্য উদ্বাস্তুদের জন্য জাতিসংঘের হাইকমিশনার দপ্তর সহায়তা করবে।

সেপ্টেম্বর ১৯৯১ সালে যুদ্ধবিরতি কার্যকর হয়। এটা MINURSO সামরিক পর্যবেক্ষক পর্যবেক্ষণ করেন এবং বড় কোনো লঙ্ঘনের ঘটনাও ঘটেনি। যা হোক, দলগুলো স্থিতিশীলতা পরিকল্পনার বিরোধিতা করতে থাকে প্রধানত গণভোটের ভোটাধিকারের বিষয়ে। ১৯৯৭ সালে পশ্চিম সাহারায় মহাসচিবের ব্যক্তিগত দূত দ্বারা একটি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ হয় এবং এর শনাক্তকরণ প্রক্রিয়া ১৯৯৯ সালের শেষ দিকে সম্পন্ন হয়। যাহোক, অব্যাহত আলোচনা এবং সমঝোতার পরও পরিকল্পনার বাস্তবায়নে মতবিরোধ অব্যাহত থাকে।

২০০৪ সালে মরক্কো একটি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে, যা বিশেষ দূত স্থিতিশীলতা প্রকল্পের অংশ ছিল। অব্যাহত অচলাবস্থা সত্ত্বেও সেখানে কিছু ইতিবাচক উন্নয়ন হয়। এর মধ্যে ছিল ফ্রেন্তে পলিসারিও' আগস্ট ২০০৫ সালে সব মরক্কোর যুদ্ধবন্দিদের মুক্তি এবং ২০০৪ সালে ইউএনএইচসিআর-এর উদ্যোগে 'পারিবারিক সাক্ষাৎ' কর্মসূচির আওতায় পশ্চিম সাহারা অঞ্চলের টিনডউফ, আলজেরিয়া শিবিরে বসবাসকারী সাহারান উদ্বাস্তু এবং তাদের আত্মীয়দের দেখা করার ব্যবস্থা করে যারা অনেকেই একে অপরকে ৩০ বছরের বেশি সময় ধরে দেখেনি।

২০০৭ সালে মহাসচিবের ব্যক্তিগত দূত দেখেন যে কেবল দুটি পথ খোলা—সংকটের অনির্দিষ্ট বর্ধন অথবা সরাসরি আলোচনা শুরু করা। নিরাপত্তা পরিষদের শর্তহীন সদ্ভাবপূর্ণ আলোচনার জন্য প্রস্তাব করে। জাতিসংঘ দূতরা এরপর নিউইয়র্কে দলগুলোর সঙ্গে বৈঠকের ব্যবস্থা করে, যাতে আলজেরিয়া ও মৌরিতানিয়াও অংশ নেয়। দ্বিতীয় সভায় পক্ষগুলো এই মতে পৌঁছায় যে, বর্তমান অবস্থা অগ্রহণযোগ্য এবং সদ্ভাবে নিজেরা

অব্যাহত রাখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন।

অবস্থানের বৈপরীত্য থাকলেও এই নতুন সংলাপ গত সাত বছরেরও বেশি সময় দলগুলোর মধ্যে প্রথম সরাসরি আলোচনা। তৃতীয় দফা আলোচনা হয় ২০০৮ সালে এবং দলগুলোর আরও অনানুষ্ঠানিক সভার আয়োজন করে ২০০৯, ২০১০, ২০১১ ও ২০১২ সাল জুড়ে। যাহোক, কোনো অগ্রগতি নিবন্ধিত হয়নি।

অপরপক্ষে, মূল বিষয় পশ্চিম সাহারার ভবিষ্যৎ পরিণতি কিংবা এই জনপদের মানুষের আত্মনির্ভরতার জন্য আর্থিক সংস্থানের ব্যাপারে কোনো উন্নতিই দৃশ্যমান হয়নি। মহাসচিব পর্যবেক্ষণ করেন যে, মধ্যপ্রাচ্য এবং উত্তর আফ্রিকার অঞ্চলগুলোতে দ্বন্দ্ব ও প্রতিবাদের সময় পশ্চিম সাহারার ভেতরের ও বাইরের উভয় এলাকার জনগণের আবেগের কেন্দ্রে ছিল দীর্ঘমেয়াদি শান্তির প্রতীক্ষা। ইতিমধ্যে MINURSO সাহারিয়ান পরিবারগুলোর বিভক্তি ও স্থানান্তরের জন্য একটা বড় ধরনের সাহায্য প্রকল্প সমর্থন করে আসছিল। জাতিসংঘ উভয় পক্ষকে অস্ত্রবিরতি রক্ষা করতে সাহায্য করেছিল, যা সমগ্র অঞ্চলের তর্ক-বিতর্ক সৃষ্টি এবং পূর্বের ফ্রেন্তে পলিসারিও নিয়ন্ত্রিত অঞ্চল থেকে পশ্চিমের মরক্কো শাসিত অঞ্চলকে পৃথক করেছিল।

৩. অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন

আগের পাতার ছবির বর্ণনা : একজন তরুণী আফ্রিকান ইউনিয়ন-জাতিসংঘ হাইব্রিড অপারেশনে সুদানের উত্তর দারফুর এলাকার এলফাশের অঞ্চলের একটি কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণে সহায়তা করছে। (১৫ আগস্ট ২০১২, ইউএন ফটো/ এবার্ট গঞ্জালেস ফাররান)

অনেকেই জাতিসংঘকে কেবল শান্তি ও নিরাপত্তাজনিত বিষয়ে নিয়োজিত মনে করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিশ্ব সংস্থাটির অঙ্গসংস্থাগুলো উন্নত জীবন, পূর্ণ কর্মসংস্থান এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন বিকাশের উদ্দেশ্যে সনদের অঙ্গীকার বাস্তবায়নে নিয়োজিত। জাতিসংঘের উন্নয়ন প্রচেষ্টা বিশ্বব্যাপী লাখো মানুষের জীবনধারণ ও ভালো থাকাকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছে। বিশ্ববাসীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক মঙ্গল নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে দীর্ঘস্থায়ী বিশ্বশান্তি এবং নিরাপত্তা সম্ভব—এই ধারণার ভিত্তিতে জাতিসংঘ তার কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে থাকে।

১৯৪৫ সাল থেকে বিশ্বব্যাপী বহু অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের দিকনির্দেশনা এবং বাস্তবায়ন জাতিসংঘের নির্দেশিত পথে ও কাজের মাধ্যমে সংগঠিত হয়েছে। বিশ্বের ঐক্য প্রতিষ্ঠার কেন্দ্র হিসেবে জাতিসংঘ বরাবরই অগ্রাধিকার অনুযায়ী লক্ষ্য স্থাপনের মাধ্যমে বিভিন্ন রাষ্ট্রের উন্নয়নে আন্তর্জাতিক সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান করেছে, যা একটি যথাযোগ্য বৈশ্বিক অর্থনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

আন্তর্জাতিক সম্মেলনগুলোর মাধ্যমে জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক এজেন্ডায় নতুন সব উন্নয়নমূলক লক্ষ্য প্রণয়ন ও প্রচারের প্লাটফর্ম দিয়ে থাকে। এটি বিভিন্ন ইস্যু যেমন নারী অগ্রগতি, মানবাধিকার, টেকসই উন্নয়ন, পরিবেশ রক্ষা ও সুশাসনকে উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে স্পষ্টভাবে অন্তর্ভুক্তির জন্য কাজ করে। ১৯৬১ সালে সূচনার পর থেকে এই বিশ্বব্যাপী ঐকমত্য বিভিন্ন আন্তর্জাতিক উন্নয়ন দশক পালনের মাধ্যমে নানা সময়ে প্রকাশ পেয়েছে। প্রতি দশকেই এসব নীতি ও লক্ষ্যের বিস্তৃত নির্ধারিত সমস্যার প্রতি গুরুত্ব প্রদান করে এবং উন্নয়নের সব পরিপ্রেক্ষিতে উন্নতির প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করে থাকে। শিল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের মধ্যে বৈষম্য হ্রাসের প্রতিও এটি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে থাকে।

২০০০ সালে আয়োজিত 'মিলেনিয়াম সামিটে' সদস্য রাষ্ট্রগুলো মিলেনিয়াম ঘোষণাপত্র গ্রহণ করে, যা সংগঠনটির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার আলোকে প্রস্তুত করা হয়েছিল। ঘোষণাপত্রটি সহস্রাব্দ উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা বা এমডিজি নামে আটটি সময়-আবদ্ধ এবং পরিমাপযোগ্য লক্ষ্য ধারণকারী রোডম্যাপে অনুবাদিত হয়, যা ২০১৫ সালের মধ্যে অর্জন করতে হবে। এমডিজিগুলো হলো চরম দরিদ্রতা ও ক্ষুধা নির্মূল; বিশ্বব্যাপী প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন; লিঙ্গ সমতা এবং নারীর ক্ষমতায়ন; শিশু মৃত্যু হ্রাস; মাতৃ স্বাস্থ্যের উন্নতি; এইচআইভি/এইডস, ম্যালেরিয়া এবং অন্যান্য রোগ মোকাবেলা; পরিবেশগত স্থিতিশীলতা নিশ্চিতকরণ এবং উন্নয়নের জন্য বৈশ্বিক অংশীদারিত্বের বিকাশ। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ২০০৫ সালের বিশ্ব সম্মেলনে নিজেদের এই লক্ষ্যে নিয়োজিত করে।

২০১০ সালের জাতিসংঘের এমডিজির সম্মেলন, যা ইতিপূর্বে সহস্রাব্দ উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা সংক্রান্ত উচ্চ পর্যায়ে পূর্ণাঙ্গ সভা হিসেবে পরিচিত ছিল। একটি বিশ্বব্যাপী কর্মসূচি গ্রহণ করে যার লক্ষ্য ২০১৫ সালের মধ্যে আটটি দারিদ্র্য-বিরোধী উদ্দেশ্য অর্জন করবে। এই সম্মেলনে নারী ও শিশু সুস্বাস্থ্যের নতুন অঙ্গীকার এবং দারিদ্র্য, ক্ষুধা ও রোগের জন্য অন্যান্য উদ্যোগেরও ঘোষণা প্রস্তাবিত হয়।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক বিতর্কে ক্রমবর্ধমানভাবে যেসব সমস্যা জাতীয় পরিধিতে সীমাবদ্ধ নয় সেগুলো সমাধানে ধনী এবং গরিব রাষ্ট্রের স্বার্থের মিল এখানে তুলে ধরা হয়। উদ্বাস্তু জনগোষ্ঠী, সংগঠিত অপরাধ, মাদক পাচার, এইচআইভি/এইডস এবং জলবায়ু পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট বিষয়কে বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা হয়, যা মোকাবেলায় সমন্বিত কর্মপন্থা প্রয়োজন। লোকালয় পরিবর্তন, সামাজিক অনৈক্য ও সংঘাতের মাধ্যমে এক অঞ্চলের দারিদ্র্য এবং বেকারত্বের প্রভাব দ্রুত অন্য অঞ্চলগুলোতেও অনুভূত হতে পারে।

একইভাবে, বিশ্ব অর্থনীতির যুগে এক দেশের অর্থনৈতিক অস্থিরতা খুব দ্রুত অন্য দেশের বাজারে প্রভাব ফেলতে পারে।

একই সাথে গণতন্ত্র, মানবাধিকার, জনগণের অংশগ্রহণ, সুশাসন ও নারীর ক্ষমতায়ন অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন ঘটাতে পারে বলে একটি সর্বজনীন বিশ্বাস তৈরি হয়েছে।

উন্নয়ন কার্যক্রমে সমন্বয় সাধন

যদিও বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নতি হয়েছে, সম্পদ ও সচ্ছল জীবনযাপনের স্থূল বৈষম্য এখনও বিশ্বের অর্থনৈতিক ও সামাজিক গঠনকে নিয়ন্ত্রণ করে। দেশের অভ্যন্তরে ও অন্যান্য দেশের মধ্যে দারিদ্র্যতা হ্রাস এবং বৈষম্য নিরসন এখনো জাতিসংঘের মৌলিক লক্ষ্যগুলোর একটি।

সাধারণ অর্থনৈতিক ও সামাজিক লক্ষ্য প্রচারের ক্ষেত্রে জাতিসংঘ বিভিন্নভাবে কাজ করে থাকে, যেমন– চলমান ও উঠতি বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জগুলো বিশ্লেষণ ও বিবেচনা করে, সরকারকে তাদের উন্নয়ন পরিকল্পনা ও কৌশলের ব্যাপারে আইনি উপদেশ প্রদান করে, আন্তর্জাতিক নিয়ম এবং মান নির্ধারণ করে এবং বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য তহবিল গঠন করে। শিক্ষা, আকাশ নিরাপত্তা, পরিবেশ সুরক্ষা ও শ্রমিকদের পরিবেশের মতো বিচিত্র ক্ষেত্রে জাতিসংঘ মানুষের জীবন ও জীবিকা প্রভাবিত করে যাচ্ছে তার বিভিন্ন তহবিল, কর্মসূচি এবং বিশেষায়িত সংগঠনের মাধ্যমে।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ জাতিসংঘ ও তার কার্যকরী সংগঠনের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক কাজের সমন্বয় সাধনের প্রধান অঙ্গ। আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করার জন্য এবং নীতি সুপারিশ প্রণয়নের জন্যও এটি কেন্দ্রীয় ফোরাম। এই পরিষদের দায়িত্বগুলোর মধ্যে রয়েছে : উন্নত জীবনযাপন, পূর্ণ কর্মসংস্থান এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতির প্রচার; অর্থনৈতিক, সামাজিক ও স্বাস্থ্য সমস্যার সমাধান চিহ্নিত করা; সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাবিষয়ক সহযোগিতা করা এবং মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার জন্য সর্বজনীনতাকে প্রাধান্য দেয়া।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের অধীনে রয়েছে উন্নয়ন নীতি প্রণয়ন কমিটি, যেখানে ২৪ জন বিশেষজ্ঞ তাদের ব্যক্তিগত দক্ষতা ও সক্ষমতা অনুযায়ী অর্থনৈতিক,

সামাজিক ও পরিবেশগত উঠতি বিষয়ের ওপর একটি পরামর্শক প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে থাকে। এটি স্বল্পোন্নত দেশগুলোর (এলডিসি) মানদণ্ড নির্ধারণ করে এবং সেসব দেশের তালিকা যাচাই করে থাকে।

২০০৫ সালের বিশ্ব সম্মেলনে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদকে একটি বার্ষিক কার্যনির্বাহী পর্যালোচনা এবং একটি দ্বিবার্ষিক ডেভেলপমেন্ট কো-অপারেশন ফোরাম আয়োজনের ক্ষমতা দেয়া হয়। এএমআর গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলনে গৃহীত আন্তর্জাতিকভাবে সম্মত উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনের অগ্রগতি নিরূপণ করে থাকে। উক্ত লক্ষ্য অর্জনে অগ্রগতি ও চ্যালেঞ্জ সংশ্লিষ্ট বার্ষিক বিষয়ভিত্তিক পর্যালোচনা এবং জাতীয় স্বেচ্ছাসেবী প্রতিবেদন এএমআরের অন্তর্ভুক্ত।

ডিসিএফের উদ্দেশ্য উন্নয়ন সহযোগীদের সংহতি এবং কার্যক্রমের কার্যকারিতা বৃদ্ধি। এটা উন্নয়ন সহযোগিতা উন্নত করার নীতিনির্দেশনা ও সুপারিশ প্রদানের কাজে নিয়োজিত। ইউনাইটেড নেশন্স ডেভেলপমেন্ট গ্রুপ ৩২টি জাতিসংঘ তহবিল, কার্যক্রম, সংস্থা, বিভাগ ও কার্যালয়কে একীভূত করে, যা জাতিসংঘের সার্বিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। এই নির্বাহী কমিটি সংশ্লিষ্ট নীতি প্রস্তুতকারী সত্তা ও চিহ্নিত বাস্তবায়নযোগ্য কর্মসূচির মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধিতে কাজ করে যায়।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ক নির্বাহী কমিটি আঞ্চলিক কমিশনসহ সচিবালয় সংস্থা দ্বারা গঠিত; এটা নীতিনির্ধারণ ও ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত। এটা জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে কর্মরত আদর্শমূলক, বিশ্লেষণাত্মক এবং কারিগরি সত্তার মধ্যে সঙ্গতি আনার লক্ষ্যে কাজ করে।

জাতিসংঘ সচিবালয়ের মধ্যে, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ক অধিদপ্তর (ডেসা) দেশগুলোকে তাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশগত চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করতে সাহায্য করে। এটা আন্তর্জাতিকভাবে সম্মত জাতিসংঘ উন্নয়ন এজেন্ডা হিসেবে পরিচিত লক্ষ্য অর্জনের একটি কাঠামোর মাধ্যমে পরিচালিত হয়। এই কাঠামোর মধ্যে ডেসা বিশ্লেষণী সমর্থন প্রদান করে; সেই সাথে ডেসা এর সদস্য দেশগুলোকে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত ক্ষেত্রের মধ্যে বাস্তব ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করে এবং নীতি বিশ্লেষণেও সমন্বয় সাধন করে। এটি নিয়ম ও মান নির্ধারণে সহায়তা করে থাকে এবং বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ঐক্যবদ্ধ কার্যপদ্ধতিতে সম্মত হওয়ার লক্ষ্যেও কাজ করে। ডেসা বৈশ্বিক নীতি ও জাতীয় কর্ম, গবেষণা, নীতি ও কার্যকরী কার্যক্রমের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে কাজ করে।

আফ্রিকান অঞ্চল, এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল, ইউরোপীয় অঞ্চল, লাতিন আমেরিকা এবং ক্যারিবীয় অঞ্চল ও পশ্চিম এশিয়া—এই পাঁচটি আঞ্চলিক কমিশন অর্থনৈতিক ও সামাজিক তথ্য ও নীতি বিশ্লেষণে অনুরূপ আদান-প্রদান সহজতর করে থাকে। জাতিসংঘের অনেক তহবিল ও কর্মসূচি অন্তর্ভুক্ত দেশে উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রমে সহায়তা করে ও এর বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠন দেশের উন্নয়ন প্রচেষ্টার জন্য সমর্থন এবং সহায়তাও প্রদান করে। উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছোনোর জন্য মানবিক এবং আর্থিক– উভয় ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান সম্পদের সীমাবদ্ধ প্রাপ্যতার ক্ষেত্রে জাতিসংঘের বিভিন্ন অঙ্গের বর্ধিত সাহায্য ও সহযোগিতা অতীব প্রয়োজনীয়।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন

সাম্প্রতিক দশকগুলোতে সমগ্র বিশ্বে ব্যাপক অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে; কিন্তু সম্পদ ও সমৃদ্ধি অপ্রতুল রয়ে গেছে। অর্থনৈতিক ভারসাম্যহীনতা বিশ্বের প্রায় প্রতিটি অঞ্চলে সামাজিক সমস্যা ও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতাকে বৃদ্ধি করেছে। স্নায়ুযুদ্ধের শেষ এবং ক্রমাগত বিশ্ব অর্থনীতির একত্রীকরণ চরম দারিদ্র্য, ঋণগ্রস্ততা, অনুন্নয়ন ও বাণিজ্য ভারসাম্যহীনতা ইত্যাদি সমস্যার সমাধান আনতে পারেনি।

জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠিত মূলনীতির অন্যতম দৃঢ় বিশ্বাস যেসব জাতির অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপায় হলো রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিরাপত্তা অর্জন। এটা সংস্থাটির একটি প্রধান উদ্বেগের বিষয় যে, বিশ্বের প্রায় অর্ধেক জনসংখ্যা, যাদের বেশিরভাগের অবস্থান আফ্রিকা, এশিয়া, লাতিন আমেরিকা ও ক্যারিবীয় অঞ্চলে, দৈনিক দুই ডলার অপেক্ষা কম আয়ে জীবন অতিবাহিত করতে বাধ্য হচ্ছে। ধারণা করা হয় যে, ১৯৭ মিলিয়নের বেশি শ্রমিক ২০১১ সালে বিশ্বব্যাপী বেকার ছিল, এবং ৮৬৮ মিলিয়নের চেয়েও বেশি দিনে দুই ডলারের কম অর্জন করেছেন। ২০১২ সালের হিসাব অনুযায়ী উন্নয়নশীল দেশে অপুষ্টির শিকার মানুষের সংখ্যা আনুমানিক ৮৫০ মিলিয়ন।

জাতিসংঘই একমাত্র প্রতিষ্ঠান যা অর্থনৈতিক সম্প্রসারণ এবং বিশ্বায়ন কর্মকাণ্ড মানুষের কল্যাণ, টেকসই উন্নয়ন, দারিদ্র্য দূরীকরণ, ন্যায্য বাণিজ্য এবং বৈদেশিক ঋণ হ্রাস ইত্যাদি দ্বারা পরিচালিত। এটি বর্তমান ভারসাম্য মোকাবেলার জন্য সমষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি গ্রহণের জোরালো পরামর্শ দিয়ে থাকে, বিশেষ করে উত্তর ও দক্ষিণের ক্রমবর্ধমান ব্যবধান, স্বল্পোন্নত দেশগুলোর ক্রমাগত সমস্যা এবং বাজার অর্থনীতির কেন্দ্রায়নে সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর অনিবার্য প্রয়োজনীয়তার ক্ষেত্রে।

জাতিসংঘের সহায়তা কর্মসূচি দারিদ্র্যবিমোচন, শিশু অস্তিত্ব রক্ষা, পরিবেশ সুরক্ষা, নারীদের অগ্রগতি এবং মানবাধিকার বিষয়গুলো তুলে ধরে। উক্ত কর্মসূচিগুলোকেই দরিদ্র দেশের কোটি কোটি মানুষ জাতিসংঘ বলে মনে করে।

দাপ্তরিক উন্নয়ন সহায়তা

জাতিসংঘ কর্মসূচির ঋণ প্রদানকারী সংস্থাগুলো তাদের নীতি ও ঋণের মাধ্যমে সম্মিলিতভাবে উন্নয়নশীল দেশগুলোর অর্থনীতি ওপর একটি কার্যকরী প্রভাব ফেলে। ৪৯টি স্বল্পোন্নত দেশের ক্ষেত্রে এটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য, যেসব দেশে চরম দারিদ্র্য ও ঋণগ্রস্ততা তাদের বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়ন থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে। এই দেশগুলোর ৩৪টি আফ্রিকায় এবং জাতিসংঘের বিভিন্ন সহায়তা কর্মসূচিতে এরা বিশেষ অগ্রাধিকার পায়। উন্নয়নশীল ক্ষুদ্র রাষ্ট্র, উন্নয়নশীল দ্বীপ রাষ্ট্র এবং পরিবর্তিত অর্থনীতির মধ্য দিয়ে যাওয়া দেশগুলো সংকটপূর্ণ সমস্যাতে জর্জরিত, যার কারণে তাদের আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় হতে বিশেষ সহযোগিতা প্রয়োজন হয়। তাদেরকেও জাতিসংঘ কার্যক্রমের সহায়তায় অগ্রাধিকার দেয়া হয়। এছাড়াও সদস্য রাষ্ট্রের মাধ্যমে দাপ্তরিক উন্নয়ন সহায়তার মাধ্যমেও সহায়তা করা হয়। বিশ্বের ৩১টি উন্নয়নশীল দ্বীপ দেশগুলোর মধ্যে ১৬টি স্বল্পোন্নত। ৩৮টি উন্নয়নশীল ছোট দ্বীপের মধ্যে ১২টি স্বল্পোন্নত।

১৯৭০ সালে সাধারণ পরিষদ স্থূল জাতীয় উৎপাদনের ০.৭ শতাংশকে ওডিএ লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করে; এখন যাকে বলা হয় স্থূল জাতীয় আয়। (জিডিপি হলো একটি রাষ্ট্রের সীমানায় প্রতিবছরের সব চূড়ান্ত পণ্য ও সেবার বাজার মান; জিএনআই হলো জিডিপি এবং অন্যান্য রাষ্ট্র হতে প্রধান আয়ের সমষ্টি)। ৩৪টি উন্নত রাষ্ট্রের সমন্বয়ে গঠিত অর্থনৈতিক সহযোগিতা এবং উন্নতি সংস্থার অন্তর্ভুক্ত উন্নয়ন সহায়তা কমিটির সদস্যদের যৌথ প্রচেষ্টায় নির্ধারিত লক্ষ্যগুলোর প্রায় অর্ধেক পর্যায়ে পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছে। জাতিসংঘ ২০০২ সালে মেক্সিকোর মন্টেরিতে অনুষ্ঠিত 'উন্নয়নের জন্য অর্থসংস্থান' শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে প্রধান দাতাদের থেকে ওডিএ বৃদ্ধির আশাব্যঞ্জক অঙ্গীকার আদায় করে। এছাড়া দারিদ্র্য হ্রাস, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে এরূপ সহায়তায় অগ্রাধিকার দান করে।

ড্যাক সদস্যদের মধ্যে ২০১১ সালে মিলিত জিএনপি ০.৩১ শতাংশ দাঁড়িয়েছে ১৩৪ বিলিয়ন ডলারে। পাঁচ দেশ ডেনমার্ক, লুক্সেমবার্গ, নেদারল্যান্ডস, নরওয়ে এবং সুইডেন-ওডিএর জন্য লক্ষ্য শতাংশ ০.৭ ছাড়িয়েছে। যুক্তরাজ্য ২০১৩ সালে লক্ষ্য পূরণের পর্যায়ে ছিল। পরিমাণ অনুযায়ী বৃহত্তম দাতা দেশগুলোর মধ্যে ছিল ফ্রান্স, জার্মানি, জাপান, যুক্তরাজ্য এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

জাতিসংঘের ওডিএ দুটি উৎস থেকে উদ্ভূত : জাতিসংঘ বিশেষ সংস্থা, তহবিল ও কর্মসূচি থেকে অনুদান সাহায্য তার মাধ্যমে এবং জাতিসংঘ ব্যবস্থার সমর্থনে বিশ্বব্যাংক ও আইএফএডির মতো ঋণ প্রতিষ্ঠান থেকে। এই ঋণ সেসব দেশের মধ্যে বিতরণ করা হয়, যাদের ঋণের চাহিদা বেশি।

২০১২ সালের অর্থবছরে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক গ্রুপ ঋণ, অনুদান, ইকুইটি বিনিয়োগের মাধ্যমে ৫২.৬ বিলিয়ন ইউএস ডলার অর্থের প্রতিশ্রুতি দেয় এবং অর্থনৈতিক বৃদ্ধি উন্নয়ন ও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে দারিদ্র্য কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করার অঙ্গীকার দেয়। ১৯৭৮ এবং ২০১১-এর মধ্যে আইএফএডি বিভিন্ন প্রকল্প এবং কর্মসূচিতে ১২.৯ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করে, যা প্রায় ৪০০ মিলিয়ন গ্রামীণ মানুষের কাছে পৌঁছায়। সরকার ও প্রাপক দেশের অন্যান্য অর্থায়ন উৎস ১১.৭ বিলিয়ন ডলার এবং বহুপক্ষীয়, দ্বিপক্ষীয় ও অন্য দাতা সংস্থাগুলো প্রায় ৯.২ বিলিয়ন ডলার সহ-অর্থায়ন প্রদান করে।

২০১১ সালে জাতিসংঘে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের জন্য ২৪.৫ বিলিয়ন ডলার ব্যয় করে। এ ধরনের কার্যক্রমে মোট অনুদানের পরিমাণ ২২.৯ বিলিয়ন ডলার। এই অবদানগুলোর ৬৭ শতাংশ উন্নয়ন সংক্রান্ত এবং ৩৩ শতাংশ মানবিক সহায়তায় বরাদ্দকৃত।

বিশ্বব্যাপী উন্নয়ন প্রসার

জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি) ২০১৫ সালের মধ্যে বিশ্বের দারিদ্র্য অর্ধেকে নামিয়ে আনার জন্য উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ইউএনডিপি ন্যায়সঙ্গত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত পরামর্শ দেয় এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

ইউএনডিপি ১৭৭টির বেশি দেশে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীকে সঙ্গে নিয়ে কাজ করে। ফলত সে দেশের মানুষেরা নিজেরা নিজেদের ভাগ্য ফেরাতে সমর্থ হয়। জাতিসংঘের এই অঙ্গ সংস্থাটি সংশ্লিষ্ট দেশগুলোকে তাদের বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সমাধান পেতে সহায়তা করে; যেমন দারিদ্র্যবিমোচন ও এমডিজি অর্জন, গণতান্ত্রিক সুশাসন,

এইচআইভি/এইডস মোকাবেলা, সংকট প্রতিরোধ ও উত্তরণ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ ও টেকসই উন্নয়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে। উক্ত চ্যালেঞ্জগুলোর প্রতিটি ক্ষেত্রে ইউএনডিপি মানবাধিকার সুরক্ষা এবং নারীর ক্ষমতায়নে সার্বিক পরামর্শ দিয়ে থাকে।

ইউএনডিপির মূল কার্যক্রমের বরাদ্দকৃত তহবিলের অধিকাংশই বিশ্বের চরম দরিদ্র অধ্যুষিত দেশগুলোতে ব্যয় করা হয়। বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিক দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা ১৯৯০ সালের ১.৯ বিলিয়ন থেকে ২০১০ সালে ১.২ বিলিয়নে নেমে আসে, যা উন্নয়নশীল বিশ্বের জনসংখ্যার ২০.৬ শতাংশের প্রতিনিধিত্ব করে। তবে বহু অঞ্চলজুড়েই অগ্রগতি ছিল না। ২০১০ সালে ১.১৮ বিলিয়ন মানুষ দৈনিক ১.২৫-২ ডলারের আয়ে জীবনযাপন করে। অনেকেই মধ্যম আয়ের উন্নয়নশীল দেশগুলোর তুলনায় অসহায় এবং দরিদ্র রয়ে গেছে। প্রায় ৮৭০ মিলিয়ন মানুষ যারা ২০১০-১২ সময়কালের মধ্যে দীর্ঘকাল ধরে অপুষ্টির শিকার, তাদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশের বসবাস উন্নয়নশীল দেশে।

২০১১ সালে ইউএনডিপি ৪.৭ বিলিয়ন ইউএস ডলার উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে ব্যয় করে। জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রগুলোর প্রায় প্রতিটি সরকারের কাছ থেকে ইউএনডিপিতে স্বেচ্ছায় অনুদান আসে। ইউএনডিপি থেকে সহায়তা পাওয়া দেশগুলো নিজেদের কর্মীদের সুবিধা, সরঞ্জাম ও সরবরাহের মাধ্যমে প্রকল্প খরচে অবদান রাখতে পারে।

বিশ্বব্যাপী উন্নয়ন সম্পদ থেকে সর্বাধিক প্রভাব নিশ্চিত করার জন্য ইউএনডিপি জাতিসংঘের অন্যান্য তহবিল ও কার্যক্রম এবং আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান—বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ)সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তার কার্যক্রমের সমন্বয় করে। উপরন্তু, ইউএনডিপির দেশীয় ও আঞ্চলিক কর্মসূচির সাফল্য দেশের নাগরিক ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বা এনজিওগুলোর দক্ষতার ওপর নির্ভরশীল। ইউএনডিপির সব সহায়তা প্রকল্পের পঁচাত্তর শতাংশ স্থানীয় সংস্থার দ্বারা বাস্তবায়িত হয়।

দেশের পরিপ্রেক্ষিতে, ইউএনডিপি জাতিসংঘ উন্নয়ন সহায়তা বিধানের একটি সংহত দৃষ্টিকোণ তুলে ধরে। বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশে এটি একটি জাতিসংঘ উন্নয়ন সহায়তা কাঠামো গড়ে তুলেছে, যা স্থানীয় জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারীর (যিনি অনেক স্থানেই ইউএনডিপি'র আবাসিক প্রতিনিধি) নেতৃত্বে পরিচালিত জাতিসংঘের একটি দল। সংশ্লিষ্ট দেশগুলো দ্বারা চিহ্নিত প্রধান প্রধান উন্নয়ন চ্যালেঞ্জগুলোকে মোকাবেলার জন্য আলোচিত অবকাঠামোটি একটি সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে। আবাসিক সমন্বয়ককে মানবিক সহায়তা সমন্বয়কারী হিসেবে মানব বিপর্যয়, প্রাকৃতিক বিপর্যয় এবং জটিল জরুরি অবস্থার ক্ষেত্রে নিযুক্ত করা হয়।

নিয়মিত কর্মসূচি ছাড়াও ইউএনডিপি বিভিন্ন সময়ে বিশেষ উদ্দেশ্যে তহবিল বরাদ্দ করে। জাতিসংঘ মুদ্রা উন্নয়ন তহবিল স্বল্পোন্নত দেশে ক্ষুদ্রঋণ ও স্থানীয় উন্নয়নে বিনিয়োগ সংশ্লিষ্ট মূলধন, সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং প্রযুক্তিগত পরামর্শ প্রদানের একটি সমন্বয় প্রস্তাব করে থাকে।

জাতিসংঘ স্বেচ্ছাসেবী কার্যক্রম : স্বেচ্ছাসেবী কর্মকাণ্ডের অগ্রগতি ও কার্যকর উন্নয়নে স্বেচ্ছাসেবী নিযুক্ত করার জন্য জাতিসংঘের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে কাজ করে। ১৫৯টি দেশ থেকে ৬,৮০০-এর অধিক স্বেচ্ছাসেবী ইউএনভি কর্তৃক ২০১১ সালে বিশ্বব্যাপী মোতায়েন করা হয়েছে।

ইউএনডিপি বিশ্বব্যাংক ও জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচির সঙ্গে গ্লোবাল এনভায়রনমেন্ট সুবিধার একটি ব্যবস্থাপনা অংশীদার। ইউএনডিপি এছাড়াও এইচআইভি/এইডস বিষয়ক জাতিসংঘের যুগ্ম কর্মসূচির অন্যতম পৃষ্ঠপোষক।

উন্নয়নের জন্য ঋণ

বিশ্বব্যাংক দুটি অনন্য প্রতিষ্ঠান দ্বারা গঠিত : পুনর্গঠন ও উন্নয়নের জন্য আন্তর্জাতিক ব্যাংক এবং আন্তর্জাতিক উন্নয়ন অ্যাসোসিয়েশন; বিশ্বব্যাংক ১০০টির অধিক উন্নয়নশীল দেশগুলোতে অর্থ এবং/অথবা প্রযুক্তিগত দক্ষতা আনয়নের মাধ্যমে তাদের দারিদ্র্যবিমোচনে সাহায্য করে। এই প্রকল্পের বেশিরভাগ কর্মসূচি লাতিন আমেরিকা ও ক্যারিবীয়, মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকা, ইউরোপ ও মধ্য এশিয়া, পূর্ব এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল, আফ্রিকা ও দক্ষিণ এশিয়াজুড়ে বিস্তৃত। ব্যাংকটি বর্তমানে কার্যত প্রতিটি খাতে এবং উন্নয়নশীল দেশে ১৩৩০-এর অধিক প্রকল্পে জড়িত; উন্নয়ন সহায়তায় বিশ্বের অন্যতম উৎস এই ব্যাংকটি উন্নয়নশীল দেশের সরকারকে স্কুল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্র গড়ে তুলতে, পানি ও বিদ্যুৎপ্রাপ্তিতে, রোগ প্রতিরোধে এবং পরিবেশ রক্ষায় কার্যকরী সহায়তা দান করে। এটি এই কাজটি করে ঋণ বরাদ্দের মাধ্যমে, যা পরিশোধযোগ্য। ২০১৩ সালের অর্থবছরে ব্যাংকটি বিশ্বব্যাপী উন্নয়নশীল দেশগুলোতে ২৭৬টি প্রকল্পে ৩১.৫ বিলিয়ন ডলার প্রদান করে।

বিশ্বব্যাংকের ঋণদান দুই ধরনের হয়। প্রথম প্রকার : উচ্চ আয়ের উন্নয়নশীল দেশে যারা বাজার সুদের হারের কাছাকাছি দিতে সক্ষম বা বাণিজ্যিক উৎস থেকে ধার করতে সক্ষম। এসব দেশ উন্নয়ন এবং পুনর্গঠনের জন্য আন্তর্জাতিক ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করে যা ঋণ, গ্যারান্টি, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পণ্য এবং বিশ্লেষণাত্মক ও পরামর্শ সেবার মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন ত্বরান্বিত করে; এছাড়াও মধ্যম আয়ের দরিদ্র দেশগুলোর মধ্যে দারিদ্র্য হ্রাস করার লক্ষ্যে কাজ করে। আইবিআরডি ঋণ গ্রহীতা দেশগুলোকে একটি বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে ধার চেয়ে শোধ করার সময় অপেক্ষা আরো অধিক সময় দিয়ে থাকে : মূল পরিশোধ শুরুর আগে একটি তিন থেকে পাঁচ বছরের গ্রেস পিরিয়ডসহ ১৫ থেকে ২০ বছর সময়কাল তহবিল নির্দিষ্ট প্রোগ্রামের সমর্থনে ধার দিয়ে থাকে, যেমন দারিদ্র্যবিমোচন, সামাজিক সেবা, পরিবেশ সুরক্ষা এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির বিতরণ। ২০১২ সালের অর্থবছরে আইবিআরডি দ্বারা ৯৩টি অপারেশনের জন্য মোট ২০.৬ বিলিয়ন ডলার ঋণ প্রতিশ্রুত হয়, যা ঐতিহাসিক ১৩.৫ বিলিয়ন ডলার গড়ের চেয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি; কিন্তু ২০১০ সালের অর্থবছরে ৪৪.২ মিলিয়ন ডলার বরাদ্দ থেকে কম, যখন অর্থনৈতিক ও আর্থিক সংকট চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছায়। আইবিআরডি তার এএএ ক্রেডিট রেটিংয়ের ভিত্তিতে বিশ্বের আর্থিক বাজারে তার বন্ড বিক্রির মাধ্যমে প্রায় সব টাকা উত্তোলন করে থাকে।

দ্বিতীয় ধরনের ঋণ দরিদ্রতম দেশগুলোর কাছেই যায়, যারা সাধারণত আন্তর্জাতিক আর্থিক বাজারে ঋণ পাওয়ায় অর্থনৈতিকভাবে অক্ষম এবং ধার করা টাকার ওপর কাছাকাছি বাজারের সুদের হার পরিশোধ করতে অক্ষম। আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা বিশ্বের দরিদ্রতম দেশগুলোকে দারিদ্র্য হ্রাস করার লক্ষ্যে ঋণ দিয়ে থাকে। বিভিন্ন কর্মসূচির অনুদান অর্থায়ন এবং ক্রেডিট প্রদানের মাধ্যমে এগুলো অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি

জোরদার, বৈষম্য হ্রাস এবং মানুষের উন্নত জীবনযাপনের জন্য সহায়ক ভূমিকা পালন করে। 'ক্রেডিট'গুলো মূলত ১০ বছরের গ্রেস সময়কাল সংবলিত ৩৫-৪০ বছরমেয়াদি সুদমুক্ত ঋণ। আইডিএ সহায়তা মূলত তার ধনী সদস্য দেশগুলোর অনুদান থেকে আসে। ২০১২ সালে আইডিএ ৮১টি দেশে ১৪.৮ বিলিয়ন ডলার উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে ব্যয়ে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়।

নীতিমালা অনুযায়ী বিশ্বব্যাংক শুধু সরকারগুলোকে ঋণ বরাদ্দ করতে পারে; কিন্তু এটা স্থানীয় গোষ্ঠী, এনজিও এবং বেসরকারি উদ্যোগের সাথেও ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে। এর প্রকল্পগুলো জনসংখ্যার দরিদ্রতম সেক্টরে সহায়তা করার জন্য প্রস্তুত করা হয়। সফল উন্নয়নের জন্য সরকার এবং সম্প্রদায়ের উন্নয়ন প্রকল্পের মালিকানা থাকা বাঞ্ছনীয়। ব্যাংকটি সরকারকে এনজিও ও সুশীল সমাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করতে এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্যাংক-অর্থায়িত প্রকল্প থেকে উপকৃত মানুষের অংশগ্রহণ উৎসাহিত করে। এ ক্ষেত্রে যেসব দেশ থেকে ধার নেয়া হয় সেসব দেশের এনজিওগুলো প্রকল্পগুলোর প্রায় অর্ধেকই সহযোগিতা করে।

ব্যাংকটি স্থিতিশীল অর্থনৈতিক নীতি, শক্তিশালী সরকারি অনুদান এবং মুক্তমনা, সৎ ও জবাবদিহিমূলক শাসনের পক্ষপাতী। এটি দ্রুত বর্ধনশীল ও কার্যকরী বেসরকারি খাতগুলোকে সহায়তা দিয়ে থাকে, যেমন : অর্থ, শক্তি, টেলিযোগাযোগ, তথ্যপ্রযুক্তি, তেল, গ্যাস ও শিল্প। ব্যাংকের বিধানে বেসরকারি খাতে সরাসরি ঋণ প্রদান নিষিদ্ধ, কিন্তু এ ব্যাংকটির একটি শাখা-ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্স করপোরেশন উচ্চ ঝুঁকি খাতে এবং সংশ্লিষ্ট দেশের বেসরকারি খাতের উন্নয়নে বিনিয়োগ করতে পারে। বহুপক্ষীয় ইনভেস্টমেন্ট গ্যারান্টি এজেন্সি এমন আরেকটি শাখা, যা রাজনৈতিক ঝুঁকি বীমা নামে সংশ্লিষ্টদের সহায়তা করে, যারা উন্নয়নশীল দেশে বিনিয়োগ বা ঋণ দান করে।

বিশ্বব্যাংক কেবল ঋণ প্রদানের চাইতেও অনেক বেশি কিছু করে থাকে। এটি নিয়মিতভাবে এর প্রকল্পগুলোর তহবিলে কারিগরি সহায়তাও দেয়। এক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো হতে পারে : একটি দেশের বাজেটের সামগ্রিক আকার এবং কোথায় কেমন টাকা বরাদ্দ করা উচিত তা নির্ধারণ বা কীভাবে গ্রামে স্বাস্থ্য ক্লিনিক স্থাপন করা উচিত তার নির্দেশনা কিংবা একটি রাস্তা নির্মাণ করার জন্য কিরূপ সরঞ্জাম প্রয়োজন ইত্যাদি। ব্যাংকটি প্রতি বছর একচেটিয়াভাবে কিছু প্রকল্পের জন্য বিশেষজ্ঞ পরামর্শ ও প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। এটি ঋণগ্রহী দেশের মানুষদের উন্নয়ন কর্মসূচি পরিকল্পনা তৈরি ও বাস্তবায়নে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে।

আইবিআরডি কিছু ক্ষেত্রে, যেমন : পুনর্বনায়ন, দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও ভূমি ব্যবস্থাপনা, পানি, পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা ও কৃষি এবং প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ প্রভৃতি টেকসই উন্নয়ন প্রকল্পে সহযোগিতা দিয়ে থাকে। সংস্থাটি গ্লোবাল এনভায়রনমেন্ট সুবিধার প্রধান দাতা, যা নিজেই বিশ্ব পরিবেশ উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর বৃহত্তম দাতা। এছাড়াও আইবিআরডি এবং আইডিএ প্রচণ্ডভাবে ঋণী দরিদ্র দেশগুলোর উদ্যোগগুলোকে সমর্থন করে। বিশ্বের দরিদ্রতম ও সবচেয়ে ব্যাপকভাবে ঋণী দেশের বৈদেশিক ঋণ কমানোর লক্ষ্যে এটি কাজ করে। ২০১২ সালের অর্থবছরে ৫ মিলিয়ন ডলার উন্নয়ন ক্রেডিট এবং ২ মিলিয়ন ডলার ত্রাণ ঋণ মাফ করা হয়েছিল আইডিএ ঋণসেবার আংশিক শর্ত শিথিলের মাধ্যমে। তাদের জুলাই ২০০৫ সালের সামিটের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উন্নত দেশগুলোর আটটি দেশের গ্রুপ নেতাদের প্রস্তাব মতে, বিশ্বের কিছু দরিদ্রতম দেশগুলোর (বেশিরভাগই আফ্রিকা ও

লাতিন আমেরিকায়) আইডিএ, আইএমএফ এবং আফ্রিকান উন্নয়ন তহবিল থেকে নেয়া ঋণের ১০০ শতাংশ বাতিল করা হয়। ফলে বহুমুখী ঋণ মওকুফের উদ্যোগের অধীনে ২০১২-এর জুলাই পর্যন্ত ১.৬ বিলিয়ন ডলার উন্নয়ন ক্রেডিট ঋণ মওকুফের জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, যেহেতু আইভরি কোস্ট নামের একটি দেশ তার এইচআইপিসি'র সুযোগের সমাপ্তিতে পৌঁছেছে। একটি ক্রমবর্ধিষ্ণু হিসাবের ভিত্তিতে প্রায় ৩৭ মিলিয়ন ডলার উন্নয়ন ক্রেডিট জুন ২০১২র তারিখ অনুযায়ী এমডিআরআই অধীনে মওকুফ করা হয়েছে।

স্থিতিশীলতার জন্য ঋণ

অনেক দেশ জাতিসংঘের একটি বিশেষ সংস্থা, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের দ্বারস্থ হয়, যখন অভ্যন্তরীণ বা বহিরাগত কারণে গুরুতরভাবে ব্যালেন্স-অফ-পেমেন্ট, রাজস্ব স্থায়িত্ব বা ঋণ পরিশোধে অঙ্গীকার পূরণে ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ে। এ ধরনের সমস্যাগুলো থেকে উত্তরণের ক্ষেত্রে আইএমএফ সমস্যাসংকুল সদস্য দেশগুলোকে পরামর্শ ও নীতি সংশ্লিষ্ট সুপারিশ দিয়ে থাকে এবং প্রায়ই অর্থনৈতিক সংস্কার কর্মসূচির সমর্থনে আর্থিক সম্পদ দিয়ে থাকে।

অর্থ পরিশোধের হিসাব সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানে সংস্থাটির সদস্যগুলো অন্য রাষ্ট্রের মুদ্রা এবং বিশেষ উত্তোলন অধিকার ব্যবহার করে আইএমএফ থেকে নিজ অর্থের সমমূল্যের সম্পদ ক্রয় করতে পারে। আইএমএফ এসব ঋণ পরিশোধের জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমা ও কর পরিশোধ মূল্য বেঁধে দেয়, যা সদস্য রাষ্ট্রগুলো নিজ অর্থের মাধ্যমে পরিশোধ করতে পারে।

২০১০ সালে আইএমএফ তাদের সহায়তা নীতি হালনাগাদ করে যাতে স্বল্প আয়ের দেশগুলো অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক পরিবর্তন ও বিশ্ব অর্থ মন্দার ফলে সৃষ্ট সমস্যা মোকাবেলা করতে পারে। এর ফলে স্বল্প আয়ের দেশগুলোর জন্য মজুত অর্থ ২০১৪ সাল নাগাদ ১৭ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে যেতে পারে, যা পূর্বের তুলনায় দ্বিগুণ। এসব দেশের জন্য অর্থনৈতিক সুবিধা আর সহজ ও সুসঙ্গত করতে আইএমএফ ২০১০ সালের জানুয়ারি মাসে বর্ধিত, মজুত ও তাৎক্ষণিক এ তিন ধরনের ঋণ সুবিধা সংবলিত দারিদ্র্যবিমোচন ও প্রবৃদ্ধি ট্রাস্ট গঠন করে। ২০১৩ সালের এপ্রিল মাসে ঋণ বরাদ্দ প্রক্রিয়া আরো সহজ করার জন্য নীতিমালা গ্রহণ করা হয়।

আইএমএফের প্রধান আর্থিক সুবিধাগুলো হচ্ছে :

- স্ট্যান্ডবাই অ্যারেঞ্জমেন্টস : যা অস্থায়ী, স্বল্পমেয়াদি ও চক্রাকার ঘাটতি পূরণে মধ্যমেয়াদি ঋণ পরিশোধের সহায়ক সুবিধা হিসেবে কাজ করে;
- ফ্লেক্সিবল ক্রেডিট লাইন : যা অর্থ পরিশোধের বর্তমান ও আসন্ন সব ধরনের চাহিদা চিহ্নিত করে;
- প্রিকশনারি অ্যান্ড লিক্যুডিটি লাইন : এটি যেসব দেশের সুগঠিত অর্থনৈতিক ও নীতিমালা সংবলিত কাঠামো আছে, কিন্তু ফ্লেক্সিবল ক্রেডিট লাইন ব্যবহার করতে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে সেসব দেশের জন্য ;
- এক্সটেন্ডেড ফান্ড ফ্যাসিলিটি : যা দীর্ঘমেয়াদি পরিশোধের সমস্যা চিহ্নিত ও সমাধানে কাজ করে;

- এক্সটেন্ডেড ক্রেডিট ফ্যাসিলিটি : যা স্বল্প আয়ের দেশগুলোর দারিদ্রবিমোচনের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক লেনদেনের জন্য প্রয়োজনীয় কাঠামো উন্নয়নে দীর্ঘমেয়াদি সহায়তা দেয়;
- স্ট্যান্ডবাই ক্রেডিট ফ্যাসিলিটি : যা স্বল্প আয়ের দেশগুলোর অভ্যন্তরীণ বা বাহ্যিক অর্থ সমস্যা বা নীতি ঘাটতিতে স্বল্পমেয়াদি অর্থ ও অন্যান্য নীতি বিষয়ক সহায়তা প্রদান করে;
- রেপিড ক্রেডিট ফ্যাসিলিটি : যা স্বল্প আয়ের দেশগুলোকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, পণ্য মূল্যে পরিবর্তন বা প্রতিবেশী দেশের সংকটের মতো আকস্মিক সমস্যা সমাধানে তাৎক্ষণিক, এককালীন ও স্বল্প শর্তসাপেক্ষে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে;
- রেপিড ফাইন্যান্সিং ইন্সট্রুমেন্ট : যা যে কোনো সদস্য রাষ্ট্রের জরুরি লেনদেনের সমস্যা সমাধানে তাৎক্ষণিক ও স্বল্প শর্ত সংবলিত আর্থিক সুবিধা প্রদান করে।

চরম ঋণগ্রস্ত দেশগুলোকে ঋণ অবকাশ দেয়ার নিমিত্তে আইএমএফ ও বিশ্বব্যাংক যৌথভাবে 'চরম ঋণগ্রস্ত দরিদ্র দেশ' প্রকল্পের অধীনে তাদের ঋণের ভার সহায়ক স্তরে আনতে ব্যতিক্রমধর্মী সহায়তা প্রদান করে। সংস্থা দুটি বর্তমানে বহুপক্ষীয় ঋণ অবকাশ উদ্যোগের সাথেও এইচআইপিসি বাস্তবায়নে কাজ করছে।

প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্রের সাধারণ অর্থনৈতিক অবস্থা ও নীতিমালা বিশ্লেষণের মাধ্যমে আইএমএফ আন্তর্জাতিক বিনিময়ের মূল্য নির্ধারণের নিরীক্ষণ করে। এ নিরীক্ষণের জন্য আইএমএফ সদস্য রাষ্ট্রের সাথে বার্ষিক আলোচনা; বছরে দু'বার বহুপক্ষীয় নিরীক্ষণ; আঞ্চলিক দলগুলোর সঙ্গে আঞ্চলিক নিরীক্ষণ বিষয়ক আলোচনা এবং আইএমএফের মজুত সহায়তার অনুপস্থিতির সতর্কতামূলক ব্যবস্থাপনা, বর্ধিত নিরীক্ষণ ও তত্ত্বাবধায়ন বিষয়ক আলোচনার আয়োজন করে।

আইএমএফ বিস্তৃত পরিসরে এর সদস্য রাষ্ট্রগুলোকে কারিগরি সহায়তা প্রদান করে; যেমন—ফিস্কাল ও আর্থিক নীতিমালার পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন; কাঠামো তৈরি এবং পরিসংখ্যানের তত্ত্ব সংগ্রহ ও সংকলন। সদস্য রাষ্ট্রগুলোর কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য আইএমএফ ওয়াশিংটন ডিসিতে অবস্থিত আইএমএফ সদর দপ্তর এবং আবুধাবি (সংযুক্ত আরব আমিরাত), ব্রাসিলিয়া, দালিয়ান (চীন), পুনে (ভারত), সিঙ্গাপুর, তিউনিস ও ভিয়েনার আঞ্চলিক দপ্তরগুলো ব্যবহার করে।

বিনিয়োগ ও উন্নয়ন

প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগের নাটকীয় প্রসারের ফলে উন্নয়নশীল দেশগুলোর অর্থনীতিতে যেমন বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাচ্ছে, তেমনি একই সময়ে এসব দেশও অন্য উন্নয়নশীল দেশে বিনিয়োগ করছে। জাতিসংঘের বিভিন্ন অঙ্গ; সংস্থা যেমন—খাদ্য ও কৃষি সংস্থা, ইউএনডিপি এবং জাতিসংঘ শিল্প উন্নয়ন সংস্থা উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যাবলি পর্যবেক্ষল ও নিরূপণ করে থাকে।

বিশ্বব্যাংকের দুটি শাখা–আন্তর্জাতিক ফিন্যান্স করপোরেশন ও বহুপক্ষীয় বিনিয়োগ নিশ্চয়তা এজেন্সি–উন্নয়নশীল দেশে বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করে। আইএফসি উপদেশ প্রদানের মাধ্যমে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর সরকারকে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক পুঁজি ও বিনিয়োগের ধারা বজায় রাখার পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়তা করে। এছাড়া বিনিয়োগ-

পরবর্তী লাভপ্রাপ্তির সম্ভাবনা প্রদর্শন করে সংস্থাটি বেসরকারি বিনিয়োগে উৎসাহ প্রদান করে। ২০১২ ফিস্কাল বছরে আইএফসি ১০৩টি দেশের ৫৭৬টি প্রকল্পে অন্যান্য বিনিয়োগকারীর প্রায় ৫০০ কোটি ডলারসহ সর্বমোট ২,০৪০ কোটি ডলার বিনিয়োগ নিশ্চিত করে। ১৯৯৬ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে আইএফসি উন্নয়নশীল দেশে বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য নিজ তহবিল থেকে ১২,৬০০ কোটি ডলার ও অন্যান্য উৎস থেকে আরো কয়েকশ' কোটি ডলার বিনিয়োগে জোগান দেয়।

বহুপক্ষীয় বিনিয়োগ নিশ্চয়তা এজেন্সি হচ্ছে বিশ্বব্যাংকের একটি বিনিয়োগ শাখা, যা বিনিয়োগকারীদের দীর্ঘমেয়াদি রাজনৈতিক ঝুঁকিতে, সম্পদ বাজেয়াপ্ত, মুদ্রা হস্তান্তর, যুদ্ধ ও অভ্যন্তরীণ কলহ ইতাদিতে ইন্স্যুরেন্স সহায়তা দেয় এবং কিছু উপদেশমূলক কাজের মাধ্যমে উন্নয়নশীল দেশে বেসরকারি বিনিয়োগ প্রবাহ বজায় রাখার লক্ষ্যে কাজ করে। এমআইজিএ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে, বিনিয়োগে সুযোগ-সংশ্লিষ্ট তথ্য বিতরণ করে এবং কারিগরি সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর বিনিয়োগের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে কাজ করে যাচ্ছে। ২০১২ ফিস্কাল বছরে এমআইজিএ ২৭০ কোটি ডলার বিনিয়োগ করে বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশের ৫০টি প্রজেক্টের বিনিয়োগ নিশ্চয়তা প্রদান করেছে। ১৯৮৮ সালের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এমআইজিএ ১০৫টি দেশের ৭০১টি প্রজেক্টের জন্য ২,৭২০ কোটি ডলারের সমমূল্যের ১০৯৬টি ইন্সুরেন্স প্রদান করে।

বাণিজ্য এবং উন্নয়ন

জাতিসংঘের বাণিজ্য ও উন্নয়ন বিষয়ক সম্মেলন বিশ্ব বাণিজ্যে সব দেশের ঐক্য আনয়নের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বাণিজ্য, অর্থ, প্রযুক্তি, বিনিয়োগ ও টেকসই উন্নয়নের মতো উন্নয়ন-সংশ্লিষ্ট বিষয়াদিতে জাতিসংঘের কেন্দ্রবিন্দু হওয়ার সুবাদে আঙ্কটাড উন্নয়নশীল দেশগুলোর বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও উন্নয়নের সুযোগ প্রসারে কাজ করে যাচ্ছে। এটি তাদেরকে বিশ্বায়নের নানা চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে বিশ্ব অর্থনীতিতে তাদের ন্যায্য জায়গা করে নিতে সাহায্য করে। আঙ্কটাড গবেষণা, নীতি বিশ্লেষণ, আন্তঃসরকার আলোচনা, কারিগরি সহায়তা এবং সুশীল সমাজ ও বাণিজ্যিক সেক্টরের সাথে যোগাযোগ রক্ষার মাধ্যমে তাদের লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে। আঙ্কটাড বিশেষত :

- বৈশ্বিক অর্থনীতির গতিধারা বিশ্লেষণ করে এবং উন্নয়নমূলক কাজে সেগুলোর প্রভাব মূল্যায়ন করে;
- আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ব্যবস্থার অংশীদার হতে ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য আলোচনায় অংশ নিতে উন্নয়নশীল রাষ্ট্র, বিশেষ করে স্বল্পোন্নত রাষ্ট্রগুলোকে সাহায্য করে থাকে;
- প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগের গতিধারায় বিদেশি বিনিয়োগের প্রবাহ নজরে রাখে এবং বাণিজ্য, প্রযুক্তি ও উন্নয়নে তাদের প্রভাব গবেষণা করে;
- উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলোকে বিনিয়োগ আকর্ষণ করতে সাহায্য করে;
- উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলোকে উদ্যোগ এবং উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করে এবং
- বাণিজ্য-সহযোগিতা সেবায় দক্ষতা বাড়ানোর মাধ্যমে উন্নয়নশীল রাষ্ট্র ও অর্থনৈতিক ক্রান্তিলগ্নে থাকা রাষ্ট্রগুলোকে সাহায্য করে। আঙ্কটাড বিদেশি বিনিয়োগ বাড়াতে ও অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগের পরিবেশ উন্নত করতে উন্নয়নশীল ও অর্থনৈতিক ক্রান্তিলগ্নে থাকা রাষ্ট্রগুলোকে সাহায্য করে থাকে। সংস্থাটি সরকারকে বিদেশি বিনিয়োগের

নীতিগুলোর প্রভাব বোঝাতে এবং নিজেদের বিনিয়োগ-নীতি সেই অনুযায়ী বাস্তবায়ন করতে সাহায্য করে। এই সংস্থাটি বিনিয়োগ, বাণিজ্য, উদ্যোগ উন্নয়ন এবং প্রযুক্তিগত সক্ষমতা বৃদ্ধির মধ্যে বিদ্যমান যোগাযোগ সম্পর্কে ধারণা পেতে সংশ্লিষ্টদের সহায়তা করে। আঙ্কটাডের বার্ষিক বিশ্ব বিনিয়োগ প্রতিবেদন, বিনিয়োগ-নীতি পর্যালোচনা, বিশ্ব বিনিয়োগ নির্দেশিকা এবং অন্যান্য গবেষণায় বিদেশি বিনিয়োগের গতিধারা ও বর্তমান পরিস্থিতি তুলে ধরা হয়।

আঙ্কটাড বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে বাণিজ্য উন্নয়নের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক গতিধারা বিশ্লেষণ করে এবং ক্রান্তিলগ্নে থাকা রাষ্ট্রগুলোর চিন্তা জগৎ প্রসারে ও নীতি নির্ধারণে সাহায্য করে থাকে। আঙ্কটাড উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের বাণিজ্য উন্নয়নের ক্ষেত্রে 'বিশেষ' ও 'ভিন্নধর্মী' ব্যবস্থা নেয়ার ধারণার অন্যতম স্রষ্টা এবং বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা, শুল্ক ও বাণিজ্য সংক্রান্ত সাধারণ চুক্তির সাথে এর সংযুক্তির মূল প্রবক্তা। এটি জাতিসংঘ ব্যবস্থার বাণিজ্যিক সাহচর্য ও সহায়তার কেন্দ্রবিন্দুও বটে। কম খরচে লেনদেনের সুযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতির বিষয়ে প্রাতিষ্ঠানিক, আইনি ও কার্যকরী সমাধান দেয়ার মাধ্যমে এটি বিশ্ববাজারে উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলোর প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি করে।

আঙ্কটাড নিয়মিত আন্তঃসরকার আলোচনা এবং কারিগরি সহায়তার মাধ্যমে উদ্যোক্তা উন্নয়ন, বিশেষ করে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগের প্রসারে কাজ করে। এর কারিগরি সহায়তা কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে :

- সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে তৈরি করা শুল্ক তথ্য সংক্রান্ত স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা, যা সরকারকে শুল্ক ব্যবস্থা আধুনিকীকরণে সাহায্য করে। ইতিমধ্যে ৯০টি দেশে ব্যবহৃত এই ব্যবস্থা দ্রুতই একটি আদর্শ আন্তর্জাতিক স্বয়ংক্রিয় শুল্ক ব্যবস্থা হিসেবে পরিণত হচ্ছে। এটি উন্নত অর্থনৈতিক প্রশাসন পরিচালনার একটি হাতিয়ারও বটে।
- EMPRETEC প্রোগ্রাম যা ক্ষুদ্র ও মাঝারি আকারের উদ্যোক্তাদের প্রচার করে। এটি একটি নেটওয়ার্ক যা উদ্যোক্তাদের বাণিজ্যিক ডাটাবেজের সাথে সংযুক্ত হওয়ার সুযোগ করে দেয়।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকেন্দ্র-আইটিসি বাণিজ্যিক প্রচারের ক্ষেত্রে উন্নয়নশীল রাষ্ট্রদের কারিগরি সহায়তা প্রদানে জাতিসংঘের কেন্দ্রবিন্দু।

আইটিসি আমদানি কর্মসূচির উন্নয়ন ও রফতানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাণিজ্যিক প্রসারের কার্যক্রম ঠিক করার জন্য উন্নয়নশীল ও অর্থনৈতিক সংকটে থাকা রাষ্ট্রগুলোর সাথে কাজ করে।

আইটিসির লক্ষ্য হলো টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিষয়ে কাজ করা এবং বাণিজ্য ও ব্যবসায়িক উন্নয়নের মাধ্যমে উন্নয়নশীল ও অর্থনৈতিক সংকটে থাকা রাষ্ট্রগুলোতে এমডিজির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে অবদান রাখা। এমডিজি-এর লক্ষ্যমাত্রাগুলো পূরণে দারিদ্র্য দূরীকরণ ও দরিদ্র সমাজের উদ্যোক্তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে তাদের বৈশ্বিক মানে তুলে আনতে আইটিসি-এর যে চেষ্টা তা শেষত একটি আইটিসি মানদণ্ডে পরিণত হয়।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কেন্দ্রটির উদ্দেশ্যগুলো হলো বাণিজ্যিক বুদ্ধিমত্তার প্রাপ্যতা ও সঠিক ব্যবহার নিশ্চিতকরণ; বাণিজ্য সহায়ক সংস্থাগুলোকে শক্তিশালী করা; রফতানি

উদ্যোগগুলোর লাভের জন্য পরিকল্পনা ও নীতি গ্রহণ; রফতানি উদ্যোক্তাদের রফতানির সক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং বাণিজ্যের প্রসার ও রফতানি উন্নয়ন নীতির মূল ধারায় ফেরত আসা এবং স্থায়িত্ব নিশ্চিত করা। বাণিজ্যের প্রচারে কারিগরি সহায়তা কর্মসূচি বাস্তবায়নে বিভিন্ন সরকারের বাণিজ্য কর্মকর্তাদের সাথে আইটিসি নিবিড়ভাবে কাজকর্ম করে। জাতীয় কর্মসূচি মাঝে মধ্যে দেশের রফতানি ও আমদানি কর্মসূচি বৃদ্ধিতে ব্যাপক আকারের সেবা প্যাকেজে পরিণত হয়।

কৃষি উন্নয়ন

পৃথিবীর বেশিরভাগ জনগণ এখনও গ্রামাঞ্চলে বসবাস করে এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তাদের জীবন ও জীবিকার জন্য কৃষিকাজের ওপর নির্ভরশীল। সাম্প্রতিক দশকগুলোতে গ্রাম্য এলাকায় দারিদ্র্য আরো গভীরভাবে ছড়িয়ে পড়েছে এবং শিল্পায়নের হুজুগে কৃষি সেক্টরে বিনিয়োগের পরিমাণ খুবই কমে গেছে। জাতিসংঘ এই অসম অবস্থাকে সামাল দিতে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়।

জাতিসংঘ কৃষি ও খাদ্য সংস্থা (এফএও) কৃষি, বনায়ন, মৎস্য চাষ ও গ্রামীণ উন্নয়নের ক্ষেত্রে মুখ্য কার্যকরী সংস্থা। সংস্থাটি ব্যাপক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের মাধ্যমে উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলোকে প্রভূত সাহায্য দিয়ে থাকে। এর নির্দিষ্ট একটি অগ্রাধিকারের মধ্যে রয়েছে গ্রামীণ উন্নয়ন ও টেকসই কৃষিকাজে উৎসাহ প্রদান– যা হলো প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি খাদ্য উৎপাদন ও খাদ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধির দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা। এফএও মাটি ও পানির উন্নয়ন; উদ্ভিদ ও পশুপ্রজনন; বনায়ন; মৎস্যচাষ; অর্থনৈতিক, সামাজিক ও খাদ্য নিরাপত্তা নীতি; বিনিয়োগ; পুষ্টি; মানসম্মত ও নিরাপদ খাদ্য এবং পণ্যদ্রব্য ও বাণিজ্য ইত্যাদি নিয়ে কাজ করে থাকে।

টেকসই কৃষি উন্নয়নের জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরিতে এফএও পরিবেশ, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিষয়াবলি বিবেচনায় নিয়ে সমন্বিত পদ্ধতিতে অগ্রসর হতে উৎসাহ দিয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, নির্দিষ্ট পরিমাণ জমিতে কিছু ফসল চাষের সমন্বয় ঘটলে তা একই সাথে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, স্থানীয় গ্রামবাসীর জন্য জ্বালানি কাঠের জোগান, মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি ও ভূমিক্ষয় রোধে অবদান রাখতে পারে।

এফএও একই সাথে ১০০০টিরও বেশি প্রকল্প নিয়ে বিশ্বব্যাপী কাজ করে; যার মধ্যে রয়েছে সমন্বিত ভূমি ব্যবস্থাপনা থেকে শুরু করে জরুরি দুর্যোগ ত্রাণ এবং বনায়ন ও বিপণন কৌশলের মতো বৈচিত্র্যময় বিষয়ে নীতি ও পরিকল্পনা-সংশ্লিষ্ট পরামর্শ। এফএও সাধারণত নিম্নোক্ত তিনটি ভূমিকার যে কোনো একটি নিয়ে কাজ করে : নিজের কর্মসূচি বাস্তবায়ন; দাতা কিংবা অন্য কোনো সংস্থার কর্মসূচি বাস্তবায়ন অথবা রাষ্ট্রীয় প্রকল্পে পরামর্শ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সহায়তা।

এফএও আন্তর্জাতিক অর্থায়ন প্রতিষ্ঠানগুলোর বিনিয়োগ কেন্দ্র আইএফআইর অংশীদার হিসেবে উন্নয়নশীল এবং ক্রান্তিকালীন রাষ্ট্রগুলোতে কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়নে বিনিয়োগ কার্যক্রম প্রণয়নে সহায়তা করে।

১৯৬৪ সাল থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত এফএও এবং তার IFI অংশীদাররা ১৯৫২টি প্রকল্পের জন্য কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়নে ১০৫.২ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বেশি এনে দিয়েছে, যার মধ্যে ৬৫.৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ছিল IFI-দের অর্থায়ন।

আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল : কৃষি উন্নয়ন কার্যক্রম এবং গ্রামীণ জনগণের দারিদ্র্য দূরীকরণে সহায়তাকারী প্রকল্পগুলোকে অর্থায়ন করে থাকে। এ সংস্থা অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও খাদ্য নিরাপত্তা-সংশ্লিষ্ট প্রকল্পগুলোকে ঋণ ও অনুদানও দিয়ে থাকে। আইএফএডি-সমর্থিত উদ্যোগগুলো গ্রাম্য এলাকার জনগণকে ভূমি, পানি, আর্থিক উৎস, কৃষি প্রযুক্তি এবং কৃষিকাজে প্রয়োজনীয় সেবাগুলোর লাভজনক ব্যবহার করতে সক্ষম করে তোলে এবং তাদের আয় বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে নিজস্ব উদ্যোগ হাতে নিতে ও বাজারে প্রবেশাধিকার পেতে সহায়তা করে। এটি গ্রামের দরিদ্রদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি এবং সংগঠন তৈরি নিয়েও কাজ করে।

ক্ষুদ্র কৃষক, ভূমিহীন মজুর, যাযাবর মেষপালক, মৎস্যজীবী, আদিবাসী সম্প্রদায়, জাতভেদ নির্বিশেষে গ্রামীণ দরিদ্র নারী অর্থাৎ বিশ্বের সবচেয়ে অসহায় ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উন্নতি ও লাভের উদ্দেশ্যে আইএফএডি বিভিন্ন কর্মসূচি ও প্রকল্প গ্রহণ করে থাকে। দরিদ্র রাষ্ট্রগুলোকে আইএফএডি অত্যন্ত সহজ শর্তে ঋণ বরাদ্দ করে থাকে, যা ১০ বছরের রেয়াত কাল ও ০.৭৫ শতাংশ বার্ষিক সার্ভিস চার্জসহ ৪০ বছর সময়কালের মধ্যে পরিশোধযোগ্য। এ তহবিলটি সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার ২০১৫ সালের মধ্যে ক্ষুধার্ত ও অতি দরিদ্র জনগণের সংখ্যা অর্ধেকে নামিয়ে আনার লক্ষ্যটি পূরণে বিশেষভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

১৯৭৮ সালে কার্যক্রম শুরু করার পর থেকে এ পর্যন্ত আইএফএডি ৯২৪টি প্রকল্পে ১৪.৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করেছে, যা ১১৯টি দেশের ৪০ কোটি মানুষের উপকারে এসেছে। গ্রাহক দেশের সরকারগুলো ও অন্যান্য অর্থায়নের উৎস প্রায় ১২.৩ বিলিয়ন দান করেছে, যেখানে বহুপক্ষীয়, দ্বিপক্ষীয় এবং অন্য দাতারা আরো অতিরিক্ত ৯.৬ বিলিয়ন ডলার দিয়েছে।

শিল্প উন্নয়ন

শিল্পের বিশ্বায়ন উন্নয়নশীল ও অর্থনৈতিক ক্রান্তিলগ্নে থাকা রাষ্ট্রগুলোর জন্য কিছু অভূতপূর্ব চ্যালেঞ্জ এবং সুযোগ এনে দিয়েছে। জাতিসংঘ শিল্প উন্নয়ন সংস্থা জাতিসংঘের সেই বিশেষায়িত সংস্থা, যা ওই সব রাষ্ট্রকে নতুন এই বৈশ্বিক পরিবেশে টেকসই শিল্পোন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে যেতে সাহায্য করে। ইএনআইডিও দারিদ্র্য দূরীকরণ, অংশগ্রহণমূলক বিশ্বায়ন ও পরিবেশগত ধারণক্ষমতা বৃদ্ধির ওপর জোর দেয়ার মাধ্যমে বৈশ্বিক উন্নয়নে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। এর সেবাগুলো দুটি মূল কাজে বিভক্ত : একটি বৈশ্বিক ফোরাম হিসেবে এটি শিল্প-সংক্রান্ত জ্ঞান আহরণ ও বিতরণ করে এবং কারিগরি সহায়তা সংস্থা হিসেবে এটি কারিগরি সহায়তা প্রদান করে ও বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে। ইউএনআইডিও-এর কারিগরি সহায়তা কার্যক্রম সরাসরি বৈশ্বিক উন্নয়নে প্রভাব রাখে নিম্নোক্ত তিনটি বিষয়ভিত্তিক অগ্রাধিকারের ওপর ভিত্তি করে :

- উৎপাদনশীল কাজের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ— শিল্প-সংক্রান্ত নীতির বিষয়ে পরামর্শদান থেকে শুরু করে বাণিজ্যিক ও ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের উন্নয়নে ব্যাপক পরিসরের সেবাদান, প্রযুক্তির প্রসার থেকে শুরু করে টেকসই উন্নয়ন এবং উৎপাদনশীল কাজে গ্রামীণ শক্তির ব্যবহার;

- ব্যবসায়িক ক্ষমতা বৃদ্ধি— ব্যবসায়িক মান, পরীক্ষণ পদ্ধতি ও মাত্রা-বিজ্ঞান মেনে প্রতিযোগিতা, বাণিজ্যনীতি এবং শিল্পের আধুনিকায়ন ও উন্নতির বিষয়ে বাণিজ্য-সংক্রান্ত উন্নয়ন সেবা, পরামর্শ ও কারিগরি সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে এবং
- পরিবেশ ও শক্তি—শিল্পের খরচ ও উৎপাদনের টেকসই প্যাটার্নের প্রচার এবং গ্রাহকদের বহুপক্ষীয় পরিবেশ-সংক্রান্ত চুক্তি বাস্তবায়নে ও পাশাপাশি তাদের অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছাতে পরিবেশ ও শক্তির সংরক্ষণ।

ইউএনআইডিও সরকার, বাণিজ্যিক সংঘ এবং ব্যক্তিমালিকানাধীন সেক্টরগুলোকে এমন সেবাদান করে, যা তাদের মূল কর্মসূচি ও প্রকল্প এবং বিষয়ভিত্তিক অগ্রাধিকারগুলোকে বাস্তবায়নে সাহায্য করে। ইউএনআইডিও-এর ১৩টি বিনিয়োগ ও প্রযুক্তি সংক্রান্ত কার্যালয় রয়েছে, যেগুলো স্থানীয় সরকারের অর্থায়নে চলে। এই কার্যালয়গুলো শিল্পোন্নত রাষ্ট্রগুলোর সাথে উন্নয়নশীল ও অর্থনৈতিক ক্রান্তিলগ্নে থাকা রাষ্ট্রগুলোর বাণিজ্যিক যোগাযোগের কেন্দ্র।

শ্রম

অর্থনৈতিক ও সামাজিক– উন্নয়নের উভয় দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কিত সংস্থা আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার দায়িত্ব আন্তর্জাতিক শ্রম-পরিবেশ তত্ত্বাবধান করা এবং এটিই জাতিসংঘের একমাত্র ত্রিপক্ষীয় সংস্থা যা সরকার, মালিক ও শ্রমিকদের প্রতিনিধিদের একসাথে নিয়ে সুন্দরভাবে কাজ করার পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে নীতি ও কর্মসূচির রূপায়ণে কাজ করে। আইএলও-র মূল লক্ষ্যগুলো হচ্ছে— কর্মক্ষেত্রে অধিকার নিয়ে প্রচারণা, উপযুক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ দিতে উৎসাহ প্রদান, সামাজিক নিরাপত্তা বৃদ্ধি, এবং কর্ম-সংক্রান্ত বিষয়ে সংলাপের পরিবেশ শক্তিশালী করা। আইএলও শ্রমের মান ও নির্দেশাবলির বিষয়ে একটি কর্মছক বা ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি করেছে, যা বস্তুত বিশ্বের সব রাষ্ট্রের আইনসভাই অনুমোদন করেছে।

আইএলও এই নীতি দ্বারা পরিচালিত যে উপযুক্ত কর্মস্থলে ন্যায্য বেতন-ভাতাভিত্তিক কর্মসংস্থানের অধিকার সমসামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হলেই শুধু সমাজের স্থিতিশীলতা ও সংহতি স্থায়িত্ব লাভ করে। বিগত দশকগুলোতে আইএলও আট ঘণ্টার কর্মদিবস, মাতৃত্বকালীন সুরক্ষা ও শিশুশ্রম আইনের মতো এবং কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা ও শান্তিপূর্ণ শিল্প-সংক্রান্ত সম্পর্কের মতো ব্যাপক পরিসরের নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। আইএলও-র কাজের মধ্যে রয়েছে :

- মানুষের মৌলিক অধিকার প্রচার, বাসস্থান ও কর্মস্থলের পরিবেশের উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক নীতিমালা ও কর্মসূচি প্রণয়ন;
- যুক্তিসঙ্গত শ্রমনীতি বাস্তবায়নে জাতীয় কর্তৃপক্ষগুলোর গাইডলাইন হিসেবে কাজ করার উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক শ্রমমান নির্ধারণ;
- এসব নীতি কার্যকর করার উদ্দেশ্যে সুবিধাভোগীদের সহযোগিতায় ব্যাপক কর্মসূচি প্রণয়নে ও বাস্তবায়নে তাদের সহায়তা দেয়া; এবং
- এই উদ্যোগগুলোকে এগিয়ে নিয়ে যেতে প্রশিক্ষণ, শিক্ষা, গবেষণা ও তথ্য কার্যক্রম চালানো।

আইএলও-র মূল উদ্দেশ্য হলো সব মানুষের জন্য মেধা ও যোগ্যতাভিত্তিক কর্মসংস্থান এবং উপযুক্ত কর্মস্থলের সুযোগের জন্য প্রচার চালানো। সংগঠনটির চারটি কৌশলগত লক্ষ্য রয়েছে, যা তার মূল উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ও একই বিন্দুতে মিলিত :

- কর্মস্থলের মান, মৌলিক নীতি ও অধিকার অনুধাবন ও প্রচার করা;
- পুরুষ ও নারী উভয়ের জন্য উপযুক্ত কর্মসংস্থান ও আয়ের সুযোগ করে দেয়া;
- সকলের জন্য সামাজিক নিরাপত্তার ব্যাপকতা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধি;
- সরকার, শ্রমিক ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে আলোচনার পরিবেশ দৃঢ় করা।

এই লক্ষ্যগুলো বাস্তবায়ন করতে আইএলও শিশুশ্রমের বিলুপ্তি; কর্মস্থলে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা; আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তা; ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের প্রচার; দক্ষতা, জ্ঞান ও চাকরির যোগ্যতা অর্জন; লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য দূরীকরণ এবং ১৯৯৮ সালের আন্তর্জাতিক শ্রম সম্মেলনে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা গৃহীত ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work-এর প্রচারণা—এসব বিষয়ের দিকে জোর দেয়।

ILO-এর কারিগরি সহায়তা মূলত গণতান্ত্রিকীকরণে সহায়তা, কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং শ্রমিকদের নিরাপত্তার ওপর জোর দেয়। এটি দেশগুলোকে তাদের সংশ্লিষ্ট আইনের প্রাসঙ্গিকতায় সাহায্য করে এবং আইএলও-র মানকে কার্যকর করতে বাস্তবিক পদক্ষেপ নেয়; যেমন উদাহরণস্বরূপ পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিভাগগুলো, সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং কর্মীদের শিক্ষা বিভাগের উন্নয়ন করে। গ্রাহক দেশ, দাতা ও আইএলও-র সাথে নিবিড় সহযোগিতার মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে, যাতে স্থানীয় ও আঞ্চলিক কার্যালয়ের সাথে একটি নেটওয়ার্ক রক্ষা করা হয়। আইএলও বিশ্বের প্রায় ৮০টি দেশজুড়ে ১০০০টিরও বেশি কারিগরি সহায়তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। আইএলও কারিগরি সহায়তা প্রকল্পগুলোতে বছরে গড়ে ১৩ কোটি মার্কিন ডলার ব্যয় করে।

ইতালির তুরিন শহরে অবস্থিত আইএলও-র আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ব্যক্তিগত ও সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর জ্যেষ্ঠ ও মাঝারি পর্যায়ের ম্যানেজার, শ্রমিক ও চাকরিজীবী সংগঠনের নেতা এবং সরকারি কর্মকর্তা ও নীতিনির্ধারকদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে থাকে। এটি ১৮০টি দেশের প্রায় ১১,০০০ লোকের জন্য বছরে ৪৫০টিরও বেশি কর্মসূচি ও প্রকল্প পরিচালনা করে।

সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় অবস্থিত আন্তর্জাতিক শ্রম গবেষণা প্রতিষ্ঠান আইএলও সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলি নিয়ে উন্মুক্ত আলোচনা ও পলিসি রিসার্চে গুরুত্ব দিয়ে থাকে। এর সাংগঠনিক বিষয়বস্তু হলো শ্রমিক সংস্থা, অর্থনৈতিক বিকাশ ও সামাজিক সাম্যের মধ্যে সম্পর্ক। এই ইনস্টিটিউট একটি বৈশ্বিক ফোরাম হিসেবে কাজ করে, আন্তর্জাতিক গবেষণা নেটওয়ার্ক বজায় রাখে এবং শিক্ষামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে।

আন্তর্জাতিক বেসামরিক বিমান চলাচল

২০১২ সালে আনুমানিক প্রায় ২.৯ বিলিয়ন যাত্রী বেসামরিক বিমানে যাত্রা করে, পাঁচ কোটি ১০ লাখ টন মালামাল বিমানে স্থানান্তর হয় এবং রেকর্ড তিন কোটি ১০ লাখ বার বিমান উড্ডয়ন হয়। আন্তর্জাতিক বেসামরিক বিমান চলাচল সংস্থা জাতিসংঘের একটি বিশেষায়িত সংস্থা, যা এর সদস্য রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক বিমান চালনা সমাজ সম্পর্কিত

একটি বৈশ্বিক সহযোগী ফোরাম হিসেবে কাজ করে। আইসিএও-এর বর্তমান লক্ষ্য হলো, বেসামরিক বিমান চলাচলের এমন একটি বৈশ্বিক ব্যবস্থা তৈরি করা, যা পূর্ণ সক্ষমতার সাথে চলবে এবং একই সাথে সর্বোচ্চ সুরক্ষা, নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা প্রদান করবে। আইসিএও মূলত তার কৌশলগত লক্ষ্যের দ্বারা পরিচালিত হয়, যা সুরক্ষা, নিরাপত্তা ও পরিবেশগত নিরাপত্তা এবং বিমান পরিবহনের টেকসই উন্নয়ন—এই তিনটি মূল ক্ষেত্রের ওপর গুরুত্ব দেয়।

এই লক্ষ্যগুলো অর্জন করতে আইসিএও :

- বিমানের নকশা, কর্মক্ষমতা ও উপকরণ, বিমানের পাইলটদের কর্মদক্ষতা, ফ্লাইট ক্রু, এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলার, স্থল ও মেরামতকর্মী এবং আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের নিরাপত্তার চাহিদা ও কর্ম-প্রক্রিয়া ইত্যাদির ব্যাপারে আন্তর্জাতিক মান ও সুপারিশমালা বজায় রাখার দিকে লক্ষ্য রাখে;
- সার্বিক (প্রকৃত ও যান্ত্রিক) ফ্লাইট-বিধির পাশাপাশি আন্তর্জাতিক নেভিগেশনের জন্য বৈমানিক চার্ট তৈরি করে এবং বিমানের টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা, রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি ও নিরাপত্তা প্রক্রিয়া দেখভালের দায়িত্ব নেয়;
- বিমানের দূষিত গ্যাস নির্গমন ও শব্দ দূষণের মাত্রা কমানোর মাধ্যমে পরিবেশের ওপর বিমান পরিবহনের ক্ষতি হ্রাসে কাজ করে;
- শুল্ক, অভিবাসন, জনস্বাস্থ্য ও অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতার মান নির্ধারণ করে দেয়ার মাধ্যমে বিমান, যাত্রী, ক্রু, মালামাল ও কার্গো চলাচলের পথ সুগম করে দেয়।

আইসিএও বেআইনি হস্তক্ষেপ—যা আন্তর্জাতিক বেসামরিক বিমান পরিবহনে গুরুতর হুমকি হয়ে দাঁড়ায়—তা রোধকল্পে নীতি ও কার্যক্রমের পরিকল্পনা করার প্রতি গুরুত্ব দেয়। যুক্তরাষ্ট্রে ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের জঙ্গি হামলার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ আইসিএও বিমান চলাচলের নিরাপত্তার বিষয়ে একটি কর্মপরিকল্পনা হাতে নেয়, যার মধ্যে ছিল নিরাপত্তার মান ও তার প্রয়োগের মূল্যায়ন এবং প্রয়োজনীয় জায়গায় সংশোধনের সুপারিশ করার জন্য একটি সর্বজনীন নিরীক্ষা কার্যক্রম।

২০১০ সালে আইসিএও-এর ৩৭তম সম্মেলনে সংস্থাটি বিমান পরিবহনের চ্যালেঞ্জ ও অগ্রাধিকারগুলো নিয়ে নতুন চুক্তি ও ঘোষণা প্রকাশ করে। রানওয়ের নিরাপত্তার দিকে নজর দেয়ার জন্য মিটিংয়ে অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রগুলো আইসিএও-এর এই ঘোষণাকে সাদরে গ্রহণ করে এবং বিমানের মাধ্যমে পরিবেশ দূষণ হ্রাস করার ব্যাপারে একটি ঐতিহাসিক সমাধানে উপনীত হয়, যা সংস্থাটির ১৯০টি সদস্য রাষ্ট্রকে ২০৫০ সাল পর্যন্ত পথ দেখাবে। এর ৩৮তম সম্মেলনটি হওয়ার কথা রয়েছে ২০১৩ সালের সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে।

আইসিএও বিমান চলাচল ব্যবস্থার উন্নয়ন ও বিমানকর্মীদের প্রশিক্ষণে সহায়তা চেয়ে উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলোর অনুরোধ রাখে। এ সংস্থাটি বেশ কয়েকটি উন্নয়নশীল রাষ্ট্রে আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করেছে। আইসিএও-এর সাহায্য লাভের মানদণ্ড নির্ভর করে মূলত আইসিএও প্রদত্ত মান ও প্রস্তাবিত অনুশীলন অনুসারে কোন কোন দেশের বেসামরিক বিমান চলাচল নিরাপদ ও কার্যকর হওয়া উচিত তার ওপর।

আন্তর্জাতিক সমুদ্র চলাচল সংস্থা, আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়ন ও বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থার মতো জাতিসংঘের অন্য বিশেষায়িত সংস্থাগুলোকে আইসিএও

ঘনিষ্ঠভাবে সহযোগিতা করে থাকে। আন্তর্জাতিক বিমান পরিবহন সংস্থা, আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর কাউন্সিল, আন্তর্জাতিক বিমান পাইলট অ্যাসোসিয়েশন ও অন্যান্য সংস্থাগুলোও আন্তর্জাতিক বেসামরিক বিমান পরিবহন সংস্থার মিটিংগুলোতে অংশ নিয়ে থাকে।

আন্তর্জাতিক নৌ পরিবহন

১৯৫৯ সালে আন্তর্জাতিক সমুদ্র চলাচল সংস্থা (আইএমও)-এর প্রথম সম্মেলনে ৪০টিরও কম রাষ্ট্র অংশগ্রহণ করে। বর্তমানে এর সদস্য সংখ্যা ১৭০ (১৬৯টি জাতিসংঘ সদস্য রাষ্ট্র এবং কুক দ্বীপপুঞ্জ) এবং এর সহযোগী সদস্য তিনটি। বিশ্বের সব বাণিজ্য বহরের (টন হিসেবে) ৯৮ শতাংশেরও বেশি ক্ষেত্রে এ সংস্থা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক নৌ পরিবহন নীতি মেনে চলে।

সমুদ্রসীমা আইনের প্রয়োগ আইএমও-এর সুপরিচিত দায়িত্ব। আইএমও প্রায় ৫০টি নীতি ও খসড়া চুক্তি গ্রহণ করেছে, যার বেশিরভাগই নৌ-বিশ্বের পরিবর্তন সংক্রান্ত এবং আরো ১০০০-এর বেশি আইন ও সুপারিশ প্রণয়ন করেছে, যা সমুদ্র নিরাপত্তা, দূষণ রোধ সংক্রান্ত। আন্তর্জাতিক নৌযাত্রার সুরক্ষা বৃদ্ধি এবং জাহাজ থেকে পরিবেশ দূষণ হ্রাসের পাশাপাশি বর্তমানে সামুদ্রিক নিরাপত্তাকেও আইএমও-র লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করেছে। এ সংস্থার মূল আলোচ্য বিষয়াবলির মধ্যে রয়েছে পলি ও নুড়িজলের মধ্যে ক্ষতিকর জলজ জীবের পরিবহন এবং জাহাজ ও জাহাজের পুনঃনবায়ন থেকে গ্রিনহাউস গ্যাসের নিঃসরণ।

প্রাথমিকভাবে আইএমও সাগরতলের জীবদের সুরক্ষার প্রতি গুরুত্ব দিয়েছিল। পরবর্তীকালে পরিবেশগত সমস্যাও এর অপরিহার্য কর্মসূচির অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে যায়। এদের মধ্যে মূল হলো— তেল-দূষণ, পরবর্তীকালে অবশ্য বিষাক্ত রাসায়নিক বহন, নর্দমা, আবর্জনা ও বায়ুদূষণ, আবর্জনা প্রতিরোধক রঙ, নুড়িজল ও জাহাজ পুনর্নবায়ন ইত্যাদি এর সাথে যোগ হয়। দায় ও ক্ষতিপূরণের চুক্তিগুলো বাস্তবায়িত হয়েছে এবং অতি সম্প্রতি সংস্থাটির আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে সোমালিয়া উপকূলের জলদস্যুদের অবৈধ জাহাজ দখল ও মানব অপহরণের মতো নিরাপত্তাজনিত বিষয়াবলি মূল উপাদান হিসেবে যুক্ত হয়েছে।

নতুন আইন তৈরি কিংবা সংশোধন করার ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত সহায়তা, কার্যকারিতা ও ধারণক্ষমতাসম্পন্ন ভবন মূল উপাদানগুলো হিসেবে বিবেচ্য হচ্ছে। সদস্য দেশের উপকূলবর্তী প্রশাসনের ওপর আরও জোর দিয়ে আইএমও এখন ওডিট স্কিমকে স্বেচ্ছা কার্যক্রম থেকে জরুরি পদক্ষেপে উন্নীত করছে।

উপকূলীয় নিরাপত্তা ও সামুদ্রিক দূষণ প্রতিরোধে বিশ্বব্যাপী বিদ্যমান আইএমও-র প্রধান চুক্তিগুলো হলো : লোড-লাইনসের ওপর আন্তর্জাতিক সম্মেলন-১৯৬৬, সামুদ্রিক সংঘর্ষ দূরীকরণে আন্তর্জাতিক বিধিমালা-১৯৭২, নিরাপদ কনটেইনার নিশ্চিতকরণে আন্তর্জাতিক সম্মেলন- ১৯৭২, জাহাজ হতে দূষণ প্রতিরোধে আন্তর্জাতিক সম্মেলন-১৯৭৩, যা ১৯৭৮-এর প্রটোকলের মাধ্যমে পরিবর্তিত, সমুদ্রে জীবনের নিরাপত্তার জন্য আন্তর্জাতিক সম্মেলন-১৯৭৪, নাবিকদের মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণ, সার্টিফিকেশন ও তদারকির ওপর আন্তর্জাতিক সম্মেলন-১৯৭৮, উপকূলবর্তী অনুসন্ধান ও উদ্ধারের ওপর আন্তর্জাতিক সম্মেলন-১৯৭৯।

ঝুঁকিপূর্ণ মালামাল বহন ও উচ্চ গতিসম্পন্ন নৌযানের মতো নির্দিষ্ট বিষয়গুলো সংশ্লিষ্ট অনেক নিয়ম প্রণয়ন করা হয়েছে, যার অনেকগুলো ইতিমধ্যে বাধ্যতামূলক।

নৌযান চালনাকারীদের জন্য আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা আইনকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে ১৯৯৪ সালের সমুদ্র জীবনের নিরপত্তার জন্য আন্তর্জাতিক সম্মেলনে সংশোধনের মাধ্যমে। STCW-এর ১৯৯৫ সালের পুনঃসংস্করণসহ 'ক্রু স্ট্যান্ডার্ড'-এর ওপর ১৯৭৮ সালে বিশেষ মনোযোগ দেয়া হয়েছে, যা আইএমও-কে প্রথমবারের মতো সম্মেলনে অর্পিত আদেশানুসারে কাজ করার ক্ষমতা দিয়েছে।

আইএমও-এর প্রধান অগ্রাধিকারগুলোর মধ্যে সমুদ্রে জীবনের নিরাপত্তা অন্যতম। ১৯৯৯ সালে কার্যতরূপে পৃথিবীর যে কোনো স্থানে সংকটাপন্ন নৌযান সহায়তা নিশ্চিতকরণে বৈশ্বিক উপকূলীয় সংকটাবস্থা হ্রাস ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা কার্যকরিভাবে চালু হয়। এমনকি জাহাজ থেকে রেডিওর মাধ্যমে সাহায্য চাওয়া সম্ভব না হলেও এই ব্যবস্থার মাধ্যমে সাহায্যের বার্তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রেরণ করা হয়।

বিভিন্ন আইএমও সম্মেলন দায়বদ্ধতা ও জরিমানার বিষয়কে আমলে নিয়ে গুরুত্ব দেয়। যে পদক্ষেপগুলো যৌথভাবে সমুদ্রে জ্বালানি দূষণের ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করে তাদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো : ১৯৯২ সালের 'সমুদ্রে জ্বালানি দূষণের ক্ষতির বেসামরিক দায়বদ্ধতার ওপর আন্তর্জাতিক সম্মেলন প্রটোকল' (১৯৬৯) ও ১৯৯২ সালের 'সমুদ্রে জ্বালানি দূষণ ক্ষতিপূরণে আন্তর্জাতিক ফান্ড প্রতিষ্ঠায় আন্তর্জাতিক সম্মেলন প্রটোকল' (IOPC ফান্ড-১৯৭১)। 'সমুদ্রগামী যাত্রী ও তাদের মালামাল পরিবহন সম্পর্কিত এথেন্স সম্মেলন' (১৯৭৪) জাহাজে যাত্রীদের ওপর প্রদেয় ক্ষতিপূরণের মাত্রা নির্ধারণ করে দিয়েছে।

২০০২ সালে আইএমও 'আন্তর্জাতিক নৌযান এবং সমুদ্রবন্দর নিরাপত্তা নীতিমালা' গ্রহণ করে, যা সন্ত্রাসী হামলা হতে নৌ পরিবহনের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা প্রদানে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ বাধ্যতামূলক করে। SOLAS-এর সংশোধনের মাধ্যমে গৃহীত নীতিমালাটি ২০০৪ সালে বাধ্যতামূলক করা হয়। পরের বছর আইএমও 'উপকূলীয় নৌ পরিচালনা সম্পর্কিত বেআইনি নীতি দমনে আন্তর্জাতিক সম্মেলন'-১৯৮৮ এবং তার সাথে সম্পর্কিত বিধিমালা সংশোধিত আকারে গ্রহণ করে। বিধিমালাটির মাধ্যমে একটি রাষ্ট্রপক্ষের অন্য কোনো রাষ্ট্রের পতাকাবাহী জাহাজকে থামানোর এখতিয়ার থাকে, যখন অনুরোধকারী পক্ষের সেই জাহাজকে কিংবা এতে অবস্থানরত কোনো ব্যক্তিকে সংশ্লিষ্ট কনভেনশনের অন্তর্গত কোনো অপরাধ সংগঠনের আওতায় দোষী সাব্যস্ত হবে, হয়েছে অথবা হতে পারে বলে সন্দেহ করার যথেষ্ট অবকাশ থাকে।

আন্তর্জাতিক মান ও নীতিমালা পালন করানোর উদ্দেশ্যে আইএমও-এর কারিগরি সহযোগিতা কার্যক্রম উন্নয়নশীল দেশগুলোতে ও সেসব দেশের সরকারকে সফলভাবে তাদের নৌ শিল্প পরিচালনায় সহায়তা করে থাকে। এতে প্রশিক্ষণের ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়; ওয়ার্ল্ড মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি, মালমাও, সুইডেন, মাল্টায় দ্য ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম ল' ইনস্টিটিউট এবং ইতালির ট্রিইসটিতে ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম একাডেমির আইএমও পৃষ্ঠপোষকতার মধ্যে রয়েছে।

টেলিযোগাযোগ

টেলিযোগাযোগ বর্তমানে বৈশ্বিক আদান-প্রদান সেবার চাবিকাঠিতে পরিণত হয়েছে। ব্যাংক ব্যবস্থা, ভ্রমণ ব্যবস্থা, যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং তথ্যশিল্প দ্রুত ও নির্ভরযোগ্য টেলিযোগাযোগের ওপর নির্ভর করছে। এই খাতে বিপ্লব এনেছে কিছু শক্তিশালী প্রবণতা, যার মধ্যে বিশ্বায়ন, বিনিয়ন্ত্রণ, পুনর্গঠন মূল্য সংযোজক নেটওয়ার্কগুলো, বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন নেটওয়ার্কগুলো এবং কিছু আঞ্চলিক ব্যবস্থা উল্লেখযোগ্য।

আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ সংস্থা (আইটিইউ) যা একটি বৈশ্বিক ফোরাম যার মাধ্যমে সরকার এবং শিল্প সংস্থাগুলো সেসব বিষয়ের প্রতি ঐক্য সাধন করছে, যেসব বিষয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত শক্তিশালী শিল্পের ভবিষ্যৎকে প্রভাবিত করে। আইটিইউ-এর লক্ষ্য টেলিযোগাযোগ ও তথ্য নেটওয়ার্কের দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নকে সুগম করা এবং এর সর্বজনীন প্রবেশের পথকে সহজতর করা, যাতে সর্বস্তরের মানুষ এতে অংশগ্রহণ করতে পারে এবং তথ্য সমাজ ও আন্তর্জাতিক অর্থনীতি দ্বারা উপকৃত হয়। এর একটি মূল অগ্রাধিকার হচ্ছে ডিজিটাল তথ্যপ্রযুক্তিতে কার্যকর প্রবেশাধিকার সম্পন্ন করা এবং যাদের খুব সীমিত বা কোনো রূপ প্রবেশাধিকার নেই তাদের মধ্যকার দূরত্ব হ্রাস করা। এছাড়াও এ সংস্থাটি দুর্যোগ প্রতিরোধ এবং প্রশমনের জন্য জরুরি যোগাযোগ শক্তিশালী করার দিকে গুরুত্ব দেয়। এসব লক্ষ্য অর্জনের জন্য সংস্থাটি সরকারি ও বেসরকারি খাতকে বিশ্ব টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানের জন্য সংগঠিত করে। আইটিইউ বিশেষভাবে :

- বিশ্বজুড়ে অবাধ তথ্য বিনিময়ের জন্য বিভিন্ন নমুনা তৈরি করে, যেগুলো জাতীয় যোগাযোগ অবকাঠামোকে বৈশ্বিক তথ্যের সাথে সংযুক্ত করতে সাহায্য করে;
- বিশ্ব টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্কে নতুন প্রযুক্তি সংযুক্ত করে যা নতুন সফটওয়্যার অ্যাপ্লিকেশন তৈরির সুযোগ দেয়;
- আন্তর্জাতিক নিয়ম-কানুন ও চুক্তিগুলো গ্রহণ করে, যেগুলো রেডিও ফ্রিকুয়েন্সি গ্রহ এবং উপগ্রহের কক্ষপথের অবস্থান বণ্টনকে নিয়ন্ত্রণ করে, প্রাকৃতিক সম্পদ যা ব্যবহৃত হয় বিস্তৃত পরিসরের উপকরণ দ্বারা, যার মধ্যে রয়েছে টেলিভিশন ও রেডিও সম্প্রচার, মোবাইল টেলিফোন উপগ্রহভিত্তিক যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিমান ও সামুদ্রিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং রেডিও কম্পিউটার সিস্টেম;
- উন্নয়নশীল বিশ্বের টেলিযোগাযোগ উন্নত ও প্রসারিত করতে কঠোর পরিশ্রম করে ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে তহবিল জোগান দেয়ার মাধ্যমে নীতি-পরামর্শ, প্রযুক্তিগত সহায়তা, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও প্রশিক্ষণ প্রদান এবং টেলিযোগাযোগ প্রশাসকদের মধ্যে অংশীদারিত্ব গড়ে তোলে।

আইটিইউ-এর ১৯৩টি সদস্য দেশ ছাড়াও রয়েছে ৭০০ জন সেক্টর মেম্বার এবং সহকারী, যাদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক ও শিল্প-কোম্পানি, সর্বজনীন এবং ব্যক্তিগত অপারেটর ও সম্প্রচার এবং আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর প্রতিনিধিত্ব রয়েছে। আইটিইউ-এর সদস্যপদ সরকারি ও ব্যক্তিমালিকানাধীন সংস্থাগুলোকে পৃথিবীকে নতুন করে গড়ার জন্য প্রযুক্তিগত উন্নয়ন সাধনে অবদান রাখার অনন্য সুযোগ দেয়।

২০০৩ ও ২০০৫ সালে অনুষ্ঠিত ওয়ার্ল্ড সামিট অন ইনফরমেশন সোসাইটির নেতৃস্থানীয় ব্যবস্থাপকের ভূমিকায় ছিল জাতিসংঘের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক

সংস্থা আইটিইউ। এই সামিট মূল নীতি ও কর্মপদ্ধতির একটি ঘোষণাপত্র গ্রহণ করেছিল যার লক্ষ্য ছিল জনগণ-কেন্দ্রিক, সর্বব্যাপী এবং উন্নয়নমুখী সমাজব্যবস্থা যেখানে প্রত্যেকেই তথ্য ও জ্ঞান প্রচার, সহজলভ্যতা সৃষ্টি, ব্যবহার ও বিনিময় করতে পারবে।

সামিটের লক্ষ্য বাস্তবায়নের নেতৃত্বভার গ্রহণ করতে আইটিইউ ২০০৭ সালে রুয়ান্ডার কিগ্লিতে অনুষ্ঠিত কানেক্ট আফ্রিকা সামিট আয়োজন করেছিল— যেটা সরকার, ব্যক্তি মালিকানাধীন খাতগুলো ও অর্থায়ন সংস্থাগুলোকে আইসিটি অবকাঠামো নির্মাণে বিনিয়োগের জন্য একত্র করেছিল। অংশগ্রহণকারীরা ২০১২ সালের মধ্যে আফ্রিকার শহরগুলোতে সংযোগ স্থাপনের জন্য ৫৫ বিলিয়ন ডলারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল।

এছাড়াও আইটিইউ ডব্লিউএসআইএস নামক একটি স্টকটেকিং ডাটাবেজ রক্ষণাবেক্ষণ করে, যা একটি সর্বজনীন ব্যবহারযোগ্য সিস্টেম, যা তথ্যপ্রযুক্তি সম্পর্কিত বিভিন্ন উদ্যোগ এবং প্রকল্প রেফারেন্স সহকারে আইটিইউ-এর ১১টি কার্যকরী দিক নির্দেশনা প্রদান করে।

আন্তর্জাতিক ডাক ব্যবস্থা

সারা বিশ্বের পাঁচ মিলিয়নেরও বেশি ডাক কর্মচারী প্রতি বছর ৩৮০ বিলিয়ন চিঠি প্রক্রিয়াজাত করে ও প্রেরণ করে এবং সেই সাথে ৬.১ বিলিয়ন আন্তর্জাতিক ও দেশীয় পার্সেল প্রেরণ করে এবং বিভিন্ন ধরনের ইলেকট্রনিক ও আর্থিক সেবাদান করে। ৬৭০,০০০-এর মতো ডাকঘর এই মুহূর্তে সারা বিশ্বে চালু রয়েছে। বিশ্ব ডাক ইউনিয়ন জাতিসংঘের একটি বিশেষায়িত সংস্থা, যা আন্তর্জাতিক ডাক ব্যবস্থাকে পরিচালনা করে।

এ সংস্থাটি চিঠি ও অন্যান্য সামগ্রী পারস্পরিক বিনিময়ের জন্য একটি পোস্টাল এলাকা গঠন করে। প্রতিটি সদস্য রাষ্ট্র অন্যান্য সদস্য রাষ্ট্রে মেইল প্রেরণ করতে নিজস্ব মেইলের জন্য ব্যবহৃত সেরা উপায়টি ব্যবহার করে। জাতীয় ডাকসেবার প্রাথমিক মাধ্যম হিসেবে আইপিইউ আন্তর্জাতিক ডাকসেবার মানোন্নয়নে কাজ করে, প্রত্যেকটি দেশের ডাক গ্রহীতারা সমন্বিতভাবে ও সহজ উপায়ে বার্তা প্রেরণ করে এবং একটি সর্বজনীন প্রাপ্তিযোগ্য হালনাগাদকৃত পণ্য ও পরিসেবার নেটওয়ার্ক তৈরি করে।

বিশ্ব ডাক ইউনিয়ন সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন ওজন ও মাপ সীমা নির্ধারণ করে, অগ্রাধিকার ও অনগ্রাধিকার সামগ্রীসহ সব চিঠিপত্র, অ্যারোগ্রাম, পোস্টকার্ড, মুদ্রিত বস্তু, ছোট ছোট প্যাকেট ইত্যাদির অবস্থা ও গ্রহণের শর্ত নির্ধারণ করে। এর ট্রানজিট চার্জ ও টার্মিনাল মাশুল গণনা এবং সংগ্রহের বিভিন্ন পদ্ধতি নির্ধারণ করে (এক বা একাধিক দেশের মধ্য দিয়ে প্রেরিত চিঠিপত্র ও অন্যান্য সামগ্রীর জন্য)। এছাড়াও এটি নিবন্ধিত, এয়ার মেইল এবং সংক্রামক ও তেজস্ক্রিয় সামগ্রী যেগুলোর জন্য বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন, সেগুলোর নিয়ম-কানুন নির্ধারণ করে।

আইপিইউ-কে ধন্যবাদ যে তারা নতুন পণ্য এবং সেবাগুলোকে আন্তর্জাতিক পোস্টাল নেটওয়ার্কে যুক্ত করেছে। এভাবে নিবন্ধিত চিঠি, ডাক, মানিঅর্ডার, আন্তর্জাতিক রিপ্লাই কুপন, ছোট প্যাকেট, ডাক পার্সেল এবং এক্সপ্রেস মেইল সেবাগুলো বিশ্বের বেশিরভাগ অঞ্চলের বাসিন্দাদের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে। এছাড়াও সংস্থাটি কিছু নির্দিষ্ট কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত; যেমন— সদস্য রাষ্ট্রগুলোর ইলেকট্রনিক ডাটা এন্টারচেঞ্জ প্রযুক্তি এবং বিশ্বব্যাপী ডাকসেবার মান পর্যবেক্ষণে নেতৃত্বের ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

আইপিইউ জাতীয় ডাকসেবার মানোন্নয়নে বহু বছরের প্রকল্পের মাধ্যমে কারিগরি সহায়তা প্রদান করে। এছাড়াও এটি স্বল্পমেয়াদি প্রকল্প পরিচালনা করে যার মধ্যে রয়েছে অধ্যয়নচক্র, প্রশিক্ষণ ফেলোশিপ এবং সেসব পরামর্শদাতার দক্ষতা উন্নয়নে যারা এসব প্রশিক্ষণ, ব্যবস্থাপনা অথবা ডাকসেবাগুলো পরিচালনা করে। ইউপিইউ ক্রমবর্ধমান আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে ডাক খাতে বিনিয়োগের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন করেছে।

সারাবিশ্বের ডাকসেবাগুলো ডাক ব্যবসা পুনরুজ্জীবিত করার একটি পরিকল্পিত প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। কমিউনিকেশন্স মার্কেটের একটি অংশ হিসেবে এই প্রচেষ্টা ব্যাপক বৃদ্ধির সম্মুখীন হচ্ছে। আরো বেশি স্বাধীন হয়ে নিজস্ব অর্থায়নে ও উদ্যোগে বিভিন্ন ধরনের সেবা প্রদান করে তাদেরকে দ্রুত পরিবর্তনশীল পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে হবে। আইপিইউ এই পুনরুজ্জীবিতকরণে নেতৃত্ব দেয়।

মেধাস্বত্ব

বিভিন্ন প্রকারের মেধাস্বত্ব; যেমন—বই, বিশেষ ধরনের চলচ্চিত্র, শৈল্পিক গণমাধ্যম ইত্যাদি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক সম্পর্কের কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে কম্পিউটার সফটওয়্যার। হাজার হাজার প্যাটেন্ট, ট্রেডমার্ক আর বাণিজ্যিক ডিজাইন পৃথিবীজুড়ে নিবন্ধিত আছে। এখনকার জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতিতে মেধাস্বত্ব হলো সম্পদ অর্জন এবং সামাজিক, আর্থিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের হাতিয়ার।

জাতিসংঘভিত্তিক বিশেষায়িত সংস্থা, দ্য ওয়ার্ল্ড ইন্টেলেকচুয়াল প্রোপার্টি অর্গানাইজেশন সংস্থাটি বা 'বিশ্ব মেধাস্বত্ব সংস্থা' মেধাস্বত্ব রক্ষা জনপ্রিয়করণের জন্য বিশ্বজুড়ে দেশগুলোর মধ্যে আইনি ও প্রশাসনিক দৃষ্টিকোণ থেকে সহায়তা ও আন্তর্জাতিক চুক্তি বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখে।

মেধাস্বত্ব প্রধানত দুটি শাখায় বিভক্ত; শিল্প-সংক্রান্ত যেটি মূলত আবিষ্কার, ট্রেডমার্ক, বাণিজ্যিক ডিজাইন, ভিত্তি সংশ্লিষ্ট কাজ করে; অপর অংশটি হলো কপিরাইট– যা কিনা সাহিত্য, সঙ্গীত, চারুকলা, ফটোগ্রাফি এবং সিনেমা-থিয়েটার সংক্রান্ত মেধাস্বত্ব সংশ্লিষ্ট স্বত্বাধিকার নিয়ে কাজ করে।

ডব্লিউআইপিও ২৫টি চুক্তির ওপর ভিত্তি করে মেধাস্বত্ব রক্ষার কাজ পরিচালনা করে, যার কিছু কিছু চুক্তি ১৮৮০ সালের। মেধাস্বত্ব ব্যবস্থার দুটি স্তম্ভ হলো প্যারিস কনভেনশন ফর দি প্রটেকশন অব ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রপার্টি (১৮৮৩) এবং বার্ন কনভেনশন ফর দি প্রটেকশন অব লিটারারি অ্যান্ড আর্টিস্টিক ওয়ার্ক (১৮৮৬)।

ডব্লিউআইপিও সদস্য রাষ্ট্রগুলোর সর্বশেষ চুক্তি ছিল সিঙ্গাপুর ট্রিটি অন দি ল অব ট্রেড মার্কস (২০০৬)। ডব্লিউআইপিও এ ধরনের বিষয়গুলো যেমন 'প্রটেকশন অব ওয়েলনোন মার্কস' (১৯৯৯), 'ট্রেডমার্ক লাইসেন্সেস' (২০০০) এবং 'মার্কস অন দি ইন্টারনেট' (২০১১) ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট ডব্লিউআইপিও-এর সুপারিশগুলো চুক্তিভিত্তিক নীতির বিধি বিধানের বিন্যাসের সম্পূরক।

এর 'আরবিট্রেশন অ্যান্ড মিডিয়া সেন্টার' পৃথিবীজুড়ে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে তাদের স্বত্ব রক্ষার আপত্তিতে সাহায্য করে, বিশেষত প্রযুক্তি, বিনোদন এবং অন্য মেধাস্বত্বভিত্তিক বিষয়গুলোতে। এটি একই সাথে নিবন্ধন এবং ইন্টারনেট ডোমেন

নেইমের অপব্যবহারের যেটি সাইবার স্কোয়াটিং নামে পরিচিত। এটি জেনেরিক উচ্চমানের ডোমেইন সংক্রান্ত কাজ করে; যেমন—ডটকম, ডটনেট, ডট অরগ, ডট ইনফো ইত্যাদি এবং একই সাথে কান্ট্রিকোডের জন্যও সেবা প্রদান করে। ডব্লিউআইপিও-র এই সেবাটি কোর্টের লিটিগেশনের তুলনায় সস্তা এবং দ্রুত; ডোমেইন নেইম সংক্রান্ত একেকটি কাজ অনলাইন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সাধারণত দুই মাসের মধ্যেই সম্পন্ন করা হয়।

ডব্লিউআইপিও দেশগুলোকে তাদের মেধাস্বত্ব রক্ষার প্রক্রিয়া, প্রতিষ্ঠান ও জনবল দৃঢ়করণে সাহায্য করে এবং একই সাথে আন্তর্জাতিক মেধাস্বত্ব আইনের উন্নয়নেও কাজ করে। এটি নীতিনির্ধারণ এবং আঞ্চলিক জ্ঞান, লোকসাহিত্য, জীববৈচিত্র্য ও জৈবপ্রযুক্তি নিয়ে আন্তর্জাতিক আলোচনার একটি ফোরাম পরিচালনা করে।

এছাড়াও ডব্লিউআইপিও উন্নয়নশীল দেশগুলোকে তাদের আর্থিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নে মেধাস্বত্বের কৌশলী ব্যবহারের দক্ষতার ব্যাপারে বিশেষজ্ঞদের মাধ্যমে পরামর্শ দেয়। এটি জাতীয় আইনিকরণের খসড়া প্রণয়ন ও পুনর্মূল্যায়নের আইনি ও কারিগরি পরামর্শ ও উপদেশ দেয়। নীতিনির্ধারক, কর্মকর্তা ও ছাত্রদের জন্য প্রশিক্ষণ কর্মশালারও আয়োজন করে এই প্রতিষ্ঠানটি। প্রশিক্ষণের প্রধান কেন্দ্র হলো ডব্লিউআইপিও ওয়ার্ল্ড ওয়াইড একাডেমি বাণিজ্যিক ও ব্যক্তিগত খাতে মেধাস্বত্ব অধিকার রক্ষায় অনেকগুলো দেশে সহজ, কার্যকরী ও অর্থ-সাশ্রয়ী উপায়ে সুবিধা প্রদান করে। এর মধ্যে আছে প্যাটেন্ট কোঅপারেশন ট্রিটি, মাদ্রিদ সিস্টেম ফর দ্য ইন্টারন্যাশনাল রেজিস্ট্রেশন অফ ট্রেডমার্কস, দ্য হেগ সিস্টেম ফর দ্য ইন্টারন্যাশনাল রেজিস্ট্রেশন অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন, দ্য লিসবন অ্যাগ্রিমেন্ট ফর দ্য প্রটেকশন অব অ্যাপিলেশন অফ ওরিজিন অ্যান্ড দেয়ার ইন্টারন্যাশনাল রেজিস্ট্রেশন এবং দি বুদাপেস্ট ট্রিটি অন দি ইন্টারন্যাশনাল রিকগনিশন অফ দি ডিপোজিট অফ মাইক্রোওরগানিজমস ফর দি পারপাজেস অফ প্যাটেন্ট প্রসিডিউর। এই সেবা থেকে ডব্লিউআইপিও প্রায় ৯৫ শতাংশ আয় করে।

বৈশ্বিক পরিসংখ্যান

সরকার ও বেসরকারি সংস্থাগুলো জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ের প্রাসঙ্গিক, সঠিক, তুলনামূলক ও সময়োপযোগী পরিসংখ্যানের ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই জাতিসংঘ পরিসংখ্যানের বৈশ্বিক কেন্দ্রীয় উৎস হিসেবে কাজ করছে। ২৪টি সদস্য রাষ্ট্রসংবলিত জাতিসংঘের আন্তঃসরকারি সংস্থা, পরিসংখ্যান কমিশন বিশ্ব পরিসংখ্যানের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ হিসেবে কাজ করে। এই কমিশন জাতিসংঘের পরিসংখ্যান বিভাগের ওপর তত্ত্বাবধান করে, যা বৈশ্বিক পরিসংখ্যান উপাত্ত সংগ্রহ ও প্রচার, পরিসংখ্যান সম্পর্কীয় কার্যাবলির গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ এবং সদস্য রাষ্ট্রগুলোর জাতীয় পরিসংখ্যান পদ্ধতি উন্নয়নে সহায়তা করে। অপর দিকে পরিসংখ্যান বিভাগ ও কমিশনকে আন্তর্জাতিক পরিসংখ্যান কার্যাবলির সাথে সমন্বয় সাধন এবং সর্বোপরি কমিশনের কার্য পরিচালনায় সহায়তা করে।

পরিসংখ্যান বিভাগের গৃহীত সেবার মধ্যে রয়েছে—জাতিসংঘ তথ্য পোর্টাল, পরিসংখ্যান তথ্যপুঞ্জি, পরিসংখ্যানের মাসিক খবর, বিশ্ব পরিসংখ্যানের পকেটবুক,

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যের ডাটাবেজ, ডেমোগ্রাফিক বর্ষপঞ্জি ও ইউএন কমট্রেড এবং জনতাত্ত্বিক, সামাজিক, জাতীয়, ব্যবসায়িক, পরিবেশগত, জ্বালানি শক্তি বিষয়ক ও ভৌগোলিক বিষয়ক প্রকাশনা।

পরিসংখ্যান বিভাগ পরামর্শ সেবা, প্রশিক্ষণ এবং কর্মশালা আয়োজনের মাধ্যমে উন্নয়নশীল দেশগুলোর জাতীয় সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য কাজ করে।

লোক প্রশাসন

জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় সফল বাস্তবায়নের জন্য একটি দেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে সে দেশের সরকারি খাত, বিশ্বায়ন, তথ্য বিপ্লব এবং গণতন্ত্রের ফলে সৃষ্ট নতুন সুযোগ। তাতে রাষ্ট্র ও তার কার্যপদ্ধতির ওপর নাটকীয় প্রভাব পরিলক্ষিত। সদা পরিবর্তনশীল সরকারি খাতকে ব্যবস্থাপনা করা পরিবেশ জাতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী, নীতিনির্ধারক ও লোকপ্রশাসকদের জন্য একটি চ্যালেঞ্জে পরিণত হয়েছে।

জাতিসংঘ তার লোকপ্রশাসন ও অর্থায়ন কর্মসূচির মাধ্যমে বিভিন্ন রাষ্ট্রের সরকারকে তাদের শাসনব্যবস্থা ও প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে উন্নয়ন ও বিশ্বায়নের যুগের আসন্ন সমস্যা চিহ্নিতকরণে সহায়তা করে। ডেসার লোকপ্রশাসন ও উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা বিভাগের ব্যবস্থাপনায় এটি বিভিন্ন সরকারকে কার্যকরী, সহায়ক ও গণতান্ত্রিক হতে সাহায্য করে। মূলত তিনটি বিষয়ে এটি সহায়তা প্রদান করে— প্রাতিষ্ঠানিক ও জনশক্তি সক্ষমতা বৃদ্ধি, ই-গভর্নমেন্ট ও মোবাইল গভর্নমেন্ট এবং জনগণ-কেন্দ্রিক উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা।

কর্মসূচিটি বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ইউএনপিএএন পুরস্কার ও জাতিসংঘ লোক প্রশাসন নেটওয়ার্কের মতো বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে গবেষণা ও বিভিন্ন সহায়তা প্রদান করে।

উন্নয়নের জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

১৯৬৩-এর দশক থেকে জাতিসংঘ সদস্য দেশগুলোকে উন্নয়নের জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রয়োগে উৎসাহ এবং সহায়তা দিয়ে আসছে। এ লক্ষ্যে জাতিসংঘ ১৯৯২ সালে ৪৩ সদস্যবিশিষ্ট উন্নয়ন বিষয়ক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কমিশন গঠন করে, যা উন্নয়নে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সমস্যা সমাধান ও পর্যালোচনা, বিজ্ঞান শিক্ষা ও প্রয়োগে উৎসাহ ও সহায়তা প্রদান করে আসছে।

কমিশনটি অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদকে সহায়তার জন্য তথ্য বিষয়ক বিশ্ব অধিবেশন আয়োজন করে। এ অধিবেশনের ২০১৩ সালের আসরে ডব্লিউএসাইএস সম্মেলন থেকে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলোর প্রয়োগ সম্পর্কে আলোচনা করে। সেখানে দুটি বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়—'টেকসই শহর ও শহরতলি গঠনের জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি' এবং 'ডিজিটাল সমাজ গঠনে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট'। ইউএনসিটিএডি কমিশনটিকে বৈষয়িক সহায়তা প্রদান করে।

উপরন্তু ইউএনসিটিএডি এমন নীতির বিকাশ ঘটায় যাতে তা প্রযুক্তিগত সক্ষমতা বৃদ্ধি, উদ্ভাবন ও তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

জাতিসংঘ খাদ্য ও কৃষি সংস্থা, আন্তর্জাতিক আনবিক শক্তি সংস্থা, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা, জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি, জাতিসংঘ শিল্প উন্নয়ন সংস্থা ও বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা

প্রত্যেকেই নিজস্ব ম্যান্ডেটের আওতায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নিয়ে কাজ করছে। উন্নয়নের জন্য বিজ্ঞান ইউনেস্কোর (UNESCO) কার্যক্রমের একটি অপরিহার্য উপাদান।

সামাজিক উন্নয়ন

অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকার কারণে সামাজিক উন্নয়ন জাতিসংঘের শুরু থেকেই এর মৌলিক কার্যক্রমের অংশ। কয়েক দশক ধরে জাতিসংঘ তার উন্নয়ন কার্যক্রমের কেন্দ্রীয় লক্ষ্য হিসেবে সামাজিক ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে মানব জীবনের উৎকর্ষ সাধনে জোর দিচ্ছে।

সংগঠনের সূচনালগ্নে জাতিসংঘ জনসংখ্যা তত্ত্ব, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা প্রভৃতি ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব গবেষণা ও উপাত্ত সংগ্রহের আয়োজন করে, যার ফলে বিশ্ব পর্যায়ে সামাজিক বিষয়গুলোর নির্ভরযোগ্য উপাত্ত সংগ্রহ সম্ভব হয়, যার কিছু ছিল বিশ্বে প্রথমবারের মতো। এর সাথে জাতিসংঘ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা; ভাষা, বিশেষ করে যেগুলো হঠাৎ পরিবর্তনের শিকার হতে পারে সেগুলো সংরক্ষণে কাজ করছে।

সংস্থাটি স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পরিবার পরিকল্পনা, গৃহায়ন ও পয়ঃনিষ্কাশনের মতো সামাজিক সেবা সম্প্রসারণে অগ্রদূত হিসেবে কাজ করছে। সামাজিক কর্মসূচির নকশা প্রদান করার পাশাপাশি জাতিসংঘ উন্নয়নের অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিকের সমন্বয় সাধনে সহায়তা করছে। সংস্থাটি বিকাশমান নীতিমালা ও কর্মসূচিতে সবসময়ই এ বিষয়ে জোর দিয়েছে যে, সামাজিক, অর্থনৈতিক, পরিবেশগত ও সাংস্কৃতিক কোনো দিকেরই বিচ্ছিন্ন উন্নয়ন সম্ভব নয়। কারণ এগুলো পরস্পরের সাথে নিবিড়ভাবে জড়িত।

বিশ্বায়নের যুগে সাম্য ও সমতা বৃদ্ধির ধারণা সর্বস্তরে গ্রহণযোগ্য হওয়া সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে নতুন চ্যালেঞ্জ। জাতিসংঘ স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও জনসংখ্যা এবং নারী, শিশু ও বৃদ্ধদের নিয়ে ব্যক্তি, পরিবার ও সম্প্রদায়কে কেন্দ্র করে জনমুখী কাজ করছে।

জাতিসংঘ দারিদ্র্যবিমোচন, কর্মসংস্থান এবং বৃদ্ধ, তরুণ, প্রতিবন্ধী ও অন্যান্য ক্ষুদ্র সম্প্রদায়কে সমাজব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত করে সামাজিক উন্নয়নের ধারা অধিকতর শক্তিশালী করতে কাজ করে যাচ্ছে। এ লক্ষ্যে জাতিসংঘ অসংখ্য সম্মেলনের আয়োজন করে, যার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ১৯৯৫ সালে অনুষ্ঠিত সামাজিক উন্নয়ন বিষয়ক সম্মেলন, যাতে প্রথমবারের মতো দারিদ্র্য, বেকারত্ব ও সামাজিক বিভেদ দূরীকরণ নিয়ে বিশ্ব সম্প্রদায় মতৈক্যে পৌঁছেছে। এর ফলে কোপেনহেগেন সামাজিক উন্নয়ন ঘোষণাপত্র উপস্থাপনা করা হয়, যার ১০টি প্রতিশ্রুতি বিশ্ব পরিসরের আদর্শ সমাজ ব্যবস্থা নির্দেশ করে।

উন্নত ও উন্নয়নশীল উভয় ধরনের রাষ্ট্রই কোনো না কোনো পরিসরে বেকারত্ব, সামাজিক অবক্ষয় ও দারিদ্র্যের মতো বিভিন্ন সমস্যার মুখোমুখি হয়। শরণার্থী সমস্যা থেকে মাদক, সংগঠিত সন্ত্রাস থেকে সংক্রামক রোগ এসব কেবল আন্তর্জাতিক সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে নিরূপণ করা সম্ভব।

জাতিসংঘ তার সাধারণ পরিষদ এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের মাধ্যমে সমাজ বিষয়ক বিভিন্ন নীতিমালা ও কর্মসূচি নির্ধারণ করে। এ সভায় ৬টি প্রধান কমিটি আছে, যার মধ্যে সমাজ, মানব ও সংস্কৃতি বিষয়ক কমিটি সামাজিক সমস্যা ও উন্নয়ন

নিয়ে কাজ করে। ইকোসোকের তত্ত্বাবধানে ৪৬ সদস্য রাষ্ট্র সংবলিত সামাজিক উন্নয়ন কমিশন রাষ্ট্রগুলোর অভ্যন্তরীণ সামাজিক নীতি-নির্ধারণ ও উন্নয়ন কার্যাবলি নিয়ে কাজ করে। এ কমিশনের ২০১৩ সালের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল 'দারিদ্র্যবিমোচনে ব্যক্তির ক্ষমতায়ন, সামাজিক বন্ধন ও সবার জন্য উপযুক্ত কর্মসংস্থান'।

জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিভাগের সামাজিক নীতি ও উন্নয়ন শাখা সদস্য রাষ্ট্রগুলোকে গবেষণা, পর্যালোচনা ও দক্ষ মতামত দিয়ে সহায়তা করে। জাতিসংঘের এরকম আরো অনেক বিশেষায়িত এজেন্সি, তহবিল, কর্মসূচি ও দপ্তরের মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়নের বিভিন্ন দিক নিয়ে কাজ করছে।

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা

২০০০ সালের সেপ্টেম্বরে নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘ সহস্রাব্দ সম্মেলনে ১৮৯টি দেশের নেতারা একত্র হয়ে একটি সহস্রাব্দ ঘোষণা রচনা করেন, যার মাধ্যমে চরম দারিদ্র্যবিমোচন এবং নিরাপদ, সমৃদ্ধ ও ন্যায়সঙ্গত বিশ্ব গঠনে রাষ্ট্রগুলো সংকল্পবদ্ধ হয়। বিবৃতিটি পরবর্তীকালে একটি রোডম্যাপে পরিণত হয়, যাতে ২০১৫ সালের মধ্যে আটটি লক্ষ্য অর্জনের মাইলফলক নির্ধারিত হয়, যা সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (Millennium Development Goals – MDGs) নামে পরিচিত। এমডিজি ২০১০ সালের অধিবেশনে 'লক্ষ্য অর্জনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ' নামের একটি পরিকল্পনা নির্ধারণ করে, যা ২০১৫ সালের মধ্যে দারিদ্র্যবিমোচনের আটটি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রতিশ্রুতি ধারণ করে। এ অধিবেশনে নারী ও শিশু স্বাস্থ্য এবং দারিদ্র্য, ক্ষুধা ও রোগ সম্পর্কিত আরো অনেক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। এমডিজির দারিদ্র্য, রোগ, পরিবেশ ও উন্নয়নের লক্ষ্যগুলো হচ্ছে :

লক্ষ্য ১ : চরম দারিদ্র্য ও ক্ষুধা নিবারণ

১৯৯০ থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে এক ডলারের নিচে দৈনিক আয় করা লোকসংখ্যা অর্ধেকে নিয়ে আসা; পরবর্তীকালে এটা ১.২৫ ডলারে উন্নীত করা হয়। এছাড়াও মহিলা ও যুব সমাজসহ সকলের জন্য ক্ষুধামুক্ত, পূর্ণ ও উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা হয়।

লক্ষ্য ২ : সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা

২০১৫ সালের মধ্যে এটা নিশ্চিত করা যে ছেলেমেয়ে নির্বিশেষে সব শিশু যেন অন্তত একটি পূর্ণ প্রাথমিক শিক্ষা কোর্স সম্পন্ন করে।

লক্ষ্য ৩ : লিঙ্গ সমতা প্রতিষ্ঠা ও নারীর ক্ষমতায়ন

২০০৫ সালের মধ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষায় লিঙ্গবৈষম্য দূর করা এবং ২০১৫ সালের মধ্যে সব পর্যায়ের শিক্ষাব্যবস্থা থেকে এই বৈষম্য দূর করা।

লক্ষ্য ৪ : শিশুমৃত্যু হার হ্রাস করা

১৯৯০ থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুমৃত্যুর হার দুই-তৃতীয়াংশ হ্রাস করা।

লক্ষ্য ৫ : মাতৃত্বকালীন স্বাস্থ্যের উন্নতি

১৯৯০ থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে প্রসবকালীন মৃত্যুহার দুই-তৃতীয়াংশ হ্রাস করা।

লক্ষ্য ৬ : এইচআইভি, ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য রোগ প্রতিরোধ

২০১৫ সালের মধ্যে এইচআইভি রোধ; ২০১০ সালের মধ্যে যাদের প্রয়োজন তাদের

সবাইকে এর চিকিৎসা প্রদান। ২০১৫ সালের মধ্যে ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য প্রধান রোগ প্রতিরোধ করা।

লক্ষ্য ৭ : পরিবেশগত স্থিতিশীলতা নিশ্চিতকরণ

স্থিতিশীল উন্নয়নের মূল নীতিগুলো সব দেশের নীতিমালা ও কর্মসূচির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা এবং প্রাকৃতিক সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি কমানো। ২০১০ সালের মধ্যে জীববৈচিত্র্য হ্রাস উল্লেখযোগ্য হারে কমানো; ২০১৫ সালের মধ্যে স্থিতিশীল ও নিরাপদ পানি সরবরাহ ও মৌলিক স্যানিটেশন ব্যবস্থাবিহীন জনসংখ্যার পরিমাণ অর্ধেকে নামিয়ে আনা এবং ২০২০ সালের মধ্যে ১০ কোটি বস্তিবাসীর জীবনের উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধন।

লক্ষ্য ৮ : উন্নয়নের জন্য বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব

একটি মুক্ত, নিয়মানুবর্তী, নির্ণয়যোগ্য, বৈষম্যমুক্ত বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গঠন; এলডিসি, ভূমিবদ্ধ অঞ্চল; ছোট দ্বীপরাষ্ট্রগুলোর বিশেষ প্রয়োজনগুলো মেটানো; উন্নয়নশীল দেশগুলোর ঋণ সমস্যার সমাধান; উন্নয়নশীল দেশগুলোতে নিত্যপ্রয়োজনীয় ওষুধ সরবরাহ এবং বেসরকারি সেক্টরের সহযোগিতায় তথ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থাপনায় নতুন প্রযুক্তির সুফল নিশ্চিত করা।

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে অগ্রগতি

চরম দারিদ্র্য ও ক্ষুধা : এমডিজি প্রতিবেদন ২০১৩ অনুযায়ী দিনে ১.২৫ ডলার আয় করা জনসংখ্যার পরিমাণ অর্ধেকে নামিয়ে আনার লক্ষ্য ২০১৫-এর সময়সীমার ৫ বছর আগেই অর্জিত হয়েছে। সব উন্নয়নশীল দেশেই চরম দরিদ্র লোকসংখ্যা ১৯৯০ সালের ৪৭ শতাংশ থেকে কমে ২০১০ সালে ২২ শতাংশ হয়েছে।

তারপরও বর্তমানে ১২০ কোটি মানুষ চরম দারিদ্র্যে জীবনযাপন করছে। ধারণা করা হচ্ছে, ২০১৫ সাল নাগাদ এ সংখ্যা ৯৭ কোটি থাকবে। এ অবস্থার উন্নতির ধারা সব দেশে সমান নয়। যেখানে চীনে ১৯৯০ সালের চরম দরিদ্র লোকসংখ্যা ৬০ শতাংশ থেকে ২০১০ সালে ১২ শতাংশে নেমেছে, সেখানে সাব-সাহারান আফ্রিকা ও দক্ষিণ এশিয়ায় পৃথকভাবে ৪০ শতাংশ চরম দরিদ্র লোকের বসবাস।

১৯৯০ সাল থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে ক্ষুধার্ত মানুষের পরিমাণ অর্ধেকে নামিয়ে আনার এমডিজির লক্ষ্য অর্জনে কিছুটা অগ্রগতি হয়েছে। উন্নয়নশীল দেশগুলোর অপুষ্টিতে ভোগা লোকসংখ্যা ১৯৯০-৯২ সালে ২৩.২ শতাংশ ছিল, যা ২০১০-১২ সালে ১৪.৯ শতাংশে নেমে এসেছে। এরপরও ৮৭ কোটি মানুষ, যা বিশ্বের মোট জনসংখ্যার এক-অষ্টমাংশ, ২০১০-১২ সালে সর্বনিম্ন প্রয়োজনীয় পুষ্টিলাভ করতে পারেনি।

সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা : উন্নয়নশীল দেশগুলো প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারে উল্লেখযোগ্য সফলতা অর্জন করেছে। ২০০০ সালে যেখানে শিশুদের বিদ্যালয়ে ভর্তি সংখ্যা ৮৩ শতাংশ ছিল, সেখানে ২০১১ সালে তা ৯০ শতাংশ হয়েছে। অপরদিকে, একই সময়ে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ উপযোগী বয়সী কিন্তু বিদ্যালয়ে যাচ্ছে না এমন শিশুর সংখ্যা ১০.২ কোটি থেকে অর্ধেকের মতো কমে ৫.৭ কোটি হয়েছে। শিক্ষাবঞ্চিত এসব শিশুর

অর্ধেকই আফ্রিকার সাব-সাহারা অঞ্চলের। যদিও এ অঞ্চলের বিদ্যালয়ে ভর্তি শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৬০ শতাংশ থেকে ৭৭ শতাংশ হয়েছে; অতি দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি হারের ফলে শিক্ষাবঞ্চিত শিশুর সংখ্যা ২০১১ সালে ৩.২ কোটি হয়েছে। দক্ষিণ এশিয়াতে এক্ষেত্রে উন্নতি আশানুরূপ, ২০১১ সালে এখানকার বিদ্যালয়ে ভর্তি শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়ে ৯৩ শতাংশ হয়েছে।

লিঙ্গ সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন : ছেলেমেয়ে শিক্ষা গ্রহণের সমতা অর্জনে স্থিতিশীল অগ্রগতি হচ্ছে। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে লিঙ্গ সমতা সূচক (বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া মেয়ে ও ছেলের অনুপাত) শিক্ষার প্রতিটি স্তরে অনুমোদিত অবস্থা বা এর কাছাকাছি রয়েছে। এরপরও শিক্ষার সব স্তরে উল্লেখযোগ্য লিঙ্গবৈষম্য লক্ষণীয়। প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রায় সম্পূর্ণ সমতা অর্জন সম্ভব হলেও শিক্ষার সব স্তরে ১৩০টি দেশের মধ্যে কেবল দুটি দেশ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে পেরেছে। উত্তর ও সাব-সাহারান আফ্রিকা এবং পশ্চিম ও দক্ষিণ এশিয়াতে এখনো মেয়েরা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা অর্জনে বহু বাধার সম্মুখীন হয়।

নারীরা বিশ্ব পরিসরে শ্রমবাজারে জায়গা করে নিচ্ছে। ২০১১ সালের হিসাব অনুযায়ী, কৃষিকাজ ব্যতীত, পারিশ্রমিক অর্জনকারী কর্মক্ষেত্রের ৪০ শতাংশ নারীরা দখল করেছে। পূর্ব, ককেশাস ও মধ্য এশিয়া, লাতিন আমেরিকা এবং ক্যারিবিয়ান অঞ্চলে এরকম কর্মক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমতা অর্জিত হয়েছে।

শিশু মৃত্যুহার হ্রাস : বিশ্বজুড়ে পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুমৃত্যু হার ১৯৯৩ সাল থেকে ৪১ শতাংশ কমেছে। সব অঞ্চলে শিশুর জীবন রক্ষার উন্নয়ন সুস্পষ্ট। এর মধ্যে পূর্ব এশিয়া ও উত্তর আফ্রিকা উল্লেখযোগ্য, যেখানেই কেবল ২০১৫ সাল নাগাদ শিশুমৃত্যু দুই-তৃতীয়াংশ হ্রাসের লক্ষ্যমাত্রা ইতিমধ্যেই অর্জিত হয়েছে। লাতিন আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ান অঞ্চল, দক্ষিণ-পূর্ব ও পশ্চিম এশিয়ায় এ হার ৫০ শতাংশের বেশি হ্রাস পেয়েছে। অপরদিকে সাব-সাহারান আফ্রিকায় তা ৩৯ শতাংশ এবং দক্ষিণ এশিয়ায় ৪৭ শতাংশ। এ অগ্রগতি এমডিজি অর্জনের জন্য আরো ত্বরান্বিত করা প্রয়োজন।

মাতৃত্বকালীন স্বাস্থ্যের উন্নতি : ১৯৯০ সাল থেকে মাতৃত্বকালীন মৃত্যুহার ৪৭ শতাংশ কমেছে। সব অঞ্চলই এক্ষেত্রে উন্নতি সাধন করেছে, যার মধ্যে সর্বোচ্চ হলো পূর্ব এশিয়া (৬৯ শতাংশ), উত্তর আফ্রিকা (৬৬ শতাংশ) এবং দক্ষিণ এশিয়া (৬৪ শতাংশ)।

১৯৯০ থেকে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে দক্ষ সেবক-সেবিকা দ্বারা প্রসবের হার ৫৫ শতাংশ থেকে বেড়ে ৬৬ শতাংশ হয়েছে এবং গর্ভকালীন যত্ন ৬৩ শতাংশ থেকে ৮১ শতাংশ হয়েছে। এমডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্থাৎ প্রসবকালীন মৃত্যু দুই-তৃতীয়াংশ হ্রাস করার জন্য আরো প্রচেষ্টা চালাতে হবে। ধারণা করা হয় যে, বিশ্বে এখনো ৫ কোটি শিশু দক্ষ সেবক-সেবিকার তত্ত্বাবধান ছাড়াই জন্ম নিচ্ছে। বিশেষ করে, গ্রামীণ অঞ্চলে মাতৃত্বকালীন সেবা লাভ বেশ কঠিন। যদিও অপ্রাপ্ত বয়স্কদের মধ্যে সন্তান জন্মদান পুরো বিশ্বে (বিশেষ করে দক্ষিণ এশিয়াতে) হ্রাস করার জন্য কাজ করা হচ্ছে তবুও বিশ্বব্যাপী মোট ১৩.৫ কোটি জন্মদানকারী নারীর মধ্যে ১.৫ কোটি নারীই ১৫ থেকে ১৯ বছর বয়সী কিশোরী।

এইচআইভি/এইডস, ম্যালেরিয়া এবং অন্যান্য রোগ : নতুন করে এইডস রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির সংখ্যা ২০০১ থেকে ২০১১ সালের মধ্যে সাব-সাহারান আফ্রিকায় ২৫ শতাংশ, ক্যারিবিয়ান অঞ্চলে ৪৩ শতাংশ এবং সর্বোপরি পুরো বিশ্বে ২১ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। ২০১১ সালে আনুমানিক ২৫ লাখ মানুষ নতুন করে এইচআইভিতে আক্রান্ত হয়েছে। এন্টিরেট্রোভাইরাল থেরাপির উন্নতি এবং নতুন করে আক্রান্ত ব্যক্তির সংখ্যা হ্রাসের কারণে এইডস সম্পর্কিত মৃত্যুর সংখ্যা কমে যাচ্ছে। ২০১১ সালে ১৭ লাখ মানুষ এইডসজনিত কারণে মারা গেছে, যা ২০০৫ সালের তুলনায় ২৫ শতাংশ কম। তদুপরি উন্নয়নশীল অঞ্চলে ৮৩ লাখ মানুষ এইচআইভি বা এইডস রোধে এন্টিরেট্রোভাইরাল ওষুধপত্র পাচ্ছে। এ উন্নতির ধারা বজায় থাকলে ২০১৫ সাল শেষ হওয়ার আগে ১.৫ কোটি এইডস আক্রান্ত মানুষ জীবন বাঁচিয়ে রাখার মতো ওষুধ পাবে।

২০০০ থেকে ২০১০ সালের মধ্যে ম্যালেরিয়ার কারণে মৃত্যুর সংখ্যা ১১ লাখ কমানো সম্ভব হয়েছে, যা পূর্বের তুলনায় ২৫ শতাংশ কম। ২০১১ সালের মধ্যে ৯৯টি ম্যালেরিয়া আক্রান্ত দেশের মধ্যে ৫০টি দেশের ম্যালেরিয়া রোগের অবস্থা অনুসরণ করা হয়েছে, যার মাধ্যমে ২০১৫ সাল নাগাদ এ রোগ সংক্রান্ত দুর্ঘটনা ৭৫ শতাংশ কমানো যায়। গত এক দশকে সাব-সাহারান অঞ্চলে কীটনাশকের আশঙ্কামুক্ত মশারির প্রসার ঘটানো হয়েছে, যার ফলে সেখানকার এক-তৃতীয়াংশের বেশি শিশু নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারছে।

২০১১ সালে পুরো বিশ্বে আনুমানিক ৮৭ লাখ ব্যক্তির যক্ষ্মা ধরা পড়েছে। যদিও যক্ষ্মা রোধের ক্ষেত্রে অগ্রগতি এখনো ধীর। ২০১৫ সালের মধ্যে এ ক্ষেত্রে এমডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করে যক্ষ্মা রোগের বিস্তৃতি বিপরীতমুখী করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়। ১৯৯০ থেকে ২০১১ সালের মধ্যে সর্বমোট ৫.১ কোটি যক্ষ্মা রোগীর চিকিৎসা করা সম্ভব হয়েছে, যার ফলে দুই কোটি জীবন রক্ষা পেয়েছে।

টেকসই পরিবেশ : ২০১২ সালে কাতারের দোহায় অনুষ্ঠিত জাতিসংঘ জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক বৈঠকে কিয়োটো প্রটোকল অনুসারে ২০১৩ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত জলবায়ু বিষয়ক দ্বিতীয় শপথমালা গঠনের জন্য ঐকমত্য অর্জিত হয়েছে।

১৯৯০ সাল থেকে আরো ২১০ কোটি মানুষ পানযোগ্য পানি পাচ্ছে, যা ২০১৫ সালের এমডিজি লক্ষ্যের অর্ধেক। গ্রামীণ দরিদ্র অঞ্চলে পানযোগ্য পানি পৌঁছে দেয়া সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। সেখানকার ৪৩ শতাংশ মানুষ এখনো বিশুদ্ধ খাবার পানি পাচ্ছে না।

১৯৯০ সাল থেকে ২০১১ সালের মধ্যে ১৯৩ কোটি মানুষের কাছে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ও উন্নত পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা পৌঁছে দেয়া সম্ভব হয়েছে। এ সংখ্যা ২০১৫ সালের মধ্যে আরো ১০০ কোটি বৃদ্ধি করে এমডিজি লক্ষ্য পূরণে আরও অনেক চেষ্টা করে যেতে হবে।

২০০০ থেকে ২০১২ সালের মধ্যে ১০ কোটি বস্তিবাসীর কাছে উন্নত পানির উৎস, পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা, টেকসই বাসস্থান বা পর্যাপ্ত বাসযোগ্য স্থানে পৌঁছে দেয়া হয়েছে, যা এমডিজি লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করে ও ১০ কোটি বস্তিবাসীর জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন করে। অন্যদিকে, বস্তিতে বসবাস করা মানুষের সংখ্যা উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বেড়েই চলেছে। ২০১২ সালের হিসেব অনুযায়ী ৮৬.৩ কোটি মানুষ বস্তিতে বসবাস করে, যেখানে ১৯৯০ সালে তা ছিল ৬৫ কোটি।

উন্নয়নে বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব : ২০১১ সালে উন্নত দেশগুলোর শুল্কবিহীন বাজারে উন্নয়নশীল ও কম উন্নয়নশীল দেশগুলোর পণ্যের প্রবেশাধিকার যথাক্রমে ৮৩ ও ৮০ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে; রপ্তানি আয়ের অনুপাতে উন্নয়নশীল অঞ্চলের দেশগুলোর বৈদেশিক ঋণ পরিশোধের পরিমাণ ২০১১ সালে কমে ৩.১ শতাংশ হয়েছে, যা ২০০০ সালে ছিল ১১.৯ শতাংশ।

যদিও বিশ্ব অর্থনৈতিক সংকট সরকারি উন্নয়ন সহযোগিতায় নেতিবাচক প্রভাব অব্যাহত রেখে চলেছে। তা সত্ত্বেও কিছু দেশ লক্ষ্য অনুযায়ী তাদের সাহায্য সংক্রান্ত বাজেট বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছে। ২০১২ সালে ডেভেলপমেন্ট অ্যাসিস্ট্যান্স কমিটিভুক্ত ৯টি দেশে মোট ওডিএ বৃদ্ধি পেয়েছে।

কোনো এক হিসাবে দেখানো হয়েছে যে, ২০১৩ সালের শেষ নাগাদ বিশ্বব্যাপী ৬.৮ মিলিয়ন মোবাইল সেলুলার সংযোগ থাকবে। এতে করে গ্লোবাল পেনিট্রেশন রেট দাঁড়াবে ৯৬ শতাংশ। ২০১৩ সালের শেষ নাগাদ ২.৭ বিলিয়ন মানুষ ইন্টারনেট সংযোগ সুবিধা ভোগ করবে। প্রধান আঞ্চলিক ব্যবধান অবশ্য লক্ষণীয় : উন্নয়নশীল দেশে মাত্র ৩১ শতাংশ মানুষের এখন অনলাইন ইন্টারনেট সংযোগে রয়েছে, উন্নত বিশ্বে এর মাত্রা যেখানে ৭৭ শতাংশ।

দারিদ্র্য নিরসন

জাতিসংঘ ১৯৯৭-২০০৬ সময়কালকে আন্তর্জাতিক দারিদ্র্য-নিরসন দশক হিসেবে ঘোষণা করে দারিদ্র্য হ্রাসকে আন্তর্জাতিক কার্যতালিকায় প্রাধান্য দেয়। দারিদ্র্য নিরসনকে বিশ্বের, বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ এবং টেকসই উন্নয়নের মূল বিবেচ্য উল্লেখ করে ২০০৭ সালের ডিসেম্বরে সাধারণ পরিষদ ২০০৮-২০১৭ সময়কালকে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক দারিদ্র্য-নিরসন দশক হিসাবে ঘোষিত হয়। দ্বিতীয় দশকে জাতিসংঘ কর্মপরিকল্পনার প্রতিপাদ্য হলো— 'সবার জন্য কর্মসংস্থান ও মানবিক কাজ।'

জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি দরিদ্রতা হ্রাসকে প্রধান অগ্রাধিকার হিসাবে গুরুত্ব দিয়েছে। এটি দারিদ্র্যের বিবেচ্য সার্বিক উপাদান নিয়ে কর্মরত সব সরকারি দপ্তর ও সুশীল সমাজের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে নিয়োজিত। এর মধ্যে রয়েছে খাদ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধি; কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি; ভূমি, ঋণ, প্রযুক্তি, প্রশিক্ষণ ও বাজার ইত্যাদি বিষয়ে জনগণের সংশ্লিষ্টতা বৃদ্ধি; আশ্রয় ও মৌলিক সেবার সহজলভ্যতা ও প্রাপ্তি এবং জীবনধারা উন্নতিকল্পে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় জনসম্পৃক্ততার সুযোগ সৃষ্টি। ইউএনডিপির দারিদ্র্যবিরোধী কর্মপদ্ধতির মূলে আছে 'দরিদ্র ক্ষমতায়ন'।

ক্ষুধার বিরুদ্ধে সংগ্রাম

১৯৪৫ সালে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার পর থেকে খাদ্য উৎপাদন অকল্পনীয় হারে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ১৯৭০-১৯৯৭ সময়কালে ক্ষুধার্ত মানুষের সংখ্যা ৯৫৯ মিলিয়ন থেকে নাটকীয়ভাবে ৭৯১ মিলিয়নে নেমে এসেছে। তবে এই সংখ্যা পরবর্তীকালে আবারো বৃদ্ধি পেয়েছে এবং আজ প্রায় ৮৭০ মিলিয়ন মানুষ যথেষ্ট পরিমাণে খাবার পায় না, যদিও বর্তমানে বিশ্বের প্রতিটি পুরুষ, নারী ও শিশুর সুস্থ ও কার্যক্ষম জীবনধারণের জন্য পর্যাপ্ত

পরিমাণ খাদ্য পৃথিবীতে রয়েছে।

জনগণের, বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকার দরিদ্রতর অংশের, খাদ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধির জন্য ক্ষুধার বিরুদ্ধে লড়াই করা বেশিরভাগ জাতিসংঘ অঙ্গ সংস্থাগুলোর গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক কর্মসূচি রয়েছে। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা তার প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে দারিদ্র্য ও ক্ষুধা উপশমে কৃষি উন্নয়ন, উন্নত পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা, কার্য-কর্মক্ষম ও স্বাস্থ্যকর জীবনের জন্য চাহিদা ও পছন্দ অনুযায়ী পর্যাপ্ত, নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য লভ্যতা ও প্রাপ্তি নিশ্চয়তায় কাজ করছে।

এফএও-এর বিশ্ব খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়ক কমিটি আন্তর্জাতিক খাদ্য নিরাপত্তা প্রশ্নে পর্যবেক্ষণ, মূল্যায়ন ও পরামর্শ প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। এটি ক্ষুধা ও খাদ্য সংকটের কারণ নিরীক্ষণ করে, প্রাপ্যতা ও মজুত নির্ণয় করে এবং খাদ্য নিরাপত্তার লক্ষ্যে গৃহীত নীতিমালা পর্যবেক্ষণ করে। এফএও তার বিশ্বব্যাপী তথ্য ও পূর্বাভাস পদ্ধতির মাধ্যমে আবহাওয়া বিদ্যা ও অন্যান্য কৃত্রিম উপগ্রহ ব্যবহার করে খাদ্য উৎপাদনে প্রভাব বিস্তারকারী বিভিন্ন অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে এবং সরকার ও দাতাদেরকে খাদ্য জোগানের সম্ভাব্য হুমকি সম্পর্কে সতর্ক করে।

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ২০১৫ সালের মধ্যে বিশ্বের ক্ষুধার্ত মানুষের সংখ্যা অর্ধেকে নামিয়ে আনার উদ্দেশ্যে এফএও গৃহীত সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ হলো এর খাদ্য নিরাপত্তার বিশেষ কর্মসূচি। ১০০টিরও বেশি দেশে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে এটি ক্ষুধা, অপুষ্টি ও দারিদ্র্য দূরীকরণের কার্যকর সমাধানে অগ্রগতি এনেছে; গুরুত্বসহকারে জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা কর্মসূচি পরিচালনার জন্য সরকারকে সহায়তা দান এবং আঞ্চলিক ক্ষেত্রে বাণিজ্য নীতি হিসেবে খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে আঞ্চলিক অবস্থা ফলপ্রসূ করতে আঞ্চলিক অর্থনৈতিক সংগঠনগুলোর সাথে কাজ করার মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের চেষ্টা করে যাচ্ছে।

এফএও আয়োজিত ১৯৯৬ সালের বিশ্ব খাদ্য অধিবেশনে ১৮৬টি দেশ এক 'বিশ্ব খাদ্য নিরাপত্তা সংক্রান্ত ঘোষণা ও কর্ম-পরিকল্পনা' মঞ্জুর করে, যার লক্ষ্য হচ্ছে ২০১৫ সালের মধ্যে ক্ষুধার্ত মানুষের সংখ্যা অর্ধেকে নামিয়ে আনা ও সর্বজনীন খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন করা। ২০০২ সালের বিশ্ব খাদ্য অধিবেশনে অংশগ্রহণকারী দেশগুলো তাদের শপথ নবায়ন করে, যাতে তারা ২০১৫ সালের মধ্যে ক্ষুধার্তের সংখ্যা অর্ধেক—প্রায় ৪০০ মিলিয়নে নামিয়ে আনতে পারে। অধিবেশন এফএও-কে জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তার ও প্রগতিশীল মতামতের আলোকে পর্যাপ্ত খাদ্য অধিকারের সমর্থনে নীতিমালা সম্প্রসারণের অনুরোধ করে। এফএও কাউন্সিল ২০০৪ সালে 'খাদ্য অধিকার নীতিমালা' হিসেবে পরিচিত এসব স্বেচ্ছাকৃত নীতিমালা গ্রহণ করে।

যত দ্রুত সম্ভব ক্ষুধা নির্মূল করার বিষয়ে সব জাতির প্রতিজ্ঞা নিয়ে ২০০৯ সালে বিশ্ব খাদ্য নিরাপত্তা অধিবেশন এক বিবৃতি দেয়। এতে উন্নয়নশীল দেশে কৃষি ক্ষেত্রে যথেষ্ট পরিমাণ সাহায্য বৃদ্ধি, ২০১৫ সালের মধ্যে ক্ষুধার্তের পরিমাণ অর্ধেকে নামিয়ে আনার নিশ্চয়তা এবং খাদ্য নিরাপত্তায় জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলার অঙ্গীকার গ্রহণ করা হয়।

আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল বিশ্বের দরিদ্রতম অঞ্চলে গ্রামীণ দারিদ্র্য-বিরোধী ও ক্ষুধা-বিরোধী উন্নয়ন তহবিলের জোগান দেয়। বিশ্বের সংখ্যাগরিষ্ঠ দরিদ্রতম মানুষ, যারা

দৈনিক এক ডলারের কম ব্যয় করার সামর্থ্য রাখে, উন্নয়নশীল দেশের গ্রামীণ অঞ্চলে বসবাস করে এবং কৃষি ও কৃষিজাত কার্যকলাপের ওপর নির্ভরশীল। সবচেয়ে অভাবগ্রস্ত মানুষদের সাহায্যপ্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য আইএফএডি দরিদ্র গ্রামীণ পুরুষ ও নারীদেরকেই নিজেদের উন্নয়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করে, তাদের সাথে ও তাদের সংগঠনগুলোর সাথে কাজ করে, যাতে তারা নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে থেকেই অর্থনৈতিক উন্নতি করতে পারে।

আইএফএডি-সমর্থিত উদ্যোগগুলো গ্রামীণ দরিদ্র গোষ্ঠীকে উৎপাদনশীল আবাদের জন্য প্রয়োজনীয় জমি, পানি, অর্থ-সম্পদ এবং কৃষিপ্রযুক্তি ও সেবাপ্রাপ্তিতে সহায়তা করে। এসব উদ্যোগ তাদেরকে বিভিন্ন বাজারের সাথে যুক্ত হতে সাহায্য করে। উপরন্তু আইএফএডি তাদের জ্ঞান, দক্ষতা ও সংগঠনের প্রসারে সহায়তা করে, যাতে তারা নিজেরাই নিজেদের উন্নয়নের নেতৃত্ব নিতে পারে এবং নিজেদের জন্য প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত ও নীতিমালার ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে।

১৯৭৮ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে আইএফএডি ৯২৪টি প্রকল্প ও কর্মসূচিতে ১৪.৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং তার সহযোগীরা ২১.৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করেছে, যা ১১৯টি দেশের ৪০০ মিলিয়ন মানুষের উপকারে এসেছে।

১৯৬১ সালে প্রতিষ্ঠিত বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি বিশ্বের ক্ষুধা-বিরোধী সংগ্রামে জাতিসংঘের প্রথম সারির সংস্থা। ২০১২ সালে ডব্লিউএফপি-এর খাদ্য সহায়তা ৮০টি দেশের ৯৭ মিলিয়নের বেশি মানুষের কাছে পৌঁছেছে। প্রাপ্ত সহায়তার অর্ধেক নগদ হওয়ার দরুন

ডব্লিউএফপি স্কুলগামী শিশুদের জন্য প্রতিদিনকার পুষ্টিকর নাশতা স্কুলে সরবরাহ করতে বাংলাদেশ সরকারের সাথে কাজ করে। যেসব পরিবার প্রতিদিন পুষ্টিকর খাবার জোগাতে পারে না তাদের শিশুদের স্কুলে ভর্তি এবং প্রতিদিন ক্লাসে উপস্থিত থাকা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে এই স্কুলে খাদ্য বিতরণ কর্মসূচি একটি কার্যকরী উদ্যোগ (৮ মে ২০১৩, ডব্লিউএফপি/জিএমবি আকাশ)

সংস্থাটি উন্নয়নশীল দেশের এক-তৃতীয়াংশ খাদ্য ক্রয়ের অর্থ জোগান দিতে পেরেছে। আঞ্চলিক অর্থনীতির অগ্রগতির লক্ষ্য নিয়ে ডব্লিউএফপি উন্নয়নশীল দেশগুলো থেকে জাতিসংঘের অন্য যে কোনো সংস্থার চেয়ে বেশি পণ্য ও সেবা ক্রয় করে থাকে। এছাড়া ডব্লিউএফপি জাতিসংঘ মানবিক বিমানসেবার মাধ্যমে সমগ্র মানবিক গোষ্ঠীকে যাত্রী বিমান পরিবহন সেবা দেয়, যা বিশ্বের ২০০টিরও বেশি গন্তব্যে যাতায়াত করে।

ডব্লিউএফপি-এর ক্ষুধাবিরোধী পদক্ষেপ জরুরি সাহায্য, ত্রাণ ও পুনর্বাসন, উন্নয়ন সহায়তা ও বিশেষ কার্যক্রমের ওপর জোর দেয়। জরুরি অবস্থায় যুদ্ধ, বেসামরিক দ্বন্দ্ব, খরা, বন্যা, ভূমিকম্প, ঘূর্ণিঝড়, দুর্ভিক্ষ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে আক্রান্তদের মাঝে খাদ্য সহায়তা সরবরাহের মাধ্যমে ডব্লিউএফপি প্রায়ই সাহায্যের হাত প্রথম বাড়িয়ে দেয়। জরুরি অবস্থা অতিক্রান্ত হওয়ার পর ডব্লিউএফপি ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের জীবন ও জীবিকার পুনর্নির্মাণে সহায়তা দিয়ে থাকে।

ক্ষুধা ও দারিদ্র্য চক্রে বন্দি উন্নয়নশীল দেশের মানুষদের সাহায্যে সবচেয়ে কার্যকরী অস্ত্র হচ্ছে খাদ্য ও খাদ্য-সংক্রান্ত সহায়তা। ডব্লিউএফপি উন্নয়ন প্রকল্পগুলো স্কুলে খাদ্য বিতরণের মতো বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে সকলের, বিশেষ করে মা ও শিশুর পুষ্টি নিশ্চিত করে। ২০১২ সালে ১৭.৫ মিলিয়ন শিশুকে স্কুলে খাদ্য বিতরণ কর্মসূচির মাধ্যমে খাদ্য সরবরাহ করা হয়। ডব্লিউএফপি দুর্যোগ উপশমের মতো বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরকার ও জনগণকে দেশের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও অবকাঠামো বিনির্মাণে সাহায্য করে।

ক্ষুধা ও দারিদ্র্যচক্র থেকে উত্তরণের জন্য এর মৌলিক কারণ মোকাবেলা করার মতো দীর্ঘমেয়াদি মানবিক পদক্ষেপ প্রয়োজন হয়। এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ডব্লিউএফপি উন্নয়ন প্রকল্পগুলো সমাজের বাছাইকৃত অরক্ষিত ও বিপন্ন দিকগুলোর ওপর মনোযোগ দেয়। এসবের মধ্যে রয়েছে স্কুলে খাদ্য বিতরণসহ খাদ্য ও পুষ্টি কর্মসূচি, প্রশিক্ষণের বিনিময়ে খাদ্য ও কাজের বিনিময়ে খাদ্য ইত্যাদির মতো জীবিকা সহায়ক কর্মসূচি; বংশ-পরম্পরায় ক্ষুধাচক্র মোকাবেলার জন্য মা ও শিশু পুষ্টি কর্মসূচি এবং এইচআইভি/এইডস আক্রান্তদের সাহায্যে পুষ্টি সহায়তা কর্মসূচি।

ডব্লিউএফপি তার মানবিক ও উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর অর্থায়নের জন্য সম্পূর্ণরূপে স্বেচ্ছাকৃত অনুদানের ওপর নির্ভরশীল। বিভিন্ন দেশের সরকার ডব্লিউএফপি-এর প্রধান দাতা হলেও এর কর্পোরেট অংশীদাররা বিভিন্ন মিশনে ক্রমাগত গুরুত্বপূর্ণ অনুদান দিচ্ছে। ২০১২ সালে ডব্লিউএফপি ৯০টি সরকারি খাতসহ মোট ৯৮টি উৎস থেকে সর্বমোট ৩.৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অনুদান সংগ্রহ করেছে। বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকট সত্ত্বেও ৫০টিরও অধিক দাতা সরকার ২০১১ সালে তাদের অনুদানের পরিমাণ ২০১১ সালের চেয়ে বৃদ্ধি করে ডব্লিউএফপি-এর ওপর তাদের নিরবচ্ছিন্ন সমর্থন ও বর্ধিত নির্ভরতা প্রদর্শন করেছে। ডব্লিউএফপি প্রায় ২০০০-এর মতো এনজিওর সাথেও কাজ করে, যাদের তৃণমূল ভিত্তি এবং কারিগরি জ্ঞান খাদ্য সহায়তা বিতরণ নিরূপণের ক্ষেত্রে অমূল্য।

স্বাস্থ্য

বিশ্বের অধিকাংশ স্থানে মৌলিক স্বাস্থ্যসেবা, রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা এবং পরিষ্কার পানি ও পয়ঃনিষ্কাশনের সহজলভ্যতার দরুন মানুষের আয়ু বৃদ্ধি পাচ্ছে, শিশুমৃত্যু হার হ্রাস পাচ্ছে এবং রোগ নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হচ্ছে। স্বাস্থ্যসেবায় সহায়তা প্রদান, প্রয়োজনীয় ওষুধ

সরবরাহ, স্বাস্থ্যকর শহর তৈরি, জরুরি স্বাস্থ্যসেবা এবং সংক্রামক রোগ প্রতিরোধে কাজ করে বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশে এসব অগ্রগতির অনেকগুলোর সাথে জাতিসংঘ গভীরভাবে জড়িত থাকছে। সহস্রাব্দ ঘোষণার আওতায় ২০১৫ সালের মধ্যে দেশগুলোর জন্য পুষ্টি, নিরাপদ পানির সহজলভ্যতা, মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য, সংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ এবং প্রয়োজনীয় ওষুধের সহজলভ্যতা অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করা হয়।

অসুস্থতা, বিকলাঙ্গতা ও সংক্রামক রোগজনিত মৃত্যুর প্রভাব সমাজ ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অনেক ব্যাপক। এভিয়েন ইনফ্লুয়েঞ্জা ও সিভিয়ার একিউট রেস্পিরেটরি সিনড্রোমের মতো নতুন রোগের ক্ষেত্রে মহামারী রোধ করা জরুরি হয়ে ওঠে। বেশিরভাগ সংক্রামক রোগেরই কারণ ও নিরাময়ের উপায় জানা আছে এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অসুখ ও মৃত্যু সাশ্রয়ী খরচ এড়ানো সম্ভব। মুখ্য সংক্রামক রোগগুলো হচ্ছে এইচআইভি/এইডস, ম্যালেরিয়া ও যক্ষ্মা। এসব রোগের সংক্রমণ ও বিস্তার রোধ সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার একটি মুখ্য ও গুরুত্বপূর্ণ দিক। গ্লোবাল ফান্ড টু ফাইট এইডস, টিউবারকিলোসিস ও ম্যালেরিয়া এই প্রচেষ্টায় মুখ্য অবদান রাখে।

এইচআইভি/এইডসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। জয়েন্ট ইউনাইটেড নেশনস প্রোগ্রাম অন এইচআইভি/এইডসের হিসাব অনুযায়ী ২০১১ সালের শেষ নাগাদ বিশ্বব্যাপী এইচআইভি জীবাণু বহনকারী মানুষের সংখ্যা ছিল ৩৪ মিলিয়ন। বিশ্বব্যাপী নতুন করে আক্রান্ত ব্যক্তির সংখ্যা দাঁড়ায় ২.৫ মিলিয়ন, যা ২০০১ সালের চেয়ে ২০ শতাংশ কম এবং নতুন আক্রান্তের হার সাহারা মরুভূমি সংলগ্ন ১৩টি আফ্রিকান দেশসহ মোট ২৫টি দেশে ৫০ শতাংশ বা তার বেশি পরিমাণে হ্রাস পায়। ৮ মিলিয়নের চেয়েও বেশি এইচআইভি আক্রান্ত ব্যক্তি এন্টিরেট্রোভাইরাল চিকিৎসা পেয়েছে এবং চিকিৎসার সুযোগ পাওয়ার হার ২০০৯ সালের চেয়ে ৬৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এসব অগ্রগতির পরও এইচআইভি ভাইরাস বহনকারী ৭২ শতাংশ শিশুসহ আনুমানিক ৭ মিলিয়ন আক্রান্ত ব্যক্তি প্রয়োজনীয় চিকিৎসাসেবা পায়নি। ২০১১ সালে ১.৭ মিলিয়ন মানুষ এইডসজনিত কারণে মৃত্যুবরণ করে, যা ২০০৫ সালের চেয়ে ২৪ শতাংশ কম।

ইউএন এইডস্ এইচআইভির সংক্রমণ, বিস্তার ও মৃত্যুকে শূন্যের কোঠায় নিয়ে যাওয়ার বৈশ্বিক সংকল্পকে নেতৃত্ব দেয়। এটি এইডস মোকাবেলার ফলাফল সর্বাধিক কার্যকর করার জন্য ইউএনএইচসিআর, ইউনিসেফ, ডব্লিউএফপি, ইউএনডিপি, ইউএনএফপিএ, ইউএনওডিসি, ইউএন-উইমেন, আইএলও, ইউনেসকো, ডব্লিউএইচও এবং বিশ্বব্যাংক—এই ১১টি জাতিসংঘ অঙ্গসংস্থার প্রচেষ্টাকে ঐক্যবদ্ধ করে এবং আন্তর্জাতিক ও জাতীয় অংশীদারদের সাথে কাজ করে।

সাধারণ পরিষদ তার এইডস বিষয়ক উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে (নিউইয়র্ক, ৮-১০ জুন, ২০১১) এইচআইভি ও এইডস বিষয়ক জাতিসংঘ রাজনৈতিক ঘোষণা : এইচআইভি ও এইডস নির্মূলে আমাদের প্রচেষ্টা জোরদার করে, যার মাধ্যমে সদস্য রাষ্ট্রগুলো ২০১৫ সালের মধ্যে উচ্চাভিলাষী লক্ষ্য অর্জনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়।

এই ঘোষণায় ইউএনএইডস সমুন্নত কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের জন্য ২০১৫ সালের লক্ষ্য হিসাবে ১০টি নির্দিষ্ট করণীয় নির্ধারণ করে :

- যৌনবাহিত সংক্রমণ ৫০ শতাংশ হ্রাস করা;
- মাদকসেবীদের মধ্যকার এইচআইভি সংক্রমণ ৫০ শতাংশ হ্রাস করা;

- শিশুদের নতুন করে আক্রান্ত হওয়া রোধ করা এবং মায়েদের এইডসজনিত কারণে মৃত্যুর সংখ্যা পর্যাপ্ত পরিমাণে হ্রাস করা;
- ১৫ মিলিয়ন মানুষকে এন্টিরেট্রোভাইরাল থেরাপি প্রয়োগ করা;
- এইচআইভি আক্রান্ত ব্যক্তিদের যক্ষ্মাজনিত মৃত্যুর হার ৫০ শতাংশ হ্রাস করা;
- বিশ্ব এইডস তহবিলের অসম বরাদ্দ পরিহার করা এবং নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশগুলোতে বার্ষিক ২২ থেকে ২৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বৈশ্বিক বিনিয়োগ নিশ্চিত করা;
- লিঙ্গবৈষম্য এবং লিঙ্গভিত্তিক অনাচার ও হিংস্রতা দূর করা এবং নারী ও মেয়েদের এইচআইভি থেকে সুরক্ষার সক্ষমতা বৃদ্ধি করা;
- সার্বিক মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতাকে গুরুত্ব প্রদানপূর্বক আইন ও নীতিমালা প্রণয়ন করে এইচআইভি আক্রান্ত ব্যক্তি ও তাদের সাথে বসবাসকারী ব্যক্তিদের ব্যাপারে কুসংস্কার ও বৈষম্য দূর করা;
- এইচআইভি আক্রান্ত ব্যক্তির কোনো স্থানে প্রবেশ, থাকা ও বসবাস করার ওপর বিধিনিষেধ দূর করা;
- এইডস নিরাময়ে বৈশ্বিক স্বাস্থ্য ও উন্নয়ন প্রচেষ্টায় সমন্বিত উদ্যোগ নিশ্চিত করতে এইচআইভি সম্পর্কিত চিকিৎসা সেবায় দ্বিমুখী সেবা বর্জন করা।

কয়েক দশক ধরে স্বাস্থ্য সমস্যার সামাজিক প্রেক্ষাপটের নিরিখে বিভিন্ন নীতিমালা ও পদ্ধতি উদ্ভাবনের মাধ্যমে জাতিসংঘ রোগ প্রতিরোধমূলক কর্মকাণ্ডে অগ্রদূত হিসেবে কাজ করছে। জাতিসংঘ শিশু তহবিল শিশু ও মাতৃ স্বাস্থ্য নিয়ে এবং জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল প্রজনন স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করে। রোগের বিরুদ্ধে গৃহীত সব বৈশ্বিক পদক্ষেপের সমন্বয়কারী বিশেষায়িত সংস্থাটি হচ্ছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। ডব্লিউএইচও সবার জন্য সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা, প্রজনন স্বাস্থ্য সহজলভ্য করা, অংশীদারিত্ব বাড়ানো এবং জীবনধারা ও পরিবেশের উন্নয়নের মতো উচ্চাভিলাষী লক্ষ্য গ্রহণ করেছে।

দশ বছরের প্রচেষ্টার পর ১৯৭৯ সালে গুটিবসন্ত নির্মূল করার মতো অনেক ঐতিহাসিক অর্জনের ক্ষেত্রে ডব্লিউএইচও মূল চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করেছে। আরেকটি জাতিসংঘ সংস্থা এফএও ২০১০ সালে অর্জিত গোমড়ক নির্মূলের উপায় উদ্ভাবনে নেতৃত্ব দেয়। ২০০১ সাল পর্যন্ত অনাবিষ্কৃত এই রোগটি প্রথম পশুরোগ যা নির্মূল করা সম্ভব হয়েছে। আর মানুষের গুটিবসন্ত রোগের পর এটি পৃথিবীর দ্বিতীয় রোগ, যা সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করা সম্ভব হয়েছে।

১৯৯৮ সালে ম্যালেরিয়ার বিরুদ্ধে একটি সংঘবদ্ধ বৈশ্বিক প্রতিক্রিয়া প্রদানের লক্ষ্যে ডব্লিউএইচও, ইউনিসেফ, ইউএনডিপি এবং বিশ্বব্যাংক একযোগে রোল ব্যাক ম্যালেরিয়া নামে একটি অংশীদারিত্ব কার্যক্রম চালু করে। এই অংশীদারিত্ব কর্মকাণ্ডে ম্যালেরিয়াকবলিত দেশ, তাদের দ্বিপক্ষীয় ও বহুপক্ষীয় উন্নয়ন সহকারী, বেসরকারি খাত, এনজিও, সম্প্রদায়ভিত্তিক সংস্থা, ফাউন্ডেশন ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো এমন একটি বিশ্ব গড়ার লক্ষ্যে কাজ করছে, যেখানে ম্যালেরিয়া মৃত্যুর প্রধান কারণ হয়ে বা অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে কোনো বাধা হয়ে দাঁড়াবে না।

সরকার, এনজিও ও আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং সরকারি ও বেসরকারি দাতাসহ প্রায় ১,০০০টির মতো অংশীদার নিয়ে ডব্লিউএইচওর বিশ্বব্যাপী একটি উদ্যোগ হচ্ছে 'যক্ষ্মা রোধ অংশীদারিত্ব'। এটি ২০১৫ সালের মধ্যে যক্ষ্মাজনিত মৃত্যু ও এর প্রাদুর্ভাব ১৯৯০

সালের তুলনায় অর্ধেকে নামিয়ে আনার এবং ২০৫০ সালের মধ্যে তা শূন্যের কোঠায় নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে কাজ করছে।

সহযোগী সংস্থাগুলোকে সাথে নিয়ে ডব্লিউএইচও উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা থেকে ১৯৯৪ সালে, পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল থেকে ২০০০ সালে এবং ইউরোপ থেকে ২০০২ সালে পোলিও নিশ্চিহ্ন করে। ডব্লিউএইচও পোলিও নির্মূলে সার্বক্ষণিক নিয়োজিত। ১৯৯৮ সালে 'বিশ্ব পোলিও নিশ্চিহ্নকরণ উদ্যোগ' প্রকল্প প্রতিষ্ঠার পর থেকে পোলিও ৯৯ শতাংশ হ্রাস পায়; ঐ বছরের আনুমানিক ৩৫০,০০০ জন রোগী থেকে ২০১২ সালে তা মাত্র ২২৩ জনে নেমে আসে। ১৯৮৮ সালের ১২৫টি পোলিও আক্রান্ত দেশ থেকে ২০১৩ সালে পোলিও আক্রান্ত দেশের সংখ্যা আফগানিস্তান, পাকিস্তান ও নাইজেরিয়া এই তিনটিতে নেমে আসে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী ২.৫ বিলিয়নেরও বেশি শিশুকে পোলিওর টিকা দেয়া হয়েছে। টিকাদান শেষে পোলিও পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন হওয়ার ফলে জনস্বাস্থ্য ক্ষেত্রে বার্ষিক প্রায় ১.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বেঁচে যাবে।

তামাক ও তামাকজাত দ্রব্যের জোগান এবং ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে যুগান্তকারী এক জনস্বাস্থ্য চুক্তি সম্পাদন আরও একটি প্রধান অর্জন। 'বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা তামাক নিয়ন্ত্রণ চুক্তি কাঠামো' তামাকের ওপর করারোপ, ধূমপান প্রতিরোধ ও চিকিৎসা, অবৈধ বেচাকেনা, বিজ্ঞাপন, পৃষ্ঠপোষকতা ও প্রচার এবং পণ্য নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে কাজ করে। এটি ২০০৩ সালে ডব্লিউএইচওর সদস্য রাষ্ট্রগুলোর সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় ও ২০০৫ সালে বাধ্যতামূলক আন্তর্জাতিক আইনে পরিণত হয়। এই চুক্তি বিশ্বব্যাপী তামাক ব্যবহারের মহামারী হ্রাসকরণ কৌশলের একটি প্রধান চাবিকাঠি, যে মহামারী প্রতিবছর প্রায় ৫ মিলিয়ন মানুষের মৃত্যুর কারণ। ডব্লিউএইচও প্রতি বছর ক্রমবর্ধমান মানুষের জন্য স্বাস্থ্যঝুঁকি হয়ে দাঁড়ানো স্থূলতা নিবারণেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ডব্লিউএইচও ধারণা করে যে, ২০১৫ সালের মধ্যে আনুমানিক ২.৩ বিলিয়ন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের ওজনের আধিক্য দেখা দেবে এবং ৭০০ মিলিয়নেরও বেশি মানুষ স্থূল হবে।

১৯৮০ থেকে ১৯৯৫ সালের মধ্যে ইউনিসেফ-ডব্লিউএইচওর এক সম্মিলিত প্রচেষ্টা ছয়টি প্রাণঘাতী রোগের (পোলিও, ধনুষ্টঙ্কার, হাম, হুপিং কাশি, ডিপথেরিয়া ও যক্ষ্মা) ক্ষেত্রে প্রতিরোধক টিকাদান কর্মসূচির আওতা বিশ্বব্যাপী ৫ শতাংশ থেকে ৮০ শতাংশে উন্নীত করে এবং এর ফলে প্রতি বছর ২.৫ মিলিয়ন শিশুর জীবন বাঁচানো সম্ভব হয়। একই রকমের আরেকটি উদ্যোগ 'গ্লোবাল অ্যালায়েন্স ফর ভ্যাকসিনস অ্যান্ড ইমিউনাইজেশন' ১৯৯৯ সালে বিল অ্যান্ড মেলিন্ডা গেটস ফাউন্ডেশন থেকে প্রাপ্ত প্রাথমিক অনুদান (Seed Money) দিয়ে শুরু হয়। ২০০০ সাল থেকে জিএভিআই নিয়মিতভাবে হেপাটাইটিস বি, হেমোফাইলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা টাইপ বি ও পারটুসিসের (হুপিং কাশি) টিকাদানের মাধ্যমে এবং হাম, পোলিও ও পীতজ্বরের টিকার পেছনে এককালীন বিনিয়োগের মাধ্যমে ৫.৫ মিলিয়ন আশু মৃত্যু প্রতিরোধ করতে সাহায্য করেছে। এই জোট ডব্লিউএইচও, ইউনিসেফ, বিশ্বব্যাংক এবং বেসরকারি খাতের অংশীদারদের নিয়ে গঠিত।

সংক্রামক রোগের ক্ষেত্রে ডব্লিউএইচওর অগ্রাধিকারগুলো হলো : বৈশ্বিক অংশীদারিত্বের মাধ্যমে ম্যালেরিয়া ও যক্ষ্মার প্রভাব হ্রাস করা; সংক্রামক রোগের

নজরদারি, পর্যবেক্ষণ ও মোকাবেলায় জোর দেয়া; তীব্র ও নিয়মিত প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে রোগের প্রভাব হ্রাস করা এবং উন্নয়নশীল দেশে প্রয়োজনীয় নয়া জ্ঞান, কর্মপদ্ধতি, বাস্তবায়ন কৌশল এবং গবেষণা সামর্থ্য প্রাপ্যতা। এছাড়াও মৌলিক স্বাস্থ্যসেবা, অত্যাবশ্যকীয় ওষুধ সরবরাহ, স্বাস্থ্যকর শহর তৈরি, জীবনযাপন ও পরিবেশের প্রয়োজনীয় উন্নয়ন। এবং স্বাস্থ্য সম্পর্কিত জরুরি অবস্থার উন্নতিতে ডব্লিউএইচও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

ডব্লিউএইচও-ইউনিসেফ গ্লোবাল ইমিউনাইজেশন ভিশন অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজি, ২০০৬-২০১৫ বিশ্বে হামজনিত কারণে মৃত্যু ২০১৫ সালের শেষে ৯৫ শতাংশ কমিয়ে আনার লক্ষ্যে কাজ করছে। ডব্লিউএইচওর মিসলস ও রুবেলা উদ্যোগ ২০১২ সালে হাম ও রুবেলাবিষয়ক কৌশলগত পরিকল্পনা গ্রহণ করে, যাতে ২০১৫ এবং ২০২০ সালের জন্য নতুন বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। ডব্লিউএইচও কয়েক দশক ধরে ম্যালেরিয়ার বিরুদ্ধে কাজ করে যাচ্ছে। ধারণা করা হয় যে, ২০১১ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী ম্যালেরিয়ার সংক্রমণ রোধে বার্ষিক ৫.১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রয়োজন; কিন্তু ২০১১ সালে মাত্র ২.৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের জোগান পাওয়া গেছে।

স্বাস্থ্য সংশ্লিষ্ট গবেষণা ক্ষেত্র। স্বাস্থ্য গবেষণায় অংশীদারদের সাথে কাজ করে ডব্লিউএইচও বিশেষত উন্নয়নশীল দেশের সাম্প্রতিক অবস্থা ও চাহিদা বিষয়ক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে। এগুলো দুর্গম ক্রান্তীয় জঙ্গলের মহামারী গবেষণা থেকে শুরু করে বংশানুগতি সম্বন্ধীয় গবেষণার অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ পর্যন্ত বিস্তৃত। ডব্লিউএইচওর ক্রান্তীয় রোগ গবেষণা কর্মসূচি বহুল ব্যবহৃত ঔষধে ম্যালেরিয়া জীবাণু প্রতিরোধ শক্তি শনাক্তকরণ এবং ক্রান্তীয় সংক্রামক রোগের নতুন ঔষধ ও লক্ষণ নির্ধারণের নিমিত্তে কাজ করে। এই গবেষণা মহামারীর জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষণ উন্নয়নে এবং নতুন ও উদীয়মান রোগের জন্য প্রতিরোধক কৌশল প্রাপ্তিতে সাহায্য করে।

মান নির্ধারণ। ডব্লিউএইচও জৈবিক ও ঔষধ প্রস্তুত সংক্রান্ত বিষয়ে আন্তর্জাতিক মানদণ্ড নির্ধারণ করে। সংস্থাটি প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার মূল সূত্র ও কার্যকারিতা হিসেবে 'অপরিহার্য ঔষধ' ধারণার প্রবক্তা। ডব্লিউএইচও যথাসম্ভব স্বল্পমূল্যের এবং সবচেয়ে ফলপ্রসূ, ব্যবহারোপযোগী, নিরাপদ ও কার্যকর ঔষধের পর্যাপ্ত জোগান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন দেশের সাথে কাজ করে। এই লক্ষ্যে সংস্থাটি এ পর্যন্ত কয়েকশ' ঔষধ ও টিকার একটি 'নমুনা তালিকা' তৈরি করেছে, যার মাধ্যমে সকল স্বাস্থ্য সমস্যার ৮০ শতাংশেরও বেশি প্রতিরোধ ও নিরাময় করা সম্ভব। তালিকাটি প্রতি দুই বছর অন্তর হালনাগাদ করা হয়। এছাড়াও দরিদ্র ও মধ্যম আয়ের দেশের জন্য প্রধানতম স্বাস্থ্য সমস্যার সমাধানে প্রয়োজনীয় নতুন ঔষধ তৈরি করতে এবং প্রতিষ্ঠিত কার্যকরী ঔষধের উৎপাদন অব্যাহত রাখতে ডব্লিউএইচও বিভিন্ন সদস্য রাষ্ট্র, সুশীল সমাজ ও ঔষধ উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের সাথে কাজ করে।

জাতিসংঘকে প্রদত্ত আন্তর্জাতিক সম্পৃক্ততার সুযোগে ডব্লিউএইচও সংক্রামক রোগ সংক্রান্ত তথ্যের বৈশ্বিক সংগ্রহ তত্ত্বাবধান করে, তুলনাযোগ্য স্বাস্থ্য ও রোগের পরিসংখ্যান প্রণয়ন করে এবং নিরাপদ খাদ্যের পাশাপাশি জৈবিক ও ঔষধি পণ্যের আন্তর্জাতিক মানদণ্ড নির্ধারণ করে। এছাড়াও সংস্থাটি ক্যান্সারের ওপর দূষণের ঝুঁকি মূল্যায়ন করে ও এইচআইভি/এইডসের বৈশ্বিক নিয়ন্ত্রণে সর্বসম্মত নির্দেশনা প্রতিষ্ঠা করেছে।

মানব বসতি

২০১২ সালে বিশ্বের মোট ৭.১ বিলিয়ন জনসংখ্যার অর্ধেকই শহরে বসবাস করতো। প্রায় এক বিলিয়ন মানুষ বস্তিতে বসবাস করতো; উন্নয়নশীল দেশগুলোতে শহরে বসবাসকারী জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশই বস্তিতে বসবাস করতো। শহুরে সমস্যা নিয়ে জাতিসংঘের নেতৃত্বদানকারী সংস্থাটি হচ্ছে জাতিসংঘ মানব বসতি কর্মসূচি। সাধারণ পরিষদ সংস্থাটিকে সবার জন্য পর্যাপ্ত আশ্রয় প্রদানের লক্ষ্যে সামাজিক ও পরিবেশবান্ধব টেকসই শহর ও নগর উন্নয়নের কাজ করার জন্য গঠন করেছে। এই লক্ষ্যে সংস্থাটি এ পর্যন্ত বিভিন্ন দেশে ডজনখানেক প্রায়োগিক কর্মসূচি ও প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে, যার অধিকাংশই স্বল্পোন্নত দেশে। ১৯৯৬ সালে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় মানব বসতি সম্পর্কিত জাতিসংঘ অধিবেশন, যা হ্যাবিট্যাট-২ নামে পরিচিত, হ্যাবিট্যাট এজেন্ডা নামক বৈশ্বিক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে, যেখানে বিভিন্ন দেশ সকলের জন্য পর্যাপ্ত ও উপযুক্ত বাসস্থান ও টেকসই শহর উন্নয়নের লক্ষ্য পূরণের অঙ্গীকার করে। এই এজেন্ডার বাস্তবায়ন, বাস্তবায়নের মূল্যায়ন এবং বৈশ্বিক প্রবণতা ও অবস্থা পর্যবেক্ষণের কেন্দ্রে রয়েছে ইউএন-হ্যাবিট্যাট।

ইউএন-হ্যাবিট্যাট একবিংশ শতাব্দীতে শহরের ইতিবাচক ধারণা প্রদানকারী 'ওয়ার্ল্ড আরবান ক্যাম্পেইন' নামে একটি প্রচার মাধ্যম সমন্বয় করে। ক্যাম্পেইনটির লক্ষ্য হলো : সরকারি, বেসরকারি ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে ভবিষ্যতের জন্য সৃজনশীল, প্রাণোচ্ছল ও টেকসই সমাজে বিনিয়োগের আবশ্যকতা প্রদর্শন করা; এ ধরনের সমাজ অর্জনের উপায় বাতলে দেয়া; শহর পরিবর্তনকারীদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা এবং সহযোগীদের পরিচালিত করতে সহায়তা করা; পাশাপাশি মানদণ্ড প্রতিষ্ঠা করা, অগ্রগতির পর্যবেক্ষণ করা ও বিশ্বব্যাপী জ্ঞানের আদান-প্রদান করা।

ইউএন-হ্যাবিট্যাট বিভিন্ন উপায়ে বিস্তৃত পরিসরের সমস্যা এবং বিশেষ প্রকল্প সামনে রেখে তাদের বাস্তবায়নে কাজ করে। বিশ্বব্যাংককে সাথে নিয়ে সংস্থাটি 'শহুরে জোট' নামক একটি বস্তি উন্নয়ন উদ্যোগ শুরু করে। এর অন্যান্য উদ্যোগ বহু বছর ধরে সংঘাত-পরবর্তী ভূমি ব্যবস্থাপনায় ও যুদ্ধ বা প্রাকৃতিক দুর্যোগ বিধ্বস্ত দেশের পুনর্গঠনে কাজ করছে এবং শহর উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা নীতিমালায় নারী অধিকার ও লিঙ্গবৈষম্য সম্পর্কিত বিষয়ের অন্তর্ভুক্তিকরণ নিশ্চিত করছে। এজেন্সিটি গ্রাম ও শহরের সেতুবন্ধ জোরদারের পাশাপাশি অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও সরকারি সেবার ক্ষেত্রেও সহায়তা করছে।

ইউএন-হ্যাবিট্যাট কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে :

- **কার্যকরী অনুশীলন ও স্থানীয় নেতৃত্ব কর্মসূচি :** সরকারি এজেন্সি, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ও সুশীল সমাজের একটি বৈশ্বিক নেটওয়ার্ক যা বসবাসের পরিবেশ উন্নয়নের জন্য কার্যকরী অনুশীলন চিহ্নিত ও প্রচার এবং নীতিমালার উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধিতে অর্জিত শিক্ষা প্রয়োগ করে;
- **গৃহায়ন অধিকার কর্মসূচি :** উপযুক্ত গৃহায়ন অধিকারের পূর্ণ ও প্রগতিশীল প্রাপ্তি নিশ্চিত করে হ্যাবিট্যাট এজেন্ডায় করা অঙ্গীকার বাস্তবায়নে রাষ্ট্র ও অন্য স্টকহোল্ডারদের সহায়তা দেয়ার জন্য ইউএন-হ্যাবিট্যাট/অফিস অফ দ্য ইউনাইটেড নেশনস হাইকমিশনার ফর হিউম্যান রাইটস-এর এক যৌথ উদ্যোগ;

- **সর্বজনীন পৌর পর্যবেক্ষণাগার :** হ্যাবিট্যাট এজেন্ডা বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করে এবং পৌর পরিস্থিতি, প্রবণতা পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন করে কর্মসূচিটি সরকার, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ও সুশীল সমাজকে নীতিভুক্ত পৌর সূচক, পরিসংখ্যান ও অন্যান্য পৌর তথ্যের অগ্রগতি ও প্রয়োগে সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী পৌর জ্ঞানের ভিত্তি উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে;
- **টেকসই শহর কর্মসূচি :** একটি ইউএন হ্যাবিট্যাট/ইউএনইপি যৌথ উদ্যোগ যা পৌর পরিবেশগত পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার সক্ষমতা তৈরি করে। কর্মসূচিটি 'লোকালাইজিং এজেন্ডা ২১' নিয়ে বিশ্বব্যাপী ৩০টি শহরে তার কার্যক্রম পরিচালনা করে;
- **এজেন্ডা ২১ কর্মসূচি স্থানীয়করণ :** স্থানীয় পর্যায়ে মানব বসতির উপাদানগুলোকে কার্যক্রমে রূপান্তর করা এবং বাছাইকৃত মধ্যম আকারের শহরগুলোতে যৌথ উদ্যোগে উদ্দীপ্ত করার মাধ্যমে ১৯৯২ সালের ধরিত্রী সম্মেলন (এজেন্ডা ২১) গৃহীত টেকসই উন্নয়নের বৈশ্বিক পরিকল্পনা কার্যক্রম প্রচার করে;
- **নিরাপদ শহর কর্মসূচি :** ১৯৯৬ সালে আফ্রিকার মেয়রদের অনুরোধে গঠিত এই কর্মসূচিটি শহর পর্যায়ে পৌর অপরাধ ও সহিংসতা নিরূপণ ও প্রতিরোধের লক্ষ্যে কৌশল উন্নয়নের কাজ করে;
- **পৌর ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি :** ইউএন-হ্যাবিট্যাট, ইউএনডিপি ও বহিরাগত সাহায্য সংস্থাগুলোর একটি সমন্বিত প্রচেষ্টা। ৪০টিরও বেশি মুখ্য ও সহযোগী প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত এবং ৫৮টি দেশের ১৪০টি শহরে বিস্তৃত এই কর্মসূচিটি উন্নয়নশীল দেশগুলোতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য নিরসনে শহর ও নগরের অবদানকে শক্তিশালী করার জন্য কাজ করে;
- **নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন কর্মসূচি :** নিরাপদ পানির সহজলভ্যতা, স্বল্প আয়ের লক্ষাধিক শহরবাসীর জন্য পর্যাপ্ত স্যানিটেশন সুবিধাপ্রাপ্তিতে সহায়তা এবং এসব প্রচেষ্টার প্রভাব পরিমাপের লক্ষ্যে কাজ করে। এটি ২০১৫ সালের মধ্যে নিরাপদ পানি ও প্রাথমিক স্যানিটেশনের সুবিধাবঞ্চিত মানুষের অনুপাত অর্ধেকে নামিয়ে আনার এমডিজি লক্ষ্য এবং ২০০২ সালের টেকসই উন্নয়ন বিষয়ক বিশ্ব সম্মেলনে গৃহীত লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করে।

শিক্ষা

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যাপক অগ্রগতি হয়েছে। স্কুলগামী শিশুর সংখ্যা পূর্বের তুলনায় অনেক বেড়েছে। তারপরও ২০১০ সালে প্রায় ৫৯ মিলিয়ন প্রাথমিক শিক্ষার উপযুক্ত শিশু শিক্ষাবঞ্চিত ছিল। কিছু দেশে গৃহযুদ্ধ, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ও অভ্যুত্থান স্কুলে উপস্থিতির হার কমিয়ে দিয়েছে। স্বাক্ষরতার হার বৃদ্ধির কঠোর প্রচেষ্টার পরও ৭৭৫ মিলিয়ন মানুষ, যার মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশই নারী, ন্যূনতম শিক্ষা থেকে বঞ্চিত।

গবেষণায় দেখা গেছে যে, শিক্ষার সহজলভ্যতা উন্নত সামাজিক সূচকের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। নারীদের ক্ষেত্রে শিক্ষার বহুমুখী প্রভাব রয়েছে। একজন শিক্ষিত নারী সাধারণত সুস্বাস্থ্যের অধিকারিণী হয়, পরিবার পরিকল্পনায় সচেতন হয় ও পরিবারের আয় বৃদ্ধিতে সচেষ্ট হয়। ফলস্বরূপ তাদের সন্তান মৃত্যুর হার কম হয়, সন্তানরা

পর্যাপ্ত পুষ্টিলাভ করে ও সর্বোপরি ভালো স্বাস্থ্যের অধিকারী হয়। এ কারণে বিভিন্ন জাতিসংঘ সংস্থার শিক্ষা বিষয়ক কর্মসূচির মূল লক্ষ্য থাকে মেয়ে ও নারী। যেহেতু বহুমুখী নানা বিষয় শিক্ষার সাথে জড়িত, সেহেতু জাতিসংঘ পদ্ধতিও বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচির অর্থায়ন ও উন্নয়নের সাথে জড়িত। এসব কর্মসূচির আওতায় গতানুগতিক বিদ্যালয় শিক্ষা থেকে শুরু করে জনপ্রশাসন, কৃষি ও স্বাস্থ্যসেবা খাতে মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য কারিগরি প্রশিক্ষণ এবং এইচআইভি/এইডস, মাদকাসক্তি, মানবাধিকার, পরিবার পরিকল্পনা ও অন্যান্য বিষয়ে সচেতনতামূলক প্রচারণা পর্যন্ত সবকিছুই অন্তর্ভুক্ত। উদাহরণস্বরূপ, ইউনিসেফ তার বার্ষিক বাজেটের ২০ শতাংশই শিক্ষা খাতে, বিশেষ করে নারী শিক্ষার পেছনে ব্যয় করে।

শিক্ষাক্ষেত্রে নেতৃত্বদানকারী প্রতিষ্ঠান হচ্ছে জাতিসংঘ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা-ইউনেস্কো। অন্যান্য সহকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে সংস্থাটি একযোগে শিশুদের জন্য অনুকূল ও দক্ষ শিক্ষক সংবলিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করতে কাজ করছে। ইউনেস্কো জাতিসংঘের সবচেয়ে উচ্চাভিলাষী আন্তঃসংস্থা ক্যাম্পেইনস-এর সাচিবিক দায়িত্ব পালন করছে, ২০১৫ সালের মধ্যে সর্বজনীন, মানসম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনে সহায়তা করছে। ২০১০ সালে সেনেগালের ডাকারে অনুষ্ঠিত বিশ্ব শিক্ষা ফোরামে ১৬০টির বেশি জাতি কর্তৃক গৃহীত কর্মকাঠামোর ওপর ভিত্তি করে এই ক্যাম্পেইনের লক্ষ্য ঠিক করা হয়েছে এবং পরবর্তীকালে একই বছরের সেপ্টেম্বর মাসে বিশ্ব নেতাদের সহস্রাব্দ ঘোষণায় তা অনুমোদন দেয়া হয়েছে।

ইউনেস্কোর শিক্ষা খাতের লক্ষ্য হলো : সবার জন্য সব পর্যায়ে শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি; বিশেষ চাহিদার ও প্রান্তিক জনসংখ্যার সফলতা; শিক্ষক প্রশিক্ষণ; কর্মক্ষম জনশক্তির কর্মদক্ষতা উন্নয়ন; শিক্ষার মাধ্যমে সফলতা অর্জন; অপ্রাতিষ্ঠানিক ও জীবনধর্মী শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিতকরণ এবং শিক্ষা দান ও গ্রহণের উন্নতির জন্য প্রযুক্তির ব্যবহার। ইউনেস্কোর এই কার্যক্রমগুলো ডাকার কর্মকাঠামো; জাতিসংঘ টেকসই উন্নয়ন শিক্ষা দশক ২০০৫-২০১৪ এবং শিক্ষা ও এইচআইভি/এইডস বিষয়ক বিশ্ব উদ্যোগের আলোকে সম্পন্ন করে। সংস্থাটি সকল শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্নকরণ নিশ্চিত করার এমডিজি লক্ষ্যমাত্রা পূরণ এবং ২০১৫ সালের মধ্যে মাধ্যমিক শিক্ষার সকল স্তরে ছেলেমেয়ের বৈষম্য দূর করার জন্যও কাজ করছে।

সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষাকে এমডিজির দ্বিতীয় লক্ষ্য হিসেবে ঘোষণা করার পাশাপাশি জাতিসংঘ শিক্ষা বিষয়ক অনেক উদ্যোগ চালু করেছে। জাতিসংঘ সাইবার স্কুলবাস একটি পুরস্কার বিজয়ী ওয়েবসাইট, যেখান থেকে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা জাতিসংঘের ইতিহাস, উদ্দেশ্য ও অবকাঠামো সম্পর্কে শিখতে পারে; সদস্য রাষ্ট্র সম্পর্কে তথ্য পেতে পারে এবং জাতিসংঘ এজেন্ডাগুলোর বিষয় সম্পর্কে জানতে পারে। শিক্ষকরা জাতিসংঘের বিভিন্ন এজেন্ডার ওপর পাঠ পরিকল্পনা করতে পারেন। সাইবার স্কুলবাস বিশ্বব্যাপী ২০০টিরও বেশি দেশ ও রাজ্যে পৌঁছে গেছে এবং এটি ইংরেজি, স্প্যানিশ, ফরাসি ও রাশিয়ান ভাষায় বিদ্যমান রয়েছে।

জাতিসংঘ প্রতি বছর সকল শিক্ষাস্তরে বিভিন্ন রূপরেখার জাতিসংঘ মডেল কনফারেন্সের আয়োজন করে, যার মধ্যে 'জাতিসংঘ বৈশ্বিক মডেল কনফারেন্স' অন্যতম। এসব কর্মসূচির মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা সাধারণ পরিষদ ও জাতিসংঘের অন্যান্য অঙ্গ সংস্থার

ছায়া অধিবেশনে কূটনীতিবিদের ভূমিকায় অংশগ্রহণ করে।

জাতিসংঘ প্রাতিষ্ঠানিক ইমপ্যাক্ট একটি বৈশ্বিক উদ্যোগ, যার মাধ্যমে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো মানবাধিকার, স্বাক্ষরতা, ধারণক্ষমতা ও সংঘর্ষ নিরসন ক্ষেত্র গুলোতে সর্বস্বীকৃত ১০টি মূলনীতি অনুসরণ করতে জাতিসংঘের সাথে একযোগে কাজ করার সুযোগ পায়। এটি অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের পাশাপাশি বিশ্ব শান্তি প্রসারে উচ্চশিক্ষার উপযোগিতা ও ভূমিকা অনস্বীকার্য ও অপরিহার্য মনে করে। অংশগ্রহণকারী কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আনুষ্ঠানিকভাবে প্রাতিষ্ঠানিক ইমপ্যাক্ট কর্মসূচির মূলনীতিগুলো সমর্থন করে ও ইউএনএআই তাদেরকে প্রতিবছর অন্তত একটি মূলনীতি পালনের জন্য অনুরোধ করে।

গবেষণা ও প্রশিক্ষণ

জাতিসংঘের বেশ কিছু বিশেষায়িত সংস্থা গবেষণা ও প্রশিক্ষণের মতো প্রাতিষ্ঠানিক কাজ করে। এসব কাজের লক্ষ্য হচ্ছে বৈশ্বিক সমস্যাগুলো অনুধাবনের সক্ষমতা বাড়ানোর পাশাপাশি অধিকতর প্রযুক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গিতে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় মানবসম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখা।

গবেষণা ও সক্ষমতা উন্নয়নের মাধ্যমে জাতিসংঘ বিশ্ববিদ্যালয় (ইউএনইউ), জাতিসংঘ পরিবার ও সদস্য রাষ্ট্রগুলোর ক্ষেত্রে উদ্বেগজনক বৈশ্বিক সমস্যা সমাধানে অবদান রাখে। ইউএনইউ জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক প্রাতিষ্ঠানিক সম্প্রদায়ের মধ্যকার জাতিসংঘ কর্মপদ্ধতির পরামর্শদাতা হিসেবে ভূমিকা পালনকারী এক সেতুবন্ধন; বিশেষ করে, এই আন্তর্জাতিক উচ্চশিক্ষা কেন্দ্রটি উন্নয়নশীল দেশগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সংলাপ ও নতুন সৃজনশীল পরিকল্পনা প্রণয়নের এক কার্যকরী মঞ্চ। ইউএনইউ জাতিসংঘের ৪০টিরও বেশি অঙ্গ সংগঠন ও বিশ্বের শতাধিক গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাথে একাত্ম হয়ে কাজ করে।

ইউএনইউর প্রাতিষ্ঠানিক কার্যাবলি টেকসই বৈশিষ্ট্য সংবলিত ৫টি পরস্পর নির্ভরশীল বিষয়ভিত্তিক গুচ্ছের মধ্যে পরিচালিত হয়। এগুলো হচ্ছে— জনসংখ্যা ও স্বাস্থ্য; দক্ষ শাসন ব্যবস্থা; শান্তি, নিরাপত্তা ও মানবাধিকার; বৈশ্বিক পরিবর্তন ও টেকসই উন্নয়ন এবং বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও সমাজ। এই বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বব্যাপী ১৩টি দেশে ১৫টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ও কর্মসূচি পরিচালনায় সম্পৃক্ত। টোকিওতে অবস্থিত ইউএনইউ সেন্টার বিশ্ব ইউএনইউ সিস্টেম পরিচালনা করে এবং এর কর্মকাণ্ড সমন্বয় করে থাকে। এর বিভিন্ন ইনস্টিটিউটগুলো হচ্ছে :

- ইনস্টিটিউট অন গ্লোবালাইজেশন, কালচার অ্যান্ড মোবিলিটি, বার্সেলোনা, স্পেন;
- ইনস্টিটিউট অন কমপ্যারেটিভ রিজিওনাল ইন্টিগ্রেশন স্টাডিস, ব্রাজেস, বেলজিয়াম;
- ইনস্টিটিউট ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান সিকিউরিটি, বন, জার্মানি;
- ফিশারিজ ট্রেনিং প্রোগ্রাম, রেইকজাভিক, আইসল্যান্ড;
- জিওথারমাল ট্রেনিং প্রোগ্রাম, রেইকজাভিক, আইসল্যান্ড;
- ইনস্টিটিউট অফ অ্যাডভান্সড স্টাডিজ, ইয়োকোহামা, জাপান;
- ইনস্টিটিউট ফর সাসটেইনিবিলিটি অ্যান্ড পিস, টোকিও, জাপান;
- ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর গ্লোবাল হেলথ, কুয়ালালামপুর, মালয়েশিয়া;

- ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর সফটওয়্যার টেকনোলজি, ম্যাকাও, চায়না;
- ইনস্টিটিউট ফর ন্যাচারাল রিসোর্সেস ইন আফ্রিকা, আক্রা, ঘানা;
- ইন্টারন্যাশনাল নেটওয়ার্ক অন ওয়াটার, এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হেলথ, হ্যামিল্টন, অন্টারিও, কানাডা;
- ল্যান্ড রিস্টোরেশন ট্রেনিং প্রোগ্রাম, রেইকজাভিক, আইসল্যান্ড;
- মাশট্রিখ্ট ইকোনমিক অ্যান্ড সোশ্যাল রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেইনিং সেন্টার অন ইনোভেশন অ্যান্ড টেকনোলজি, মাশট্রিখ্ট, দ্য নেদারল্যান্ডস;
- ওয়াটার ডিকেইড প্রোগ্রাম অন ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট, বন, জার্মানি;
- ওয়ার্ল্ড ইনস্টিটিউট ফর ডেভেলপমেন্ট ইকোনমিকস রিসার্চ, হেলসিঙ্কি, ফিনল্যান্ড।

জেনেভাভিত্তিক জাতিসংঘ প্রশিক্ষণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রশিক্ষণ ও গবেষণার মাধ্যমে জাতিসংঘের কার্যকারিতা বৃদ্ধিতে কাজ করে। এই ইনস্টিটিউট বহুমাত্রিক কূটনীতি ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বিষয়ে জাতিসংঘ কূটনীতিবিদদের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক কাজে নিয়োজিত জাতীয় কর্মকর্তাদের জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণ এবং সক্ষমতা বৃদ্ধি কর্মসূচি পরিচালনা করে। এছাড়াও ইউএনআইটিএআর সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি এবং শান্তি ও নিরাপত্তা বিধানে ব্যাপক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি আয়োজন ও সম্পন্ন করে। ইউএনআইটিএআর সক্ষমতা বৃদ্ধি, ই-লার্নিং এবং প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রণালি ও জ্ঞান প্রসার-পদ্ধতি নিয়ে গবেষণা করে। ইনস্টিটিউটটি দূরশিক্ষা প্রশিক্ষণ প্যাকেজ, ওয়ার্ক বুকস, সফটওয়্যার ও ভিডিও প্রশিক্ষণ প্যাকসহ বিভিন্ন শিক্ষা সংক্রান্ত উপাদান ও উপকরণ বিকাশের কাজও করে। ইউএনআইটিএআর সম্পূর্ণরূপে স্বেচ্ছাকৃত অনুদান সহায়তাপুষ্ট, মূলত সরকার, আন্তঃসরকারি সংস্থা ও ফাউন্ডেশন।

ইতালির তুরিনে অবস্থিত জাতিসংঘ সিস্টেম স্টাফ কলেজ জাতিসংঘের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও পারদর্শিতা উন্নয়নে সহায়তা করে। এই লক্ষ্যে এটি আন্তঃএজেন্সি সহযোগিতা শক্তিশালী করে, সমন্বিত ও সংহত ব্যবস্থাপনা সংস্কৃতি উৎসাহিত করে, নিরবচ্ছিন্ন শিক্ষা ও কর্মচারী উন্নয়নে সহায়তা করে এবং কৌশলী নেতৃত্ব বাস্তবায়নে কাজ করে। এর বিষয়ভিত্তিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে রয়েছে : নেতৃত্ব, রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে জাতিসংঘ সংহতি, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন, সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি, সংঘর্ষ প্রতিরোধ ও শান্তি প্রতিষ্ঠা, কর্মচারী নিরাপত্তা ও সুরক্ষা, কর্মচারী ওরিয়েন্টেশন, শিক্ষা প্রণালি ও জ্ঞান ব্যবস্থাপনা এবং অনুশীলনমূলক সম্প্রদায়।

জেনেভায় অবস্থিত জাতিসংঘ সামাজিক উন্নয়ন বিষয়ক গবেষণা ইনস্টিটিউট সমসাময়িক উন্নয়ন বিষয়ক সামাজিক গতিধারা নিয়ে বহুমাত্রিক গবেষণায় রত। বিভিন্ন গবেষক ও ইনস্টিটিউটের এক বৈশ্বিক নেটওয়ার্কে কাজ করার মাধ্যমে ইউএনআরআইএসডি সরকার, উন্নয়ন এজেন্সি, সুশীল সমাজ সংগঠন ও বিদ্বান ব্যক্তিদের বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর ওপর উন্নয়ন নীতিমালা ও প্রক্রিয়ার প্রভাব বুঝতে সাহায্য করে। সাম্প্রতিক গবেষণার বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে লিঙ্গ সমতা, সামাজিক নীতিমালা, দারিদ্র্য হ্রাস, শাসনকার্য ও রাজনীতি এবং কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা।

জনসংখ্যা ও উন্নয়ন

জাতিসংঘের হিসাব অনুযায়ী অধিকাংশ দেশে গর্ভনিরোধক ব্যবস্থার ব্যবহার বৃদ্ধি পেলেও বিশ্বের জনসংখ্যা ২০০৫-২০১০ সালের মধ্যে প্রতি বছর ১.১৬ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। আশঙ্কার বিষয় হচ্ছে, ২০১১ সালে যে বৈশ্বিক জনসংখ্যা ৭ বিলিয়নে পৌঁছেছে তা ২০৫০ সালের মধ্যে ৯ বিলিয়ন ছাড়িয়ে যেতে পারে এবং এ বর্ধিত জনসংখ্যার সিংহভাগের বাস হবে উন্নয়নশীল দেশে। জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি পৃথিবীর ব্যবহারযোগ্য সম্পদ ও পরিবেশের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলে এবং প্রায়ই উন্নয়ন প্রচেষ্টাকে ব্যাহত করে। জাতিসংঘ নানাদিক থেকে জনসংখ্যা ও উন্নয়নের মধ্যকার সম্পর্কের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছে এবং তা সমাজে নারীর অবস্থান ও অধিকারের অগ্রগতির ওপর বিশেষ জোর দিয়ে, যা সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির চাবিকাঠি হিসেবে দৃশ্যমান।

পরিবর্তনধর্মী জনতাত্ত্বিক ধারা নতুন চাহিদার সৃষ্টি করছে। উদাহরণস্বরূপ, ২০১১ সালের ৭৮৪ মিলিয়ন দ্রুত বর্ধমান ৬০ বছর বয়সী বৃদ্ধ ব্যক্তির সংখ্যা ২০৫০ সালের মধ্যে ইতিহাসে প্রথমবারের মতো শিশুর সংখ্যার চেয়ে বেশি, দুই বিলিয়নে পৌঁছাবে। অতঃপর উন্নত বিশ্বে আয় উপযোগী ২৫-৫৯ বছর বয়সী ব্যক্তির সংখ্যা আগামী দশকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছাবে এবং এরপর এই হার হ্রাস পেয়ে ২০৫০ সাল নাগাদ হবে ৫৩১ মিলিয়ন। অপরদিকে স্বল্পোন্নত বিশ্বে তা বাড়তে থাকবে এবং ২০৫০ সালে ৩.৬ বিলিয়নে পৌঁছাবে। ইতিমধ্যেই ইতিহাসে প্রথমবারের মতো বিশ্বের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক মানুষ শহরে বসবাস করে।

জাতিসংঘ জনসংখ্যা প্রবণতার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে কাজ করে যাচ্ছে। সংগঠনের বিভিন্ন অংশ জাতীয় পরিসংখ্যান দপ্তর নির্মাণ, আদমশুমারি গণনা, পূর্বানুমান এবং নির্ভরযোগ্য উপাত্ত বিতরণ ইত্যাদি কাজ একত্রে করছে। জাতিসংঘের অগ্রগামী সংখ্যাতাত্ত্বিক ও পদ্ধতিগত কাজ, বিশেষ করে জনসংখ্যার বিস্তৃতি ও পরিবর্তন সম্পর্কে এর নির্ভরযোগ্য অনুমান রাষ্ট্রগুলোকে পূর্ব পরিকল্পনা গ্রহণের ক্ষমতা বৃদ্ধি, উন্নয়ন পরিকল্পনায় জনসংখ্যা নীতিমালার অন্তর্ভুক্তি এবং যুক্তিসঙ্গত অর্থনৈতিক ও সামাজিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করছে।

৪৭ সদস্য রাষ্ট্র সংবলিত জনসংখ্যা ও উন্নয়ন কমিশন, ইকোসক-এর জনসংখ্যা পরিবর্তন এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে তার প্রভাব সংশ্লিষ্ট কাজের পর্যালোচক ও উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করে। এর প্রাথমিক কাজ হচ্ছে, ১৯৯৪ সালের জনসংখ্যা ও উন্নয়ন বিষয়ক আন্তর্জাতিক কনফারেন্সের কর্মসূচি বাস্তবায়নের পর্যালোচনা করা।

জাতিসংঘ অর্থনৈতিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ড ডিপার্টমেন্টের জনসংখ্যা বিভাগ উপরোক্ত কমিশনটির সচিবালয়রূপে কাজ করে। এছাড়া এটি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে জনসংখ্যা ও উন্নয়ন সম্বন্ধে হালনাগাদকৃত বৈজ্ঞানিক বিষয়ভিত্তিক তথ্য প্রদান করে। এটি জনসংখ্যা স্তর, প্রবণতা, হিসাব, পূর্বানুমানের পাশাপাশি জনসংখ্যা নীতিমালা এবং জনসংখ্যা ও উন্নয়নের সম্পর্ক নিয়ে গবেষণা করে। এই বিভাগ গুরুত্বপূর্ণ কিছু ডেটাবেজ সংরক্ষণ করে, যার মধ্যে রয়েছে জনসংখ্যা, সম্পদ, পরিবেশ ও উন্নয়ন ডেটা ব্যাংক, বিশ্ব জনসংখ্যা সম্ভাবনা, বিশ্ব জনসংখ্যা নীতিমালা এবং বিশ্ব নগরায়ন সম্ভাবনা। উপরন্তু, এটি জনসংখ্যা তথ্য নেটওয়ার্ক সমন্বয় করে, যা ইন্টারনেটের ব্যবহার উৎসাহিত করার মাধ্যমে জনসংখ্যা তথ্যের বৈশ্বিক আদান-প্রদান সহজতর করে।

জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল জনসংখ্যা ও উন্নয়ন বিষয়ে জাতিসংঘ কর্মপদ্ধতির প্রায়োগিক কর্মকাণ্ডকে নেতৃত্ব দেয়ার মাধ্যমে উন্নয়নশীল এবং অর্থনৈতিক রূপান্তরমুখী দেশগুলোকে জনসংখ্যা সমস্যার সমাধান খুঁজতে সহায়তা করে। এটি রাষ্ট্রগুলোকে ব্যক্তিগত পছন্দের ভিত্তিতে প্রজনন স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা উন্নয়নে এবং টেকসই উন্নয়নের সহায়তায় জনসংখ্যা নীতিমালা প্রণয়নে সাহায্য করে। এছাড়াও এটি জনসংখ্যা সমস্যা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করে এবং নিজ নিজ দেশের প্রয়োজন অনুযায়ী এই সমস্যা সমাধানের জন্য উপযুক্ত নীতিমালা গ্রহণ করতে সরকারগুলোকে সহায়তা করে।

ইউএনএফপিএ তার সাংগঠনিক উদ্দেশ্যের বক্তব্য অনুযায়ী 'প্রতিটি নারী, পুরুষ ও শিশু যাতে সুস্বাস্থ্য এবং সমান সুযোগপ্রাপ্ত জীবন উপভোগ করতে পারে সেই অধিকার রক্ষায় কাজ করে। ইউএনএফপিএ নীতিমালা ও কর্মসূচির জন্য দেশগুলোকে জনসংখ্যা উপাত্ত দিয়ে সাহায্য করে, যাতে দারিদ্র্য নিরসন হয় এবং নিশ্চিত হয় যে প্রতিটি গর্ভধারণ ঈপ্সিত, প্রতিটি জন্ম নিরাপদ, প্রতিটি নবীন ব্যক্তি এইচআইভি/এইডসমুক্ত এবং প্রতিটি মেয়ে ও নারী মর্যাদা ও শ্রদ্ধার গণ্য।' এই উদ্দেশ্য পূরণে এটি মূলত সরকার, জাতিসংঘ এজেন্সি ও এনজিওগুলোর জনসংখ্যাবিষয়ক প্রকল্প ও কর্মসূচির অর্থ জোগানদাতা হিসেবে ভূমিকা পালন করে।

এর কর্মসূচির প্রধান ক্ষেত্রগুলো হচ্ছে :

- প্রজনন স্বাস্থ্য, নারীর সমগ্র জীবনব্যাপী যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা প্রদান, বিশেষ করে মাতৃসেবা উন্নয়নে সরকারগুলোকে সহায়তা করা;
- লিঙ্গ সমতা, যার সাথে মা ও সদ্যজাতের স্বাস্থ্য এবং এইচআইভির বিস্তার রোধ নিবিড়ভাবে জড়িত; এ ক্ষেত্রে মুখ্য বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে নারী শিক্ষা, নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন, রাজনীতিতে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং প্রজনন ও জনন বিষয়ক ভূমিকা;
- জনসংখ্যা ও উন্নয়ন কৌশল, যা রাষ্ট্রগুলোকে জনসংখ্যার মাত্রা ও প্রবণতা নিয়ে উপযুক্ত তথ্য প্রদান করে, যার মাধ্যমে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ চাহিদা বিশেষ করে দেশান্তর, বার্ধক্য, জলবায়ু পরিবর্তন ও নগরায়নের আলোকে প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন ও রাজনৈতিক সদিচ্ছা নির্ধারণ করা সম্ভব হয়।

ইউএনএফপিএ গর্ভপাতের ব্যাপারে সহায়তা করে না; বরং পরিবার পরিকল্পনা প্রসারের মাধ্যমে গর্ভপাতের প্রয়োজনীয়তা হ্রাস করার চেষ্টা করে। এছাড়াও এটি অপ্রাপ্তবয়স্ক মাতৃত্ব রোধ, ফিস্টুলা রোধ ও নিরাময়, এইচআইভি/এইডস ও অন্যান্য যৌনবাহিত সংক্রমণ রোধ, গর্ভপাত হ্রাস এবং প্রজনন সম্পর্কিত স্বাস্থ্যসেবা ও তথ্যের সহজলভ্যতা বৃদ্ধিমূলক নানা কর্মসূচির আয়োজনের মাধ্যমে বয়ঃসন্ধিকালীন প্রজনন স্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করে।

অভিভাবকদের জন্য সন্তানের সংখ্যা ও সন্তানধারণের মধ্যবর্তী সময় নিয়ন্ত্রণ করতে পারা প্রজনন স্বাস্থ্যের একটি অপরিহার্য বিবেচ্য বিষয় এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত একটি মৌলিক মানবাধিকার। ধারণা করা হয় যে, কমপক্ষে ২০০ মিলিয়ন নারী নিরাপদ ও কার্যকর পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহার করতে আগ্রহী হলেও তথ্য ও সেবার ঘাটতি এবং স্বামী বা সমাজের চাপে পড়ে তা করতে ব্যর্থ হয়। ইউএনএফপিএ পরিবার পরিকল্পনার চাহিদা পূরণে সরকার, বেসরকারি খাত ও এনজিওদের সাথে কাজ করে।

লিঙ্গ সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন

নারী ও পুরুষের সমতা এবং নারীর ক্ষমতায়ন সম্প্রসারণ জাতিসংঘের অন্যতম প্রধান একটি কাজ। লিঙ্গ সমতা শুধু আলাদাভাবে একটি লক্ষ্য বা উচ্চারণ নয় বরং এমডিজিসহ অন্যান্য লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের অন্তর্নিহিত উপাদান ও অপরিহার্য পন্থা। দারিদ্র্য ও ক্ষুধা নিরসন, সবার জন্য সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণ, এইচআইভি/এইডস রোধ এবং টেকসই উন্নয়ন সহজতর করার জন্য পুরুষের পাশাপাশি নারীর চাহিদা, অগ্রাধিকার ও অবদানের দিকেও নিয়মমাফিক মনোযোগ দেয়া প্রয়োজন। সংস্থাটি নারীর মানবাধিকার নিয়ে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে এবং সশস্ত্র সংঘাত ও নারী পাচারসহ নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতার ব্যাপকতা নির্মূলে কাজ করে। এছাড়া জাতিসংঘ বৈশ্বিক আদর্শ ও মানদণ্ড গ্রহণ করে এবং উন্নয়ন সহায়তা কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে জাতীয় পর্যায়ে তা পর্যবেক্ষণ ও বাস্তবায়নে সহায়তা করে।

মেক্সিকো সিটি (১৯৭৫), কোপেনহেগেন (১৯৮০), নাইরোবি (১৯৮৫) ও বেইজিংয়ে (১৯৯৫) অনুষ্ঠিত জাতিসংঘ অধিবেশনগুলো বিশ্বব্যাপী লিঙ্গ সমতা ও নারীর ক্ষমতায়নের অঙ্গীকার ও কর্মপ্রক্রিয়া গ্রহণ করে। চতুর্থ নারী অধিবেশনে (১৯৯৫) ১৮৯ দেশের সরকার বেইজিং ঘোষণা এবং কর্মপ্রক্রিয়া মঞ্চ উত্থাপন করে, যার মাধ্যমে জীবনের প্রতিটি স্তরে বিদ্যমান ভেদাভেদ ও বৈষম্য এবং নারীর ক্ষমতায়নের ওপর গুরুত্বারোপ করা সম্ভব হয়। ২০১০ সালে বেইজিং+১৫ পর্যালোচনা লিঙ্গ সমতা অর্জনের অগ্রগতিকে স্বাগত জানায় এবং এমডিজিসহ অন্যান্য উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ঘোষণা ও কর্মপ্রক্রিয়া মঞ্চ প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে।

ইউএন-ইউমেন জাতিসংঘের লিঙ্গ সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন বিষয়ক কর্মসত্তা, যা ২০১০ সালে লিঙ্গ সম্পর্কিত সমস্যা ও নারী অগ্রগতি বিষয়ক বিশেষ উপদেষ্টার কার্যালয়, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ক ডিপার্টমেন্টের নারী অগ্রগতি বিষয়ক বিভাগ, নারী অগ্রগতি সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এবং জাতিসংঘ নারী উন্নয়ন তহবিলের (অফিস অফ দ্য স্পেশাল অ্যাডভাইজার অন জেন্ডার ইস্যুজ অ্যান্ড অ্যাডভান্সমেন্ট অফ উইমেন, দ্য ডিভিশন ফর দ্য অ্যাডভান্সমেন্ট অফ উইমেন ইন দ্য ডিপার্টমেন্ট অফ ইকোনমিক অ্যান্ড সোশাল অ্যাফেয়ার্স, দ্য ইন্টারন্যশনাল রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেইনিং ইনস্টিটিউট ফর দ্য অ্যাডভান্সমেন্ট অফ উইমেন এবং ইউনাইটেড নেশনস ডেভেলপমেন্ট ফান্ড ফর উইমেন) একত্রীকরণের ফলস্বরূপ গঠিত হয়। ইউএন-উইমেন নারী ও মেয়েদের প্রতি বৈষম্য দূরীকরণ, নারীর ক্ষমতায়ন এবং উন্নয়ন, মানবাধিকার, মানবতাবাদী কর্মকাণ্ড এবং শান্তি ও নিরাপত্তায় অংশীদার ও উপকারী হিসেবে নারী-পুরুষের সমতা রক্ষায় কাজ করে। ইউএন-ইউমেন বৈশ্বিক মানদণ্ড ও আদর্শ প্রণয়নে কমিশন অন দ্য স্ট্যাটাস অফ উইমেনের মতো বিভিন্ন আন্তঃসরকারি সংস্থাকে সহায়তা করে; প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত ও আর্থিক সহায়তা দিয়ে এবং সুশীল সমাজের সাথে অংশীদারিত্ব বজায় রেখে সদস্য রাষ্ট্রগুলোকে এসব মানদণ্ড বাস্তবায়নে সাহায্য করে এবং কর্মপদ্ধতির অগ্রগতি নিয়মিত পর্যবেক্ষণসহ লিঙ্গ সমতা বিষয়ক অঙ্গীকার রক্ষায় জাতিসংঘ কর্মপদ্ধতির দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করে।

ইকোসক-এর তত্ত্বাবধানে নারীর মর্যাদাবিষয়ক কমিশন চতুর্থ নারী অধিবেশন প্রসূত কর্মপ্রক্রিয়া মঞ্চের বাস্তবায়ন পর্যালোচনার মাধ্যমে বিশ্বজুড়ে লিঙ্গ সমতার অগ্রগতি

পর্যবেক্ষণ করে। কমিশনটি সমাজের সকল স্তরে নারীর অধিকার উন্নয়নের জন্য এবং সকল ক্ষেত্রে বৈষম্য ও অসমতা নির্ণয়ের জন্য কর্মপ্রণালি সুপারিশ করে। ৪৫ সদস্যবিশিষ্ট এই কমিশনের ৬০ বছরের ইতিহাসে প্রধান সফলতা হচ্ছে চারটি নারী বিষয়ক অধিবেশনের আয়োজন ও ফলোআপ এবং নারীর মানবাধিকার বিষয়ক 'দ্য নাইনটিন সেভেনটি নাইন কনভেনশন অন দ্য এলিমিনেশন অফ অল ফর্মস অফ ডিসক্রিমিনেশন এগেইনস্ট উইমেন' চুক্তির প্রণয়ন।

নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণ কমিটি কনভেনশনের বিভিন্ন নীতিমালার সঠিক প্রয়োগ নিরীক্ষণ করে। ২৩ সদস্যবিশিষ্ট এই কমিটি রাষ্ট্রপক্ষের সাথে তাদের দেয়া প্রতিবেদন অনুযায়ী কনভেনশনের নীতিমালার প্রয়োগ নিয়ে ফলপ্রসূ আলোচনা করে। এর সুপারিশমালা নারী অধিকার আরও ভালোভাবে অনুধাবনের ক্ষেত্রে এবং এসব অধিকার প্রতিষ্ঠা ও বৈষম্য দূরীকরণের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে।

দপ্তরের বাইরেও জাতিসংঘ পরিবারের প্রতিটি সংস্থা নারী ও লিঙ্গ সম্পর্কিত বিভিন্ন নীতিমালা ও কর্মসূচি নিয়ে কাজ করছে এবং এমডিজি লক্ষ্যমাত্রাতেও নারীর ক্ষমতায়ন কেন্দ্রীয় উপাদানরূপে বিবেচিত।

শিশুর অধিকার ও কল্যাণ প্রসার

শিশুমৃত্যু হার সাম্প্রতিক বছরগুলোতে উল্লেখযোগ্য হারে কমলেও সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ২০১৫ সালের মধ্যে এই মৃত্যুহার ১৯৯০ সালের মৃত্যুহারের তুলনায় দুই-তৃতীয়াংশে কমিয়ে আনার জন্য আরও অনেক কিছু করা প্রয়োজন। ১৯৯০ সালে ৫ বছরের কম বয়সী ১২ মিলিয়ন শিশু মৃত্যুবরণ করেছে, যা ২০১১ সালে কমে হয়েছে ৬.৯ মিলিয়ন। প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ শিশুমৃত্যুর কারণ সংক্রামক রোগ, যেমন– ম্যালেরিয়া, নিউমোনিয়া, ডায়রিয়া, পচন, হাম এবং এইডস, যা স্বল্পব্যয়ে ও যথাযোগ্য ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রতিরোধযোগ্য। পুষ্টির অভাব শিশুর রোগজনিত মৃত্যুর হার বৃদ্ধি করে। এছাড়াও এর ফলে বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতাসহ দীর্ঘমেয়াদি মানসিক ও শারীরিক সমস্যা দেখা দিতে পারে। এটি পরিবার, গোষ্ঠী, জাতি ও বিশ্বের জন্য ভয়াবহ ক্ষতিকর হিসেবে প্রতীয়মান হয়। শৈশবের পরে শিশুদের জীবনযাপন এবং বেড়ে ওঠাও হুমকির সম্মুখীন হয়। তারা আরও অরক্ষিত হয়ে পড়ে। কারণ তারা শিক্ষা, অংশীদারিত্ব ও বিপদ থেকে সুরক্ষা পাওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়।

ইউনিসেফ শিশুদের বেঁচে থাকা, বেড়ে ওঠা ও সুরক্ষার অধিকার নিশ্চিত করতে কাজ করে। এটি শিশু অধিকার সনদ এবং একই সাথে সবার বিরুদ্ধে সকল প্রকার বৈষম্য বিরোধী চুক্তি পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নে কাজ করে। ১৯১টি দেশে ইউনিসেফ সরকার, আন্তর্জাতিক সংস্থা, সুশীল সমাজ এবং যুবকদের সাথে যৌথ উদ্যোগে শিশুদের সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে কাজ করে, যার মধ্যে রয়েছে দারিদ্র্য, সহিংসতা, রোগ ও বৈষম্য। ইউনিসেফের প্রধান কাজগুলোর মূলে রয়েছে শিশুদের বেঁচে থাকা ও বেড়ে ওঠা; মৌলিক শিক্ষা ও লিঙ্গ সমতা; এইচআইভি/এইডস ও শিশু; শিশু সুরক্ষা; প্রচারনীতি এবং অংশীদারিত্ব। এই লক্ষ্যগুলো এমডিজি'র সাথে এবং ২০০২ সালের শিশু বিষয়ক সাধারণ সভার বিশেষ অধিবেশন থেকে উদ্ভূত দলিল 'আ ওয়ার্ল্ড ফিট ফর চিলড্রেন'-এ ব্যক্ত উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

ইউনিসেফের তহবিল শিশুর জন্মের পূর্ব থেকে বয়ঃসন্ধিকাল পর্যন্ত স্বাস্থ্যের প্রতিটি বিশেষ দিক নিয়ে বিস্তৃত পরিসরে কাজ করে। এটি গর্ভবতী মহিলাদের প্রসবপূর্ব ও প্রসবকালীন যত্নের সহজলভ্যতা নিশ্চিত করতে ভূমিকা রাখে, শৈশবকালীন রোগের বিরুদ্ধে বাড়িতেই ব্যবস্থা নেয়ার ব্যাপারে পরিবারের সক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং সমাজকে সর্বোত্তম স্বাস্থ্য সুরক্ষা অর্জনে দিকনির্দেশনা দিয়ে থাকে। ইউনিসেফ অল্প বয়সীদের মধ্যে এইচআইভি/এইডসের ঝুঁকি কমাতে তাদেরকে সুরক্ষিত রাখার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য প্রচারে কাজ করে। এটি এইডস আক্রান্ত মহিলা এবং শিশুদের পূর্ণ মর্যাদা নিয়ে জীবনযাপন করার ব্যাপারেও সাহায্য করে।

ইউনিসেফ বিশ্বব্যাপী টিকাদানের সাথেও জড়িত, যা প্রতিষেধক ক্রয় এবং বণ্টন থেকে নিরাপদে টিকা দেয়া পর্যন্ত ব্যাপ্ত। এটি বিশ্বের ৩৬ শতাংশ শিশুর জন্য প্রতিষেধক সরবরাহ করে ও এ ব্যাপারে বৈশ্বিকভাবে নেতৃত্ব দিচ্ছে। ইউনিসেফ ডব্লিউএইচওর সাথে যৌথভাবে সর্বজনীন শৈশবকালীন টিকাদানের লক্ষ্য অর্জনের জন্য টিকাদানের সম্প্রসারিত কর্মসূচি আওতাধীন ছয়টি প্রতিষেধক নিয়ে কাজ করে : বিসিজি, ওপিভি, ডিপথেরিয়া, টিটেনাস, পারটুসিস এবং হাম। ২০১১ সালে ১০৭ মিলিয়ন শিশুকে প্রতিষেধক দেয়া হয়, বিশ্বব্যাপী টিকাদানের আওতার ৮৩ শতাংশ। এই তহবিল অন্যান্য প্রাণরক্ষাকারী সেবা প্রদানের জন্য টিকাদানের সুযোগ কাজে লাগায়, যার মধ্যে রয়েছে নিয়মিত ভিটামিন-এ সাপ্লিমেন্ট এবং ম্যালেরিয়া থেকে পরিবারদের নিরাপদ রাখার জন্য কীটনাশকযুক্ত মশারি সরবরাহ।

প্রাক-বিদ্যালয় থেকে বয়ঃসন্ধিকাল পর্যন্ত শিশুদের শিক্ষাদানে সহায়তা প্রদানকারী নানা উদ্যোগের দ্বারা ইউনিসেফ শিক্ষকদের কার্যকর করে তোলে, শিশুদের নিবন্ধিত করে, স্কুলের সুযোগ-সুবিধা তৈরি করে এবং পাঠ্যক্রমকে ঢেলে সাজায়; কখনও কখনও শিক্ষা পদ্ধতিকে গোড়া থেকে পুনর্বিন্যাসের কাজও করে। শিশুরা যেন সবসময়, এমনকি সংঘর্ষ চলাকালীন সময়েও খেলার ও শেখার সুযোগ পায় এটি তা নিশ্চিত করে। কারণ শিশুর বিকাশে খেলাধুলা ও বিনোদন সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এটি প্রসূতি মায়েদের জন্য সঠিক পুষ্টি নিশ্চিত করতে এবং জন্মের পর স্তন্যদান করতে উৎসাহিত করে। এটি কিন্ডার গার্টেন ও শিশুকল্যাণ কেন্দ্রগুলোতে পানি ও স্যানিটেশন সুবিধা উন্নত করে। এই তহবিল অপ্রাপ্তবয়স্কদের জন্য সুরক্ষিত পরিবেশ সৃষ্টিতেও সহায়তা করে। এটি শিশুশ্রমকে নিষিদ্ধ করে ও নারীদের যৌন হয়রানির ক্ষেত্রে শাস্তি প্রদান সংবলিত আইনকে উৎসাহিত করে এবং শিশুদের যৌন ও অর্থনৈতিক কাজে ব্যবহার করাকে দুরূহ করতে ভূমিকা রাখে। এছাড়াও ইউনিসেফ ল্যান্ডমাইন সচেতনতা ক্যাম্পেইনের পরিকল্পনা করে এবং শিশুদের সৈন্যের ভূমিকা থেকে বিরত থাকতে সহায়তা করে।

সামাজিক সংহতি

জাতিসংঘ বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীকে চিহ্নিত করেছে, যাদের বিশেষ মনোযোগের প্রয়োজন; এদের মধ্যে রয়েছে শিশু, বৃদ্ধ, দরিদ্র, সুবিধাবঞ্চিত, প্রতিবন্ধী, সংখ্যালঘু ও নৃগোষ্ঠী। সাধারণ পরিষদ, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ (ইকোসক) এবং সামাজিক উন্নয়ন কমিশনের সভায় এসব বিষয়ে আলোচনা হয়। এই গোষ্ঠীর বিশেষ কার্যক্রমগুলো জাতিসংঘের অর্থনীতি ও সমাজকর্ম বিভাগ দ্বারা পরিচালিত হয়। জাতিসংঘ এসব ক্ষুদ্র

গোষ্ঠীর মানবিক অধিকার অর্জন ও রক্ষার জন্য কাজ করে। এগুলোকে বাস্তবে রূপ দেয়ার জন্য নিয়ম, মানদণ্ড ও নীতিমালা নির্ধারণ করে। আন্তর্জাতিক সচেতনতা ও কার্যক্রম বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন গবেষণা এবং তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে বিশেষ 'বছর' এবং 'দশক' ঘোষণা করে থাকে।

পরিবার

জাতিসংঘ পরিবারকে সমাজের মূল ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করে। কাঠামোগত পরিবর্তনের কারণে, যেমন : (ছোট পরিবার, বিলম্বিত বিবাহ ও গর্ভধারণ, ক্রমবর্ধমান বিবাহ বিচ্ছেদ), বৈশ্বিক অভিবাসন প্রবণতা, বার্ধক্য, এইচআইভি/এইডস এবং বিশ্বায়নের প্রভাব ইত্যাদির ফলে গত ষাট বছরে পরিবারগুলোতে যথেষ্ট পরিবর্তন এসেছে। এই পরিবর্তনগুলো শিশুর সামাজিকীকরণ ও পরিবারে শিশু এবং বৃদ্ধদের যত্ন নেয়ার মতো বিষয়ের ওপর প্রভাব ফেলে। পরিবার সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি ও সে উদ্দেশ্যে সঠিক উদ্যোগ গ্রহণের লক্ষ্যে প্রতি বছর ১৫ মে 'আন্তর্জাতিক পরিবার দিবস' পালন করা হয়।

পরিবার-সংশ্লিষ্ট জাতিসংঘ ফোকাল পয়েন্ট জাতিসংঘের সরকার সম্পৃক্ত সংস্থাগুলোকে পরিবার ও পারিবারিক নীতি সম্বন্ধে সহায়তা দেয়; আন্তর্জাতিক পরিবার বর্ষের (১৯৯৪) লক্ষ্যগুলো বাস্তবায়নকল্পে প্রচারণা করে এবং জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক নীতিনির্ধারণে পারিবারিক পরিস্থিতি বিবেচনায় রাখে; পারিবারিক ইস্যুগুলোতে অভিজ্ঞতা ও বিশেষজ্ঞ বিনিময় এবং নেটওয়ার্কিং ও তথ্য বিতরণে সহায়তা করে; পরিবারিক সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও গবেষণায় সহযোগিতা করে; জাতিসংঘ ও সদস্য রাষ্ট্রের সরকার উভয় ক্ষেত্রেই পরিবার সম্বন্ধীয় নীতিমালা ও কর্মসূচিতে উৎসাহ দেয় ও সমন্বয় সাধন করে; সদস্য রাষ্ট্র সরকারগুলোকে কারিগরি সহায়তাদান ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে সহযোগিতা দেয়; একইসাথে এটি পরিবার সম্বন্ধে সরকার, সুশীল সমাজ ও বেসরকারি সেক্টরের সাথে যোগসূত্র রক্ষা করে চলে।

যুব সমাজ

সাধারণ পরিষদ ১৫ থেকে ২৪ বছর বয়সীদের যুবক-যুবতী হিসেবে বিবেচনা করে তাদের জন্য বিভিন্ন প্রস্তাব ও ক্যাম্পেইন গ্রহণ করে এবং পরিষদ সচিবালয় সংশ্লিষ্ট প্রোগ্রাম ও ক্যাম্পেইনের তদারকি করে থাকে। জাতিসংঘের যুবক সংশ্লিষ্ট প্রোগ্রাম যুবকদের জন্য সংস্থাটির মুখ্য কর্মকেন্দ্র; এর লক্ষ্য হলো বৈশ্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে যুবকদের সচেতন করা, তাদের অধিকার ও আকাঙ্ক্ষার প্রসার ঘটানো এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির মাধ্যমে শান্তি ও উন্নতি অর্জন করা। সরকারগুলো নিয়মিত যুবক প্রতিনিধিদের সাধারণ পরিষদ ও অন্যান্য অঙ্গ সংস্থার সভায় অন্তর্ভুক্ত করে।

২০১২ সালের জানুয়ারিতে মহাসচিব বান কি-মুন তার দ্বিতীয় দফার কাজের শুরুতে পাঁচ বছরের কর্মসূচি প্রদান করেন, যেখানে তিনি মহিলা ও যুবকদের নিয়ে কাজ করাকে প্রাধান্য দেন। এই লক্ষ্যে তিনি ২০১৩ সালের জানুয়ারিতে 'যুবদূত' নিয়োগ করেন। 'যুবদূত' নিয়োগের ফলে জাতিসংঘের কর্মকাণ্ডে যুবকদের সংশ্লিষ্টতা বৃদ্ধি; উন্নয়ন কাঠামো বা প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়নে যুবকদের অধিকতর অংশগ্রহণ; যুবক-

সংশ্লিষ্ট বিষয়াদিতে আন্তর্জাতিক সচেতনতা ও মনোযোগ বৃদ্ধি; সদস্য রাষ্ট্র, বেসরকারি ক্ষেত্র, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সুশীল সমাজ ও গণমাধ্যমের যুবক-সংশ্লিষ্ট বিষয়াদিতে অংশীদারিত্ব এবং জাতিসংঘের অঙ্গ সংস্থাগুলোর যুব উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে সমন্বয় ইত্যাদি সহজতর হয়। ১৯৯৯ সালে সাধারণ পরিষদ ১২ আগস্টকে প্রতি বছর 'আন্তর্জাতিক যুব দিবস' হিসেবে পালনের ঘোষণা দেয়। ১৯৯৫ সালে গৃহীত বিশ্ব যুব কর্মসূচি সংক্রান্ত জনসচেতনতা বৃদ্ধির নিমিত্তে সাধারণ পরিষদ 'আন্তর্জাতিক যুব দিবস' পালন উপলক্ষে বিভিন্ন রকমের গণজাগরণমূলক অনুষ্ঠানাদি আয়োজন করতে সুপারিশ করে; বিশ্বব্যাপী যুব সম্প্রদায়ের সার্বিক অবস্থার উন্নতিকল্পে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কর্মপদ্ধতির নীতিগত কাঠামো নির্দেশনা হিসেবে 'বিশ্ব যুব কর্মসূচি' প্রণীত হয়। ২০০০ সালের সহস্রাব্দ সামিটের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে জাতিসংঘ, আইএলও ও বিশ্বব্যাংকের সমন্বয়ে দ্য ইয়থ এমপ্লয়মেন্ট নেটওয়ার্ক গঠিত। বিশ্বব্যাপী উপযুক্ত ও উন্নয়নমূলক যুব কর্মসংস্থানের কৌশল বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে এই নেটওয়ার্কের সৃষ্টি।

প্রবীণ ব্যক্তি

সাম্প্রতিক জন্ম ও মৃত্যুহার হ্রাসের কারণে বিশ্বব্যাপী অভূতপূর্ব ও অপরিবর্তনযোগ্য জনগণনাতত্ত্বে রূপান্তর স্পষ্টভাবে লক্ষ্যণীয়। ফলত পৃথিবীব্যাপী প্রবীণ ব্যক্তির সংখ্যা বৃদ্ধির সম্ভাবনা বাড়ার দিকে। ২০৫০ সাল নাগাদ প্রতি পাঁচজনে একজনের বয়স হবে ৬০ বছর বা তার অধিক। বিশ্বসংস্থা এই বিষয়ে নীতিমালা প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে এবং বার্ধক্য বিষয়টিকে উন্নয়ন-বান্ধব করার প্রয়াস পোষণ করে। বার্ধক্যজনিত নতুন একটি কাঠামোর নীতিমালা প্রণয়নের জন্য জাতিসংঘ প্রবীণ কর্মসূচি নিয়োজিত।

জাতিসংঘ বিশ্বব্যাপী বার্ধক্যজনিত চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা মোকাবেলায় বিশেষ কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করে :

- ১৯৮২ সালে ভিয়েনায় অনুষ্ঠিত বার্ধক্যের ওপর প্রথম আন্তর্জাতিক সমাবেশে বয়স্কদের জন্য ভিয়েনা আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা গৃহীত হয়, যেখানে নিম্নলিখিত সুপারিশ করা হয় : কর্মসংস্থান ও আয়ের নিশ্চয়তা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, বাসস্থান, শিক্ষা এবং সমাজকল্যাণ। এই কর্মপরিকল্পনাটি বয়স্ক ব্যক্তিদের বিপরীতমুখী বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন জনগোষ্ঠী মনে করে : বয়স্ক ব্যক্তিদের স্বাস্থ্যসেবাসহ বিভিন্ন প্রয়োজন রয়েছে কিন্তু তারা একই সাথে অনেক বিষয়ে পারদর্শী;
- ১৯৯১ সালে সাধারণ পরিষদ কর্তৃক গৃহীত প্রবীণ ব্যক্তিবর্গের জন্য জাতিসংঘের নীতিমালা অনুযায়ী বয়স্কদের মর্যাদা সংক্রান্ত পাঁচটি বিষয়কে, যথা স্বাধীনতা, অংশগ্রহণ, সেবা, স্বয়ংসম্পূর্ণতা ও মর্যাদা গুরুত্ব দেয়া হয়
- ২০০২ সালে মাদ্রিদে অনুষ্ঠিত বার্ধক্যের ওপর দ্বিতীয় বিশ্বসভায় একবিংশ শতাব্দীর বার্ধক্যজনিত আন্তর্জাতিক নীতিমালা গ্রহণ করা হয়; 'আন্তর্জাতিক মাদ্রিদ বার্ধক্য কর্মপরিকল্পনা' নামের এই নীতিমালা অনুযায়ী জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রগুলো তিনটি মুখ্য বিষয়ের ওপর গুরুত্ব সহকারে কাজ করার অঙ্গীকার করেন। এগুলো হলো বৃদ্ধ ব্যক্তিবর্গ ও উন্নয়ন, বৃদ্ধ বয়সে স্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং বন্ধুসুলভ ও সহায়ক পরিবেশের নিশ্চয়তা।

আদিবাসী বিষয়াবলী

সারা পৃথিবীতে ৯০টির মতো দেশে প্রায় ৩৭ কোটি আদিবাসী মানুষ বাস করে, যারা সমাজে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে বৈষম্যের শিকার। আদিবাসী মানুষেরা দরিদ্রতম, অশিক্ষিত এবং বিশ্বের নিঃস্ব জাতি হিসেবে অযাচিত পরিচয়ে কালাতিপাত করে। যুদ্ধ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলশ্রুতিতে প্রায়ই তাদেরকে পৈতৃক ভিটামাটি থেকে উৎখাত হতে হয়, এছাড়া আরও অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়, যা তাদের বেঁচে থাকা ও সাংস্কৃতিক জীবনের জন্য হুমকিস্বরূপ। এমনকি অনেক সময় তাদের ঐতিহ্যবাহী জ্ঞান বা জীবনধারার কোনো উপকরণকে তাদের সম্মতি বা সম্পৃক্ততা ছাড়াই বাজারজাত করা হয়। বিশ্বের সকল আদিবাসী জনগণের অধিকার সমর্থন ও সুরক্ষার জন্য প্রতি বছর ৯ আগস্ট 'আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস' পালন করা হয়।

জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাউন্সিলের মাধ্যমে ২০০২ সালে প্রতিষ্ঠিত 'আদিবাসী সমস্যা সংশ্লিষ্ট স্থায়ী ফোরাম' অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন, সংস্কৃতি, শিক্ষা, পরিবেশ, স্বাস্থ্য এবং মানবাধিকার ইত্যাদি আদিবাসী ইস্যুগুলোকে সুবিবেচনায় রাখে ও সে মতে কাজ করে। এই ফোরাম ইকোসককে এবং এর মাধ্যমে জাতিসংঘের বিভিন্ন অঙ্গ সংস্থাগুলোকে অভিজ্ঞ ও সুবিবেচনামূলক সুপারিশ-পরামর্শ-উপদেশ দিয়ে থাকে। এর মূল লক্ষ্য হলো জাতিসংঘের কর্মপদ্ধতিতে আদিবাসী ইস্যু-সংশ্লিষ্ট কার্যক্ষেত্রে জনসচেতনতা বৃদ্ধি, ঐক্য ও সমন্বয় বৃদ্ধি এবং এতদ সংক্রান্ত বিষয়গুলো সম্পর্কে তথ্য প্রচার করা। এছাড়াও এই ফোরাম আদিবাসী সমস্যা কীভাবে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার নিরিখে সুষ্ঠু সমাধানের দিকে নেয়া যায়, তা বিবেচনায় রাখে। স্মর্তব্য যে, অনেক দেশের ক্ষেত্রে আদিবাসী ইস্যু-সংশ্লিষ্ট ফলপ্রসূ কর্মকাণ্ড ২০১৫ সালের মধ্যে বিশ্বের দারিদ্র্য অর্ধেকে নামিয়ে আনার লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক হবে।

আদিবাসীদের নিয়ে স্থায়ী ফোরামে জাতিসংঘের ১২তম অধিবেশনে (২০১৩) আদিবাসী প্রতিনিধি দলকে 'সাধারণ অধিবেশন কক্ষে' দেখা যাচ্ছে। (২০ মে ২০১৩, ইউএন ছবি/ রিক বাজোরনাস)

সাধারণ পরিষদ ২০০৫-২০১৫ সময়কালকে 'দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক আদিবাসী দশক' হিসেবে ঘোষণা করে। এর মূল উদ্দেশ্যগুলো হলো :

- বৈষম্যমুক্ত পরিবেশ প্রসার এবং কর্মসূচি, প্রকল্প, নীতিমালা ও আইনের পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়নে আদিবাসী মানুষদের অন্তর্ভুক্তি ও সক্রিয় অংশগ্রহণ;
- জীবনধারা, পৈতৃক জমিজমা ও আবাসস্থল, সাংস্কৃতিক সংহতি ও যৌথ অধিকারসহ আদিবাসীদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট সার্বিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাদের কার্যকরী সম্পৃক্ততা;
- আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত স্বকীয়তার পরিপন্থী সকল আইন ও নীতিমালার পুনর্মূল্যায়ন ও পুনর্নির্ধারণ;
- আদিবাসী মানুষদের উন্নতির জন্য ন্যূনতম উপকারভিত্তিক কর্মসূচি, প্রকল্প, নীতিমালা ও বাজেট প্রণয়নের মাধ্যমে তাদের বিশেষত আদিবাসী নারী, শিশু ও যুবকদের উন্নয়নে সহায়তা দান এবং
- আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সুরক্ষা ও তাদের জীবনের উন্নতিকল্পে আইনের প্রয়োগ এবং নীতিমালা ও কর্মসূচি কাঠামো বাস্তবায়নে শক্তিশালী নিরীক্ষা ব্যবস্থা ও সর্বস্তরে দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি।

২০০৭ সালে সাধারণ পরিষদ 'আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অধিকার সংবলিত জাতিসংঘ ঘোষণা' গ্রহণ করে; যেখানে নিজস্ব পরিচিতি, ভাষা, সংস্কৃতি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও কর্মসংস্থানসহ আদিবাসী জনগণের ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত অধিকার বর্ণিত আছে। এই ঘোষণা আদিবাসী জনগোষ্ঠীর নিজস্ব প্রতিষ্ঠান, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও শক্তিশালী করতে গুরুত্ব আরোপ করে, যেখানে তারা তাদের নিজস্ব প্রয়োজন ও আকাঙ্ক্ষা মোতাবেক উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে মনোযোগ দিতে পারে। এটি সব ধরনের বৈষম্যকে নিষিদ্ধকরণের মাধ্যমে তাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের পথে অগ্রসর হতে প্রেরণা এবং সর্বাত্মক সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে। পাশাপাশি তাদের স্বকীয়তা বজায় রাখতে প্রতিশ্রুতি দেয়।

প্রতিবন্ধী

প্রতিবন্ধী মানুষদের প্রায়শই সমাজের মূল স্রোতধারা-বহির্ভূত মনে করে তাদের সাথে সুবিধাবঞ্চিতদের মতো আচরণ করা হয়। বৈষম্যের রকমফের অনেক : শিক্ষার অধিকারবঞ্চিত হওয়া থেকে শুরু করে বিভিন্ন অপ্রকাশ্য শারীরিক ও সামাজিক বাধা যা তাদেরকে আলাদা ও একঘরে করে দেয়। সমাজ অবশ্য এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কারণ সুবিধাবঞ্চিত ব্যক্তিদের প্রতিভাকে তারা কাজে লাগাতে পারে না। প্রতিবন্ধী সম্পর্কে মানুষের ধারণা ও চিন্তাভাবনার পরিবর্তন প্রয়োজন। কেননা এর সাথে সমাজের সর্বস্তরের মূল্যবোধ ও উন্নত ভাবনা জড়িত। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই জাতিসংঘ প্রতিবন্ধী ও সুবিধাবঞ্চিতদের মর্যাদা বৃদ্ধি ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। মানবাধিকার, মৌলিক স্বাধীনতা ও সাম্য—এই ত্রয়ী নীতিমালায় নিহিত আছে উল্লিখিত সুবিধাবঞ্চিতদের মর্যাদা ও অধিকারের প্রতি জাতিসংঘের চিন্তা ও উৎকণ্ঠা।

সমঅধিকার ও প্রতিবন্ধী মানুষের কর্মসংস্থান-সংশ্লিষ্ট তিন দশকের অধিপরামর্শ ও প্রচেষ্টার ফলশ্রুতিতে সাধারণ পরিষদ ২০০৬ সালে 'প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর অধিকার-সংশ্লিষ্ট সম্মেলন এবং ঐচ্ছিক প্রটোকল' গ্রহণ করে। ২০০৮ সালে কার্যকরী হওয়া এই

চুক্তিটি সব ধরনের মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতাকে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য বলে ঘোষণা করে। এর মূলে রয়েছে কিছু নীতিমালা, যেমন— ব্যক্তি মর্যাদা ও স্বাতন্ত্র্য, বৈষম্যহীন সাম্য, সমাজের সব ক্ষেত্রে সার্বিক ও কার্যকরী অংশগ্রহণ ও অন্তর্ভুক্তিকরণ, বৈচিত্র্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও মানব বৈচিত্র্যের অংশ হিসেবে প্রতিবন্ধীদের গ্রহণ, সমান সুযোগ ও বৈষম্যহীন অংশগ্রহণ, নারী-পুরুষ সমান অধিকার, প্রতিবন্ধী ও সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের বিভিন্ন সুপ্ত প্রতিভার প্রতি নিরবচ্ছিন্ন সমর্থন এবং তাদের নিজস্ব পরিচিতি রক্ষার অধিকার।

এই সম্মেলন বিশেষ দৃষ্টি দেয় যেখানে মানবাধিকারের লঙ্ঘন হয়, যেখানে সুরক্ষা জোরালো করা প্রয়োজন এবং যেখানে সুবিধাবঞ্চিতদের অধিকার রক্ষায় আইন প্রণয়ন বা অন্য কোনো পদক্ষেপ নেয়া অপরিহার্য। আলোচিত দায়িত্বাবলি পালনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রগুলোকে নিবিড় পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। প্রতিবন্ধী সংশ্লিষ্ট জাতিসংঘের ফোকাল পয়েন্ট কনভেনশনের সচিবালয় হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। ১৮ জন অভিজ্ঞ সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত 'প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীদের অধিকার রক্ষা কমিটি' এই সম্মেলনের কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও কার্যকারিতা পরিবীক্ষণ করে। সম্মেলনের ঐচ্ছিক প্রটোকলের আওতায় এই কমিটি ব্যক্তিগত নালিশ অথবা সমস্যা ও এর পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা নীতিমালা অমান্য হওয়ার বিষয়গুলো তত্ত্বাবধান করে, যা সদস্য-রাষ্ট্রগুলো গুরুত্ব দেয় ও মেনে চলে।

অসুশীল সমাজ : অপরাধ, নিষিদ্ধ মাদক এবং সন্ত্রাস

বহু দেশীয় সংগঠিত অপরাধ, বেআইনি মাদক পাচার ও সন্ত্রাস এখন সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে সমগ্র দেশের অথবা অঞ্চলের ভাগ্যে দুর্দশা এনে দিতে সক্ষম। সরকারি কর্মচারীদের ব্যাপক ঘুষ লেনদেন, বহুজাতিক অপরাধী চক্রের প্রসার, মানব পাচার, বিভিন্ন সম্প্রদায়কে আয়ত্তে রাখাতে ও অর্থনীতিকে বিপর্যস্ত করতে সন্ত্রাসী পদক্ষেপ, ইত্যাদি হুমকি মোকাবেলা করতে কার্যকরী আন্তর্জাতিক সহযোগিতা অপরিহার্য। জাতিসংঘ সুশাসন, সামাজিক সাম্য ও সর্বজনীন ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে সব ধরনের হুমকি মোকাবেলায় বিশ্বব্যাপী নিয়োজিত।

ভিয়েনাভিত্তিক জাতিসংঘের মাদক ও অপরাধ বিষয়ক দপ্তর সামাজিক কুপ্রথা নামে পরিচিত 'আন্তর্জাতিকভাবে মাদক পাচার ও এর অপব্যবহার, পরিকল্পিত অপরাধ ও আন্তর্জাতিক সন্ত্রাস'কে সমাজের সভ্যতা-বিবর্জিত ও ক্ষতিকর অংশ হিসেবে বিবেচিত এবং এগুলোর বিরুদ্ধে কাজ করে যাচ্ছে।

অপরাধ কার্যক্রম ও মাদক কার্যক্রম এই দপ্তরের অন্তর্ভুক্ত; অপরাধ কার্যক্রম সন্ত্রাস ও এর প্রতিরোধে নিয়োজিত। সংস্থাটির ২১টি মাঠ কার্যালয় রয়েছে এবং নিউইয়র্কে এর সমন্বয় কার্যালয় অবস্থিত।

মাদক নিয়ন্ত্রণ

সারা বিশ্বে বছরে ২৭.২ কোটি মানুষ অবৈধ মাদক গ্রহণ করে ও ১.৫ থেকে ১.৯ কোটি মানুষ নেশাগ্রস্ত। অর্থের অপচয়, স্বাস্থ্যের অবক্ষয় ও চিকিৎসার ব্যয় বৃদ্ধি, পরিবারিক ভাঙন এবং অধোগামী সম্প্রদায় ইত্যাদির জন্য মাদকের অপব্যবহার দায়ী। অনেক ক্ষেত্রে

ইনজেকশনের মাধ্যমে মাদক গ্রহণ এইচআইভি/এইডস ভাইরাস বিস্তার ও হেপাটাইটিসের কারণ। মাদক এবং সন্ত্রাস ও অপরাধ বৃদ্ধির মধ্যে সরাসরি ও অবিচ্ছদ্য যোগাযোগ ও সম্পর্ক বিদ্যমান। মাদক চালান ও ব্যবসায় সরকার ও বৈধ ব্যবসায়ী উভয়ের জন্য ক্ষতিকর। অবৈধ মাদক চালান ও ব্যবসায় থেকে অর্জিত অর্থ ভয়াবহ প্রাণঘাতী সংঘাতের তহবিল হিসেবে অবদান রাখে। এ ক্ষেত্রে আর্থিক ব্যয়/অপচয় প্রতুল। পুলিশ বাহিনীকে শক্তিশালী করতে, বিচারকার্যে এবং চিকিৎসা ও পুনর্বাসনে প্রচুর পরিমাণ অর্থ খরচ হয়। পথ সন্ত্রাস, দলবদ্ধ যুদ্ধ-বিবাদ ও নগর ক্ষয় এ ধরনের সামাজিক ক্ষেত্রে খরচ বেড়ে যায়।

জাতিসংঘ বিভিন্ন উপায়ে আন্তর্জাতিক মাদক সমস্যা নিয়ন্ত্রণ করছে। কমিটি অন নরকোটিক ড্রাগস নামের ইকোসক-এর একটি কার্যকরী কমিশন আন্তর্জাতিক মাদক নিয়ন্ত্রণে আন্তঃসরকারি নীতিমালা সমন্বয় করে। ৫৩টি সদস্য রাষ্ট্র নিয়ে গঠিত এই কমিশন বিশ্বে মাদকের অপব্যবহার ও পাচার সমস্যা বিশ্লেষণ করে এবং মাদক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে প্রস্তাবনা প্রণয়ন করে। এটি আন্তর্জাতিক মাদক নিয়ন্ত্রণ চুক্তিগুলোর বাস্তবায়ন এবং সাধারণ পরিষদ কর্তৃক গৃহীত সংশ্লিষ্ট নীতিমালা ও পদক্ষেপগুলো পরিবীক্ষণ করে থাকে।

ইন্টারন্যাশনাল নারকোটিকস কন্ট্রোল বোর্ড হলো একটি ১৩ সদস্যবিশিষ্ট স্বাধীন আধা-বিচারিক সংস্থা, যা আন্তর্জাতিক মাদক নিয়ন্ত্রণ চুক্তিগুলোর কার্যকারিতায় সরকারের কর্মকাণ্ড নিরীক্ষণ করে ও আনুষঙ্গিক সাহায্য-সহযোগিতা দেয়। শুধু চিকিৎসাশাস্ত্র ও বৈজ্ঞানিক কাজ ব্যতীত অবৈধ কোনো কাজে মাদকের ব্যবহার প্রতিরোধ কঠোরভাবে নিশ্চিত করতে আইএনসিবি সদা চেষ্টারত। এই বোর্ড মাদক আক্রান্ত দেশে তদন্তমূলক মিশন পাঠায় এবং কারিগরি সফরের আয়োজন করে থাকে। বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে এই সংস্থাটি মাদক নিয়ন্ত্রণ প্রশাসনের প্রশিক্ষণমূলক প্রোগ্রাম পরিচালনা করে।

চেতনানাশক ওষুধ ও মাদকদ্রব্যের উৎপাদন ও সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ, মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও এর বেআইনি বেচাকেনা রোধ এবং আন্তর্জাতিক মহলে এসব অপরাধের বিষয়ে প্রতিবেদন দেয়ার দায়িত্ব সকল সরকারের নেয়া উচিত বলে জাতিসংঘ কর্তৃপক্ষের গৃহীত চুক্তিগুলো নির্দেশ দেয়।

- সিঙ্গেল কনভেনশন অন নারকোটিক ড্রাগস-১৯৬১ মাদকের উৎপাদন, মজুত, বিতরণ, ব্যবহার ও বাণিজ্য কেবল চিকিৎসা ও বৈজ্ঞানিক উদ্দেশ্যে সীমিত করতে চায় এবং অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রগুলোকে হেরোইন জাতীয় ওষুধের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য করে। উক্ত কনভেনশনের ১৯৭২ প্রটোকল মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের ওপর গুরুত্ব দেয়।
- কনভেনশন অন সাইকোট্রপিক সাবসটেনসেস-১৯৭১ সাইকোট্রপিক উপাদানের ক্ষেত্রে একটি আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে। এটা ওষুধের বৈচিত্র্যতা ও সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে একটি বাধা হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে এবং বেশ কিছু কৃত্রিম ওষুধের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রবর্তন করেছে।
- অবৈধ চেতনানাশক ওষুধ ও সাইকোট্রপিক সাবসটেনসেস পাচারের বিরুদ্ধে জাতিসংঘ সম্মেলন-১৯৮৮ অর্থপাচার ও ওষুধের রাসায়নিক উপাদানের স্থানান্তরসহ

মাদক ব্যবসায় রোধে ব্যাপক ও সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণ করে; অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রগুলো ওষুধের চাহিদা হ্রাসের ব্যাপারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

ইউএনওডিসি সার্বিক মাদক নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে এনজিও ও সুশীল সমাজের সাথে একসঙ্গে কাজ করে মাদক প্রতিরোধ এবং ভুক্তভোগীদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসন সংশ্লিষ্ট সমাজভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনা করে; পাশাপাশি অবৈধ শস্যের ওপর নির্ভরশীল অর্থনীতিতে নতুন অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থাকল্পে জাতিসংঘের এই সংস্থাটি নেতৃত্ব প্রদান করে থাকে।

অপরাধ প্রতিরোধ

অপরাধ জনগণকে নিরাপত্তা হুমকির মুখে ঠেলে দেয় এবং দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে ক্ষতিসাধন করে। বিশ্বায়ন বহুজাতিক অপরাধের নবতর ক্ষেত্র ও ধরন সৃষ্টি করেছে; বহুজাতিক অপরাধ-চক্র মাদক ও অস্ত্র চোরাচালান থেকে অর্থ পাচার পর্যন্ত তাদের অপারেশন বিস্তৃত করেছে, চোরাচালানকারীরা প্রতি বছর লক্ষাধিক অবৈধ অভিবাসী পাচার করে কোটি কোটি মুনাফা অর্জন করে। দুর্নীতিমুক্ত একটি দেশের থেকে দুর্নীতিতে জর্জরিত একটি দেশের বিনিয়োগ আকর্ষণ করার সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত কম থাকে, ঠিক তেমনি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে ক্ষতির সম্ভাবনা অধিক।

অপরাধ প্রতিরোধ এবং ফৌজদারি বিচার কমিশন, চল্লিশটি রাষ্ট্রের সমন্বয়ে গঠিত এবং এটি ইকোসকের একটি কার্যকরী অংশ। এটি অপরাধ প্রতিরোধে এবং ফৌজদারি বিচারে আন্তর্জাতিক নীতির প্রচলন এবং বিভিন্ন কার্যক্রম সমন্বয় করে। ইউএনওডিসি কমিশনের নির্ধারিত ম্যান্ডেটগুলো বাস্তবায়ন করে এবং এটি অপরাধ প্রতিরোধ, ফৌজদারি বিচার ও আইন সংশোধনের জন্য দায়বদ্ধ। এটি সংঘবদ্ধ বহুজাতিক অপরাধ, দুর্নীতি, সন্ত্রাসবাদ এবং মানব পাচার প্রতিরোধে বিশেষ নজর দেয়। ইউএনওডিসির কর্মকৌশল আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও তৎসংলগ্ন প্রচেষ্টায় সহায়তা দানের ওপর নির্ভরশীল। এটি সততা ও আইনভিত্তিক একটি সংস্কৃতি তৈরি করে এবং অপরাধ ও দুর্নীতি প্রতিরোধে সুশীল সমাজের অংশগ্রহণে উৎসাহিত করে।

ইউএনওডিসি বিশ্বব্যাপী অপরাধ প্রতিরোধ সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক আইনি বাধ্যবাধকতা সমর্থন করে, যার মধ্যে ২০০৩ সালে গৃহীত 'বহুজাতিক সংগঠিত অপরাধ নির্মূলে জাতিসংঘ কনভেনশন' ও এর তিনটি প্রটোকল এবং ২০০৫ সালে গৃহীত 'দুর্নীতির বিরুদ্ধে জাতিসংঘ কনভেনশন' অন্যতম।

এটি কনভেনশনগুলোকে কার্যকর করতে রাষ্ট্রকে সাহায্য করে। ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থা আধুনিকায়ন ও শক্তিশালী করার জন্য এই কার্যালয় প্রযুক্তিগত সহযোগিতার মাধ্যমে সরকারের সক্ষমতা বৃদ্ধি করে। এর সংঘবদ্ধ অপরাধ বিরোধী ও আইন প্রয়োগ ইউনিট দুর্নীতি ও সংগঠিত অপরাধ মোকাবেলায় দুর্নীতির বিরুদ্ধে কনভেনশনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ কার্যকর ও বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ গ্রহণে রাষ্ট্রকে সাহায্য করে।

মানবিক ও কার্যকর বিচার ব্যবস্থার মৌলিক স্তম্ভ হিসেবে ইউএনওডিসি অপরাধ নিবারণ ও ফৌজদারি বিচারের ক্ষেত্রে জাতিসংঘের মান এবং নিয়মাবলি প্রয়োগে সদা অগ্রসরমান, যা জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক অপরাধ মোকাবেলায় অপরিহার্য। একশ'টিরও বেশি দেশ জাতীয় আইন ও নীতির সম্প্রসারণের জন্য এই মানের ওপর ভরসা করে

থাকে। ইউএনওডিসি সন্ত্রাসবাদের বিষয়াদির ক্ষেত্রে অপরাধ ও ন্যায়বিচার সংশ্লিষ্ট নব্য প্রবণতা বিশ্লেষণ করে, ডাটাবেস প্রস্তুত করে, তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও প্রচার করে, বিশ্বব্যাপী সমস্যার ওপর জরিপ করে, সংশ্লিষ্ট দেশের চাহিদা নিরূপণ করে ও আগাম সতর্কতামূলক পদক্ষেপ নেয়।

২০০৩ সালে ইউএনওডিসি সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে আইনি শাসন শক্তিশালী করতে ও সর্বজনীন সন্ত্রাসবিরোধী কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট দেশে কারিগরি সহায়তা প্রসারিত করে।

ইউএনওডিসি ২০০৫ সালে জাতিসংঘ মহাসচিব দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সন্ত্রাসবিরোধী কার্যক্রম বাস্তবায়ন টাস্কফোর্সকেও সহযোগিতা করে। এটি জাতিসংঘের সন্ত্রাসবিরোধী কর্মকাণ্ডকে সমন্বয় ও সংহত করে। এই টাস্কফোর্সের কার্যকরী দলগুলো ৩১টি আন্তর্জাতিক সত্তা দ্বারা গঠিত, যাদের ভাগ্য সফল সন্ত্রাসবিরোধী পদক্ষেপের সাথে জড়িত। টাস্কফোর্সটি বিশ্বশান্তি ও জননিরাপত্তার প্রয়োজনে নিম্নলিখিত কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত :

- দ্বন্দ্ব প্রতিরোধ ও মীমাংসা
- সন্ত্রাসবাদের শিকারদের সহায়তা
- গণবিধ্বংসী সন্ত্রাসী হামলা প্রতিরোধ ও মোকাবেলা
- সন্ত্রাসবাদের অর্থায়ন সামাল দেয়া
- সন্ত্রাসী কাজের জন্য ইন্টারনেট ব্যবহার প্রতিহত করা
- অরক্ষিত এলাকার/অবস্থার সুরক্ষা শক্তিশালী করা এবং
- মানবাধিকার রক্ষায় সন্ত্রাসবাদ প্রতিহত করা।

অর্থ পাচারের বিরুদ্ধে বৈশ্বিক কর্মসূচি অপরাধীদের আন্তর্জাতিক আর্থিক ব্যবস্থায় অপরাধ-অর্জিত অর্থ সুরক্ষায় সরকারকে সহায়তা দেয়। এই কর্মসূচিটি আন্তর্জাতিক অর্থ পাচারবিরোধী সংগঠনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার মাধ্যমে সরকার, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও আর্থিক গোয়েন্দা ইউনিটকে মানি লন্ডারিং-বিরোধী স্কিম প্রদান করে; উন্নত ব্যাংকিং ও আর্থিক নীতির ওপর উপদেশ দেয় এবং জাতীয় আর্থিক তদন্তে সাহায্য করে।

২০০৭ সালে ইউএনওডিসি মানব পাচার অপরাধের বিরুদ্ধে ও মানব পাচার রোধে বিশ্বব্যাপী আন্দোলনের লক্ষ্যে Global Initiative To Fight Human Trafficking কর্মসূচিটি শুরু করে।

জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক অপরাধ ও বিচার গবেষণা ইনস্টিটিউট, একটি আন্তর্জাতিক গবেষণা সংস্থা যেটি ইউএনওডিসি অপরাধ কর্মসূচির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে এবং অপরাধ প্রতিরোধে, অপরাধীদের দমনে ও উপযুক্ত নীতি প্রণয়নে গবেষণা উৎসাহিত করে। সাধারণ পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, অপরাধ প্রতিরোধে ও অপরাধী দমনে বিদ্যমান নীতি বিনিময় ও অপরাধের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের অগ্রগতি বেগবান করতে একটি ফোরাম হিসেবে প্রতি পাঁচ বছর অন্তর জাতিসংঘের কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কংগ্রেসে অপরাধ বিজ্ঞানী, দণ্ড বিজ্ঞানী ও সিনিয়র পুলিশ কর্মকর্তাদের পাশাপাশি ফৌজদারি আইন, মানবাধিকার ও পুনর্বাসন-সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞরা অংশগ্রহণ করেন।

১২তম অপরাধ কংগ্রেস ব্রাজিলের সালভাদরে অনুষ্ঠিত হয়, যার প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল 'বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সমন্বিত অপরাধ প্রতিরোধ ও ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থা এবং পরিবর্তনশীল বিশ্বে এটার গতিধারা ও প্রভাব'।

বিজ্ঞান, সংস্কৃতি এবং যোগাযোগ

জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক শান্তি ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক ও বৈজ্ঞানিক আলোচনা ও আদানপ্রদানের পাশাপাশি যোগাযোগকেও গুরুত্বপূর্ণ মনে করে। জাতিসংঘের একাধিক অঙ্গ-প্রতিষ্ঠান এসব ক্ষেত্রে জড়িত ও কর্মরত। এ ক্ষেত্রে ইউনেস্কো শিক্ষা সংক্রান্ত মুখ্য বিষয় ছাড়াও বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি নিয়ে কাজ করে থাকে, যা জ্ঞানের অগ্রগতি, বিতরণ ও বিস্তারে সহায়ক।

প্রাকৃতিক, সামাজিক এবং মানবিক বিজ্ঞান

প্রকৃতি বিজ্ঞান-সংশ্লিষ্ট ইউনেস্কো-এর বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও আন্তঃসরকারি কার্যক্রমগুলো নিম্নরূপ : মানুষ ও জীবমণ্ডল সংক্রান্ত কার্যক্রম, আন্তঃসরকারি সমুদ্রবিজ্ঞান কমিশন, সামাজিক পরিবর্তন ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম, আন্তর্জাতিক পানিবিদ্যা কার্যক্রম, আন্তর্জাতিক মৌলিকবিজ্ঞান কার্যক্রম ও আন্তর্জাতিক ভূতত্ত্ববিদ্যা।

বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ও বিভিন্ন সক্ষমতা বাড়ানোর উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে ইউনেস্কো দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়নে উন্নয়নশীল দেশগুলোর বৈজ্ঞানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতেও সহযোগিতা করছে।

১৯৯৭ সালে 'ইউনিভার্সাল ডিক্লারেশন অন দ্য হিউম্যান জিনোম অ্যান্ড হিউম্যান রাইটস' প্রকাশিত হয়, যা জীবনবিদ্যার গবেষণায় মূল্যবোধ সম্পর্কিত লেখা প্রথম আন্তর্জাতিক পুস্তক। এরই ফলশ্রুতিতে ২০০৩ সালে ইউনেস্কোর সাধারণ সম্মেলনে দ্য 'ইন্টারন্যাশনাল ডিক্লারেশন অন দ্য হিউম্যান জিনোম ডাটা' এবং ২০০৫ সালে 'দ্য ইউনিভার্সাল ডিক্লারেশন অন বায়োএথিকস অ্যান্ড হিউম্যান রাইটস' গৃহীত হয়।

সর্বজনীন মূল্যবোধ-সংশ্লিষ্ট ন্যায়বিচার, স্বাধীনতা ও মানবিক মর্যাদার সহায়ক সামাজিক রূপান্তরের উদ্দেশ্যে ইউনেস্কো সর্বদা চেষ্টারত এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির নীতিশাস্ত্র সংবলিত দর্শন এবং সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা, মানবাধিকার ও গণতন্ত্র শিক্ষাদান ও প্রচার, এইচআইভি/এইডসের সাথে সম্পর্কিত সব ধরনের বৈষম্য বিরোধিতা এবং নারীর অবস্থার উন্নতি, প্রভৃতি বিষয়ে গুরুত্ব দেয়। সামাজিক রূপান্তর ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত আন্তঃসরকার কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে ইউনেস্কো উল্লিখিত বিষয়ে অবদান রাখে। ২০০৫ সালে ইউনেস্কোর সাধারণ সম্মেলনে খেলা ডোপিং-এর বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক কনভেনশন গৃহীত হয়, যা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, উন্নয়ন ও শান্তি প্রচার করার জন্য খেলায় ডোপিং বর্জন কামনা করে।

সংস্কৃতি এবং উন্নয়ন

ইউনেস্কোর সাংস্কৃতিক কার্যক্রমগুলো হলো : টেকসই উন্নয়ন এবং সামাজিক সংহতি প্রসারে বাস্তব ও অধরা ঐতিহ্যের প্রচার করা, সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তির বৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও সাংস্কৃতিক সংলাপ আয়োজন করা, শান্তির সংস্কৃতি ধারণ করা, এবং সংস্কৃতির ধারায় সংঘাত-পরবর্তী ও দুর্যোগ-পরবর্তী দেশের পুনর্গঠন করা। ২০০৩ সালে ইউনেস্কো সাধারণ সম্মেলন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ধ্বংস ও অপমানের পরিপ্রেক্ষিতে 'ইউনেস্কো ডিক্লেয়ারেশন' গ্রহণ করে, যা ছিল মূলত ২০০১ সালে আফগানিস্তানের বামিয়ানের বৌদ্ধদের বিয়োগান্ত মৃত্যুর প্রতিক্রিয়া। ২০০৩ সালের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষার জন্য যে কনভেনশনটি হয়েছিল তা মৌখিক ঐতিহ্য, আচার, ভাষা, পারফর্মিং আর্ট, সামাজিক

চর্চা, ধর্মানুষ্ঠান, বিভিন্ন অনুষ্ঠান, ঐতিহ্যবাহী জ্ঞান, ঐতিহ্যবাহী কারুশিল্প, বিপন্ন ভাষা এবং ভাষাগত বৈচিত্র্যের প্রচার প্রভৃতি বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেছে।

২০০৫ সালের Convention on The Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions সাংস্কৃতিক পণ্য ও সেবাকে পরিচিতি ও মূল্যবোধের স্বরূপ হিসেবে স্বীকৃতি দেয় এবং এদের সৃষ্টি, উৎপাদন, বিতরণ ও আনন্দদায়ক উপাদান সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোকে জোরদার করতে চায়, বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশের সংশ্লিষ্ট শিল্পকে উৎসাহ ও সমর্থন দিয়ে থাকে।

সভ্যতার জোট

২০০৫ সালে মহাসচিব কফি আনান সভ্যতার জোট (Alliance of Civilizations)– ইউএনএওসি চালু করেছিলেন, যার উদ্দেশ্য ছিল ধর্মীয় বিশ্বাস ও ঐতিহ্যের জন্য পারস্পরিক শ্রদ্ধা উৎসাহিত করা এবং সর্বক্ষেত্রে মানবতার ক্রমবর্ধমান পারস্পরিক নির্ভরশীলতা অলঙ্ঘনীয় ও অপরিহার্য মনে করা। ইউএনএওসি জোটের প্রাথমিক মিশন হলো বিভিন্ন দেশ, জাতি ও সম্প্রদায়ের মধ্যে বহুপক্ষীয় সাংস্কৃতিক সমঝোতা ও সহযোগিতা প্রসারে যৌথ রাজনৈতিক সদিচ্ছা গড়া ও সমন্বিত কাজকর্মের উদ্যোগ নিশ্চিত করা। ইউএনএওসি পশ্চিমা ও মুসলিম সমাজের নিজেদের মধ্যে ও একে অপরের মধ্যে সম্পর্ক জোরদার করে এবং চলমান আশঙ্কা ও বিভাজনের ওপর নজর রাখে। জাতিসংঘের মহাসচিব উক্ত জোটের জন্য উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। ইউএনএওসি প্রধানত চারটি ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে : শিক্ষা, তারুণ্য, গণমাধ্যম ও অভিবাসন। ২০১৩ সালে জোটের পঞ্চম বিশ্ব ফোরাম ভিয়েনায় অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে 'বৈচিত্র্য ও সংলাপের ক্ষেত্রে দায়িত্বপূর্ণ নেতৃত্ব' 'রেসপনসিবল লিডারশিপ ইন ডাইভার্সিটি অ্যান্ড ডায়লগ'-এর ওপর মনোযোগ নিবদ্ধ করা হয়।

শান্তি ও উন্নয়নের উদ্দেশ্যে খেলাধুলা

জেনেভাভিত্তিক উন্নয়ন ও শান্তির জন্য জাতিসংঘের খেলাধুলা অফিস (ইউএনওএসডিপি) জাতিসংঘ মহাসচিবের বিশেষ উপদেষ্টা খেলাধুলা ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে সহায়তা করে এবং বিশেষ উপদেষ্টা খেলাধুলা চর্চা ও ক্রীড়াঙ্গন সংশ্লিষ্টতার সামাজিক উদ্দেশ্য ও প্রভাবের একজন একনিষ্ঠ প্রবক্তা, ফ্যাসিলিটেটর ও প্রতিনিধি হিসেবেও দায়িত্বপ্রাপ্ত। এই অফিস ক্রীড়া সংগঠন, ক্রীড়াবিদ, সুশীল সমাজ ও বেসরকারি খাতকে একত্রে শামিল করে খেলাধুলা ও উন্নয়ন উভয়কেই কাছাকাছি এনেছে। ইউএনওএসডিপি সংলাপ, জ্ঞান বিনিময় ও অংশীদারিত্ব প্রভৃতির মাধ্যমে সকল আগ্রহী স্টকহোল্ডারের মধ্যে ক্রস-কাটিং ও আন্তঃবিষয়ক আলাপ-আলোচনা ও মত-বিনিময় সংশ্লিষ্ট সকলকে শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যের জন্য খেলাধুলাকে একটি হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে উৎসাহিত করে। এছাড়াও ইউএনওএসডিপি অফিস ও বিশেষ উপদেষ্টা উন্নয়ন ও শান্তির অগ্রযাত্রায় শারীরিক কসরতের ব্যবহার সংক্রান্ত সচেতনতা বাড়াতে কাজ করে যায়; ঠিক যেমন, সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার মাধ্যমে লিঙ্গ সমতার প্রচার এবং এইচআইভি/এইডসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। ফিফা বিশ্বকাপ ও অলিম্পিক খেলাধুলা প্রভৃতি প্রধান বৈশ্বিক ক্রীড়া অনুষ্ঠানের সময় ইউএনওএসডিপি জাতিসংঘ সম্পর্কিত সমন্বয় এবং উপস্থাপনাকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে।

যোগাযোগ এবং তথ্য

ইউনেস্কো সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী; বহুত্ববাদী ও স্বাধীন মিডিয়ার অগ্রযাত্রায় প্রাধান্য দেয়। ধারণা ও মতামতের অবাধ প্রবাহের পক্ষে ইউনেস্কোর অবস্থান, বিশেষত উন্নয়নশীল দেশগুলোর যোগাযোগের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং তথ্য ও জ্ঞানের প্রাপ্তি ও চর্চার বিষয়ে তাদের আগ্রহ বাড়াতে এটি সহায়ক ভূমিকা রাখে। সংস্থাটি সদস্য রাষ্ট্রগুলোকে তাদের মিডিয়া আইনের গণতন্ত্রায়নে সহায়তা করে এবং সরকারি ও বেসরকারি মিডিয়াকে সম্পাদকীয় স্বাধীনতায় উৎসাহিত করে। যখন কোন দেশে প্রেস স্বাধীনতা লঙ্ঘিত হয় তখন ইউনেস্কোর মহাপরিচালক কূটনৈতিক চ্যানেল বা প্রকাশ্য বিবৃতির মাধ্যমে প্রতিবাদ জানান। ইউনেস্কোর উদ্যোগে প্রতি বছর ৩ মে 'ওয়ার্ল্ড প্রেস ফ্রিডম ডে' পালিত হয়। মানবকেন্দ্রিক, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও উন্নয়ন-বান্ধব তথ্য সমাজ বিনির্মাণে ও এর প্রসারে আইটিইউর উদ্যোগে প্রতি বছর ১৭ মে বিশ্ব টেলিযোগাযোগ ও তথ্য সোসাইটি দিবস পালিত হয়।

উন্নয়নশীল দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা ও মানবসম্পদ শক্তিশালী করার লক্ষ্যে ইউনেস্কো প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তিগত দক্ষতা প্রদান করে এবং জাতীয় ও আঞ্চলিক মিডিয়া প্রজেক্ট উন্নয়নে সাহায্য দিয়ে থাকে; বিশেষভাবে এর যোগাযোগ উন্নয়নের জন্য আন্তর্জাতিক প্রোগ্রাম গ্রহণের মাধ্যমে।

ইন্টারনেট গভর্ন্যান্স ফোরাম ইন্টারনেট গভর্ন্যান্স বিষয়াদি সম্বন্ধে আলোচনা করার জন্য সরকার, প্রাইভেট সেক্টর, এনজিও এবং প্রযুক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক সম্প্রদায়কে একত্রিত করে।

টেকসই উন্নয়ন

জাতিসংঘের প্রারম্ভিক দশকগুলোর আন্তর্জাতিক আলোচ্যসূচিতে পরিবেশ সংক্রান্ত কোনো বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকতে দেখা যায়নি। সংঘের নিজস্ব কর্মসূচিগুলো প্রাকৃতিক সম্পদের আহরণ ও ব্যবহারের ওপর বেশি গুরুত্ব দিতো এবং একই সাথে নিশ্চিত করতো যে উন্নয়নশীল দেশগুলো তাদের সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারে। ১৯৬০ দশকে সামুদ্রিক দূষণের ওপর নজর থাকায় তেল দূষণের ওপর চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। তখন থেকেই অতিরিক্ত মাত্রায় পরিবেশ দূষণের বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়; আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় পরিবেশ রক্ষায় তাদের উদ্বেগ এবং প্রতিবেশ ও মানব উন্নয়নের ওপর পরিবেশ দূষণের নেতিবাচক প্রভাব বিষয়ে তাদের আশঙ্কা প্রকাশ করে। জাতিসংঘ পরিবেশ সংরক্ষণে প্রধান পৃষ্ঠপোষক এবং টেকসই উন্নয়নের এক শক্তিশালী প্রবক্তা।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও পরিবেশের অবনতির মধ্যে সম্পর্ক ১৯৭২ সালে সুইডেনের স্টকহোমে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের মানব পরিবেশ সংক্রান্ত সম্মেলনে প্রথমবারের মতো কোনো আন্তর্জাতিক আলোচ্যসূচিতে স্থান পায়। সম্মেলনের পর পৃথিবীর অন্যতম প্রধান পরিবেশ পৃষ্ঠপোষক জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি প্রতিষ্ঠিত হয়।

পশ্চিম আফ্রিকার মেরুকরণ প্রক্রিয়া প্রতিরোধে ১৯৭৩ সালে সুদানো-সাহেলিয়ান অফিস, বর্তমানে ইউএনডিপি-এর ড্রাইল্যান্ড উন্নয়ন সেন্টার প্রতিষ্ঠিত হয়। সেন্টারটি পরবর্তীকালে বৈশ্বিকভাবে পরিচিতি পায় ও বিশদ আকারের কার্যক্রম হাতে নেয়। ১৯৯৬ সালে সেন্টারটি 'আফ্রিকাসহ খরা এবং/অথবা মেরুকরণ আক্রান্ত দেশগুলোতে

মেরুকরণ প্রতিরোধ সংক্রান্ত জাতিসংঘ কনভেনশন'-এ যুক্ত হওয়ায় সেন্টারটির কর্মকাণ্ড আরও গতি পায়।

ওজোন স্তরের সুরক্ষা এবং ক্ষতিকর বর্জ্য কমানোর জন্য জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রগুলো চুক্তি গ্রহণ করে। তাছাড়া আরো অনেক পরিবেশ বিষয়ক ইস্যু ১৯৮০-র দশকের যুগান্তকারী আলোচনায় স্থান পায়। ১৯৮৩ সালে সাধারণ পরিষদ কর্তৃক গৃহীত 'পরিবেশ উন্নয়ন বিষয়ক বিশ্ব কমিশন' পরিবেশের সম্পদগুলোকে রক্ষার পাশাপাশি এক নতুন ধারণার জন্ম দেয়, যা বর্তমান ও আগামী প্রজন্মের অর্থনৈতিক সচ্ছলতার জন্য একটি জরুরি ও বলিষ্ঠ উন্নয়ন-উপাদান ছিল। সাধারণ পরিষদে উপস্থাপিত ১৯৮৭ সালের কমিশনের রিপোর্ট টেকসই উন্নয়নকে নিরবচ্ছিন্ন অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি বিকল্প হিসেবে তুলে ধরে। রিপোর্টটি বিবেচনার পর সাধারণ পরিষদ ১৯৯২ সালে ব্রাজিলের রিও ডি জেনিরোতে পরিবেশ ও উন্নয়ন বিষয়ক ধরিত্রী সম্মেলনের ডাক দেয়। ১৯৯২ সালে অনুষ্ঠিত সুযোগ, পরিধি, কলেবর ও প্রভাবে অভূতপূর্ব এই ধরিত্রী সম্মেলনে টেকসই উন্নয়নের সাথে মানবাধিকার, জনগণ, সামাজিক উন্নয়ন ও মানব বসতিকে অবিচ্ছেদ্য বিবেচনা করা হয়।

পরিবেশকে রক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কিত সচেতনতা বর্তমানে জাতিসংঘের সকল কর্মকাণ্ডে প্রতিফলিত। জাতিসংঘ এবং বিভিন্ন দেশের সরকার, এনজিও, বৈজ্ঞানিক সংস্থা ও প্রাইভেট সেক্টরের মধ্যে সম্পর্ক তথ্য ও পরিবেশ সংশ্লিষ্ট সমস্যার নতুন সমাধান এনে দিচ্ছে। জাতিসংঘের মতে, পরিবেশ সুরক্ষার সাথে অর্থনৈতিক এবং সামাজিক উন্নয়ন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। টেকসই উন্নয়ন অর্জনের জন্য অর্থনৈতিক, পরিবেশগত এবং সামাজিকভাবে সম্মিলিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন।

এজেন্ডা-২১

ধরিত্রী সম্মেলনে এজেন্ডা-২১ অবলম্বনের মাধ্যমে সারা বিশ্বের সরকারগুলো এ গ্রহের ভবিষ্যৎ সংরক্ষণ ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ২০০২ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গে অনুষ্ঠিত হওয়া টেকসই উন্নয়নের ওপর বিশ্ব সম্মেলনে এর বাস্তবায়ন এবং সংশ্লিষ্ট কর্মসূচি পুনরায় সুনিশ্চিত করা হয়। সরকারগুলো এজেন্ডা-২১-এ কিছু পদক্ষেপ চিহ্নিত করে যেগুলোর ওপর বৃদ্ধি ও উন্নয়ন নির্ভর করে এবং যা পরিবেশের সম্পদ সংরক্ষণ ও নবায়ন করবে। কার্য পদক্ষেপগুলোর মধ্যে বায়ুমণ্ডল রক্ষা, বনায়ন, মাটি ও পানির দূষণ রোধ, মাছের সহজলভ্যতা এবং বিষাক্ত বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য সচেতনতা অন্যতম।

এজেন্ডা-২১-এ উন্নয়নের ধরনগুলোও উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলো পরিবেশে বিরূপ প্রভাব ফেলে। এটি উন্নয়নশীল দেশের দারিদ্র্য, বৈদেশিক ঋণ ও উৎপাদনে বিরূপ প্রভাব ফেলা বিষয়গুলোর উন্নয়ন কার্যক্রম নিয়েও আলোচনা করে। কর্মসূচিতে মূল দলগুলোর কাজ শক্তিশালী করার জন্য নারী, বাণিজ্য ইউনিয়ন, কৃষক, শিশু, তরুণ, আদিবাসী, বৈজ্ঞানিক দল, আঞ্চলিক কর্তৃপক্ষ, শিল্প এবং এনজিওর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা তুলে ধরা হয়েছে।

টেকসই উন্নয়নকে সম্মিলিত করার জন্য জাতিসংঘ সংশ্লিষ্ট সকল নীতি ও কার্যক্রমে কাজ করেছে। আয় বর্ধনমূলক প্রকল্পগুলোই মূলত পরিবেশের ক্ষতিসাধন করে।

খাদ্যপণ্য ও সেবার উৎপাদক হিসেবে এবং পরিবেশের রক্ষণাবেক্ষণকারী হিসেবে নারীর ভূমিকাকে মাথায় রেখে বর্তমানে নারীদের অন্য যে কোনো সময়ের চেয়ে বেশি উন্নয়ন সহায়তা প্রোগ্রামে যুক্ত করা হয়। দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং পরিবেশের মানকে সমান গুরুত্ব দেয়ার মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণে নৈতিক এবং সামাজিক দায়বদ্ধতাকে জরুরিভাবে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

এজেন্ডা-২১-এর পৃষ্ঠপোষকতা নিশ্চিত করার জন্য ১৯৯২ সালে সাধারণ পরিষদ টেকসই উন্নয়ন কমিশন গঠন করে। ইকোসক ৫৩ সদস্য নিয়ে গঠিত একটি কমিশন যা এজেন্ডা-২১ বাস্তবায়ন ও তত্ত্বাবধায়ন করে এবং ধরিত্রী সম্মেলনসহ ২০০২ সালের টেকসই উন্নয়নের ওপর বিশ্ব সম্মেলনের ফলাফল নজরে রাখে। এটি টেকসই উন্নয়নের সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলো নিয়েও আলোচনা করে যেমন দারিদ্র্য দূরীকরণ, উৎপাদন এবং এর কাঠামো পরিবর্তন, প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষা ও ব্যবস্থাপনা, বৈশ্বিক উষ্ণায়ন, সামাজিক উন্নয়ন। কমিশনের সচিবালয় জাতিসংঘের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক বিষয়াবলি বিভাগকে টেকসই উন্নয়নের জন্য কাঠামোগত এবং তথ্যগত সেবা প্রদানের মাধ্যমে সাহায্য করে।

টেকসই উন্নয়ন বিষয়ক বিশ্ব সম্মেলন

১৯৯২ সালের ধরিত্রী সম্মেলনের পর থেকে নতুন প্রাপ্তি, নতুন চ্যালেঞ্জ এবং নতুন বিষয়ের সমন্বয়ে ২০০২ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গে বিশ্ব টেকসই উন্নয়ন সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সদস্য রাষ্ট্রগুলো টেকসই উন্নয়ন এবং গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো সম্পাদনের কর্মপরিকল্পনার সাথে একমত পোষণ করে। 'টেকসই উন্নয়ন মূলত আন্তর্জাতিক বিষয়সূচির কেন্দ্রীয় উপাদান'—সম্মেলনে এই বিষয়টিকে উপযুক্ত প্রাধান্য দেয়া হয়। সমাধানের পথ চিহ্নিত করে এখানে পৃথিবীর গুরুত্বপূর্ণ কিছু চ্যালেঞ্জ তুলে ধরা হয়, যেখানে সম্পদের সংরক্ষণ এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সম্পর্কের ওপর আলোকপাত করা হয়। টেকসই উন্নয়নের জন্য স্বেচ্ছায় গঠিত হওয়া কিছু যৌথ উদ্যোগ আন্তর্জাতিক অঙ্গীকারের অসঙ্গতি দূর করে।

টেকসই উন্নয়ন বিষয়ক জাতিসংঘ সম্মেলন

জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন সম্মেলন অথবা রিও+২০ ২০১২ সালের জুন মাসে ব্রাজিলের রিও ডি জেনিরোতে অনুষ্ঠিত হয়। এটি ছিল রিও ডি জেনিরোতেই অনুষ্ঠিত ১৯৯২ সালের ধরিত্রী সম্মেলনের ২০ বছর পূর্তি এবং জোহানেসবার্গে অনুষ্ঠিত ২০০২ সালের বিশ্ব ধরিত্রী সম্মেলনের ১০ বছর পূর্তি। সম্মেলনটির প্রতিপাদ্য ছিল, 'আমরা যে ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখি', যার মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন কার্যক্রমগুলো বাস্তবায়নের ফলাফল আলোচনা করা হয়েছিল। সদস্য রাষ্ট্রগুলো টেকসই উন্নয়ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পদক্ষেপ হাতে নেয় যা সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা এবং ২০১৫-পরবর্তী উন্নয়নসূচির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হবে। সম্মেলনটি সবুজ অর্থনীতির জন্য সাধারণ সমাবেশের অধীনে একটি আন্তঃসরকার কার্যধারা বাস্তবায়ন করে, যা টেকসই উন্নয়নের আর্থিক নীতিমালা তৈরি করবে। বিভিন্ন দেশের সরকার ইউএনডিপিকে বিভিন্নভাবে আরও শক্তিশালী করার জন্য একমত হয় এবং টেকসই উন্নয়নের জন্য একটি উচ্চ

পর্যায়ের ফোরাম প্রতিষ্ঠা করার বিষয়েও তারা একমত পোষণ করে। তারা ১০ বছরের জন্য টেকসই ব্যয় ও উৎপাদন পদ্ধতির একটি কাঠামো গ্রহণ করে। রিও+২০ সম্মেলনের ফলস্বরূপ টেকসই উন্নয়ন বাস্তবায়নের জন্য ৭০০ স্বেচ্ছা-অঙ্গীকার পাওয়া যায়, যা টেকসই উন্নয়ন বাস্তবায়নে নতুন মাত্রা আনে। টেকসই উন্নয়নের জন্য নিবন্ধনকৃত যৌথ উদ্যোগের সংখ্যা ছিল দুইশ'র অধিক।

টেকসই উন্নয়নে অর্থায়ন

১৯৯২ সালের সম্মেলনে এই বিষয়ে ঐকমত্য হয়েছিল যে, এজেন্ডা-২১-এর জন্য বেশিরভাগ অর্থায়ন প্রত্যকে দেশের পাবলিক এবং প্রাইভেট সেক্টর থেকে আসবে। কিন্তু উন্নয়নশীল দেশগুলোর পরিবেশ রক্ষা তথা টেকসই উন্নয়নের অনুশীলন বাস্তবায়নের প্রচেষ্টাকে সহায়তা করার জন্য বাড়তি অর্থায়নের প্রয়োজন অনুভব করা গিয়েছিল।

বিশ্ব পরিবেশ কাঠামো (GEF) ১৯৯১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়, যা উন্নয়নশীল দেশগুলোর স্থানীয় সম্প্রদায়গুলোকে বৈশ্বিক পরিবেশ রক্ষা এবং টেকসই জীবনযাপনের সাথে পরিচিত হতে সাহায্য করে। বিগত বছরগুলোতে এটি গ্রাহক সরকার, আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা, প্রাইভেট ইন্ডাস্ট্রি এবং এনজিওর সহ-অর্থায়নে ১৬৫টি উন্নয়নশীল দেশে ৩২১৫টি প্রকল্পের জন্য ১১.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারেরও বেশি অর্থের জোগান দিয়েছে এবং ৫৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলারেরও বেশি অর্থমূল্যের বিনিয়োগ নিশ্চিত করেছে।

জিইএফ-এর অর্থায়ন জীববৈচিত্র্য, জলবায়ু পরিবর্তন, মরুকরণ এবং স্থায়ী জৈব দূষণ সংক্রান্ত নীতির লক্ষ্য অর্জনের জন্য অর্থের মূল উৎস। ইউএনডিপি, ইউনেপ এবং বিশ্বব্যাংক দ্বারা বাস্তবায়িত জিইএফ প্রকল্পগুলো এই লক্ষ্যগুলোর সমান্তরালে জীববৈচিত্র্যের সংরক্ষণ এবং টেকসই ব্যবহার, বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের সমস্যা নিরসন, আন্তর্জাতিক জলসীমার অবনতি রোধ, ওজোন স্তর ধ্বংসে দায়ী পদার্থ চিহ্নিতকরণ, মাটির ক্ষয় ও খরা রোধ এবং কতিপয় স্থায়ী জৈব দূষকের উৎপাদন ও ব্যবহার হ্রাস ও বিলুপ্তির লক্ষ্যে কাজ করে।

নিম্নোক্ত সংস্থাগুলোও জিইএফ প্রকল্পগুলোর ব্যবস্থাপনা ও বাস্তবায়নে অংশগ্রহণ করে : আফ্রিকান উন্নয়ন ব্যাংক, এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংক, ইউরোপীয় পুনর্নির্মাণ ও উন্নয়ন ব্যাংক, জাতিসংঘ খাদ্য সংস্থা, আন্ত-আমেরিকান পুনর্গঠন ব্যাংক, কৃষি উন্নয়নবিষয়ক আন্তর্জাতিক তহবিল এবং জাতিসংঘ শিল্প উন্নয়ন সংস্থা।

পরিবেশের জন্য উদ্যোগ

জাতিসংঘের সমস্ত কর্মপদ্ধতিই বিচিত্রভাবে পরিবেশ সংরক্ষণের সাথে জড়িত। এ ক্ষেত্রে এর প্রধান সংস্থা হলো জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি–ইউনেপ। ইউনেপ পৃথিবীর পরিবেশকে পরীক্ষা করে ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সম্পর্কিত বিষয়গুলোকে চিহ্নিত করে আন্তর্জাতিক পরিবেশ আইন কার্যকরে সাহায্য করে এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক ও জাতিসংঘের বিভিন্ন কার্যক্রমে পরিবেশ দূষণের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে নেয়। একটি দেশ এককভাবে যে সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ হয় সেগুলোতে ইউনেপ সাহায্য করে। আন্তর্জাতিক চুক্তি এবং শুমারি করার জন্য এটি একটি ফোরামের ব্যবস্থা করে। এভাবে এটি ব্যবসায় এবং শিল্পের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির জন্য কাজ করে যায়। ইউনেপ-এর ছয়টি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো :

জলবায়ু পরিবর্তন, দুর্যোগ ও দ্বন্দ্ব-বিবাদ, বাস্তুসংস্থান ব্যবস্থাপনা, পরিবেশ ব্যবস্থাপনা এবং সম্পদ-সংশ্লিষ্ট দক্ষতা।

ইউনেপ-এর কেমিক্যাল বিভাগের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলোকে বিষাক্ত কেমিক্যালের তথ্য সরবরাহ করে, তাদের সামর্থ্যের মধ্যে কেমিক্যাল প্রস্তুত, ব্যবহার এবং নিরাপদে ধ্বংস করতে সাহায্য করে। রাসায়নিক ঝুঁকি না কমিয়ে বরং বিলুপ্ত করতে এটি আন্তর্জাতিক কিংবা আঞ্চলিক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডকে সহায়তা করে। ২০০১ সালে ইউনেপ স্থায়ী জৈব দূষক বিষয়ে স্টকহোম সম্মেলন সমাপ্ত করে। এ সম্মেলনের চুক্তি অনুযায়ী দীর্ঘ সময়ে পরিবেশে অবস্থান করে দূষণ ঘটায়, ছড়িয়ে পড়ে এবং বন্যজীবনে প্রভাব ফেলে এমন দূষণের নির্গমন রোধের ওপর সকল দেশ কাজ করবে। এসব দূষণের মধ্যে রয়েছে কীটনাশক, শিল্প বর্জ্য এবং উপজাত দ্রব্য ইত্যাদি।

বিগত বছরগুলোতে পৃথিবীর ক্ষতিরোধে জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ এবং আলোচনার প্রভাবক হিসেবে কাজ করেছে ইউনেপ। ১৯৮৭ সালে ঐতিহাসিক মন্ট্রিল প্রটোকল এবং এর সংশোধনীগুলো বায়ুমণ্ডলের ওপরের স্তরের ওজোন লেয়ার সংরক্ষণে ভূমিকা পালন করে। ক্ষতিকর বর্জ্য বিনষ্টের ব্যাপারে ১৯৮৯ সালের ব্যাসেল সম্মেলনের সিদ্ধান্তের ফলে বর্জ্য হতে বিষাক্ত দূষণের হার হ্রাস পেয়েছে। ফাও-এর সহযোগিতায় ১৯৯৮ সালে ইউনেপ রোটেরডাম সম্মেলনে গৃহীত আগাম অবহিতকরণ পদ্ধতিসাপেক্ষে আমদানিকারক দেশের ওপর নিরাপদে সংরক্ষণ; অন্যথায় বিনষ্ট করার ক্ষমতা থাকার শর্তে তাদের ইচ্ছামতো রাসায়নিক গ্রহণ করার ক্ষমতা বর্তায়।

২০১৩ সালের জানুয়ারি মাসে ১৪০টিরও বেশি দেশ পারদ নিঃসরণ রোধে আইনি বাধ্যবাধকতায় রাজি হয়। ২০১৩ সালের অক্টোবরে মিনামাটা মার্কারি চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য উন্মুক্ত হয়।

১৯৭৩ সালের বিপন্ন প্রজাতির আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ওপর চুক্তি বন্যপ্রাণীর পণ্যস্বরূপ বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণে এর অবদানের জন্য সার্বিকভাবে স্বীকৃত। ১৯৯৪ সালের ইউনেপ আফ্রিকা দেশগুলোর সরকারগুলোকে সাহায্য প্রদান সংক্রান্ত বন্য প্রাণী ও উদ্ভিদের অবৈধ বাণিজ্যের বিরুদ্ধে লুসাকা চুক্তি করে। ১৯৯২ সালের জীববৈচিত্র্য চুক্তি এবং ২০০০ সালের জৈব নিরাপত্তায় কার্টাজেনা প্রটোকলের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের গাছপালা, পশুপাখি এবং অনুজীব সংরক্ষণ এবং এর টেকসই ও ন্যায্য ব্যবহারকে উৎসাহিত করা হয়েছে। ইউনেপ জলবায়ু পরিবর্তনের ওপরও অনেক কার্যকরী চুক্তি ও আলোচনার আয়োজন করেছে।

জলবায়ু পরিবর্তন এবং বৈশ্বিক উষ্ণতা

শিল্পযুগের শুরু থেকেই ধীরে ধীরে এবং বর্তমানে ভয়ানকভাবে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে গ্রিনহাউস গ্যাসের বৃদ্ধির ফলে বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। যখন শক্তি উৎপন্ন করতে জীবাশ্ম জ্বালানি পোড়ানো, বনভূমি কেটে ফেলা এবং পোড়ানো হচ্ছে তখন কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গত হচ্ছে। গ্রিনহাউস গ্যাসের মধ্যে মিথেন, নাইট্রাস অক্সাইড এবং অন্যান্য গ্যাস এমন পরিমাণে বায়ুমণ্ডলে জমা হয়েছে যে, এই পৃথিবী মারাত্মক এক হুমকির মুখে আছে। জাতিসংঘ কর্মপদ্ধতি জলবায়ু পরিবর্তনের মাধ্যমে এই সমস্যা মোকাবেলা করছে।

১৯৮৮ সালে জাতিসংঘের দুই সংস্থা—ইউনেপ এবং ডব্লিউএমও-এর সবচেয়ে সেরা গবেষণাটিও এই সমস্যার সম্ভাব্য তীব্রতা প্রকাশ করেছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে পরিবেশে ও আর্থ-সামাজিক অবস্থায় সৃষ্ট প্রভাব সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্ত ও জ্ঞান আহরণে এবং এর থেকে পরিত্রাণ পেতে ডব্লিউএমও জলবায়ু সংক্রান্ত আন্তঃসরকারি প্যানেল (IPCC) প্রতিষ্ঠা করে। একটি আইনসম্মত ও সমন্বিত সমাধানে পৌঁছানোর লক্ষ্যে বিজ্ঞানীদের একটি প্যানেল, যা কিনা বিশ্বব্যাপী অভিজ্ঞ হাজার হাজার বিজ্ঞানীর বিশাল এক নেটওয়ার্ক, স্বেচ্ছাসেবামূলকভাবে কাজ করে যাচ্ছে। তাদের কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ এই প্যানেল যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট আলবার্ট আরনোল্ড (আল) গোর জুনিয়রের সাথে যৌথভাবে ২০০৭ সালে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার লাভ করে।

বিজ্ঞানীদের সতর্কবার্তা আমলে নিয়ে জাতিসংঘ ১৯৯২ সালে রিও ডি জেনিরোতে সকল দেশকে সাথে নিয়ে স্বাক্ষর করে। এখন পর্যন্ত ১৯৫টি দেশ এই আন্তর্জাতিক চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে। এ চুক্তির মাধ্যমে উন্নত দেশগুলো ১৯৯০ সালের মাত্রা অনুযায়ী কার্বন ডাই-অক্সাইড, গ্রিনহাউস গ্যাস ও অন্যান্য ক্ষতিকর গ্যাস নিঃসরণ কমানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছে এবং এও বলেছে যে, তারা এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলোকে প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি ও তথ্য হস্তান্তর করবে।

আইপিসিসি-এর বিজ্ঞানীদের দেয়া সাক্ষ্য অনুযায়ী ১৯৯৫ সালে এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে বৈশ্বিক উষ্ণতা ও এ সম্পর্কিত সমস্যাগুলো সমাধান করতে ১৯৯২ এর লক্ষ্যমাত্রা যথেষ্ট হবে না। তাই ১৯৯৭ সালে বিগত নীতিমালাটিকে অনুমোদন করা দেশগুলো জাপানের কিয়োটোতে মিলিত হয়ে একটি প্রটোকল গ্রহণ করে, যাতে বলা হয় ২০০৮ এবং ২০১২ সালের মধ্যে উন্নত দেশগুলোকে গ্রিনহাউসের ছয়টি গ্যাসের নিঃসরণ ৫.২ শতাংশে কমিয়ে আনতে হবে।

প্রটোকলটি ২০০৫ সালে বলবৎ হয়। এর দ্বারা যে ছয়টি গ্যাস নিয়ন্ত্রণ করার কথা ছিল, এর মধ্যে কার্বন ডাই-অক্সাইড, মিথেন এবং নাইট্রাস অক্সাইড প্রাকৃতিকভাবেই বায়ুমণ্ডলে প্রচুর পরিমাণে আছে; কিন্তু মানুষের ক্ষতিকারক কার্যকলাপ বায়ুমণ্ডলে এদের মাত্রাকে চরমভাবে বৃদ্ধি করেছে। প্রটোকলে ক্লিন ডেভেলপমেন্ট ম্যাকানিজম-এর মধ্য দিয়ে যেসব প্রকল্প উন্নয়নশীল দেশগুলোতে গ্রিনহাউস গ্যাসের নিঃসরণ হ্রাস করে ও টেকসই উন্নয়নে অবদান রাখে, সেসব দেশ সার্টিফাইড এমিশন রিডাকশন ক্রেডিট লাভ করতে পারে, যা ক্রয় করে শিল্পোন্নত দেশগুলো তাদের নিঃসরণ হ্রাসকরণের অঙ্গীকারের কিছু অংশ পূরণ করতে পারে।

প্রটোকলের প্রথম অঙ্গীকারবদ্ধ সময় শেষ হয় ২০১২ সালে। ২০১২ সালের ডিসেম্বর মাসের দোহা সংশোধনী প্রটোকলের মাধ্যমে ১৯৯০ সালের মাত্রা থেকে গড়ে ৫ শতাংশ গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণের জন্য ৩৭টি শিল্পোন্নত দেশ এবং ইউরোপীয় সম্প্রদায় একত্রিত হয়। দ্বিতীয় অঙ্গীকারবদ্ধ সময়ে তারা এই মাত্রা ২০১৩ থেকে ২০২০-এর মধ্যে কমপক্ষে ১৮ শতাংশ কমিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করে।

যখন জলবায়ু পরিবর্তনের হুমকির ক্ষতিকর দিকগুলো তুলে ধরার জন্য জাতিসংঘ সর্বপ্রথম এ নিয়ে আলোচনা শুরু করে, তখন অনেকেই এরূপ পরিবর্তন আদৌ হচ্ছে কিনা তা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করে। ২০০৭ সালে আইপিসিসি বৈজ্ঞানিক তথ্য এবং

বর্তমান সময় পর্যন্ত এর চিত্র তুলে ধরে ৯০ শতাংশ নিশ্চয়তার সাথে বলে যে, 'বিশ্ব উষ্ণায়ন চলমান এবং খুবই দ্রুত কোনো পদক্ষেপ না নিলে পরিস্থিতির অবনতি ঘটে পুরো বিশ্ব ক্ষতিগ্রস্ত হবে।' ২০০৭ সালের প্যানেলের জলবায়ু রিপোর্টে ৪০টি দেশের বিশেষজ্ঞ এবং বৈজ্ঞানিকদের একটি শুমারি উপস্থাপন করা হয় এবং তা ১১৩টি দেশের সরকার গ্রহণ করে। এই শতকের শেষদিকে পৃথিবী ৩ ডিগ্রি তাপমাত্রা বৃদ্ধির সম্মুখীন হবে।

যদি গ্রিনহাউস নিঃসরণ বর্তমান গতিতে বৃদ্ধি পেতে থাকে, তাহলে এর ফল হিসেবে থাকতে পারে তীব্র তাপমাত্রা, তাপ প্রবাহ, নতুন বায়ু গঠন, কিছু অঞ্চলে ভয়াবহ খরা এবং অন্যান্য স্থানে ভারি অধঃপাতন, হিমবাহ ও মেরু অঞ্চলের বরফ গলন এবং বিশ্বব্যাপী সমুদ্রস্ফীতি। একদিকে যখন গ্রীষ্মমণ্ডলীয় সাইক্লোনের (টাইফুন এবং হারিকেন) সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে; অন্যদিকে সমুদ্রের অধিক উষ্ণ পানির ফলে উচ্চতর বায়ুর ঊর্ধ্বগতি এবং আরো ঘন অধঃপাতনের কারণে এদের তীব্রতা বৃদ্ধির আশঙ্কা করা হচ্ছে।

২০০৫ সালে জাপানের কোবেতে দুর্যোগ হ্রাসের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হওয়া জাতিসংঘ বিশ্ব সম্মেলনে ১৬৮টি দেশ দ্বারা গৃহীত হয় হুগো ফ্রেমওয়ার্ক ফর অ্যাকশন; ২০০৫-২০১৫-তে অন্তর্গত সুপারিশগুলো জলবায়ু সংক্রান্ত সমস্যা থেকে উৎপন্ন দুর্যোগের ঝুঁকি কমাতে কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারে। যদিও শেষ পর্যন্ত একমাত্র কার্যকরী পন্থা হলো বায়ুমণ্ডলের পূর্বাবস্থা ফিরিয়ে আনার মাধ্যমে বৈশ্বিক উষ্ণতার মোকাবেলা করা। সৌভাগ্যক্রমে এই পন্থা কার্যকরের রূপরেখা তৈরি করা হয়েছে এবং এই লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব যদি পুরো পৃথিবীর মানুষ একত্রে এটি করতে এগিয়ে আসে। জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত কনভেনশন ফ্রেমওয়ার্ক ও এর কিয়োটো প্রটোকলের মতো আন্তর্জাতিক চুক্তিগুলোর কার্যপরিকল্পনার সাথে সাথে জাতিসংঘ মনে করে যে, ব্যক্তিবর্গ, নগরগুলো, এনজিও এবং অন্য সংস্থাগুলোরও ভূমিকা রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, কার্বন ডাই অক্সাইডের বৃদ্ধি কমিয়ে আনতে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে ২০০৬ সালে শুরু করা ইউনেপ-এর বিশ্বব্যাপী গাছ রোপণ কর্মসূচি-প্ল্যান্ট ফর দ্য প্ল্যানেট : বিলিয়ন ট্রি ক্যাম্পেইনের ফলস্বরূপ ১২ বিলিয়নের অধিক গাছ রোপণ করা হয়।

২০০৭ সালে জলবায়ু পরিবর্তনের সমস্যা মোকাবেলায় সমন্বিত আন্তর্জাতিক কর্মপরিকল্পনার জরুরি প্রয়োজন আলোকপাত করে নিরাপত্তা পরিষদ শক্তি, নিরাপত্তা ও জলবায়ুর ওপর একটি অভূতপূর্ব ও মুক্ত বিতর্ক রাখে। বিতর্ককে উদ্দেশ্য করে মহাসচিব বান কি-মুন আধুনিক বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের সাথে সুসঙ্গত একটি দীর্ঘমেয়াদি বৈশ্বিক কর্মপদ্ধতি আহ্বান করেন। জলবায়ু পরিবর্তনকে আমাদের যুগ নিরূপণকারী প্রসঙ্গ হিসেবে বর্ণনা করে তিনি এটিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারগুলোর একটি হিসেবে চিহ্নিত করেন এবং এই প্রসঙ্গ নিয়ে বিশ্বনেতাদের সাথে আলোচনার উদ্দেশ্যে কয়েকজন বার্তাবহের নাম উল্লেখ করেন।

ওজোন শূন্যকরণ

ওজোন স্তর হলো স্ট্রাটোস্ফেয়ারের একটি পাতলা গ্যাসীয় স্তর, যা ভূমি থেকে ১০ কিলোমিটারের (ছয় মাইল) বেশি উচ্চতায় ভূপৃষ্ঠকে সূর্যের ক্ষতিকারক অতিবেগুনি রশ্মি থেকে রক্ষা করে। ১৯৭০-এর মাঝামাঝি এটি উদ্‌ঘাটন করা হয় যে, মানবসৃষ্ট কিছু রাসায়নিক পদার্থ যেমন শীতলকরণ উপাদান, বায়ু নিয়ন্ত্রণ ও কারখানা পরিষ্কারে ব্যবহৃত

ক্লোরোফ্লোরো কার্বন বায়ুমণ্ডলীয় ওজোন ধ্বংস করে ওজোন স্তরের শূন্যকরণ করে আসছে। যেহেতু অতিবেগুনি রশ্মির ফলে ত্বকের ক্যান্সার, চোখের ছানি এবং মানুষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার হ্রাস বাড়তি আন্তর্জাতিক উদ্বেগের বিষয় হয়ে ওঠে, সেহেতু এটি পৃথিবীর বাস্তুসংস্থানেও অপূরণীয় ক্ষতিসাধন করে।

এই সংগ্রামের প্রতিক্রিয়া হিসেবে ইউনেপ-এর সাহায্যে ১৯৮৭ সালের মন্ট্রিয়াল প্রটোকল এবং এর সংশোধনীর সাথে সাথে ওজোন স্তর সংরক্ষণে ঐতিহাসিক ভিয়েনা সম্মেলনে সমঝোতা হয়। এসব চুক্তির আওতায় ইউনেপ-এর তত্ত্বাবধানে উন্নত দেশগুলো সিএফসির উৎপাদন ও বিক্রয় নিষিদ্ধ করে দেয় এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোতে ২০১০ সালের মধ্যে উৎপাদন বন্ধ করার প্রয়োজন দেখা দেয়। ওজোন শূন্যকরণের অন্যান্য পদার্থ হ্রাসের জন্য পরিকল্পনা তৈরি করা হয়। ইউনেপ-এর ওজোন সচিবালয় বায়ুমণ্ডলের নিম্নস্তর ও স্ট্রেটোস্ফেয়ারে ওজোন শূন্যকরণ পদার্থ হ্রাসের পরিষ্কার প্রমাণ প্রদর্শন করেছেন। এই দৃষ্টিকোণ থেকে চলমান ওজোন ধ্বংসকারী বস্তুর শূন্যকরণ প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকলে ২০৩৫ সালের ভেতরেই বৈশ্বিক ওজোন স্তরকে ১৯৮০-পূর্ব অবস্থায় নিয়ে যাওয়া সম্ভব হতে পারে।

ক্ষুদ্র দ্বীপ-রাষ্ট্র

ক্ষুদ্র দ্বীপগুলোর জন্য নির্দিষ্ট কিছু অসুবিধা এবং দুর্বলতা লক্ষ্য করা যায়। এগুলো সাধারণত আকারে ছোট, প্রাকৃতিক সম্পদ সীমাবদ্ধ এবং বহির্বিশ্বের বাজার থেকে বিচ্ছিন্ন থাকায় বিশ্বায়নের ফলে প্রাপ্ত সুবিধাগুলো ভোগ করতে সক্ষম নয়। যা দ্বীপ-রাষ্ট্রের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পথে অন্তরায়; যার ফলে এখানকার টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা একটি চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ১৯৯৪ সালে বৈশ্বিক সম্মেলনে গৃহীত বারবাদোস প্রোগ্রাম অফ অ্যাকশন, ১৯৯৪-এর বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ক বিভাগ বর্তমানে ৫২টি ক্ষুদ্র দ্বীপ-রাষ্ট্র এবং অঞ্চলগুলোকে পর্যবেক্ষণ করে আসছে। এই প্রোগ্রাম অফ অ্যাকশন দ্বীপ-রাষ্ট্রগুলোর টেকসই উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় নীতি, কার্যকরী পদক্ষেপ ও কার্যক্রম ইত্যাদি ঘোষণা করে।

২০০৫ সালে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের বৈঠকে বিগত ১০ বছরের কর্মসূচি নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়। এই বৈঠকে আরও বিস্তৃত বিষয়ে সুপারিশ উত্থাপন করা হয়, যা মরিশাস কৌশল নামে সুপরিচিত। এখানে জলবায়ু পরিবর্তন ও সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতার ক্রমশ বৃদ্ধি, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, সমুদ্রতীর, মেরিন, বিশুদ্ধ পানি, ভূমি, জ্বালানি, পর্যটন এবং জীববৈচিত্র্য ও এর উৎস, যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থা, বিশ্বায়ন ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, টেকসই উৎপাদন ও ভোগ ব্যবস্থা, সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং টেকসই উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষাব্যবস্থা, স্বাস্থ্য, সংস্কৃতি এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে তথ্য ও জ্ঞানের বিস্তার ইত্যাদি বিষয় বিবৃত করা হয়েছে।

টেকসই বনাঞ্চল ব্যবস্থাপনা

বনাঞ্চলগুলো থেকে উৎপাদিত সম্পদ প্রতি বছরেই আন্তর্জাতিক বাজারে বিলিয়ন ডলারের ব্যবসার সুযোগ করে দিচ্ছে। প্রায় ১.৬ বিলিয়ন মানুষ তাদের জীবিকার জন্য বনাঞ্চলের ওপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল। পুরোনো জ্ঞানের ভিত্তিতে বলা হয়,

প্রতিটি বনাঞ্চল ব্যাপক আকারে আর্থসামাজিক সমৃদ্ধিতে অবদান রাখে। জলবায়ু পরিবর্তনে ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবেলায় এবং জীববৈচিত্র্য রক্ষায় বাস্তুতন্ত্রে মূল ভূমিকা থাকে বনাঞ্চলের। বর্তমানে যুগোপযোগী পরিকল্পনার মাধ্যমে বৃক্ষরোপণ করে এবং প্রাকৃতিকভাবে বনায়নের সুযোগ বৃদ্ধি করার ফলে বনাঞ্চল উজাড় হওয়ার হার কিছুটা হলেও কমেছে। হিসাবে দেখা যায়, প্রতিবছর প্রায় ১৩ মিলিয়ন হেক্টর বনাঞ্চল উজাড় হয়। এতে বায়ুমণ্ডলে ২০ শতাংশ গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণের হার বাড়ে। সারা বিশ্বের বনাঞ্চলের উদ্ভিদ এবং মাটি এক ট্রিলিয়নেরও বেশি কার্বন ধরে রাখতে সক্ষম, যা বায়ুমণ্ডলে থাকা কার্বনের দ্বিগুণ পরিমাণ।

অধিক হারে বনাঞ্চল ধ্বংসের প্রধান কারণ হচ্ছে অতিমাত্রায় কাঠ আহরণ। এ ছাড়া বনের গাছপালা কেটে কৃষি জমি তৈরি কিংবা বসতি তৈরি বনাঞ্চল কমে যাওয়ার উল্লেখযোগ্য কারণ। জাতিসংঘ ১৯৯২ সালে অনুষ্ঠিত ধরিত্রী সম্মেলনে বনাঞ্চল রক্ষায় পদক্ষেপ নেয়ার সিদ্ধান্ত নেয় এবং টেকসই বনাঞ্চল ব্যবস্থাপনায় মত দেয়।

১৯৯৫ থেকে ২০০০ সালের মধ্যে বনাঞ্চল সংক্রান্ত আন্তঃসরকার প্যানেল ও ফোরাম টেকসই উন্নয়ন বিষয়ক জাতিসংঘ কমিশনের অধীনে কাজ করার সময় বিশ্বের বন-নীতির উন্নয়ন বিষয়ক মূল ফোরাম ছিল। ২০০০ সালে অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাউন্সিল জাতিসংঘ বনাঞ্চল ফোরাম সৃষ্টি করে, যা একটি উচ্চপর্যায়ের আন্তঃসরকার প্ল্যাটফর্ম।

২০০৭ সালে এই ফোরাম আন্তর্জাতিক বন নীতি ও সহযোগিতার বিষয়ে একটি যুগান্তকারী চুক্তি গ্রহণ করে; 'অ-আইনত সকল বন বিষয়ক দলিল' নামে যা একই বছর সাধারণ পরিষদও গ্রহণ করে। যদিও চুক্তিটি অ-আইনত এবং ঐচ্ছিক বৈশ্বিক অর্থায়ন প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত, এটি বন উজাড় হ্রাস, বন অবক্ষয় রোধ, টেকসই জীবনমান নিশ্চিত ও সব বন-নির্ভর জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য হ্রাসের দিকে লক্ষ্য রেখে একটি মানদণ্ড স্থাপন করে।

জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের আহ্বানে সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রধানরা ১৪ সদস্যের একটি 'বন বিষয়ক সহযোগিতামূলক অংশীদারিত্ব' গঠন করে, যা জাতিসংঘ বন ও বিশ্বজুড়ে টেকসই বন নিয়ন্ত্রণ বাস্তবায়ন বিষয়ক ফোরামের লক্ষ্যে সহযোগিতা ও সমন্বয় করে।

মরুকরণ

মরুভূমি হচ্ছে প্রখর ও শুষ্ক পরিবেশ, যেখানে ক্ষুদ্রসংখ্যক মানুষ বসবাস করে। পৃথিবীর ৪১ ভাগ স্থল শুষ্ক ভূমির অন্তর্ভুক্ত। এখানে স্বল্প বৃষ্টি ও অধিক বাষ্পীভবন হয়। এখানে দুই বিলিনেরও অধিক লোক বাস করে, পৃথিবীর দরিদ্র জনসংখ্যার অর্ধেকসহ। এদের ১.৮ বিলিয়ন উন্নয়নশীল দেশে থাকে।

মরুকরণ হলো অনুর্বর, আধা-উর্বর ও শুষ্ক এবং অনার্দ্র এলাকায় ভূমি অবক্ষয়, যা জলবায়ু পরিবর্তন এবং মানব কর্মকাণ্ডসহ আরও বিভিন্ন কারণের ফলে হয়ে থাকে। শুষ্ক ভূমিতে ভূমি অবক্ষয় বলতে এ অঞ্চলে জৈবিক অথবা অর্থনৈতিক উৎপাদনের হ্রাস বা বিনাশকে বোঝায়। ইউনেপ-এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী পৃথিবীর ১১০টির বেশি দেশে এটি এক-তৃতীয়াংশ ভূমি ও এক বিলিয়নেরও বেশি মানুষের ওপর প্রভাব ফেলে। বিশেষ

ঝুঁকিতে রয়েছে সাব-সাহারান আফ্রিকা, যেখানে দুই-তৃতীয়াংশ ভূমি হলো মরুভূমি বা শুষ্ক ভূমি।

মরুকরণ ও খরার প্রভাবের মধ্যে রয়েছে খাদ্য-স্বল্পতা, দুর্ভিক্ষ ও দারিদ্র্য। আসন্ন সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উত্তেজনার ফলে দ্বন্দ্ব ও অধিক দারিদ্র্যের সৃষ্টি হতে পারে এবং পাশাপাশি ভূমি অবক্ষয়ও বৃদ্ধি করতে পারে। বিশ্বজুড়ে বর্ধিষ্ণু মরুকরণের ফলে নতুন আবাস ও জীবিকার খোঁজে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা বাড়িয়ে দেয়ার আশঙ্কা দেখা যায়।

১৯৯৪ সালে গৃহীত 'জাতিসংঘের সংকটজনক খরা ও মরুকরণের সম্মুখীন দেশগুলোতে মরুকরণ মোকাবেলা নীতিমালা' এই সমস্যা মোকাবেলায় নিয়োজিত। এটা জমি পুনর্বাসন, জমির কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি এবং জমি ও পানিসম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার দিকে নজর দেয়। এই নীতিমালা স্থানীয় বসবাসকারীদের ভূমি অবক্ষয় রোধে সক্রিয় পরিবেশ সৃষ্টির গুরুত্ব দেয়। এটা আক্রান্ত দেশগুলোর জাতীয় কর্মসূচি প্রস্তুতে শর্ত হিসেবে কাজ করে এবং এনজিওদের এ ধরনের কর্মসূচি বাস্তবায়নে অপরিহার্য উপাদান হিসেবে বিবেচ্য। ১৯৯৬ সাল কার্যকর এই নীতিমালা বাস্তবায়নে ১৯৫টি দেশ নিয়োজিত।

মরুকরণ দমনে জাতিসংঘের বহু সংস্থা সহায়তা দিয়ে থাকে। ইউএনডিপি তার নাইরোবিভিত্তিক শুষ্ক ভূমি উন্নয়ন কেন্দ্রের দ্বারা মরুকরণবিরোধী কর্মকাণ্ড চালিয়ে থাকে। আইএফএডি গত তিন দশক ধরে ৩.৫ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি অর্থ ব্যয় করেছে শুষ্ক ভূমি উন্নয়নে। বিশ্বব্যাংক শুষ্ক ভূমি সংরক্ষণ ও কৃষি ফলন বৃদ্ধি সংক্রান্ত কর্মসূচিতে পুঁজি বিনিয়োগ করেছে। ফাও টেকসই কৃষি উন্নয়নে সরকারকে কার্যকর সহযোগিতা করে থাকে। ইউনেপ স্থানীয় কর্মসূচি, তথ্য যাচাই, দক্ষতা ও জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে সহযোগিতা করে।

জীববৈচিত্র্য, দূষণ ও অতিরিক্ত মৎস্য শিকার

জীববৈচিত্র্য-পৃথিবীর উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতির ঝলমলে বৈচিত্র্য মানুষের টিকে থাকার জন্য জরুরি। ১৯৯২ সালের 'জাতিসংঘ জীববৈচিত্র্য নীতিমালা'র মূল লক্ষ্য বিচিত্র প্রাণী ও উদ্ভিদ রক্ষা ও সংরক্ষণ, যাতে ১৯২টি দেশ ও ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন অংশগ্রহণ করে। এই নীতিমালা সব রাষ্ট্রকে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে টেকসই পরিবেশ নিশ্চিত করায় ও জেনেটিক সম্পদ ব্যবহারের উপকারিতা সুষ্ঠু ও ন্যায্য বণ্টনে বাধ্য করে। ২০০৩ সাল থেকে কার্যকর জীব-নিরাপত্তা বিষয়ক 'কারটাজেনা মূলনীতি' জেনেটিক পরিবর্তন সম্পন্ন জীবের নিরাপদ ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্য রাখে। এর ১৬৬ অংশগ্রহণকারী দেশ রয়েছে।

ইউনেপ -এর তদারকিতে ১৯৭৩ সালের 'বিপন্ন প্রাণীর আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মূলনীতি'-এর মাধ্যমেও বিপন্ন প্রাণীর সংরক্ষণ জোরদার করা হয়। মূলনীতির ১৭৮ অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্র নিয়মিত বৈঠকে বসে, উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতি এবং আইভরির মতো পণ্য কোটার মাধ্যমে রক্ষা করতে বা নিষিদ্ধ করতে তালিকা হালনাগাদ করে। ১৯৭৯ সালে বন্য প্রজাতি সংরক্ষণে 'বন নীতিমালা' এবং কিছু সংশ্লিষ্ট চুক্তি স্থলজ, জলজ ও খেচর পরিযায়ী প্রজাতি (বিশেষত বিপন্ন প্রজাতি ও তাদের আবাস) সংরক্ষণে লক্ষ্য

রাখে। ১১৯টি অংশগ্রহণকারী দেশ এই চুক্তির অন্তর্গত। ইউনেস্কোর 'মানুষ ও জীবমণ্ডল কর্মসূচি' জীববৈচিত্র্যের টেকসই ব্যবহার ও সংরক্ষণ এবং একই সাথে বিশ্বজুড়ে মানুষ ও পরিবেশের সম্পর্কোন্নয়ন নিয়ে সচেতন। এই কর্মসূচি প্রাকৃতিক ও সামাজিক বিজ্ঞান, অর্থনীতি ও শিক্ষা একীভূত করে জীবনমান উন্নয়ন ও প্রকৃতি রক্ষা করতে এমন উদ্ভাবনী পন্থা অবলম্বন করে, যা সামাজিক ও সাংস্কৃতিকভাবে উপযুক্ত ও পরিবেশবান্ধব।

কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সালফার ডাই অক্সাইড নির্গমনের ফলে এসিডবৃষ্টি ইউরোপ ও উত্তর আফ্রিকাতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে ১৯৭৯ সালের 'সুদূরপ্রসারী আন্তঃসীমান্ত বায়ুদূষণ নীতিমালা'-এর কারণে। এই নীতিমালায় রয়েছে ৫০টি রাষ্ট্র ও উট দল, যা 'জাতিসংঘ ইউরোপ অর্থনৈতিক কমিশন'-এর তদারকিতে পরিচালিত। আটটি নির্দিষ্ট মূলনীতি দ্বারা এর পরিধি বৃদ্ধি করা হয়েছে, যেগুলো হলো; ভূমি স্তরের ওজোন, অব্যাহত জৈবিক দূষণকারী, ভারী ধাতু, সালফার নির্গমন রোধ, উদ্বায়ী জৈবিক যৌগ ও নাইট্রোজেন অক্সাইড।

ক্ষতিকর বর্জ্য ও রাসায়নিক দ্রব্য : বছরে যে মিলিয়ন মিলিয়ন টন বিষাক্ত বর্জ্য জাতীয় সীমান্ত পার হয় তা নিয়ন্ত্রণ করতে সদস্য রাষ্ট্রগুলো ১৯৮৯ সালে 'বাসেল আন্তঃসীমান্ত বিষাক্ত বর্জ্য পারাপার ও নিষ্পত্তি নীতিমালা' গ্রহণ করে, যা ইউনেপ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ১৭৯টি রাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন কর্তৃক গৃহীত নীতিমালাটি উন্নয়নশীল দেশে বিষাক্ত বর্জ্য রফতানি নিষিদ্ধ করতে ১৯৯৫ সালে আরও শক্তিশালী করা হয়। কারণ এসব দেশের বিষাক্ত বর্জ্য নিষ্কাশন করার প্রযুক্তিগত সক্ষমতা নেই। অনৈতিক নিষ্পত্তি ও দুর্ঘটনাজনিত বর্জ্য নিষ্কাশনের ঘটনায় অর্থনৈতিক দায়ভারের প্রেক্ষিতে ১৯৯৯ সালে সরকারগুলো 'বাসেল দায়ভার ও ক্ষতিপূরণ নীতিমালা' চালু করে।

দূরসমুদ্রে মৎস্য শিকার : অতিরিক্ত মৎস্য শিকার ও বাণিজ্যিকভাবে মূল্যবান মৎস্য প্রজাতির প্রায়-বিলুপ্তি, অন্যান্য বর্ধমান অনৈতিক মৎস্য শিকারের পরিপ্রেক্ষিতে সরকার মৎস্যসম্পদ রক্ষার আহ্বান জানিয়েছে। ১৯৯৫ সালে এই বিষয়ে একটি চুক্তি হয়, যা ২০০১ সালে কার্যকর করা হয়। ইউরোপিয়ান ইউনিয়নসহ ৭৯টি অংশগ্রহণকারী পক্ষ এ ব্যাপারে কাজ করে যাচ্ছে।

সামুদ্রিক পরিবেশ সুরক্ষা

সমুদ্র ও এর উপকূলবর্তী অঞ্চলগুলো পৃথিবীর প্রায় ৭০ ভাগ স্থান দখল করে আছে যা পৃথিবীতে প্রাণ সঞ্চার করে। সামুদ্রিক পরিবেশ রক্ষা করা জাতিসংঘের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য জাতিসংঘের পরিবেশ বিষয়ক সংস্থা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

অধিকাংশ পানি দূষণের কারণ হচ্ছে শিল্পবর্জ্য, খনি, কৃষিকাজ, যান্ত্রিক জলযান থেকে বর্জ্য নির্গমন, যার উৎপত্তি জলাশয় থেকে দূরে মূল ভূখণ্ডে হতে পারে। জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচির পৃষ্ঠপোষকতায় ১৯৯৫ সালে ভূমিজনিত দূষণ থেকে সমুদ্র রক্ষার্থে বৈশ্বিক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয় যেটিকে সমুদ্র, উপকূল ও মোহনা রক্ষার একটি মাইলফলক হিসেবে গণ্য করা হয়। এর অন্তর্ভুক্ত আঞ্চলিক সমুদ্র কর্মসূচিতে বিশ্বের

১৪০টিরও বেশি দেশ সম্পৃক্ত এবং ইউনেপ ক্রমহ্রাসমান উপকূল ও সমুদ্র সম্পর্কে এই কর্মসূচিতে আলোচনা করে। এই কর্মসূচিতে পারস্পরিক সমুদ্র সম্পদ সুরক্ষায় ১৩টি কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। ইউনেপ-এর পৃষ্ঠপোষকতায় এই কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে কৃষ্ণসাগর, পূর্ব এশীয় সাগরগুলো, পূর্ব আফ্রিকা, সামুদ্রিক পরিবেশ রক্ষার্থে প্রতিষ্ঠানগুলো, ভূমধ্যসাগর, উত্তর-পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল, উত্তর-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল, লোহিত সাগর, এডেন উপসাগর, দক্ষিণ এশীয় সাগরগুলো, প্রশান্ত মহাসাগর, দক্ষিণ-পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগর, পশ্চিম আফ্রিকা ও বিস্তৃত ক্যারিবিয়ান অঞ্চল।

বিশ্বে বাণিজ্যিক জাহাজের বৃদ্ধি সত্ত্বেও ১৯৮০ সালের পর থেকে জাহাজের তেল নিঃসরণজনিত দূষণ প্রায় ৬০ শতাংশ কমেছে এবং এখনও কমছে। বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় উন্নতি এবং আন্তর্জাতিক নীতিমালার কঠোর অনুসরণ ও বাস্তবায়নের ফলে এটি সম্ভব হয়েছে। আন্তর্জাতিক সমুদ্রবিষয়ক সংস্থা সমুদ্রপথে নিরাপত্তা ও দূষণ নিয়ন্ত্রণে দায়িত্বপ্রাপ্ত একটি সংস্থা। সর্বপ্রথম তেল নিঃসরণজনিত দূষণ প্রতিরোধের জন্য আন্তর্জাতিক নীতিমালা গ্রহণ করা হয় ১৯৫৪ সালে, যা পাঁচ বছর পরে আইএমও-এর অন্তর্ভুক্ত হয়। ষাটের দশকের শেষদিকে কয়েকটি বড় ধরনের তেলবাহী জাহাজ দুর্ঘটনায় আরও বেশ কিছু পদক্ষেপ নিতে উৎসাহিত করে। তখন থেকে আইএমও ভূমিজনিত সমুদ্র দূষণের কারণসহ সমুদ্রে তেল দুর্ঘটনা প্রশমন ও মোকাবেলায় পদক্ষেপ নিচ্ছে।

অন্যতম কয়েকটি আন্তর্জাতিক চুক্তিগুলো হলো—গভীর সমুদ্রে তেল দুর্ঘটনায় হস্তক্ষেপ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক নীতিমালা ১৯৬৯, সমুদ্রে বর্জ্য নিক্ষেপ দূরীকরণ সংক্রান্ত নীতিমালা ১৯৭২ এবং তেল দূষণ মোকাবেলায় পূর্বপ্রস্তুতি ও সহযোগিতা সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক নীতিমালা ১৯৯০।

তেলবাহী জাহাজ মেরামতের ফলে তৈরি হওয়া বর্জ্য এবং ইঞ্জিনরুমের বর্জ্য, যা তেল দুর্ঘটনার চেয়েও মারাত্মক ক্ষতিকর সেটিকেও আইএমও নিয়ন্ত্রণে আনতে পেরেছে। এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হচ্ছে জাহাজসৃষ্ট দূষণ থেকে 'সমুদ্র রক্ষার্থে আন্তর্জাতিক নীতিমালা ১৯৭৩' গ্রহণ, যা ১৯৭৮ সালে পরিবর্ধিত হয়। শুধু দুর্ঘটনাজনিত দূষণই নয় বরং রাসায়নিক, প্যাকেটজাত দ্রব্যাদি ও নর্দমাজনিত দূষণ রোধও এর অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া ১৯৯৭ সালে একটি ক্রোড়পত্রে জাহাজ দ্বারা বায়ুদূষণ এতে সম্পৃক্ত করা হয়। এই নীতিমালাটি ১৯৯২ সালে সংস্কার করা হয়, যেখানে দ্বিস্তরবিশিষ্ট ও যথাযথ নিরাপত্তাসম্পন্ন জাহাজ নির্মাণ বাধ্যতামূলক করা হয়। এছাড়া ২০১০ সালের মধ্যে কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া একস্তর বিশিষ্ট জাহাজগুলো অপসারণের বিষয়টি নথিভুক্ত করা হয়।

দূষণের ফলে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য সহায়তাকল্পে আইএমও ১৯৬৯ সালে দূষণ-সংক্রান্ত দায়িত্বভার সংক্রান্ত নীতিমালা এবং ১৯৭১ সালে আন্তর্জাতিক ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত নীতিমালা গ্রহণ করে। ১৯৯২ সালে এই নীতিমালা দুটি আরো পরিমার্জিত করে ক্ষতিপূরণের বিষয়টি সহজতর করা হয়েছে, যা ইতোপূর্বে কষ্টসাধ্য ছিল।

আবহাওয়া, জলবায়ু এবং পানি

আবহাওয়ার পূর্বাভাস থেকে শুরু করে জলবায়ুর পরিবর্তন ও পরিবেশবিষয়ক গবেষণায় সঠিক সময়ে সঠিক তথ্য প্রদান, সমুদ্র ও আবহাওয়ার আন্তঃসম্পর্ক ও পানিসম্পদের সুষ্ঠু বণ্টনে বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা কাজ করছে। জাতিসংঘের এই সংস্থাটি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আবহাওয়া ও পানি-সংক্রান্ত বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করছে। আবহাওয়া সংবাদ দ্রুত আদান-প্রদান, গবেষণার উন্নয়ন এবং গবেষণালব্ধ তথ্য ও উপাত্ত সমন্বিতভাবে প্রকাশের কাজ করে এই সংস্থা। বিমান ও জাহাজ চালনা, কৃষি ও পানিসম্পদের উন্নয়নে, গবেষণা ও প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে এবং আবহাওয়া সম্পর্কিত আর্থ-সামাজিক বিষয়গুলোতে ডব্লিউএমও কাজ করে যাচ্ছে।

বিশ্বের আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ ডব্লিউএমও-এর কাজের মেরুদণ্ড। স্বয়ংক্রিয় আবহাওয়া কেন্দ্র সংবলিত স্যাটেলাইট, বিমান, ভূমি পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র, জাহাজ ঘাট, স্থায়ী ও ভাসমান বয়া ইত্যাদির মাধ্যমে এবং বিভিন্ন জায়গায় নিযুক্ত জনবলের সাহায্যে ডব্লিউএমও প্রতিমুহূর্তের আবহাওয়া পরিস্থিতি সারা বিশ্বে প্রচারের কাজ করে, যেখানে পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি ও টেলিযোগাযোগ লিংক সদস্য রাষ্ট্র এবং অঞ্চল কর্তৃক বাস্তবায়িত। এই তথ্য অবাধে বিভিন্ন দেশের আবহাওয়া কেন্দ্রগুলো গ্রহণ, গবেষণা ও প্রচার করতে পারে। তাই ধরা যায় যে, বর্তমান সময়ের পাঁচ দিনের আবহাওয়া পূর্বাভাস গত ২০ বছর আগের দুই দিনের পূর্বাভাসের মতোই নির্ভরযোগ্য।

ডব্লিউএমও আবহাওয়ার মান, পরিমাপ ও সম্প্রচারে সমঝোতার জটিল বিষয়টিকে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে। ক্রান্তীয় সাইক্লোন কর্মসূচির মাধ্যমে সাইক্লোনপ্রবণ দেশগুলোতে পূর্বাভাস প্রদান ও পূর্বপ্রস্তুতির বিষয়ে সহায়তা করা হয়। ডব্লিউএমও ও এর প্রাকৃতিক দুর্যোগ নিবারণ ও উপশম কর্মসূচি অন্যান্য কর্মসূচির মধ্যে সমন্বয় করে। এটি দুর্যোগ সম্পর্কিত আঞ্চলিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলোকে বিশেষভাবে ঝুঁকি মূল্যায়ন, পূর্বাভাস প্রদান ও সক্ষমতা অর্জনের জন্য সমন্বয় করে।

ডব্লিউএমও -এর আহ্বানে সাড়াদানের লক্ষ্যে বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি সহায়তাও প্রদান করা হয়।

বিশ্ব জলবায়ু কর্মসূচি জলবায়ু সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে ও সরকারপ্রধানদের জলবায়ু পরিবর্তনে যুগোপযোগী পরিকল্পনা গ্রহণে সাহায্য করে। আসন্ন জলবায়ু পরিবর্তন, যেমন– 'এল নিনো' এবং 'লা নিনা'-এর পূর্বাভাস দান ও মানুষের জীবনের ওপর এর প্রভাব সম্পর্কে এই সংস্থা সরকারদের পরামর্শ দান করে। জলবায়ু পরিবর্তনের সঠিক মূল্যায়নের জন্য ডব্লিউএমও এবং ইউনেপ ১৯৮৮ সালে জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত আন্তঃসরকার প্যানেল আইপিসিসি প্রতিষ্ঠা করে।

বায়ুমণ্ডলীয় ও পরিবেশ সংক্রান্ত গবেষণা, বায়ুমণ্ডলের গঠন, ক্রান্তীয় আবহাওয়া এবং পূর্বাভাস দানের বিষয়ে এটি সমন্বয় করে। বৈশ্বিক বায়ুমণ্ডল পর্যবেক্ষকের তত্ত্বাবধানে আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র এবং স্যাটেলাইটের সমন্বয়ে একটি চক্র প্রতিষ্ঠা করা হয়, যাতে গ্রিনহাউস গ্যাস, ওজোন, রেডিওনিউক্লাইড ও অন্যান্য গ্যাসের মাত্রা পর্যবেক্ষণ করা যায়।

বায়ু-সংক্রান্ত এই কর্মসূচির প্রয়োগের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের জনগণ, সম্পদ, সমাজ ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা করা হয়। এর লক্ষ্য হচ্ছে আবহাওয়া সম্পর্কিত সেবার

মানোন্নয়ন, সমুদ্রে ও আকাশে নিরাপত্তা জোরদার, মেরুকরণের প্রভাব লাঘব করা, কৃষি ও পানিসম্পদ উন্নয়ন; যেমন- কৃষিক্ষেত্রে আবহাওয়া সংক্রান্ত তথ্যের মাধ্যমে খরা, পতঙ্গ ও রোগজনিত ক্ষতির দৃশ্যমান হ্রাস সম্ভব।

পানিসম্পদ কর্মসূচি বিশ্বের পানি ব্যবস্থাপনা ও রক্ষার কাজ করে যাচ্ছে। এটি তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ, পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণের মাধ্যমে বৈশ্বিক সহযোগিতার উন্নয়ন ঘটায়। অভিন্ন জলসীমা সংরক্ষণে পারস্পরিক সহযোগিতাকে সহজতর করে এবং বন্যাপ্রবণ এলাকাগুলোতে পূর্বাভাসদান ও সতর্কীকরণের মাধ্যমে জানমাল সুরক্ষায় কাজ করে এই সংস্থা।

ডব্লিউএমও ও এর মহাকাশ বিষয়ক কর্মসূচি বিশ্ব আবহাওয়া নিয়ে কাজ করে এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মসূচিগুলোতে সহায়তা করে। শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ এবং কারিগরি সহায়তার মাধ্যমে এ সংস্থা বিজ্ঞানভিত্তিক জ্ঞান আদান-প্রদান ও কারিগরি দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করে।

প্রাকৃতিক সম্পদ ও শক্তি

জাতিসংঘ দীর্ঘদিন ধরে সদস্য দেশগুলোর প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় সহায়তা করে আসছে। ১৯৫২ সালের প্রথমদিকে সাধারণ সভায় ঘোষণা করা হয় যে, উন্নয়নশীল দেশগুলোর তাদের প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের অধিকার রয়েছে এবং জাতীয় স্বার্থ ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিষয় মাথায় রেখে তাদের তা ব্যবহার করতে হবে।

পানিসম্পদ

এটি প্রাক্কলিত যে ৭৬৮ মিলিয়ন লোক পর্যাপ্ত পানির অধিকার থেকে বঞ্চিত। যেহেতু প্রতি কিলোমিটার দূরের একটি উৎস থেকে একজনের জন্য একদিনে প্রায় ২০ লিটার পানি সরবরাহ সম্ভব। উৎসগুলো হলো গৃহে অবস্থিত সংযোগ, জনগণের ব্যবহারের টিউবওয়েল, সংরক্ষিত কুয়া, সংরক্ষিত ঝরনা এবং সংরক্ষিত বৃষ্টির পানি। জাতিসংঘ দীর্ঘদিন ধরে বর্ধিত জনসংখ্যা, বাণিজ্যিক ও কৃষিজ চাহিদার বিপরীতে সৃষ্ট পানিস্বল্পতা মোকাবেলায় কাজ করছে। জাতিসংঘের পানি বিষয়ক সম্মেলন ১৯৭৭, সুপেয় পানি ও স্যানিটেশন দশক ১৯৮১-১৯৯০, পানি এবং পরিবেশ বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলন ১৯৯২ এবং ধরিত্রী সম্মেলন ১৯৯২-এর মূল লক্ষ্য ছিল পানিসম্পদ নিয়ে কাজ করা। এই দশকটি বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোর প্রায় ১.৩ বিলিয়ন লোকের সুপেয় পানির চাহিদা পূরণে সহায়তা করেছে।

পানিস্বল্পতার কারণগুলো হচ্ছে—পানির যথেচ্ছ ব্যবহার, পানিদূষণ ও ভূগর্ভস্থ পানির অধিক উত্তোলন। বিশুদ্ধ পানির মান, চাহিদা, পরিমাণ ও যোগান মাথায় রেখে সমস্যাগুলো সমাধানের পরিকল্পনা করা হয়। জাতিসংঘ পানির সেসব সীমাবদ্ধ উৎসের টেকসই উন্নয়নে গুরুত্ব আরোপ করে, যেগুলো জনসংখ্যা, দূষণ, কৃষি ব্যবহার ও বাণিজ্যিক ব্যবহারের চাপের ফলে হুমকির সম্মুখীন। জনস্বাস্থ্য ও উন্নয়নের জন্য পানির গুরুত্ব বিবেচনা করে এমডিজির অন্তর্ভুক্ত সব দেশকে পানি বিষয়ক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়তা করা হয়।

বিশুদ্ধ পানি ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন সম্পর্কে জনসচেতনতা বাড়ানোর লক্ষ্যে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ২০০৩ সালকে আন্তর্জাতিক বিশুদ্ধ পানি বর্ষ ঘোষণা করে।

একই বছর জাতিসংঘের প্রশাসনিক সমন্বয়কারী বোর্ড 'ইউএন ওয়াটার' নামে একটি আন্তঃসংঘ তৈরি করে, যার লক্ষ্য ছিল পানি বিষয়ক সহস্রাব্দ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ও ২০০২ সালে অনুষ্ঠিত টেকসই উন্নয়ন বিষয়ক সম্মেলনে পানি বিষয়ক সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বৈশ্বিক উদ্যোগকে আরও জোরদার করা। এ লক্ষ্যে সাধারণ পরিষদ ২০০৫-২০১৫ সালকে 'জীবনের জন্য পানি' প্রতিপাদ্য সম্পন্ন দশক হিসেবে ঘোষণা করে, যা শুরু হয় ২২ মার্চ ২০০৫ সাল থেকে এবং এ দিনটিকে বিশ্ব পানি দিবস হিসেবে পালন করা হয়। ২০১২ সালে ইউনেস্কো তাদের ত্রিবার্ষিকীর চতুর্থ সংস্করণে জাতিসংঘের বিশ্ব পানি উন্নয়ন কর্মসূচির মূল হিসেবে 'ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তায় পানি ব্যবস্থাপনা'কে গ্রহণ করে।

২০১২ সালে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সুপেয় পানির লক্ষ্যমাত্রা ২০১০ সালের মধ্যে অর্জন সম্ভব হয়েছে; কিন্তু স্যানিটেশনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন হয়নি। প্রায় ২.৫ বিলিয়ন মানুষ এখনও স্বাস্থ্যকর শৌচাগারের মৌলিক চাহিদা থেকে বঞ্চিত।

শক্তি

বিশ্বের প্রায় এক-চতুর্থাংশ মানুষ বিদ্যুৎবিহীন ও তারও বেশি মানুষ আধুনিক জ্বালানি সুবিধা থেকে বঞ্চিত। পর্যাপ্ত শক্তিসম্পদের জোগান অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্যবিমোচনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। একই সাথে প্রথাগত জ্বালানি ব্যবহারের ফলে পরিবেশ ও স্বাস্থ্যঝুঁকির বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ। উপরন্তু বর্ধিত জনসংখ্যার দরুন মাথাপিছু শক্তির চাহিদা বাড়ছে, যা বর্তমানে প্রচলিত শক্তির উৎস থেকে জোগান দেয়া সম্ভব নয়।

জাতিসংঘের শক্তি সংক্রান্ত পদক্ষেপগুলো উন্নয়নশীল দেশগুলোতে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, সক্ষমতা অর্জন, পরিকল্পনা গ্রহণসহ নানা বিষয়ে সহায়তা করছে। যদিও নবায়নযোগ্য ও কম দূষণকারী শক্তির উৎসগুলো নিয়ে কাজ করা হচ্ছে, ক্রমবর্ধমান চাহিদার তুলনায় তা অপ্রতুল। উপরন্তু পরিশুদ্ধ জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে টেকসই উন্নয়নের জন্য আরো উদ্যোগের প্রয়োজন।

সিইবি ২০০৪ সালে 'জাতিসংঘ শক্তি সংস্থা' প্রতিষ্ঠা করে, যার মূলে রয়েছে শক্তিসম্পদ সংক্রান্ত আন্তঃপ্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করা। এই সংস্থা ২০০২ সালে অনুষ্ঠিত টেকসই উন্নয়ন সম্মেলনের বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করে এবং ব্যক্তি ও বেসরকারি পর্যায়ে গৃহীত উদ্যোগের সাথে জাতিসংঘের নীতিমালার সংযোগ করে।

পরমাণু নিরাপত্তা

সারা বিশ্বে ২০১২ সালের শেষ নাগাদ ৪৩৭টি পারমানবিক চুল্লি সক্রিয় ছিল। পাঁচটি দেশের ৪০ শতাংশের বেশি শক্তি আসে পারমাণবিক শক্তি থেকে। জাতিসংঘ পরিবারের সদস্য আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থা পারমাণবিক শক্তির গঠনমূলক, নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের লক্ষ্যে কাজ করছে। বর্তমান সময়ে আলোচিত কম কার্বন ডাই-অক্সাইড নিঃসরণকারী শক্তির উৎস হিসেবে আইএইএ পারমাণবিক শক্তির ওপর গুরুত্ব আরোপ করছে, যেহেতু এটি গ্রিনহাউজ ও অন্যান্য ক্ষতিকারক গ্যাস কম নিঃসরণ করে। আইএইএ পরমাণু শক্তি ও গবেষণার ক্ষেত্রে সরকারের একটি আন্তঃসংগঠন হিসেবে কাজ করে, এর মূল কাজ হচ্ছে বিভিন্ন দেশের সরকারের মধ্যে পরমাণু নিরাপত্তা ও পদ্ধতি

সম্পর্কে তথ্য আদান-প্রদান এবং সরকারের আহ্বানে পারমাণবিক চুল্লির নিরাপত্তা ও ঝুঁকি মোকাবেলায় পরামর্শ প্রদান করা।

এ সংস্থার দায়িত্ব আরো প্রসারিত হয়েছে, কারণ পরমাণু শক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে এবং নিরাপত্তার বিষয়টি গুরুত্ব পাচ্ছে। আইএইএ তেজস্ক্রিয় পদার্থের পরিবহন ও পরিমাণ সম্পর্কে নীতিনির্ধারণ করে। এই সংস্থা ১৯৮৬ সালে পরমাণু দুর্ঘটনা ও তেজস্ক্রিয় জরুরি অবস্থায় সহায়তা নীতিমালা এবং পরমাণু দুর্ঘটনা-পূর্ববর্তী প্রজ্ঞাপন নীতিমালার অধীনে সদস্য রাষ্ট্রগুলো সহায়তা দান করে। অন্য যেসব চুক্তির জন্য আইএইএ বিশ্বস্ততা অর্জন করেছে সেগুলো হলো, ১৯৪৭ সালের পারমাণবিক পদার্থের বাহ্যিক সুরক্ষা প্রদান, ১৯৬৩ সালের পারমাণবিক ক্ষয়ক্ষতির দায়ভার সংক্রান্ত ভিয়েনা সনদ, ১৯৯৪ সালের পারমাণবিক সুরক্ষা সনদ ও ১৯৯৭ সালের ব্যবহৃত জ্বালানি ব্যবস্থাপনা ও তেজস্ক্রিয় বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক যুক্ত সনদ।

আইএইএ -এর কারিগরি সহায়তা প্রকল্প বিভিন্ন দেশের অভ্যন্তরীণ শান্তিপূর্ণ পারমাণবিক শক্তি প্রকল্পে সহায়তা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করে। এটি দেশের অন্যান্য জটিল বিষয়, যেমন– পানি, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, চিকিৎসা এবং খাদ্য উৎপাদনে সহায়তা করে; পারমাণবিক প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে বিকল্প ফসল উদ্ভাবন করে ফলন বাড়ানো সম্ভব। এছাড়া আইসোটোপ হাইড্রোলজির মাধ্যমে ভূগর্ভস্থ জলস্তর সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায় এবং এর মাধ্যমে জল ব্যবস্থাপনা, পানি দূষণ রোধ, বাঁধের ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ ও বিশুদ্ধ পানির জোগান নিশ্চিত করা সম্ভব। এছাড়া এই সংস্থা উন্নয়নশীল ও মধ্যম আয়ের দেশগুলোতে রেডিওথেরাপির সরঞ্জাম ও ক্যান্সার রোগীর চিকিৎসায় প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে।

আইএইএ -এর ভিয়েনাভিত্তিক পরমাণু তথ্যকেন্দ্রের মাধ্যমে পরমাণু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ ও প্রচার করা হয়। ইউনেস্কোর সাথে এই সংস্থা ইতালির ত্রিয়েস্তেতে তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ক একটি আন্তর্জাতিক কেন্দ্র ও কয়েকটি বিজ্ঞানাগার পরিচালনা করে। আইএইএ কৃষি ও খাদ্য সম্পর্কিত পরমাণু গবেষণায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সাথে কাজ করে। এর মোনাকোতে অবস্থিত সামুদ্রিক পরিবেশ বিষয়ক গবেষণাগার ইউনেপ ও ইউনেস্কোর সাথে সমুদ্র-দূষণ নিয়ে কাজ করে।

জাতিসংঘের পরমাণু তেজস্ক্রিয়তা প্রভাব বিষয়ক কমিটি-(UNSCEAR) প্রতিষ্ঠা করা হয় ১৯৫৫ সালে এবং এটি আয়নিত তেজস্ক্রিয়তার মাত্রা নিয়ে কাজ করে ও তা মূল্যায়ন করে। তেজস্ক্রিয়তার ঝুঁকি নিরূপণ, তেজস্ক্রিয়তা প্রতিরোধ ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ এবং তেজস্ক্রিয়তার উৎস নিয়ন্ত্রণে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সরকার ও প্রতিষ্ঠানগুলো এ সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য-উপাত্তের ওপর নির্ভর করে।

৪. মানবাধিকার

ছবির বর্ণনা : পাকিস্তানি কন্যা মালালা ইউসুফজাই তার ১৬তম জন্মদিনে 'মালালা দিবস' উপলক্ষে জাতিসংঘের যুব সম্মেলনে ভাষণ দেন। জাতিসংঘ মহাসচিব তাকে একটি চামড়া দিয়ে বাঁধাই করা জাতিসংঘ সনদের কপি উপহার দেন, যা সাধারণত সদস্য দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের দেয়া হয়ে থাকে। (১২ জুলাই ২০১৩, ইউ এন ফটো/এস্কিন্দার দেবেবে)

জাতিসংঘের অর্জনগুলোর মধ্যে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ অর্জন হলো একটি বিস্তৃত মানবাধিকার আইন, যেটি আন্তর্জাতিকভাবে সকল দেশের মানুষের আস্থা অর্জন করেছে। জাতিসংঘ আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সাধারণ নাগরিক অধিকার, সাংস্কৃতিক অধিকার, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকারের বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছে। জাতিসংঘ একই সাথে এ অধিকারগুলো সংরক্ষণের জন্য সদস্য দেশগুলোকে সহায়তাকল্পে কিছু কৌশলপত্র প্রণয়ন করেছে।

এই আইন প্রণয়নের মূল ভিত্তি হচ্ছে ১৯৪৫ সালে ঘোষিত জাতিসংঘ সনদ ও ১৯৪৮ সালের বিশ্ব মানবাধিকার ঘোষণা। তখন থেকে জাতিসংঘ মানবাধিকারের বিষয়টিকে নারী, শিশু, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন লোক, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের সমাজে বিদ্যমান বৈষম্যের হাত থেকে রক্ষা করার কথা মাথায় রেখে পরিবর্ধিত করেছে।

সাধারণ পরিষদের মানবাধিকারের যুগান্তকারী বিষয়টি ক্রমান্বয়ে তাদের সর্বজনীনতা, অখণ্ডতা, গণতন্ত্র ও উন্নয়নের সাথে একীভূত হয়েছে। শিক্ষার সুযোগের মাধ্যমে সারা বিশ্বের সাধারণ জনগণ তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হচ্ছে। একই সাথে জাতিসংঘ সদস্য রাষ্ট্রগুলোর আইন সংস্থাগুলোকে প্রশিক্ষণ ও পরামর্শদানের মাধ্যমে এই প্রক্রিয়াকে আরো জোরদার করছে। মানবাধিকারের এই বিষয়টি সদস্য রাষ্ট্রগুলো থেকে যথেষ্ট মর্যাদা ও সহায়তা পেয়েছে।

জাতিসংঘ মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশন বিশ্বব্যাপী মানবাধিকারের সুরক্ষা ও জোরদার করার লক্ষ্যে জাতিসংঘের পদক্ষেপগুলোর সমন্বয় করছে। যাই হোক, শান্তি ও নিরাপত্তা, উন্নয়ন, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়গুলোর মূলে মানবাধিকার সুরক্ষাকে রেখে এই সংস্থা কাজ করে। তাই প্রকৃতপক্ষে জাতিসংঘের প্রত্যেকটি অঙ্গ সংগঠনই কোনো না কোনোভাবে মানবাধিকারের সুরক্ষায় জড়িত।

মানবাধিকার সংক্রান্ত দলিলাদি

সানফ্রানসিসকোতে ১৯৪৫ সালে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে প্রায় ৪০টি বেসরকারি সংগঠন যারা নারী শ্রমিক, নৃগোষ্ঠী, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি ছিল, তারা মানবাধিকারের একটি সুস্পষ্ট রূপরেখা প্রস্তাব করে। এই প্রস্তাবনার ফলে প্রতিষ্ঠাকালীন জাতিসংঘ সনদে মানবাধিকার বিষয়ে আলোকপাত করা হয়, যা পরবর্তীকালে ১৯৪৫ সালের আন্তর্জাতিক আইন তৈরি করতে সহায়তা করে।

জাতিসংঘের মূল সনদে মানবাধিকারের বিষয়টি উল্লেখ রয়েছে এভাবে–

'মৌলিক মানবাধিকার হলো মানুষের যোগ্যতা ও মর্যাদার প্রতি, নারী ও পুরুষের সমান অধিকারের প্রতি এবং ক্ষুদ্র ও বৃহৎ জাতির প্রতি বিশ্বাস।'

অনুচ্ছেদ-১-এ বলা হয় যে, জাতিসংঘের প্রধান কাজগুলোর একটি হচ্ছে, 'ভাষা, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে মানবাধিকার ও স্বাধীনতার মৌলিক অধিকারের প্রতি সম্মান।' অন্য মূলনীতিগুলো জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রগুলোকে মানবাধিকারের প্রতি সম্মানের বিষয়টিতে গুরুত্ব আরোপ করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করে।

মানবাধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক বিল

জাতিসংঘের সৃষ্টির তিন বছর পর সাধারণ পরিষদ বর্তমান মানবাধিকার আইনের ভিত্তি স্থাপন করে, যা কিনা মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র নামে পরিচিত। এর উদ্দেশ্য হলো জনসাধারণের জন্য মানবাধিকারের একটি যথাযথ মান নির্ধারণ। এটি ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বরে গৃহীত হয় এবং বর্তমানে এই দিনটি বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস হিসেবে পালিত হচ্ছে। এর ৩০টি ধারায় প্রাথমিক নাগরিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক অধিকারগুলো বর্ণিত রয়েছে, যা প্রতিটি দেশের প্রতিটি নাগরিকের উপভোগ করা বাঞ্ছনীয়।

ধারা ১ ও ২ অনুযায়ী, সব মানুষই জন্মগতভাবে সম্মান ও অধিকারের দিক থেকে সমান এবং জাতি, বর্ণ, লিঙ্গ, ভাষা, ধর্ম, রাজনীতি বা ভিন্নমত, জাতীয়তা বা সামাজিক উৎপত্তি, সম্পত্তি, জন্ম অথবা অন্য অবস্থান নির্বিশেষে ঘোষণায় বর্ণিত সকল অধিকার এবং স্বাধীনতার দাবিদার।

ধারা ৩ থেকে ২১ সব মানুষ যেসব নাগরিক এবং রাজনৈতিক অধিকারগুলোর দাবিদার তার ধারণা দেয়, যার মধ্যে রয়েছে :

- জীবন, স্বাধীনতা এবং নিরাপত্তার অধিকার;
- দাসত্ব এবং অধীনতা থেকে মুক্তি;
- অত্যাচার অথবা নির্মম, অমানবিক অথবা হানিকর ব্যবহার অথবা শাস্তি থেকে মুক্তি;
- আইনের চোখে ব্যক্তি হিসেবে স্বীকৃতির অধিকার, আইনি সমাধানের অধিকার, স্বেচ্ছাচারী আটক, শাস্তি অথবা নির্বাসন থেকে মুক্তি; স্বাধীন ও পক্ষপাতহীন ট্রাইব্যুনাল দ্বারা সুষ্ঠু বিচার এবং প্রকাশ্য শুনানির অধিকার; দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত নির্দোষ বলে বিবেচিত হওয়ার অধিকার;
- গোপনীয়তা, পরিবার, বাসস্থান অথবা যোগাযোগে স্বৈরাচারী হস্তক্ষেপ থেকে মুক্তি; সম্মানহানি থেকে মুক্তি; উক্ত আক্রমণগুলো থেকে মুক্তির অধিকার।
- আন্দোলনের অধিকার; আশ্রয়ের অধিকার, জাতীয়তার অধিকার;
- বিবাহ এবং পরিবার গঠনের অধিকার; সম্পত্তির মালিক হওয়ার অধিকার;
- চিন্তা, বিবেক এবং ধর্মের স্বাধীনতা; মতামত প্রদান এবং তা প্রকাশের স্বাধীনতা;
- শান্তিপূর্ণ সভা-সমাবেশের অধিকার,
- সরকারের অংশগ্রহণ এবং সাধারণ সুবিধাগুলো সমভাবে ভোগের অধিকার।

ধারা ২২ থেকে ২৭, সকল মানুষ যেসব অধিকারের দাবিদার সেসব অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকারের ঘোষণা দেয়। যেমন :

- সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার;
- কর্মের অধিকার, কর্মের সমপরিমাণ মূল্যপ্রাপ্তির অধিকার, ট্রেড ইউনিয়ন গঠন এবং তাতে যোগদানের অধিকার।

- বিশ্রাম এবং অবসর যাপনের অধিকার।
- সুস্বাস্থ্য এবং ভালো থাকার জন্য উপযুক্ত যথাযথ আয়ের অধিকার।
- শিক্ষার অধিকার।
- গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের অধিকার

অবশেষে ধারা ২৮ থেকে ৩০ স্বীকৃতি দেয় যেসবই একটি সামাজিক এবং জাতীয় শৃঙ্খলের অন্তর্ভুক্ত যাতে ঘোষণায় উল্লিখিত মানবাধিকারগুলো আয়ত্তিকরণ হয়েছে; এই অধিকারগুলো কেবল অন্যদের অধিকারগুলো, স্বাধীনতা সুরক্ষায় মূল্যবোধ, জন ও সাধারণ কল্যাণে ব্যবহৃত হবে এবং প্রত্যেকের তার নিজস্ব গোষ্ঠীর, যাতে সে বাস করে, প্রতি দায়িত্ব রয়েছে।

সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণার বিধানগুলোকে প্রথাগত আন্তর্জাতিক আইনের মর্যাদাপূর্ণ বলে বিশেষজ্ঞরা বিবেচনা করে থাকেন। কেননা এই বিধান রাষ্ট্রগুলোর কর্মপ্রক্রিয়া পরিবীক্ষণের মানদণ্ড হিসেবে ধরা হয়। অনেক সদ্য স্বাধীন দেশ সর্বজনীন ঘোষণাকে তাদের মৌলিক আইন বা সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করেছে।

জাতিসংঘের আওতায় গৃহীত আইনগতভাবে প্রয়োগযোগ্য চুক্তিনামার মধ্যে দুটি আন্তর্জাতিক চুক্তি রয়েছে : একটি হলো 'অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার' বিষয়ক এবং অন্যটি হলো 'নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার' সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক চুক্তি। ১৯৬৬ সালে সাধারণ পরিষদে গৃহীত চুক্তিগুলোর প্রয়োগ আইনগত বাধ্যতামূলক করা হয়েছে এবং একটি বিশেষজ্ঞ কমিটিকে রাষ্ট্রপক্ষ কর্তৃক এর প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন তদারকির দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।

সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা, আন্তর্জাতিক চুক্তি এবং নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত প্রথম ও দ্বিতীয় ঐচ্ছিক প্রটোকল—এই তিনের সমন্বয়ে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার বিল প্রণীত।

অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার

অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক চুক্তিনামা ১৯৭৬ সালে কার্যকর হয় এবং ২০১৩ সালের ৩১শে মে পর্যন্ত ১৬০টি রাষ্ট্র এই চুক্তিনামার অন্তর্ভুক্ত হয়।

এই চুক্তিতে যেসব মানবাধিকারের বিকাশ, সংরক্ষণ ও সুরক্ষার উল্লেখ রয়েছে তা হলো :

- সঠিক ও অনুকূল পরিবেশে কাজের অধিকার;
- সামাজিক সুরক্ষা, পর্যাপ্ত জীবনযাত্রার মান এবং সর্বোচ্চ মানের দৈহিক ও মানসিক কল্যাণের অধিকার;
- শিক্ষা, সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা এবং বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির সুফল ভোগের অধিকার।

এই চুক্তি কোনোরূপ বৈষম্য ব্যতিরেকে উপরোক্ত অধিকারগুলো প্রাপ্তির ও আদায়ের নির্দেশ দেয়। রাষ্ট্রপক্ষগুলোর দ্বারা চুক্তির বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ করার জন্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাউন্সিল ১৯৮৫ সালে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার কমিটি প্রতিষ্ঠিত করে। সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের একজন প্রতিনিধিসহ ১৮ সদস্যের এই বিশেষজ্ঞ কমিটি চুক্তির ১৬নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নিয়মিত রাষ্ট্রপক্ষের জমা দেয়া প্রতিবেদন পর্যবেক্ষণ ও

বিশ্লেষণ করে এবং কমিটি রাষ্ট্রগুলোর দেয়া প্রতিবেদনের ওপর ভিত্তি করে রাষ্ট্রগুলোকে মূল্যায়ন করে। এই বিশেষজ্ঞ কমিটি মানবাধিকার ও ক্রস-কাটিং প্রতিপাদ্য বোঝার জন্য সাধারণ মন্তব্য গ্রহণ করে।

২০০৮ সালে একটি একক নালিশের পরিপ্রেক্ষিতে এক নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। সে বছরেই সাধারণ পরিষদ চুক্তিটির জন্য ঐচ্ছিক প্রটোকল গ্রহণ করে, যা অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার কমিটিকে বার্তা ও প্রতিবেদন আদান-প্রদান ও বিবেচনার এখতিয়ার দেয়। ২০১৩ সালের ৫ মে ঐচ্ছিক প্রটোকল কার্যকরী হয়, যাতে সম্মত হয়েছে ১০টি রাষ্ট্র এবং ৪২ জন স্বাক্ষরকারী।

নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার

নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারসংক্রান্ত আন্তর্জাতিক চুক্তি ও এর প্রথম ঐচ্ছিক প্রটোকল কার্যকরী হয় ১৯৭৬ সালে। ২০১৩ সালের মে মাস পর্যন্ত চুক্তির সদস্য সংখ্যা ছিল ১৬৭টি রাষ্ট্র। ১৯৮৯ সালে দ্বিতীয় ঐচ্ছিক প্রটোকল গৃহীত হয়।

এই আন্তর্জাতিক চুক্তিটি চলাচলের স্বাধীনতা; আইনের দৃষ্টিতে সাম্য; ন্যায্য বিচার ও প্রাক-বিচার নির্দোষিতা; চিন্তা-বিবেক ও ধর্মের স্বাধীনতা; মতপ্রকাশের স্বাধীনতা; শান্তিপূর্ণ জমায়েতের অধিকার; সংগঠন করার অধিকার; নির্বাচন ও জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অংশগ্রহণ এবং সংখ্যালঘুদের অধিকার সংক্রান্ত বিষয়ে কাজ করে।

স্বৈরাচারী মনোভাবের মাধ্যমে বঞ্চনা; নিপীড়ন, নির্যাতন, নিষ্ঠুর আচরণ ও অবমাননাকর শাস্তি; দাসত্ব ও জোরপূর্বক শ্রম আদায়; স্বৈরাচারী গ্রেফতার বা আটক; একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়ে অযাচিত হস্তক্ষেপ; যুদ্ধংদেহী প্রচারণা; বৈষম্য এবং জাতিগত ও ধর্মীয় অসহিষ্ণুতাকে এই চুক্তিতে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। চুক্তিপত্রে দুটি ঐচ্ছিক প্রটোকল বিদ্যমান : প্রথম ঐচ্ছিক বিধান মতে, চুক্তিপত্রে উল্লিখিত অধিকারগুলো থেকে বঞ্চিতদের পক্ষে এর বিরুদ্ধে আবেদন করার অধিকার দেয়া হয়েছে। ২০১৩ সালের ৩১ মে পর্যন্ত প্রথম ঐচ্ছিক বিধানে ১১৪টি রাষ্ট্রের সমর্থন ছিল। ৭৬টি রাষ্ট্রের সমর্থনপ্রাপ্ত দ্বিতীয় ঐচ্ছিক প্রটোকলের মাধ্যমে মৃত্যুদণ্ডাদেশকে স্বতন্ত্রভাবে রদ করার ঘোষণার আবেদন করা হয়েছিল।

চুক্তিটির মাধ্যমে ১৮ সদস্যবিশিষ্ট একটি মানবাধিকার কমিটি গঠিত হয়; যার মাধ্যমে চুক্তির বিধানগুলো বাস্তবায়নে রাষ্ট্রের নেয়া সবরকম পদক্ষেপ সম্পর্কিত সাময়িক বিবরণ বিবেচনা করা হয়। এই কমিটি রাষ্ট্র থেকে প্রাপ্য চুক্তিপত্র অনুসারে প্রটোকল প্রদত্ত অধিকার বঞ্চিত নাগরিকের বক্তব্য বিবেচনা করে এবং এরূপ বক্তব্য, বিবরণ, প্রতিবেদন ইত্যাদি বিবেচনার ক্ষেত্রে গোপনীয়তা বজায় রাখা হয়ে থাকে। তবে কমিটির তদন্তে প্রাপ্ত তথ্য পরবর্তীকালে প্রকাশ করা হয় এবং বার্ষিক প্রতিবেদনের অংশ হিসেবে সাধারণ পরিষদের উপস্থাপন করা হয়। এছাড়া এ কমিটি সার্বিক মানবাধিকার ব্যবস্থা, এ সংক্রান্ত ইস্যু অথবা কার্যপন্থা নিয়ে নিজস্ব মতামতও প্রকাশ করে থাকে।

অন্যান্য চুক্তিপত্র

জাতিসংঘের বিস্তৃত ইস্যু সংশ্লিষ্ট প্রায় ৮০টি কনভেনশন ও ঘোষণাপত্রের প্রেরণা ও ভিত্তি হিসেবে রয়েছে সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্র। প্রথম দিকের উত্থাপিত কনভেনশনের

মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতায় জেনোসাইড বা গণহত্যার মতো অপরাধ এবং নিজ ভূমি থেকে বিতাড়িত বা প্রত্যাখ্যাত লক্ষ্য যুদ্ধকালীন শরণার্থী সম্পর্কিত সমস্যা। নতুন সহস্রাব্দতে এসে তা আজও প্রাসঙ্গিক।

- গণহত্যা অপরাধের প্রতিরোধ ও শাস্তি বিষয়ক কনভেনশন (১৯৪৮) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের নির্মমতার বিরুদ্ধে একটি সুস্পষ্ট প্রতিক্রিয়া; এর সংজ্ঞা অনুযায়ী গণহত্যা এমন একটি কর্মকাণ্ড যার মাধ্যমে একটি জাতি, নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী বা ধর্মীয় সম্প্রদায়কে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে নিশ্চিহ্ন করার প্রয়াস নেয়া হয়েছে। এই কনভেনশনের আওতায় গণহত্যার সাথে জড়িত সকলকে আইনের কাঠগড়ায় সোপর্দ করতে রাষ্ট্রগুলো প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। ১৪২টি রাষ্ট্র এই কনভেনশনে চুক্তিবদ্ধ।
- শরণার্থীদের মর্যাদা সম্পর্কিত কনভেনশন (১৯৫১), এটিও যুদ্ধের নির্মমতার বিরুদ্ধে স্পষ্ট প্রতিক্রিয়া। এই কনভেনশন যুদ্ধকালীন সময়ে শরণার্থীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে; বিশেষ করে তাদের যেন জোরপূর্বক নিজ দেশে ফেরত পাঠানো না হয়, যেখানে তাদের জীবন অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। এছাড়া তাদের প্রাত্যহিক জীবন, কাজের অধিকার, শিক্ষা, সার্বিক সহায়তা, সামাজিক নিরাপত্তা, সর্বোপরি আইনি কাগজপত্রের অধিকার নিশ্চিত করে এই কনভেনশন। শরণার্থীদের মর্যাদা সম্পর্কিত প্রোটোকল (১৯৬৭)-এর মাধ্যমে উক্ত কনভেনশনটি সারা বিশ্বের জন্য প্রযোজ্য। ২০১৩ সালের মে মাসের শেষে কনভেনশনটিতে সমর্থন দেয় ১৪৫টি রাষ্ট্র। আর প্রটোকলে সমর্থন দেয় মোট ১৪৬টি রাষ্ট্র।

আন্তর্জাতিক চুক্তিপত্রের সাথে সমান্তরালে আরো ৭টি 'core' আন্তর্জাতিক মানবাধিকার চুক্তি চলমান, যার বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রগুলো পর্যবেক্ষণ করে থাকে।

নিচে বর্ণিত প্রতিটি চুক্তির বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া 'ট্রিটি বডি' নামের একটি অভিজ্ঞ কমিটি নিশ্চিত করে। এই চুক্তিগুলোর কোনো কোনোটির সাথে নির্দিষ্ট কিছু বিষয়ে ঐচ্ছিক প্রটোকল যুক্ত থাকে, যা কোনো ব্যক্তিকে তার নিজের মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে মনে হলে মামলা করার অধিকার দিয়ে থাকে।

- সব ধরনের জাতিগত বৈষম্য দূরীকরণে আন্তর্জাতিক চুক্তি ১৭৬টি রাষ্ট্রপক্ষ দ্বারা গৃহীত হয়। জাতিগত বৈষম্যভিত্তিক শ্রেষ্ঠত্বের কোনো নীতি অসমর্থনীয়, বৈজ্ঞানিকভাবে মিথ্যা এবং নৈতিক ও আইনগতভাবে নিন্দনীয় : এ প্রতিজ্ঞার ওপর ভিত্তি করে 'জাতিগত বৈষম্য' সংজ্ঞায়িত হয় এবং রাষ্ট্রপক্ষগুলো আইনগত ও বাস্তবিক আচরণগত ক্ষেত্রে এসব প্রথা আশু রদের ব্যবস্থা নিতে বদ্ধপরিকর। সমঝোতা চুক্তিটির আওতায় 'জাতিসংঘ বৈষম্য দূরীকরণ কমিটি' গঠনের বিধান রাখা হয়েছে; ঐচ্ছিক কার্যপ্রণালি সমর্থন করা সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রপক্ষগুলোর ক্ষেত্রে কমিটির দায়িত্ব হবে উপরোক্ত চুক্তি লঙ্ঘনের অভিযোগ বিবেচনা করা।
- নারীর প্রতি সব ধরনের বৈষম্য দূরীকরণে চুক্তি-১৯৭৯ বৈষম্য দূরীকরণ, রাজনৈতিক ও জনজীবন, জাতীয়তা, শিক্ষা, চাকরি, স্বাস্থ্য, বিয়ে ও পরিবার— এসব বিষয়ে বৈষম্য দূরীকরণে পদক্ষেপ নেয় ও আইনের ক্ষেত্রে নারীর সমতা নিশ্চিত করে। ১৮৭টি সদস্য রাষ্ট্র এই চুক্তিকে সমর্থন করে। 'নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণ কমিটি' নামের 'ট্রিটি বডি'টির চুক্তি মতে, রাষ্ট্রগুলোর প্রদত্ত প্রতিবেদন বিবেচনা করে এবং সেগুলোর বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ করে। এই চুক্তির আওতাভুক্ত ১০৪টি রাষ্ট্র সমর্থিত

ঐচ্ছিক প্রটোকল (১৯৯৯) এই চুক্তির লঙ্ঘন ঘটলে প্রত্যেক ব্যক্তিকে কমিটির কাছে অভিযোগ করার সুযোগ প্রদান করে এবং একই সাথে কমিটিকে অনুসন্ধানের জন্য ক্ষমতা প্রদান করে, যদি প্রদত্ত তথ্য এই চুক্তির গুরুতর ও নিরবচ্ছিন্ন লঙ্ঘন প্রতীয়মান হয়।

- ১৫৩টি রাষ্ট্রপক্ষ নিয়ে গঠিত নির্যাতন ও অন্যান্য অমানবিক অথবা অধঃপতিত আচরণ অথবা শাস্তি প্রতিরোধে চুক্তি-১৯৮৪ নির্যাতনকে একটি আন্তর্জাতিক অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করে, এটাকে প্রতিরোধ করার জন্য রাষ্ট্রপক্ষগুলো দায়বদ্ধ এবং অপরাধীদের শাস্তি দেয়ার জন্য আদেশ করে। অত্যাচারকে যুক্তিযুক্ত করতে কোনো ব্যতিক্রমী পরিস্থিতির আশ্রয় নেয়া যাবে না; এমনকি নির্দেশপ্রাপ্ত হয়ে অত্যাচার করা হয়েছে বলেও কোনো অত্যাচারী নিজের সপক্ষে কোনো যুক্তি পেশ করতে পারবে না। 'নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটি' নামের 'ট্রিটি বডি' উক্ত চুক্তির আওতায় পরিবীক্ষণে নিয়োজিত। এই কমিটি রাষ্ট্রপক্ষগুলোর প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে, অনুসমর্থনকারী সকল রাষ্ট্রপক্ষের নাগরিকদের আবেদন গ্রহণ ও বিবেচনা করে এবং সংশ্লিষ্ট সকল দেশে গুরুতর ও নিয়মিত সংগঠিত অত্যাচার তদন্ত করে। উক্ত চুক্তিভুক্ত ঐচ্ছিক প্রটোকল (২০০২) 'নির্যাতন প্রতিরোধে উপকমিটি' গঠন করে এবং দেশের অভ্যন্তরে জেল-হাজত পরিদর্শনের অধিকার দেয়। এই প্রটোকলে জাতীয় প্রতিরোধক পদ্ধতি প্রবর্তনের কথাও বলা হয়েছে। এটি ৬৮টি সদস্য রাষ্ট্র নিয়ে গঠিত।
- শিশু অধিকার চুক্তিটি-১৯৮৯ শিশুদের বিশেষ বিপদাপন্ন অবস্থাকে গুরুত্বসহকারে স্বীকৃতি দেয়। এই চুক্তি মানবাধিকারের সার্বিক বিষয় বিবেচনায় একটি শিশু সুরক্ষা নীতিমালা প্রণয়ন করে। চুক্তিটি সমঅধিকার এবং সকল ক্রিয়াকলাপ শিশুদের সর্বোচ্চ স্বার্থ রক্ষা নির্ভর হতে হবে—এই মর্মে প্রতিশ্রুতি দেয়। সংখ্যালঘু ও উদ্বাস্তু শিশুদের প্রতি বিশেষ নজর দেয়া হয়। শিশুদের উন্নত জীবন, উন্নয়ন, সুরক্ষা এবং অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার দায়িত্ব রাষ্ট্রের। এই কনভেনশনটি সংখ্যাগুরু ১৯৩টি সদস্য রাষ্ট্র দ্বারা অনুমোদিত একটি চুক্তি। কনভেনশন দ্বারা গঠিত শিশু অধিকার কমিটি শিশু সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ডের বাস্তবায়ন তদারকি করে এবং সদস্য রাষ্ট্র কর্তৃক দাখিলকৃত তথ্য-প্রতিবেদন বিবেচনা করে।

এই কনভেনশনের তিনটি ঐচ্ছিক প্রটোকল রয়েছে : প্রথমত, সশস্ত্র দ্বন্দ্বে শিশুদের সম্পৃক্ততা সম্বন্ধে; দ্বিতীয়ত, শিশু বিক্রয়, শিশু যৌনতা ও শিশু পর্নোগ্রাফি সম্বন্ধে এবং আরেকটি কনভেনশনের আওতায় শিশুদের অধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় অভিযোগ দাখিলের উপায়/পদ্ধতি সম্বন্ধে।

- সকল অভিবাসী শ্রমিক ও তাদের পরিবারের অধিকার রক্ষায় আন্তর্জাতিক কনভেনশন-১৯৯০ অভিবাসনের সার্বিক প্রক্রিয়ায় সকল নথিভুক্ত ও অনথিভুক্ত অভিবাসী শ্রমিকদের মৌলিক অধিকার নির্ধারণ করে এবং তাদের অধিকার রক্ষার ব্যবস্থাও প্রবর্তন করে। ৪৬টি সদস্য রাষ্ট্রের সমর্থনপুষ্ট এই কনভেনশনটি ২০০৩ থেকে কার্যকর হয়। 'অভিবাসী শ্রমিক কমিটি'র তদারকি 'Treaty body'।
- প্রতিবন্ধী অধিকার কনভেনশন-২০০৬ বিশ্বের ৬৫০ মিলিয়ন প্রতিবন্ধীদের চাকরি, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, পরিবহন ও ন্যায়বিচারের সুযোগসহ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে

বৈষম্য নিষিদ্ধ করে। এটি ২০০৮ থেকে কার্যকর হয়; ২০১৩ সালের ১৫ জুন পর্যন্ত ১৩১টি রাষ্ট্র ও ইউরোপিয়ন ইউনিয়ন এই কনভেনশনের অংশগ্রহণকারী। এর তদারকির দায়িত্বে আছে 'প্রতিবন্ধী অধিকার কমিটি'। একটি ঐচ্ছিক প্রটোকল অনুসারে নাগরিকরা জাতীয় পর্যায়ে বিফল হলে প্রতিবন্ধী অধিকার কমিটির কাছে অধিকার আদায়ে আপিল করতে পারবেন। ২০১৩ সালের ১৫ জুন পর্যন্ত এই ঐচ্ছিক প্রটোকলের সদস্য সংখ্যা ছিল ৭৭টি।

- 'বলপূর্বক অন্তর্ধান হতে সকলের সুরক্ষা সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক কনভেনশন'-২০০৬) বলপূর্বক অন্তর্ধান নিষিদ্ধ করে ও রাষ্ট্রগুলোকে এটাকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করে আইন প্রণয়নের আহ্বান জানায়। এই কনভেনশনটি ক্ষতিগ্রস্তের ও তার পরিবারকে অন্তর্ধানের পরিস্থিতি ও আক্রান্ত ব্যক্তির পরিণীতি সম্পর্কেও জানার ও ক্ষতিপূরণ দাবির অধিকার অনুমোদন করে। ২০১০ সালে এটি কার্যকর হয় এবং ২০১৩ সালের মে পর্যন্ত এই কনভেনশনটির সদস্যসংখ্যা ছিল ৩৮টি।

ইউরোপিয়ান মানবাধিকার কনভেনশন, আমেরিকান মানবাধিকার কনভেনশন এবং আফ্রিকান মানব ও গণঅধিকার সনদের মতো আঞ্চলিক চুক্তিগুলোর ভিত্তি জাতিসংঘের সর্বজনীন ঘোষণা ও অন্য দলিলগুলো।

অন্যান্য মানদণ্ড

জাতিসংঘ মানবাধিকার রক্ষায় আরও অনেক মানদণ্ড ও নীতিমালা গ্রহণ করেছে। এসব 'ঘোষণা', 'আচরণবিধি' ও 'মূলনীতি', ইত্যাদিতে রাষ্ট্রগুলোর কোনো অংশীদারিত্ব নেই; তথাপি সদস্য রাষ্ট্রগুলোর ওপর এসব নীতির গভীর প্রভাব রয়েছে। কেননা নীতিগুলো সদস্য রাষ্ট্রগুলো নিজেরা নিজেদের ঐক্যমতের ভিত্তিতে প্রণয়ন করেছে, যা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

এদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি নিচে ব্যাখ্যা করা হলো :

- 'ধর্ম ও বিশ্বাসনির্ভর সকল প্রকার অসহিষ্ণুতা ও বৈষম্য দূরীকরণ ঘোষণা'-১৯৮১ সকলের চিন্তা, বিবেক ও ধর্মের স্বাধীনতা এবং ধর্ম বা অন্য কোনো বিশ্বাসের ভিত্তিতে বৈষম্যের শিকার না হওয়ার অধিকার গুরুত্বপূর্ণ মনে করে।
- 'উন্নয়ন অধিকার সংক্রান্ত ঘোষণা'-১৯৮৬ অধিকারকে মানব জীবনের 'একটি অবিচ্ছেদ্য অধিকার হিসেবে বর্ণনা করে, যার মাধ্যমে সকল মানুষ অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নে অংশগ্রহণ করতে, ভূমিকা রাখতে ও ভোগ করতে সুযোগ পায়, যাতে সব ধরনের মানবাধিকার ও স্বাধীনতা অর্জিত ও সুরক্ষা হয়।' আরও যোগ করা হয় : 'উন্নয়নের সুযোগের সমতা রাষ্ট্র ও ব্যক্তির বিশেষ অধিকার।'
- জাতীয় বা জাতিগত, ধর্মীয় এবং ভাষাগত সংখ্যালঘু ব্যক্তিদের অধিকার সংক্রান্ত ঘোষণা-১৯৯২ সংখ্যালঘুদের নিজ সংস্কৃতি উপভোগ করার, তাদের নিজ ধর্ম প্রচার ও চর্চা করার, নিজ ভাষা ব্যবহার করার এবং নিজ দেশসহ যে কোনো দেশ ত্যাগ করা ও নিজ দেশে ফিরে আসার অধিকার ঘোষণা করে। ঘোষণাটি এই সব অধিকারের অগ্রগতি ও সুরক্ষার জন্য রাষ্ট্রের পদক্ষেপ আহ্বান করে।
- মানবাধিকার রক্ষাকারী সংক্রান্ত ঘোষণা-১৯৯৮ বিশ্বজুড়ে মানবাধিকার কর্মীদের

কার্যকলাপকে স্বীকৃতি, উন্নয়ন ও রক্ষা করার জন্য আহ্বান করে। এটি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মানবাধিকার রক্ষাকল্পে উন্নতি ও সংগ্রাম করতে এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে স্বতন্ত্রভাবে ও দলবদ্ধভাবে সকলের অধিকার সংরক্ষিত করে। সহিংসতা, হুমকি, প্রতিশোধ, চাপ বা অন্যান্য স্বেচ্ছাচারী প্রক্রিয়া থেকে মানবাধিকার কর্মীদের রক্ষার জন্য রাষ্ট্রকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়।

- 'আদিবাসীদের অধিকার সংক্রান্ত ঘোষণা'-২০০৭ আদিবাসীদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত অধিকারের সাথে সাথে তাদের সংস্কৃতি, পরিচয়, ভাষা, চাকরি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা সংক্রান্ত অধিকার নির্ণয় করে। একই সাথে এটি আদিবাসীদের নিজেদের প্রতিষ্ঠান, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য এবং উন্নয়ন পরিকল্পনা সংরক্ষণ ও শক্তিশালী করার অধিকারে গুরুত্ব আরোপ করে। আদিবাসীদের বিরুদ্ধে যে কনো ধরণের বৈষম্য এই ঘোষণায় নিষিদ্ধ এবং জনকল্যাণমূলক কাজে তাদের অংশগ্রহণ উৎসাহিত করা হয়েছে।

অন্যান্য চুক্তি বহির্ভূত মানদণ্ডের মধ্যে রয়েছে 'কয়েদিদের সাথে আচরণের ন্যূনতম মানসম্মত নিয়ম'-১৯৫৭, 'বিচার বিভাগের স্বাধীনতা সংক্রান্ত মূলনীতি'-১৯৮৫, 'আইনজীবীদের ভূমিকা সংক্রান্ত মূলনীতি'-১৯৯০ এবং 'যে কোনো প্রকারের কারাদণ্ডপ্রাপ্ত বা আটক ব্যক্তিদের সুরক্ষা নীতিমালাগুলো'-১৯৮৮।

মানবাধিকার প্রক্রিয়া

মানবাধিকার কাউন্সিল

মানবাধিকার কাউন্সিল হচ্ছে সকল মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার প্রসার ও সুরক্ষার দায়িত্বপ্রাপ্ত মূল জাতিসংঘ আন্তঃসরকার সংস্থা। ৬০ বছরের পুরনো মানবাধিকার বিষয়ক কমিশনের পরিবর্তে ২০০৬ সালে সাধারণ পরিষদ কর্তৃক মানবাধিকার কাউন্সিল প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কাউন্সিল মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলো নিয়ে কাজ করে এবং প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান করে। এটি মানবাধিকার সংকটে সাড়া দেয়, লঙ্ঘন রোধে কাজ করে, সার্বিক পরিচালনা নীতি প্রদান করে, নতুন আন্তর্জাতিক রীতিনীতি প্রণয়ন করে, বিশ্বজুড়ে মানবাধিকার সংরক্ষণ ও সুরক্ষা পরিস্থিতি পরিবীক্ষণ করে এবং রাষ্ট্রগুলোকে তাদের মানবাধিকার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে সহায়তা করে। মানবাধিকার কাউন্সিল একটি আন্তর্জাতিক ফোরাম হিসেবে কর্মরত, যেখানে রাষ্ট্র (সদস্য ও পর্যবেক্ষক), আন্তঃসরকারি সংস্থা, জাতীয় মানবাধিকার প্রতিষ্ঠান ও এনজিওগুলো তাদের মানবাধিকার সম্পর্কিত উদ্বেগের ব্যাপারে মতামত জানাতে পারে।

সাধারণ পরিষদের ১৯৩ জন সদস্য কর্তৃক প্রদত্ত সরাসরি ও স্বতন্ত্র সংখ্যাগরিষ্ঠ গোপন ভোটে কাউন্সিলের ৪৭ জন সদস্য বাছাই করা হয়। তারা তিন বছরের নবায়নযোগ্য মেয়াদে কাজ করে এবং পরপর দুই মেয়াদের পর পুনর্নির্বাচনের সুযোগ পায় না। সদস্যপদ ন্যায্য ভৌগোলিক বণ্টনের ভিত্তিতে হয়ে থাকে। আফ্রিকান ও এশিয়ান রাষ্ট্রগুলোর জন্য ১৩টি করে আসন, লাতিন আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ান রাষ্ট্রগুলোর

জন্য ৮টি আসন, পশ্চিম ইউরোপ ও অন্য রাষ্ট্রগুলোর জন্য ৭টি আসন এবং পূর্ব ইউরোপের জন্য ৬টি আসন বরাদ্দ রয়েছে।

এই মানবাধিকার কাউন্সিল বছরজুড়ে নিয়মিতভাবে কর্মসভায় মিলিত হয়। প্রতি বছর এটি কমপক্ষে দশ সপ্তাহব্যাপী অন্তত তিনটি বৈঠকের আয়োজন করে থাকে। পরিষদের এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থনসাপেক্ষে যে কোনো রাষ্ট্র বিশেষ বৈঠকের জন্য অনুরোধ করতে পারে। ২০১২ সালে সিরিয়ান আরব প্রজাতন্ত্রে সরকার ও বিদ্রোহী বাহিনীর মধ্যে সশস্ত্র দ্বন্দ্বের কারণে সৃষ্ট ক্ষীয়মাণ ও অবনতিশীল মানবাধিকার অবস্থা নিয়ে আলোচনা করার জন্য একটি বিশেষ বৈঠক বসেছিল।

মানবাধিকার কাউন্সিলের সবচেয়ে উদ্ভাবনী বৈশিষ্ট্য হলো 'সর্বজনীন সাময়িক পর্যালোচনা'। প্রতি চার বছর অন্তর ১৯৩টি সদস্য রাষ্ট্রের প্রতিটির মানবাধিকার নথিপত্র পর্যালোচনা করা এর মৌলিক প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত। এই পর্যালোচনা পরিষদের পৃষ্ঠপোষকতায় একটি সহযোগিতামূলক রাষ্ট্রচালিত প্রক্রিয়া, যা প্রতিটি রাষ্ট্রকে নিজ দেশের মানবাধিকার অবস্থার উন্নয়নের জন্য গৃহীত পদক্ষেপগুলো ও জরুরি ভিত্তিতে মোকাবেলা করা প্রয়োজন এমন চ্যালেঞ্জগুলো উপস্থাপন করার এবং তাদের আন্তর্জাতিক দায়বদ্ধতা পূরণ করার সুযোগ দেয়। এই পর্যালোচনাটি সকল দেশের প্রতি সমান আচরণ নিশ্চিত করার পরিকল্পনা নিয়ে প্রক্রিয়াজাত ও চলমান।

এই কাউন্সিল উন্নত মানের বিশেষজ্ঞ ও কর্মীদলের স্বাধীনতা ও অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করতে পারে। এটি মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ তদন্ত করতে ঘটনা-প্রবাহ অনুসন্ধানী মিশন গঠন করতে পারে, রাষ্ট্রগুলোকে সহায়তা প্রদান করতে পারে, সরকারের সাথে প্রয়োজনীয় উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সংলাপে বসতে পারে এবং অসদাচরণের নিন্দা জানাতে পারে। এর অভিযোগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এটি কোনো ব্যক্তি, সংস্থা বা এনজিওর মানবাধিকার লঙ্ঘনের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় স্পষ্ট ও রীতিবদ্ধ ব্যবস্থা নিতে পারে।

নিজ কার্যকলাপ প্রশ্নে মানবাধিকার কাউন্সিল 'উপদেষ্টা কমিটি'র কাছ থেকেও সহায়তা পায়। ১৮ সদস্যের এই কমিটি কাউন্সিলের পরামর্শদাতা হিসেবে দায়িত্ব পালন করে এবং হারানো ব্যক্তি, খাদ্য অধিকার, কুষ্ঠরোগজনিত বৈষম্য, মানবাধিকার শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মতো মানবাধিকার সংক্রান্ত বিষয়গুলোতে অভিজ্ঞতা ও পরামর্শ প্রদান করে। কর্মপ্রক্রিয়ার ধারাবাহিকতায় এই কমিটিকে বিভিন্ন রাষ্ট্র, আন্তঃসরকারি সংস্থা, জাতীয় মানবাধিকার প্রতিষ্ঠান, এনজিও ও অন্যান্য সুশীল সমাজের সাথে আলাপ-আলোচনা বজায় রাখতে হয়।

জাতিসংঘ মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনার

'জাতিসংঘ মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনার' জাতিসংঘ মানবাধিকার কার্যক্রমের মূল দায়িত্ব পালন করে। চার বছর মেয়াদি এই হাইকমিশনার সকলের জন্য সব মানবাধিকার উপভোগের উপযোগী পরিবেশ জোরদার ও সুরক্ষা, জাতিসংঘ ব্যবস্থায় মানবাধিকার প্রক্রিয়াগুলো উদ্দীপ্ত ও পরিচালনা, নতুন মানবাধিকার মানদণ্ড প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা এবং মানবাধিকার চুক্তিগুলোর সমর্থন জোরদার করা ইত্যাদি নানাবিধ কাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত। গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনে সঠিক ব্যবস্থা অবলম্বন এবং প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম চালানোও হাইকমিশনারের দায়িত্ব।

হাইকমিশনার জাতিসংঘ মহাসচিবের নির্দেশনা ও অনুমতির আওতায় মানবাধিকার কাউন্সিল ও সাধারণ পরিষদের কাছে রিপোর্ট করেন। মানবাধিকারের সম্মান রক্ষার্থে ও লঙ্ঘন প্রতিরোধে হাইকমিশনার সরকারগুলোর সাথে সংলাপে বসেন। হাইকমিশনার জাতিসংঘ ব্যবস্থার অভ্যন্তরে জাতিসংঘ মানবাধিকার প্রক্রিয়াকে অধিক ফলপ্রসূ ও কার্যকর করার লক্ষ্যে এর শক্তি ও দক্ষতা বৃদ্ধি করতে সদা সচেষ্ট থাকেন।

জাতিসংঘ মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনারের অফিস জাতিসংঘ মানবাধিকার কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু। এটি মানবাধিকার কাউন্সিল, 'চুক্তি সংস্থা' (চুক্তি পূরণ পর্যবেক্ষণের বিশেষজ্ঞ কমিটি) এবং অন্যান্য জাতিসংঘ মানবাধিকার সংস্থার জন্য সাচিবিক ভূমিকা পালন করে। এছাড়াও এটি মানবাধিকার সংক্রান্ত মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিচালনা করে এবং উপদেষ্টামূলক সেবা ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতা প্রদান করে। স্বাভাবিক বাজেটের বাইরেও অফিসের কিছু কর্মকাণ্ডের অর্থায়ন বাজেটবহির্ভূত উৎসের মাধ্যমে করা হয়। হাইকমিশনার মানবাধিকার সংক্রান্ত অন্যান্য জাতিসংঘ সংস্থা, যেমন— জাতিসংঘ শিশু তহবিল, জাতিসংঘ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ক সংস্থা, জাতিসংঘ উন্নয়ন কার্যক্রম, জাতিসংঘ উদ্বাস্তু সংক্রান্ত হাইকমিশনারের অফিস এবং জাতিসংঘ স্বেচ্ছাসেবী কার্যক্রমের মতো জাতিসংঘ সংস্থাগুলোর সহযোগিতা ও সম্মেলন প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে বিশেষ পদক্ষেপ নিয়েছেন। একইভাবে এই অফিস জাতিসংঘ সচিবালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগের ঘনিষ্ঠ সহায়তায় শান্তি ও নিরাপত্তার ক্ষেত্রে কাজ করে। এই অফিসটি 'আন্তঃসংস্থা স্থায়ী কমিটির'ও একটি অংশ, যা মানবতামূলক সংকটে আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া তদারকি করে।

বিশেষ র‍্যাপোটিয়ার ও ওয়ার্কিং গ্রুপ

মানবাধিকার সংক্রান্ত বিশেষ র‍্যাপোটিয়ার ও কর্মীদল মানবাধিকার রক্ষার মূল দায়িত্ব পালন করে। তারা মানবাধিকার লঙ্ঘন তদন্ত করে এবং স্বতন্ত্র ঘটনা ও জরুরি অবস্থায় হস্তক্ষেপ করে, যাকে বলা হয়ে থাকে 'বিশেষ প্রক্রিয়া'। মানবাধিকার বিশেষজ্ঞরা স্বাধীন, তাঁরা ব্যক্তিগত পর্যায়ে বিনা পারিশ্রমিকে সর্বোচ্চ ছয় বছর পর্যন্ত সেবা দিয়ে থাকেন। এসব বিশেষজ্ঞের সংখ্যা প্রতি বছর অবিরতভাবে বেড়ে চলছে। ২০১৩ সালের এপ্রিল পর্যন্ত ৩৬টি বিষয়ভিত্তিক এবং ১৩টি দেশভিত্তিক বিশেষ প্রক্রিয়া ম্যান্ডেট চলমান ছিল।

মানবাধিকার কাউন্সিল ও সাধারণ পরিষদের জন্য প্রতিবেদন তৈরিতে বিশেষজ্ঞরা ব্যক্তিগত অভিযোগ ও এনজিও থেকে প্রাপ্ত তথ্যসহ সব নির্ভরযোগ্য সূত্র কাজে লাগান। তাঁরা সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ে মধ্যস্থতা করতে 'জরুরি পদক্ষেপ প্রক্রিয়া' চালু করতে পারেন। তাঁদের গবেষণার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ মাঠ পর্যায়ে সম্পন্ন হয়, যেখানে তাঁরা কর্তৃপক্ষ ও আক্রান্ত ব্যক্তি উভয়ের সংস্পর্শেই আসতে পারেন এবং প্রত্যক্ষ প্রমাণ জোগাড় করতে পারেন। তাঁদের প্রতিবেদন জনসম্মুখে প্রকাশ করা হয়। ফলে লঙ্ঘন প্রচারে এবং মানবাধিকার রক্ষায় সরকারের দায়িত্বে গুরুত্ব আরোপ করতে সহায়ক হয়।

দেশভিত্তিক বিশেষ র‍্যাপোটিয়ার, স্বাধীন বিশেষজ্ঞ ও প্রতিনিধিরা বর্তমানে বেলারুশ, কম্বোডিয়া, আইভরি কোস্ট, এরিট্রিয়া, গণতান্ত্রিক গণপ্রজাতন্ত্রী কোরিয়া, হাইতি, ইরান, মালি, মিয়ানমার, ১৯৬৭ সাল থেকে দখলকৃত ফিলিস্তিনি অঞ্চল, সোমালিয়া, সুদান ও সিরিয়া সম্পর্কে রিপোর্ট করে।

বিষয়ভিত্তিক বিশেষ র‍্যাপোটিয়ার, প্রতিনিধি ও কর্মীদলগুলো বর্তমানে উপযুক্ত আবাসন, আফ্রিকান বংশোদ্ভূত জনগোষ্ঠী, স্বেচ্ছাচারী আটক, শিশু বাণিজ্য, শিশুদের বেশ্যাবৃত্তি ও পর্নোগ্রাফি, সাংস্কৃতিক অধিকার, একটি গণতান্ত্রিক ও ন্যায্য আন্তর্জাতিক অনুশাসনের উন্নয়ন, শিক্ষা, পরিবেশ, অপহরণ বা গুম, সংক্ষিপ্ত বিচারে মৃত্যুদণ্ড, চরম দারিদ্র্য; খাদ্য অধিকার, মানবাধিকারের ওপর বৈদেশিক ঋণের প্রভাব, শান্তিপূর্ণ সভা-সমাবেশ করার স্বাধীনতা, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, ধর্ম বা বিশ্বাস পালনের স্বাধীনতা, শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য, মানবাধিকার রক্ষক, আইন বিভাগের স্বাধীনতা, আদিবাসী জনগোষ্ঠী, অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত ব্যক্তি, ভাড়াটে সৈনিক, অভিবাসী, সংখ্যালঘু সংক্রান্ত বিষয়, সত্য, ন্যায়, ক্ষতিপূরণ ও পুনরাবৃত্তি না হওয়ার প্রতিশ্রুতির প্রচার, বর্ণবাদ ও বর্ণবৈষম্য, দাসত্ব, আন্তর্জাতিক ঐক্য ও মানবাধিকার, সন্ত্রাসবাদ, নির্যাতন, বিপজ্জনক বস্তু ও আবর্জনার ব্যবস্থাপনা ও নিষ্পত্তি, মানব পাচার, আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো, পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন, নারীর প্রতি বৈষম্য এবং নারী নির্যাতন সম্পর্কে রিপোর্ট করে।

মানবাধিকার প্রচার এবং সুরক্ষা

মানবাধিকার প্রচার এবং সুরক্ষায় জাতিসংঘ কার্যক্রমের ভূমিকা ও প্রসার ক্রমবর্ধমান। সংস্থাটির কেন্দ্রীয় ম্যান্ডেট হলো 'জাতিসংঘ অন্তর্ভুক্ত জনগণ'-এর মানব মর্যাদার প্রতি পূর্ণ সম্মান নিশ্চিত করা, যাদের কল্যাণে 'জাতিসংঘ সনদ' প্রণীত হয়েছিল।

জাতিসংঘের জন্য 'শিক্ষা' মানুষের মৌলিক অধিকার এবং মানবাধিকার প্রচারের অন্যতম কার্যকর একটি মাধ্যম। মানবাধিকার শিক্ষা (প্রচলিত বা অপ্রচলিত উভয় ক্ষেত্রেই) উদ্ভাবনী শিক্ষা পদ্ধতি, জ্ঞানের বিস্তার ও দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের মাধ্যমে সর্বজনীন মানবাধিকার সংস্কৃতি প্রসারে সচেষ্ট হয়। উদাহরণস্বরূপ, জাতিসংঘ মানবাধিকার শিক্ষা দশকে (১৯৯৫-২০০৪) বিশ্বব্যাপী সচেতনতা বৃদ্ধি ও একটি সর্বজনীন মানবাধিকার সংস্কৃতি গড়ে তুলতে চেষ্টা করা হয়েছে। স্কুলের পাঠ্যসূচিতে মানবাধিকার শিক্ষা অন্তর্ভুক্তকরণ এবং এ বিষয়ে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে মানবাধিকার শিক্ষা প্রচারে এই দশক অনেক দেশকে দিকনির্দেশনা দিয়েছিল।

জাতিসংঘ তার আন্তর্জাতিক প্রশাসনিক কাঠামোর মাধ্যমে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করে যাচ্ছে :

- বিশ্ববিবেকরূপে—বিভিন্ন জাতির আচরণের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য আন্তর্জাতিক মান প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে। এটি মানবাধিকারের মান পতনের ক্ষেত্রে হুমকিস্বরূপ চর্চাগুলোর প্রতি বিশ্বের মনোযোগ নিবদ্ধ করে যাচ্ছে। বিস্তৃত পরিসরের ঘোষণাপত্র ও কনভেনশনের মাধ্যমে সাধারণ পরিষদ মানবাধিকার নীতিমালার সর্বজনীনতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছে।
- আইন প্রণেতা হিসেবে—আন্তর্জাতিক আইনের এক অভিনব সারসংক্ষেপ প্রণয়নে প্রেরণা প্রদানে। নারী, শিশু, কয়েদি, বন্দি ও মানসিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি সংক্রান্ত মানবাধিকারের পাশাপাশি গণহত্যা, জাতিগত বৈষম্য ও নির্যাতনে এর লঙ্ঘন এখন আন্তর্জাতিক আইনের প্রধান বৈশিষ্ট্য, যা এক সময় কেবল আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্কতেই আলোচিত হতো।
- পর্যবেক্ষক হিসেবে—মানবাধিকার শুধু সংজ্ঞায়িত নয় বরং তা যেন রক্ষাও করা হয়

তা নিশ্চিত করতে একটি কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালনে। রাষ্ট্রগুলো কীভাবে তাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে, আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোকে তা পর্যবেক্ষণের ক্ষমতা প্রদানকারী চুক্তিগুলোর প্রাথমিক উদাহরণগুলোর মধ্যে রয়েছে 'নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক চুক্তি' এবং 'অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার চুক্তি' (১৯৬৬)। আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী কর্মপদ্ধতি পর্যবেক্ষণ এবং লঙ্ঘনের অভিযোগ সম্পর্কে তদন্ত করার জন্য হিউম্যান রাইটস কাউন্সিলের চুক্তি পক্ষগুলো, বিশেষ দূত এবং কার্যদল প্রত্যেকেরই নিজস্ব পদ্ধতি এবং প্রক্রিয়া রয়েছে। কোনো নির্দিষ্ট ঘটনায় এদের সিদ্ধান্ত একটি নৈতিক গুরুত্ব বহন করে, যা খুব কম দেশের সরকারই অমান্য করতে প্রয়াস পাবে।

- স্নায়ু কেন্দ্র হিসেবে—ওএইচসিএইচআর বিভিন্ন দল এবং ব্যক্তির কাছ থেকে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ পেয়ে থাকে। প্রতি বছর অভিযোগ আসে ১০০,০০০ এরও অধিক। ওএইচসিএইচআর এসব অভিযোগ কনভেনশন ও অনুমোদিত বাস্তবায়ন পদ্ধতি নিরিখে জাতিসংঘের সংশ্লিষ্ট সংস্থা বরাবর পৌঁছে দেয়। জরুরি হস্তক্ষেপের জন্য ওএইচসিএইচআরকে তাদের ফ্যাক্স : (৪১-২২-৯১৭-৯০২২) এবং ই-মেইলের মাধ্যমে অনুরোধ করা যেতে পারে।
- রক্ষক হিসেবে— যখন কোনো দূত বা কোনো ওয়ার্কিং গ্রুপের চেয়ারম্যান জানতে পারেন যে, কোনো একটি গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনমূলক কাজ হতে যাচ্ছে (যেমন কোনো নির্যাতন বা কোনো বিচারবহির্ভূত মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হতে যাচ্ছে), তখন তিনি সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রকে একটি জরুরি বার্তা পাঠানোর মাধ্যমে এর ব্যাখ্যা এবং অভিযোগকারীর অধিকার সুরক্ষিত করার অঙ্গীকারের জন্য অনুরোধ করতে পারেন।
- গবেষক হিসেবে— মানবাধিকার আইনের উন্নয়ন এবং প্রয়োগের জন্য অপরিহার্য তথ্য সংকলন করা। জাতিসংঘ সংস্থাগুলোর অনুরোধে ওএইচসিএইচআর কর্তৃক প্রস্তুতকৃত গবেষণা এবং প্রতিবেদনগুলো মানবাধিকারের প্রতি সম্মান বৃদ্ধিমূলক নতুন নীতি, চর্চা ও প্রতিষ্ঠানের দিকে নির্দেশনা দেয়।
- আপিল ফোরাম হিসেবে—সকল অভ্যন্তরীণ প্রতিকার নিঃশেষিত হয়ে গেলে কোনো ব্যক্তি 'নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক চুক্তির প্রথম ঐচ্ছিক খসড়া দলিল' এবং একই সাথে 'সব ধরনের জাতিগত বৈষম্য বিলোপের আন্তর্জাতিক কনভেনশন', 'নির্যাতনবিরোধী কনভেনশন', 'মহিলাদের বিরুদ্ধে সব ধরনের বৈষম্য বিলোপের কনভেনশন সংক্রান্ত ঐচ্ছিক খসড়া দলিল', 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার বিষয়ক কনভেনশন সংক্রান্ত ঐচ্ছিক খসড়া দলিল', 'গুম থেকে সব ব্যক্তির সুরক্ষা সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক কনভেনশন' এবং 'অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক চুক্তির ঐচ্ছিক খসড়া দলিল'-এর অধীনে সংশ্লিষ্ট আপিল ব্যবস্থা গ্রহণকারী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনতে পারে। একইভাবে 'একটি যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় শিশু অধিকার সংক্রান্ত কনভেনশনের ঐচ্ছিক খসড়া দলিল'-এর প্রয়োগ নিশ্চিত হলে ভবিষ্যতে এটি শিশুদের জন্যও সম্ভব হবে। উপরন্তু মানবাধিকার কাউন্সিলের বিশেষ কার্যপ্রণালিগুলো প্রতি বছর এনজিও বা ব্যক্তি কর্তৃক জমা হওয়া অসংখ্য অভিযোগ বিবেচনা করে।
- ঘটনা অনুসন্ধানী হিসেবে—নির্দিষ্ট ধরনের নির্যাতনের ওপর এবং একই সাথে কোনো

নির্দিষ্ট দেশে আইন লঙ্ঘনের ওপর নজরদারি ও প্রতিবেদন তৈরি করার জন্য মানবাধিকার কাউন্সিলের নিজস্ব প্রক্রিয়া রয়েছে। বিশেষ দূত, প্রতিনিধি ও কর্মীদল এসব রাজনৈতিক সংবেদনশীল, মানবিক এবং কখনো কখনো বিপজ্জনক কাজে নিয়োজিত। তারা তথ্য সংগ্রহ করে, স্থানীয় গোষ্ঠী ও সরকারি কর্তৃপক্ষদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে, সরকারি অনুমতিসাপেক্ষে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে এবং মানবাধিকারের প্রতি সম্মান জোরদার করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ প্রস্তাব করে।

- বিচক্ষণ কূটনীতিবিদ হিসেবে—মহাসচিব এবং জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনার সদস্য দেশগুলোর সঙ্গে গোপনীয়ভাবে বিভিন্ন মানবাধিকার লঙ্ঘন, যেমন বন্দিদের মুক্তি এবং মৃত্যুদণ্ড লঘুকরণ ইত্যাদি ব্যাপারে আলোচনার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। মানবাধিকার কাউন্সিল মহাসচিবকে গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘন রোধ করার জন্য কোনো একটি নির্দিষ্ট মানবাধিকার পরিস্থিতিতে হস্তক্ষেপ করার বা পরিদর্শনের জন্য একজন বিশেষজ্ঞ পাঠানোর অনুরোধ করতে পারে।

মহাসচিবও চাইলে জাতিসংঘের বৈধ উদ্বেগ অবহিত করার ও নির্যাতন প্রশমনের জন্য বার্তার মাধ্যমে নীরব কূটনীতির আশ্রয় গ্রহণ করতে পারেন।

উন্নয়ন অধিকার

অগ্রগতি ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে সুযোগের সমতামূলক নীতিমালাগুলো 'জাতিসংঘ সনদ' এবং 'সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা'তে সঠিকরূপে লিপিবদ্ধ রয়েছে। ১৯৮৬ সালে সাধারণ পরিষদ কর্তৃক গৃহীত একটি অবিচ্ছেদ্য মানবাধিকার হিসেবে বিবেচিত 'উন্নয়ন অধিকার সংক্রান্ত ঘোষণা'কে একটি সন্ধিক্ষণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়, যার মাধ্যমে প্রতিটি ব্যক্তি এবং তাবৎ জনগোষ্ঠী অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নে অংশ নিতে, অবদান রাখতে এবং তা উপভোগ করতে পারে। ১৯৯৩ সালের দ্বিতীয় বিশ্ব মানবাধিকার সম্মেলনের 'ভিয়েনা ঘোষণা ও কর্মপ্রক্রিয়া'র মাধ্যমে একে আরও বিশিষ্টতা প্রদান করা হয় এবং একই সাথে ২০০০ সালের 'সহস্রাব্দ ঘোষণা'সহ জাতিসংঘের শীর্ষ পর্যায়ের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক ও সম্মেলনের উদ্ভূত ফলাফল বিবরণীতে উদ্ধৃত করা হয়। উন্নয়ন অধিকারের অগ্রগতি নিরীক্ষা, প্রতিবন্ধকতা বিশ্লেষণ ও বাস্তবায়ন কৌশল উদ্ভাবনের জন্য ১৯৯৮ সালে মানবাধিকার কমিশন একটি কর্মীদল গঠন করে।

জাতিসংঘ খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও)

জাতিসংঘ খাদ্য ও কৃষি সংস্থা খাদ্য অধিকারকে বিশেষ প্রাধান্য দেয়। এই অধিকারের সমর্থনে এফএও কাউন্সিল ২০০৪ সালে 'জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তার পরিপ্রেক্ষিতে পর্যাপ্ত খাদ্যের অধিকার সম্পর্কিত প্রগতিশীল উপলব্ধি সহায়ক স্বেচ্ছাকৃত নির্দেশিকা' গ্রহণ করে। জনগণের জন্য সম্মানের সাথে খাদ্য সংস্থানের পরিবেশ তৈরিতে এবং অপারগদের জন্য খাদ্য নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠায় সরকার যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করার কথা চিন্তা করতে পারে, তা এই 'খাদ্য অধিকার নির্দেশিকা' সবিস্তারে বর্ণনা করে। এছাড়াও এগুলো সরকারের জবাবদিহি শক্তিশালী করতে বিভিন্ন পরামর্শ দিয়ে থাকে এবং একই সাথে খাদ্য ও কৃষি সংশ্লিষ্ট এজেন্সিগুলোর কর্মকাণ্ডে মানবাধিকার বিষয়টিকে একীভূত করতে সহায়তা করে থাকে।

শ্রম অধিকার

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা শ্রমিকদের অধিকারের সংজ্ঞায়ন ও সংরক্ষণের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত জাতিসংঘের একটি বিশেষায়িত সংস্থা। সরকার, মালিকপক্ষ ও শ্রমিক প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত এর ত্রিমুখী 'আন্তর্জাতিক শ্রম সম্মেলন' ২০১৩ সালের ১৫ জুন পর্যন্ত ১৮৯টি কনভেনশন ও ২০২টি সুপারিশ গ্রহণ করেছে। গৃহীত এই কনভেনশন ও সুপারিশগুলো কর্মজীবনের সব দিকে আলোকপাত করে এবং এতে আন্তর্জাতিক শ্রম আইনের পদ্ধতিগুলো অন্তর্ভুক্ত। এর সুপারিশগুলো সংশ্লিষ্ট দেশের নীতি, আইন ও অনুশীলনের ওপর নির্দেশনা দেয় এবং এর কনভেনশনগুলো অনুমোদনকারী রাষ্ট্রগুলোর জন্য কিছু বাধ্যবাধকতা আরোপ করে।

শ্রম প্রশাসন, শিল্প সম্পর্ক, নিয়োগ নীতি, কর্মপরিবেশ, সামাজিক নিরাপত্তা, পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যসহ বিভিন্ন বিষয়ে কনভেনশন ও সুপারিশগুলো গ্রহণ করা হয়েছে। কোনটি কর্মস্থলে মৌলিক মানবাধিকার নিশ্চিত করে, আবার কোনটি নারী ও শিশুদের কর্মসংক্রান্ত সমস্যা এবং অভিবাসী শ্রমিক ও বিকল ব্যক্তিদের বিশেষ বিষয়াবলি নিয়ে কাজ করে।

কনভেনশনগুলোর আইন ও অনুশীলন উভয় ক্ষেত্রেই প্রয়োগ নিশ্চিতকারী আইএলওর তত্ত্বাবধানমূলক কার্যপ্রণালিগুলো স্বাধীন বিশেষজ্ঞদের বস্তুনিষ্ঠ নিরীক্ষণ এবং আইএলওর ত্রিপক্ষীয় অঙ্গ সংস্থার ঘটনা পরীক্ষণের ভিত্তিতে তৈরি। এছাড়াও সংগঠনের স্বাধীনতা লঙ্ঘনের অভিযোগ তদন্ত করার একটি বিশেষ প্রক্রিয়াও রয়েছে।

আইএলও বহুসংখ্যক যুগান্তকারী কনভেনশন প্রণয়ন করেছে যার মধ্যে রয়েছে :

- অন ফোর্সড লেবার (১৯৩০)—সব ধরনের জোরপূর্বক বা বাধ্যতামূলক শ্রম দমন দাবি করে;
- অন ফ্রিডম অফ অ্যাসোসিয়েশন অ্যান্ড প্রটেকশন অফ দ্য রাইট টু অর্গানাইজ (১৯৪৮)–পূর্ব অনুমোদন ছাড়াই শ্রমিক ও নিয়োগকর্তাদের সংগঠনে যোগ দেয়ার অধিকার সংরক্ষণ করে এবং উক্ত সংগঠনগুলোর স্বাধীন কার্যক্রম পরিচালনার পরিবেশ নিশ্চিত করে;
- অন দ্য রাইট টু অর্গানাইজ অ্যান্ড কালেক্টিভ বারগেইনিং (১৯৪৯)—সংঘবিরোধী বৈষম্য থেকে নিরাপত্তা প্রদান করে, কর্মী ও নিয়োগকর্তাদের সংগঠনের নিরাপত্তা প্রদান করে এবং সম্মিলিত দরকষাকষি পরিবেশ পরিমাপ করে;
- অন ইক্যুয়াল রেমুনারেশন (১৯৫১)—সমমানের কাজের জন্য সমপরিমাণ পারিশ্রমিক ও সুবিধা দাবি করে;
- অন ডিসক্রিমিনেশন (১৯৫৮)—সমান সুযোগ ও আচরণ নিশ্চিতকারী জাতীয় নীতি প্রণয়ন এবং জাতি, বর্ণ, লিঙ্গ, ধর্ম, রাজনৈতিক মতাদর্শ, বংশ বা সামাজিক পরিচিতির ভিত্তিতে কর্মক্ষেত্রে বৈষম্য নিরসনের দাবি করে;
- অন মিনিমাম এইজ (১৯৭৩)—শিশুশ্রম দমনের সংকল্প করে এবং কর্মনিয়োগের সর্বনিম্ন বয়স হবে আবশ্যিক পড়াশোনা সমাপনের বয়স;
- অন দ্য ওর্স্ট ফর্ম অফ চাইল্ড লেবার (১৯৯৯)—শিশু দাসত্ব, ঋণ দাসত্ব, পতিতাবৃত্তি ও পর্নোগ্রাফি, ঝুঁকিপূর্ণ কাজ এবং সশস্ত্র সংঘর্ষের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক নিয়োগ নিষিদ্ধ করে এবং

- অন মেটারনিটি প্রটেকশন (২০০০); মাতৃত্বকালীন ছুটি, চাকরির নিরাপত্তা, চিকিৎসা সুবিধা ও স্তন্যদান সুযোগের মানদণ্ড নির্ণয় করে।

২০১০ সালে আইএলও সম্মেলন এইচআইভি/এইডস বিষয়ে যুগান্তকারী এক আন্তর্জাতিক শ্রম মানদণ্ড গ্রহণ করে, যা পেশাগত দুনিয়ায় এই বিষয়ে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়া প্রথম মানবাধিকার দলিল। এটি বৈষম্যবিরোধী পদক্ষেপ গ্রহণে সাহায্য করে এবং এইচআইভি আক্রান্ত বা তার সাথে বসবাসকৃত জনগোষ্ঠীর জন্য চাকরি ও উপার্জনমূলক কর্মকাণ্ডের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে।

সাধারণ পরিষদ অভিবাসী কর্মীদের অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রেও একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

বৈষম্য দমনে সংগ্রাম

বর্ণবৈষম্য

জাতিসংঘের অন্যতম বৃহৎ সাফল্য দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবৈষম্য উচ্ছেদ করা, যা বিশ্বে গুরুতর অন্যায় দমনে তার সক্ষমতা ও পারদর্শিতা প্রদর্শন করে। সূচনা থেকেই জাতিসংঘ দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের আরোপিত প্রাতিষ্ঠানিক পৃথককরণ ও বর্ণবৈষম্য ব্যবস্থাবিরোধী সংগ্রামে জড়িত ছিল; যা ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৯০-এর শুরু পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।

জাতিসংঘ ১৯৬৬ সালে বর্ণবৈষম্যকে 'মানবতাবিরোধী অপরাধ' হিসেবে চিহ্নিত করে এবং এ অপরাধ 'জাতিসংঘ সনদ' ও 'সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা'র সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ বলে নিন্দা জানায় এবং শেষ পর্যন্ত বৈষম্য সাধারণ পরিষদের কার্যাবলির তালিকায় ছিল :

- ১৯৫০ সালে সাধারণ পরিষদ দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের কাছে সনদের মূলনীতি অনুযায়ী বর্ণবৈষম্য বর্জন করতে একাধিকবার আবেদন করে;
- দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদী নীতি পর্যালোচনা প্রক্রিয়াধীন রাখতে পরিষদ ১৯৬২ সালে 'বর্ণবৈষম্যবিরোধী বিশেষ কমিটি' প্রতিষ্ঠা করে। এই কমিটি বর্ণবৈষম্যবিরোধী ব্যাপক কর্মসূচি প্রণয়নের আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়ায়;
- ১৯৬৩ সালে নিরাপত্তা পরিষদ দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে স্বেচ্ছা অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে;
- পরিষদ ১৯৭০ থেকে ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত সাধারণ পরিষদের নিয়মিত সভায় দক্ষিণ আফ্রিকার পরিচয়পত্র গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায়। ফলস্বরূপ, নিষেধাজ্ঞার পর থেকে ১৯৯৪ সালে বর্ণবৈষম্যের সমাপ্তি পর্যন্ত দক্ষিণ আফ্রিকা পরিষদের কোনো কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পারেনি;
- ১৯৭১ সালে পরিষদ দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ক্রীড়া বয়কট জারি করে, যা দেশে ও বহির্বিশ্বে জনমতে উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলে;
- ১৯৭৩ সালে পরিষদ 'বর্ণবৈষম্য অপরাধ রোধ ও শাস্তি প্রদান সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক কনভেনশন' গ্রহণ করে;
- ১৯৭৭ সালে পরিষদ দক্ষিণ আফ্রিকার ওপর অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা বাধ্যতামূলক করে,

কারণ দেশটির প্রতিবেশীদের প্রতি আগ্রাসন ও সম্ভাব্য পারমাণবিক ক্ষমতা আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরপত্তার জন্য ঝুঁকি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই প্রথম পরিষদ তার সদস্য রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এমন পদক্ষেপ গ্রহণ করে;

- ১৯৮৫ সালে পরিষদ 'খেলাধুলায় বর্ণবৈষম্য নীতির বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক কনভেনশন' গ্রহণ করে;
- ১৯৮৫ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে নিপীড়ন বাড়িয়ে দেয়ার পর নিরাপত্তা পরিষদ জাতিসংঘ সনদের সপ্তম অধ্যায় অনুযায়ী দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহণে সরকারদের অনুরোধ করে।

১৯৯০ সালে জাতিসংঘের পূর্ণ সমর্থনে সরকার ও গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক দলের মধ্যে শান্তিচুক্তির মাধ্যমে দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবৈষম্য সরকার থেকে বর্ণ-নিরপেক্ষ গণতন্ত্রে রূপান্তরের প্রক্রিয়া ঘটে। ১৯৯২ সালের নিরাপত্তা পরিষদের দুটি প্রস্তাব এই পরিবর্তনে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের জড়িত থাকার বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করে। ১৯৯২ সালে পরিষদ 'ইউনাইটেড নেশনস অবজার্ভার মিশন ইন সাউথ আফ্রিকা' (ইউএনওএমএসএ) স্থাপন করে চুক্তির গঠন দৃঢ় করার জন্য। ইউএনওএমএসএ ১৯৯৪ সালের নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করে যা বর্ণ-নিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সরকারে রূপ নেয়।

এই সরকারের অভিষেক ও দেশের প্রথম বর্ণ-নিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সংবিধান গ্রহণ করার সাথে সাথে বর্ণবৈষম্যের সমাপ্তি ঘটে।

সদ্য নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট নেলসন ম্যান্ডেলা ১৯৯৪ সালে সাধারণ পরিষদে ভাষণ দেয়ার সময় বলেন, '৪৯ বছরে এই প্রথম আফ্রিকান সংখ্যাগুরু থেকে কোনো ব্যক্তি সাধারণ পরিষদের সভায় দক্ষিণ আফ্রিকার রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে বক্তৃতা রাখছেন।' বর্ণবৈষম্য দমনকে স্বাগত জানিয়ে তিনি বলেন 'এই ঐতিহাসিক পরিবর্তন এসেছে শুধু মানবতাবিরোধী বর্ণবৈষম্য অপরাধ দমন নিশ্চিত করতে জাতিসংঘের প্রচেষ্টার কারণে।'

বর্ণবাদ

১৯৬৩ সালে সাধারণ পরিষদ জাতিসংঘের সব ধরনের বর্ণববৈষম্য নির্মূলে ঘোষণাপত্র গ্রহণ করে। ঘোষণায় সকল মানুষের অলঙ্ঘনীয় সাম্যের স্বীকৃতি দেয়া হয় এবং জাতি, বর্ণ বা জন্মের ভিত্তিতে মানুষের মধ্যে যে বৈষম্য রয়েছে তা মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং জাতি ও মানুষের মাঝে বন্ধুত্বপূর্ণ ও শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক সৃষ্টির পথে একটি অন্তরায় হিসেবে নিশ্চিত করা হয়। দুই বছর পরে পরিষদটি বর্ণবাদী বৈষম্য বিলোপের আন্তর্জাতিক সনদ গ্রহণ করে, যা অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রগুলোকে আইনগত, বিচার বিভাগীয়, প্রশাসনিক এবং অন্যান্য পদক্ষেপ গ্রহণ করে বর্ণবাদী বৈষম্যের প্রতিরোধ ও শাস্তি দেয়ার জন্য বাধ্য করে।

১৯৯৩ সালে সাধারণ পরিষদ ১৯৯৩-২০০৩ সময়কালকে বর্ণবাদ এবং জাতিগত বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াই করার তৃতীয় দশক হিসেবে ঘোষণা করে এবং সকল রাষ্ট্রকে আহ্বান জানায় বর্ণবাদের নব ধারার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ব্যবস্থা নিতে—বিশেষত আইন, প্রশাসনিক পদক্ষেপ, শিক্ষা এবং তথ্যের মাধ্যমে। এছাড়াও ১৯৯৩ সালে মানবাধিকার কমিশন বর্ণবাদের সমসাময়িক আঙ্গিক, জাতিগত বৈষম্য, বিদেশাতঙ্ক এবং সংশ্লিষ্ট

অসহিষ্ণুতা মোকাবেলার জন্য একটি বিশেষ দূত নিয়োজিত করে। বিশেষ দূতের দায়িত্ব হলো বিশ্বব্যাপী বর্ণবাদের সমসাময়িক ধরনের ঘটনা; জাতিগত বৈষম্য; আরব, মুসলিম, আফ্রিকান ও আফ্রিকান বংশোদ্ভূত লোকদের বিরুদ্ধে যে কোনো প্রকার বৈষম্য; বিদেশাতঙ্ক; ইহুদি-বিদ্বেষ অসহিষ্ণুতা-সংশ্লিষ্ট অভিব্যক্তি খতিয়ে দেখা এবং সেই সাথে এসব মোকাবেলায় সরকারি পদক্ষেপের তদারকি ও পর্যালোচনা করা।

২০০১ সালে আয়োজিত বর্ণবাদ, জাতিগত বৈষম্য, বিদেশাতঙ্ক ও সংশ্লিষ্ট অসহিষ্ণুতা সংক্রান্ত তৃতীয় বিশ্ব সম্মেলনে বর্ণবাদ নির্মূল করার লক্ষ্যে বাস্তববাদী পদক্ষেপ নেয়া হয়। তার মধ্যে রয়েছে প্রতিরোধ, শিক্ষা ও সুরক্ষা ব্যবস্থাসহ ডারবান ঘোষণাপত্র ও কর্মসূচি গ্রহণ।

২০০৯ সালে অনুষ্ঠিত ডারবান পর্যালোচনা সম্মেলনে একটি ১৪৩ দফা ঘোষণা আসে বর্ণবাদ ও সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে বৈষম্য মোকাবেলার জন্য। এছাড়াও এটি মানুষকে তাদের ধর্মের ওপর ভিত্তি করে স্টেরিওটাইপিংয়ের বিরুদ্ধে সতর্ক করে এবং ইসলাম-বিদ্বেষ, ইহুদি-বিদ্বেষ এবং খ্রিষ্টান-বিদ্বেষের কঠোর সমলোচনা করে। ২০১১ সালের ২২ সেপ্টেম্বর ঘোষণাপত্র ও কর্ম-পরিকল্পনা গ্রহণের দশম বার্ষিকী একটি একদিনের উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকের মাধ্যমে নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় গৃহীত একটি রাজনৈতিক ঘোষণায় বিশ্ব নেতৃবৃন্দ বর্ণবাদ, জাতিগত বৈষম্য, বিদ্বেষ এবং সংশ্লিষ্ট অসহিষ্ণুতার বিরুদ্ধে যুদ্ধকে তাদের দেশের জন্য একটি উচ্চ অগ্রাধিকার হিসেবে নেয়ার সংকল্প করেন।

নারী অধিকার

১৯৪৫ সালে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার পর থেকেই নারীদের জন্য সমতা-বিধান তাদের কাজের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হিসেবে গণ্য হয়ে এসেছে। জাতিসংঘ নারীদের মানবাধিকার প্রচার এবং সুরক্ষার জন্য বৈশ্বিক সংগ্রামে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। এটি নারীর বিরুদ্ধে সব ধরনের বৈষম্য এবং সহিংসতা নির্মূল এবং সকল ক্ষেত্রে নারীদের সম্পূর্ণ ও সমান অংশীদারিত্ব, অর্থনৈতিক, সামাজিক উন্নয়ন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে রাজনৈতিক ও জনজীবনে অংশগ্রহণের নিশ্চয়তার প্রচেষ্টায় নিয়োজিত।

২০১০ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ লিঙ্গ সমতা ও নারী ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে ইউএন-উইমেন গঠন করে। জাতিসংঘের সংস্কারসূচির অংশ হিসেবে ও বৃহত্তর প্রভাব আনয়নের জন্য সম্পদ ও ম্যান্ডেট একত্রীকরণের মাধ্যমে এই পদক্ষেপ নেয়া হয়েছিল। ইউএন-উইমেন উল্লেখযোগ্যভাবে নারী ও মেয়েশিশুদের জন্য সুযোগ প্রসারিত করতে এবং বিশ্বব্যাপী বৈষম্য মোকাবেলা করার জন্য জাতিসংঘের প্রচেষ্টা জোরদার করার লক্ষ্যে কাজ করে। এ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক মান এবং নিয়ম প্রণয়ন ইউএন-উইমেনের অন্যতম প্রধান ভূমিকা।

'নারী সামাজিক মর্যাদা কমিশন' নারীদের সমতা ও বৈষম্যহীনতা সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক নির্দেশিকা ও আইন সম্প্রসারিত করেছে। লক্ষণীয় যে, এর মধ্যে রয়েছে ১৯৭৯ সালের নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণ কনভেনশন এবং ১৯৯৯ সালের ঐচ্ছিক প্রটোকল কনভেনশন। তাছাড়াও এটি নারীর প্রতি সব ধরনের সহিংসতা দূরীকরণ ঘোষণা প্রস্তুত করেছে। ১৯৯৩ সালে সাধারণ পরিষদ কর্তৃক গৃহীত এই ঘোষণায় অন্যান্য

বিষয়ের মধ্যে নারীর প্রতি পরিবার বা সমাজের শারীরিক, যৌন বা মানসিক অত্যাচারকে এবং রাষ্ট্র দ্বারা সংগঠিত বা উপেক্ষিত অন্যায়-অত্যাচারকে 'সহিংসতা' হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে।

নারীর বিরুদ্ধে বৈষম্য দূরীকরণের কমিটি ২৩ জন স্বতন্ত্র বিশেষজ্ঞদের নিয়ে গঠিত একটি কর্মসত্তা, যা রাষ্ট্র দ্বারা ১৯৭৯ সালের 'নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণ কনভেনশনে'র বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ করে। এটি রাষ্ট্রপক্ষ দ্বারা নারী ও পুরুষ সমতার নীতির অগ্রগতি মূল্যায়ন সংক্রান্ত অর্পিত প্রতিবেদন বিবেচনা করে। এই কমিটি কনভেনশনের ঐচ্ছিক প্রটোকলের আওতায় যে কোনো ব্যক্তিগত বক্তব্য ও মতামত পর্যালোচনা এবং প্রয়োজনবোধে গোটা বিষয়টি অনুসন্ধান করতে পারে। এটি নারী প্রভাবিত হচ্ছে এমন কোনো বিষয়ে রাষ্ট্রপক্ষের কাছে প্রস্তাবনা পেশ করে, যার প্রতি রাষ্ট্রপক্ষের অধিক মনোযোগ প্রদান করা উচিত, যেমন নারী সহিংসতা।

এটি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার মানের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ এবং সেক্রেটারি জেনারেলের নারী সহিংসতার বিরুদ্ধে প্রচারণার কাজ করে; যেমন— বিশ্বের সব অংশে নারী ও মেয়েশিশুদের বিরুদ্ধে সব ধরনের সহিংসতা প্রতিরোধ এবং নির্মূল করার লক্ষ্যে গণসচেতনতা এবং রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও সম্পদ বৃদ্ধির লক্ষ্যে এটি কাজ করে। ইউনাইটি নারী ও সুশীল সমাজ সংগঠনের এই প্রচেষ্টা সমর্থন করে এবং ২০১৫ সালের শেষে পাঁচটি লক্ষ্য অর্জনের জন্য বেসরকারি খাতকে নিয়োজিত করে : জাতীয় আইন প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের মাধ্যমে নারী ও মেয়েশিশুদের বিরুদ্ধে সব ধরনের সহিংসতার দণ্ড প্রদান; জাতীয় কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ, নারী ও মেয়েশিশুদের বিরুদ্ধে সহিংসতার বিভিন্ন প্রকারের প্রাদুর্ভাবের ওপর তথ্য সংগ্রহ; সহিংসতা প্রতিরোধ ও নির্যাতিত নারী ও মেয়েশিশুদের সমর্থনে জাতীয় ও স্থানীয় ক্যাম্পেইন এবং সংঘাতময় পরিস্থিতিতে যৌন সহিংসতার সমস্যা মোকাবেলা।

শিশু অধিকার

অপুষ্টি ও রোগজনিত কারণে প্রতি বছর লাখ লাখ শিশু মারা যায়। আরও অসংখ্য মানুষ যুদ্ধ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, এইচআইভি/এইডস এবং সহিংসতা, শোষণ ও চরম নির্যাতনের শিকার হয়। লাখ লাখ শিশুর, বিশেষ করে মেয়েদের মানসম্পন্ন শিক্ষার সুযোগ নেই। জাতিসংঘ শিশু তহবিল, সেই সাথে ওএইচসিএইচআর এবং জাতিসংঘের অন্যান্য সংস্থা শিশু অধিকার কনভেনশনের বৈশ্বিক প্রতিশ্রুতি বজায় রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করে; শিশু অধিকার কনভেনশন সর্বজনীন নৈতিক নীতি ও শিশুদের প্রতি আচরণের আন্তর্জাতিক আইনগত মানের মূর্ত প্রতীক। কনভেনশন প্রদত্ত দায়িত্ব পালনে রাষ্ট্রগুলোর অগ্রগতি নিরীক্ষণের লক্ষ্যে এবং সেই বিষয়ে সরকারকে বিভিন্ন উপায় সুপারিশ প্রদানে কনভেনশনের অধীন ১৮ জন স্বাধীন বিশেষজ্ঞদের নিয়ে গঠিত শিশু অধিকার কমিটি নিয়মিতভাবে সভায় মিলিত হয়। এছাড়াও কমিটি সাধারণ মন্তব্য আকারে কনভেনশনের বিধানের ব্যাখ্যা দিয়ে থাকে।

২০০০ সালে সাধারণ পরিষদ কর্তৃক কনভেনশনে দুটি ঐচ্ছিক প্রটোকল গৃহীত হয়: একটি ১৮ বছরের কম বয়সী শিশুদের সশস্ত্র বাহিনীতে নিয়োগ বা যুদ্ধবিগ্রহে অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ করে এবং অন্যটি শিশু বিক্রয়, শিশু পতিতাবৃত্তি ও শিশু পর্নোগ্রাফি বিক্রয়

সংক্রান্ত শক্তিশালী নিষেধাজ্ঞা এবং জরিমানা জারি করে। ২০১১ সালে পরিষদ কর্তৃক গৃহীত একটি তৃতীয় ঐচ্ছিক প্রটোকল প্রতিটি শিশুকে কনভেনশনের অধীনে তাদের অধিকার লঙ্ঘন এবং প্রথম দুই প্রটোকল সংক্রান্ত অভিযোগ জমা দিতে একটি দাপ্তরিক পদ্ধতি প্রণয়ন করে। দাপ্তরিক যোগাযোগ পদ্ধতি-সংশ্লিষ্ট ঐচ্ছিক প্রটোকলে ৩৬ স্বাক্ষরকারী এবং ৬টি রাষ্ট্রপক্ষ রয়েছে; এটি জাতিসংঘের ১০ সদস্য রাষ্ট্র কর্তৃক সমর্থনপুষ্ট হলে কার্যকরী হবে।

শিশুশ্রম বিষয়ে জাতিসংঘ শিশুদের শোষণ এবং শারীরিক ও মানসিক বিকাশ বিপন্নকারী বিপজ্জনক অবস্থা থেকে রক্ষা করার প্রচেষ্টা করে, গুণগত শিক্ষা, পুষ্টি ও স্বাস্থ্য সেবা পেতে শিশুদের সহায়তা করে এবং দীর্ঘমেয়াদে শিশুশ্রম নির্মূলে অবিরত চেষ্টা করে। 'শিশুশ্রম দূরীকরণ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক কর্মসূচি' একটি আইএলও উদ্যোগ; এই কর্মসূচি কারিগরি সহযোগিতার মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং কর্মকাণ্ড সক্রিয় করতে সচেষ্ট। শিশুশ্রম প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে সরাসরি হস্তক্ষেপ একটি কার্যকরী উপায়; বিকল্প উপায়ের মধ্যে পিতা-মাতাদের জন্য যথাযোগ্য কর্মসংস্থান এবং শিশুদের পুনর্বাসন, শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ উল্লেখযোগ্য। ইউনিসেফ খুব বিপজ্জনক বা অবমাননাকর অবস্থায় কর্মরত শিশুশ্রমিকদের জন্য শিক্ষা, পরামর্শ ও সেবা দেয় এবং তাদের অধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে জোরালো পদক্ষেপ গ্রহণ করে। সাধারণ পরিষদ এবং মানবাধিকার কাউন্সিল উভয়ই সরকারগুলোকে শিশু অধিকার রক্ষা ও বিকাশের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণে আহ্বান জানায়, বিশেষত দুরূহ পরিস্থিতিতে নিমজ্জিত শিশুদের ক্ষেত্রে। তারা সেসব কর্মসূচি এবং পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করতে রাষ্ট্রের প্রতি আহ্বান করে আসছে, যা শিশুদের (বিশেষত যারা পরিবারবিহীন) সুরক্ষা ও সহায়তা প্রদান করে; যেমন—স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা ও সামাজিক সেবা নিশ্চিতকরণ, সেইসাথে যেখানে প্রয়োজন স্বেচ্ছা প্রত্যাবাসন, পরিবার অনুসন্ধান ও পুনর্মিলন। এছাড়াও সাধারণ পরিষদ ও মানবাধিকার কাউন্সিল সদস্য রাষ্ট্রগুলোকে শিশুদের সর্বোত্তম স্বার্থরক্ষাকে অগ্রাধিকার প্রদান করে থাকে।

শিশু বিক্রয়, শিশু পতিতাবৃত্তি ও শিশু পর্নোগ্রাফির বিরুদ্ধে নিয়োজিত বিশেষ দূত এবং পাশাপাশি শিশুদের বিরুদ্ধে সহিংসতা ও সশস্ত্র সংঘাতের বিরুদ্ধে নিয়োজিত মহাসচিবের বিশেষ প্রতিনিধি নিয়মিত সাধারণ পরিষদে এবং মানবাধিকার কাউন্সিলে প্রতিবেদন পেশ করে। এছাড়াও মহাসচিবের বিশেষ প্রতিনিধি নিরাপত্তা পরিষদে প্রতিবেদন পেশ করে।

শিশু সহিংসতা সংক্রান্ত বিশ্ব প্রতিবেদন, যা পূর্ববর্তী বছরের সাধারণ পরিষদে উপস্থাপিত হয়েছিল, প্রকাশের পর শিশু সহিংসতা সংশ্লিষ্ট মহাসচিবের বিশেষ প্রতিনিধির পদটি ২০০৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিবেদনটি প্রথমবার শিশুদের বিরুদ্ধে সব ধরনের সহিংসতার ভয়ঙ্কর মাত্রা ও প্রভাব প্রকাশ করে, যা সমস্যাটির সর্বজনীনতা এবং মাত্রাকে বিভিন্ন বিন্যাসে সকলের দৃষ্টিগোচরে আনে : আবাস ও পরিবার; বিদ্যালয়; সেবামূলক ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠান; কর্মক্ষেত্র এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠী। প্রতিবেদনের ১২টি সমন্বিত সুপারিশ ও কিছুসংখ্যক নির্দিষ্ট সুপারিশ পরবর্তী করণীয় কাজের জন্য একটি কার্যকর কাঠামো প্রদান করে। শিশু ও সশস্ত্র সংঘাতের জন্য মহাসচিবের বিশেষ প্রতিনিধির কর্মপরিধি, যা তিন বছরের জন্য পরিষদ কর্তৃক ১৯৯৬ সালে গৃহীত হয়, সর্বদা নবায়ন করা হয়, অতি সম্প্রতি ২০১২ সালে আরও তিন বছরের জন্য নবায়ন করা হয়েছে।

সংখ্যালঘুদের অধিকার

বিশ্বজুড়ে প্রায় এক বিলিয়ন বা ১০০ কোটি মানুষ সংখ্যালঘু গোষ্ঠীভুক্ত, যাদের অনেকেই বৈষম্য, সংঘাত ও অবহেলার শিকার। জাতীয়, জাতিতত্ত্বমূলক, ধর্মীয় এবং ভাষাগত গোষ্ঠীগুলোর আইনসঙ্গত আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করার মাধ্যমে মৌলিক মানবাধিকারের সুরক্ষা জোরদার হয়, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের সুরক্ষা ও বিকাশ ঘটে এবং সামগ্রিকভাবে সামাজিক স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি পায়। জাতিসংঘের জন্মলগ্ন থেকেই সংখ্যালঘুদের অধিকার তার মানবাধিকার আলোচ্যসূচিতে অগ্রাধিকার পেয়ে আসছে। সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর সদস্যদের মানবাধিকার রক্ষার নিশ্চয়তা বিশেষভাবে নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তির ২৭ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত হয়েছে। একই সাথে বৈষম্যহীনতা ও অংশীদারিত্বের নীতিমালায়ও তাদের মানবাধিকার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত, যা জাতিসংঘের সকল মানবাধিকার আইনের ভিত্তিস্বরূপ। জাতীয় বা জাতিগত, ধর্মীয় এবং ভাষাগত সংখ্যালঘুদের অধিকার ঘোষণাপত্র সাধারণ পরিষদে ১৯৯২ সালে গৃহীত হলে, তা জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়সূচিকে নতুন আস্থা ও সংশ্লিষ্ট কর্মীবাহিনীকে নব কর্মস্পৃহা দেয়।

জাতীয় বা জাতিগত, ধর্মীয় ও ভাষাগত সংখ্যালঘু সংক্রান্ত বিষয়ে উপযুক্ত পরিবেশে আলোচনা ও সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্য এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ভিত্তিক কর্মকাণ্ডে অবদান ও দক্ষতা প্রয়োগে সংখ্যালঘু বিষয়ক স্বাধীন বিশেষজ্ঞদের সহায়তা প্রদান করতে ২০০৭ সালে 'সংখ্যালঘু বিষয়ক ফোরাম' প্রতিষ্ঠিত হয়। ফোরামটি ঘোষণাপত্রের সফল বাস্তবায়নের জন্য সর্বোত্তম অনুশীলন, চ্যালেঞ্জ, সুযোগ ও উদ্যোগ শনাক্ত এবং বিশ্লেষণ করে থাকে। এটি বিষয়ভিত্তিক আলোচনা ও বিশ্লেষণের জন্য প্রতি বছর দু'দিনের জন্য বৈঠক করে থাকে, সংখ্যালঘু বিষয়ক স্বাধীন বিশেষজ্ঞ ফোরামের কাজ তদারকি করে এবং মানবাধিকার কাউন্সিলে সুপারিশ করে থাকে। মানবাধিকার কাউন্সিলের সভাপতি আঞ্চলিক গোষ্ঠীর সাথে আলোচনাপূর্বক ও আঞ্চলিক এলাকার প্রতিনিধিত্ব বিবেচনায় রেখে আবর্তনের ভিত্তিতে প্রতিটি সেশনের জন্য সংখ্যালঘু বিষয়ক বিশেষজ্ঞদের মাঝ থেকে একজন ফোরাম সভাপতিকে নিয়োগ দিয়ে থাকে।

আদিবাসী জনগোষ্ঠী

বিশ্বের সবচেয়ে সুবিধাবঞ্চিত গোষ্ঠীরূপে বিবেচিত আদিবাসী জনগণের সমস্যাকে জাতিসংঘ সর্বদাই প্রাধান্য দিয়ে থাকে। এই আদিবাসী জনগণকে প্রথম জনগোষ্ঠী, গোত্রভুক্ত পার্বত্য জনগণ, আদিম মানুষ প্রভৃতি নামেও চিহ্নিত করা হয়। বিশ্বের পাঁচটি মহাদেশের ৭০টিরও বেশি দেশে বসবাসরত পাঁচ হাজার আদিবাসী গোষ্ঠীর মানুষের সর্বমোট জনসংখ্যা প্রায় ৩৭ কোটি। নীতিনির্ধারণী প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ না থাকায় এদের অনেকে প্রান্তিক, শোষিত ও বলপূর্বক একত্রিত। উপরন্তু, নিজেদের অধিকারের কথা বলতে গিয়ে তাদেরকে দমন, নির্যাতন, নিপীড়ন ও হত্যার শিকার হতে হয়েছে। শান্তির ভয়ে অনেক সময় তারা স্বীয় ভিটেমাটি ত্যাগ করে শরণার্থী হয়েছে; অনেক সময় নিজেদের ভাষা ও ঐতিহ্যবাহী রীতি-নীতি পরিত্যাগ করে নিজেদের পরিচয় গোপন করেছে।

১৯৮২ সালে মানবাধিকার কমিশনের উপকমিশন একটি আদিবাসী জনগোষ্ঠী বিষয়ক ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন করে, যা আদিবাসী জনগণের অধিকার বিষয়ক ঘোষণার খসড়া তৈরি

করেছে। ১৯৯২ সালে অনুষ্ঠিত 'ধরিত্রী সম্মেলনে' আদিবাসী জনগণের সম্মিলিত কণ্ঠস্বর শুরু হয়েছে যখন তারা তাদের এলাকা, ভূমি ও পরিবেশের অবনতিকর অবস্থা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে। ইউএনডিপি, ইউনিসেফ, ইফাদ, ইউনেস্কো, বিশ্বব্যাংক এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বিভিন্ন আদিবাসী গোষ্ঠীর স্বাস্থ্য ও সাক্ষরতার উন্নতি এবং তাদের ভূখণ্ডের অধিকার রক্ষা ও পরিবেশের অবনতি রোধকল্পে কর্মসূচি গ্রহণ করে। বিশ্ব আদিবাসীদের আন্তর্জাতিক বর্ষের (১৯৯৩) পরিসমাপ্তিতে সাধারণ পরিষদ আদিবাসী জনগণের জীবনমান উন্নয়নের নিমিত্তে ও তাদের অংশীদারিত্বের বিকাশ ঘটাতে ১৯৯৫-২০০৪ সময়কালকে 'বিশ্ব আদিবাসী জনগণের আন্তর্জাতিক দশক' হিসেবে ঘোষণা ও পালন করে এবং পরবর্তীকালে ২০০৫-২০১৫ সময়কালকে 'দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক আদিবাসী দশক' হিসেবে ঘোষণা দেয়। আদিবাসী সংক্রান্ত বিষয়ে অধিক আলোকপাত করার ফলে ২০০০ সালে ইকোসকের একটি সম্পূরক অঙ্গ হিসেবে 'আদিবাসী সংক্রান্ত বিষয়ে একটি স্থায়ী ফোরাম' প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সমান অনুপাতে সরকারি ও আদিবাসী বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে একটি ১৬ সদস্যের ফোরাম তৈরি করা হয়, যা ইকোসককে পরামর্শ দেয়; জাতিসংঘের সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমকে সমন্বয় করে এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন, সংস্কৃতি, শিক্ষা, পরিবেশ, স্বাস্থ্য ও মানবাধিকার বিষয়ে আদিবাসী উদ্বেগগুলোকে বিবেচনায় রাখে। এর পাশাপাশি আদিবাসী সমস্যা-সংশিষ্ট একটি 'আন্তঃসংস্থা সমর্থন গ্রুপ' গঠন করা হয়।

আদিবাসীদের অধিকার সংক্রান্ত ল্যান্ডমার্ক ঘোষণা ২০০৭ সালে সাধারণ পরিষদ কর্তৃক গৃহীত হয়। এই ঘোষণাটি আদিবাসীদের ব্যক্তিগত ও গোত্রভিত্তিক অধিকার নির্দেশ করে, যার মধ্যে পরিচয়, ভাষা, সংস্কৃতি, কর্মসংস্থান, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা, ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত। একই ঘোষণা তাদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য বজায় রাখা ও শক্তিশালী করার অধিকার এবং তাদের নিজস্ব চাহিদা ও আশা-আকাঙ্ক্ষার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ উন্নয়নের ওপর জোর দেয়। এটি আদিবাসীদের প্রতি বৈষম্যকেও নিষিদ্ধ করে এবং স্বকীয়তা বজায় রাখা ও স্বীয় চাহিদা মোতাবেক অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণসহ নিজেদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট সব ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার দেয়।

ওএইচসিএইচআর এসব উন্নয়নের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে এবং আলোচিত ঘোষণার বাস্তবায়ন এই অফিসে অগ্রাধিকার পায়। আদিবাসী সংক্রান্ত বিষয়ে 'জাতিসংঘ আন্তঃসংস্থা সমর্থন গ্রুপ' খুবই কার্যকর ও সক্রিয় অবদান রাখে। এটি জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্র দল ও মাঠ পর্যায়ের ওএইচসিএইচআর কর্মকর্তা-কর্মীদের জন্য আদিবাসী ইস্যুতে প্রশিক্ষণ পরিচালনা করে। ওএইচসিআর আদিবাসীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং আদিবাসী জনগোষ্ঠীর স্বেচ্ছাধীন তহবিলের ট্রাস্টি বোর্ডকে সহায়তা প্রদান করে। আদিবাসী সম্প্রদায়ের পাঁচজন প্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত এই তহবিলটি আদিবাসী ইস্যুতে স্থায়ী ফোরামের বার্ষিক অধিবেশনে আদিবাসী সম্প্রদায়ের ও প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণ সমর্থন করে এবং আদিবাসীদের অধিকার-সংশ্লিষ্ট বিশেষ প্রক্রিয়াতেও এই তহবিল কার্যকর।

২০০৭ সালে গৃহীত 'পাঁচ বিশেষ প্রক্রিয়া' আদিবাসীদের অধিকার-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মানবাধিকার কাউন্সিলকে সাহায্য নেয়। ওএইচসিআর বিশেষজ্ঞ প্রক্রিয়াকে সাহায্য করে এবং মানবাধিকার ও আদিবাসীদের মৌলিক স্বাধীনতা প্রশ্নে বিশেষ দূতকে সহায়তা

করে। আদিবাসীদের অধিকার বৃদ্ধির জন্য এটা দেশীয় ও আঞ্চলিক কার্যক্রম হাতে নেয়।

অফিস আইনি উদ্যোগকে সমর্থন প্রদান করে এবং নিষ্কর্ষ শিল্প ও বিচ্ছিন্ন আদিবাসীদের অধিকারের মতো বিষয়ভিত্তিক কাজে নিয়োজিত হয়।

প্রতিবন্ধী মানুষ

বিশ্বের জনসংখ্যার প্রায় দশ শতাংশ বা ৬৫ কোটি মানুষ শারীরিক ও মানসিকভাবে বিকল। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ৮০ শতাংশের কাছাকাছি উন্নয়নশীল দেশে বাস করে। তারা প্রায়ই সমাজের মূলধারা থেকে বাদ পড়ে যায়। বৈষম্য বিভিন্ন রূপ নেয়; শিক্ষা বা কাজের সুযোগের অস্বীকার এবং শারীরিক ও সামাজিক বাধা আরোপের মাধ্যমে পৃথকীকরণ ও বিচ্ছিন্নতা। ফলে প্রতিবন্ধীদের সুপ্ত গুণাবলি ও সক্ষমতা থেকে সমাজ ও বিশ্ব বঞ্চিত হচ্ছে। প্রতিবন্ধী-সংশ্লিষ্ট উপলব্ধি এবং ধারণা পরিবর্তনের লক্ষ্যে সমাজের সর্বস্তরে মূল্যবোধ ও বিচার-বুদ্ধির বিকাশ প্রয়োজন।

শুরু থেকে জাতিসংঘ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মর্যাদা ও জীবন উন্নত করার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। প্রতিবন্ধীদের মঙ্গল ও অধিকার-সংশ্লিষ্ট জাতিসংঘের উদ্বেগ সংস্থাটির মানবাধিকার, মৌলিক স্বাধীনতা ও সাম্যের মূল নীতিতে নিহিত।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য মানবাধিকারের ধারণা সত্তরের দশকে ব্যাপকভাবে আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতা পায়। মানসিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সংশ্লিষ্ট ঘোষণা-১৯৭১ এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সংশ্লিষ্ট ঘোষণা-১৯৭৫ গ্রহণের মাধ্যমে সাধারণ পরিষদে সমান ব্যবহার এবং পরিসেবা প্রাপ্তির সমান সুযোগ সংক্রান্ত মান নির্ধারণ করে। ফলস্বরূপ, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সামাজিক সংহতি ত্বরান্বিত হয়। 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আন্তর্জাতিক বছর'-১৯৮১ সাধারণ পরিষদ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিষয়ে বিশ্ব কর্মসূচি গ্রহণ করে, যেটা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার বিকাশের নীতিমালা। এই প্রোগ্রাম আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে দুটি লক্ষ্য চিহ্নিত করে : সুযোগের সমতা এবং সামাজিক জীবন উন্নয়নে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অংশগ্রহণ।

জাতিসংঘের 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের দশকের' (১৯৮৩-১৯৯২) মুখ্য ফলাফলরূপে 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সুযোগের সমতা-সংশ্লিষ্ট মানসম্মত বিধিমালা' ১৯৯৩ সালে সাধারণ পরিষদ কর্তৃক গৃহীত হয়েছিল, যা নীতি তৈরির জন্য একটি সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে এবং কারিগরি ও অর্থনৈতিক সহযোগিতার জন্য একটি ভিত্তি প্রদান করে। একটি বিশেষ দূত নিয়মগুলো বাস্তবায়ন নিরীক্ষণ করে এবং ইকোসক-এর একটি সম্পূরক অঙ্গ 'সামাজিক উন্নয়ন কমিশনের' কাছে বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ করে।

মানসিক অসুস্থ ব্যক্তির সুরক্ষার জন্য তৈরি মান 'মানসিক অসুস্থ ব্যক্তিদের সুরক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়নে নীতিমালা' ১৯৯১ সালে সাধারণ পরিষদে গৃহীত হয়। তিন বছর পর বিশ্ব কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সাধারণ পরিষদ 'সকলের জন্য সমাজ' নির্মাণে একটি দীর্ঘমেয়াদি কৌশল অনুমোদন করে।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার-সংক্রান্ত কনভেনশন বা চুক্তি এবং ঐচ্ছিক প্রটোকল ২০০৬ সালে গৃহীত হয় এবং ২০০৭ সালে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর স্বাক্ষরের জন্য উন্মুক্ত করা হয়। ২০১৩ সালের ১৫ জুন নাগাদ এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারীর সংখ্যা ছিল ১৫৫ ও ঐচ্ছিক প্রটোকলে ৯১ এবং চুক্তিতে ১৩২টি দল ও ঐচ্ছিক প্রটোকলে ৭৭টি দল ছিল।

চুক্তির সমর্থনে এই স্বাক্ষর ও অনুস্বাক্ষর জাতিসংঘের ইতিহাসে সর্বোচ্চ সংখ্যা বলে গণ্য করা হয়। চুক্তিটি ২০০৮ সাল থেকে কার্যকরী হয়। এটি ২১ শতকের প্রথম সমন্বিত মানবাধিকার চুক্তি, যা আঞ্চলিক সংস্থা-সংগঠন কর্তৃক স্বাক্ষরের জন্য উন্মুক্ত করা হয়।

এই চুক্তি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতি সর্বসাধারণের গতানুগতিক মনোভাব ও আচার-আচরণের ক্ষেত্রে একটি যুগান্তকারী পরিবর্তনের সূচনা করে; কনভেনশনটি প্রতিবন্ধী গোষ্ঠীদের জীবনধারা ও মর্যাদাকে এক উন্নত পর্যায়ে নিয়ে যায়, যেখানে প্রতিবন্ধীদের এখন আর দান, চিকিৎসা বা সামাজিক সুরক্ষার বস্তু হিসেবে গণ্য করার সুযোগ নেই; বরঞ্চ তারা এখন সমাজের অধিকার সম্পন্ন সক্রিয় সদস্য হিসেবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্বাধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণে পারদর্শী। ওএইচসিআর 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার কমিটি' ও চুক্তিটির আন্তর্জাতিক পরিবীক্ষণ প্রক্রিয়া সংক্রান্ত কার্যাবলির সচিবালয় হিসেবে পরিচিত; জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ক বিভাগ নিউইয়র্কে সদস্য রাষ্ট্রপক্ষের নিমিত্তে সম্মেলন আয়োজন করে।

মানবাধিকারের বৃহত্তম কাঠামোর আওতায় ক্রমবর্ধমান তথ্য-উপাত্তের মজুত জাতীয় উন্নয়নের আঙ্গিকে প্রতিবন্ধীদের সমস্যা সমাধানের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে। জাতিসংঘ প্রতিবন্ধীদের ইস্যুতে বৃহত্তর মানবাধিকার সংক্রান্ত সচেতনতা ও জাতীয় সক্ষমতা প্রসারের ক্ষেত্রে সরকার এনজিও, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও পেশাজীবী সমাজের সাথে নিবিড়ভাবে কাজ করে থাকে। এই কাজে জাতিসংঘ প্রতিবন্ধী সমস্যাগুলোকে এমডিজিসহ আন্তর্জাতিক উন্নয়ন এজেন্ডার আওতায় অগ্রসর হতে পদক্ষেপ নেয়। প্রতিবন্ধী-সংশ্লিষ্ট সুযোগের সাম্যতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান জনগণের সমর্থন তথ্যসেবার ও প্রাতিষ্ঠানিক সেবার উন্নতির ওপর অধিক নজর দেয়। সার্বিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় প্রতিবন্ধী ইস্যুগুলো অগ্রসরমান করতে জাতীয় সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে জাতিসংঘ সদস্য রাষ্ট্রগুলোকে সহায়তা করে থাকে।

অভিবাসী শ্রমজীবী

সাড়ে সতেরো কোটির অধিক জনগোষ্ঠী, যাদের মধ্যে রয়েছে অভিবাসী শ্রমজীবী, শরণার্থী, আশ্রয়প্রার্থী, স্থায়ী অভিবাসী ও এ ধরনের আরো অনেকে নিজ জন্মভূমির পরিবর্তে অন্য দেশে জীবনযাপন করে চলেছে। তাদের অনেকে অভিবাসী শ্রমজীবী। 'সকল অভিবাসী শ্রমজীবী ও তাদের পরিবারের সদস্যবর্গের অধিকারের সুরক্ষা সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক কনভেশনের' দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ অনুযায়ী 'সেই ব্যক্তিকে অভিবাসী শ্রমিক বলা হয়, যিনি তার দেশের পরিবর্তে অন্য কোনো দেশে জীবিকা নির্বাহের জন্য বেতনভুক্ত কাজে নিয়োজিত।' সীমান্তে কর্মরত শ্রমজীবী, অস্থায়ী শ্রমজীবী, সমুদ্রকেন্দ্রিক জীবিকা অর্জনকারী, সামুদ্রিক যানে কর্মরত ব্যক্তিবর্গ, বিশেষ প্রকল্পে কর্মরত অভিবাসী ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের শ্রমজীবী মানুষ ও তাদের পরিবারবর্গের ক্ষেত্রে আলোচিত কনভেনশনটি বিশেষ কিছু অধিকারপ্রাপ্তির নিশ্চয়তা দান করে।

দশ বছরের আলোপ-আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৯০ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ কর্তৃক অভিবাসী শ্রমজীবী কনভেনশনটি গৃহীত হয়। নিবন্ধিত ও অনিবন্ধিত উভয় অভিবাসী শ্রমিক ও তাদের পরিবারবর্গের অধিকারের ক্ষেত্রে এই কনভেনশনটি সমভাবে প্রযোজ্য। অভিবাসী শ্রমজীবীদের বহিষ্কার করা এবং তাদের পরিচিতিমূলক কাগজপত্র,

কাজের ছাড়পত্র অথবা পাসপোর্ট ইত্যাদি ধ্বংস করা এই কনভেনশন অনুযায়ী একটি অবৈধ ও গর্হিত পদক্ষেপ। অন্য যে কোনো জাতির অধিবাসীদের মতো একই ধরনের বেতন-ভাতা, সামাজিক সুযোগ-সুবিধা এবং চিকিৎসা সেবা একইভাবে শ্রমজীবী অভিবাসীদের বেলাও প্রযোজ্য; একইভাবে তাদের অধিকার রয়েছে কর্মচারী ইউনিয়নে অংশগ্রহণ করার এবং কাজের সমাপ্তিতে আয়ের অর্থ জমা ও ব্যক্তিগত জিনিসপত্র নতুন স্থানে স্থানান্তর করার। জন্মনিবন্ধন, জাতীয়তা এবং শিক্ষা প্রাপ্তিতেও এই কনভেনশন অভিবাসী শ্রমজীবীদের সন্তানদের অধিকার দান করে।

২০০৩ সালে কার্যকরী হওয়া উল্লিখিত কনভেনশনটি ৩৫ স্বাক্ষরকারী ও ৪৬ দল কর্তৃক সমর্থনপুষ্ট। স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রগুলো অভিবাসী শ্রমজীবীদের কমিটির মাধ্যমে এই কনভেনশনের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ করে থাকে।

১২টি জাতিসংঘ সংস্থা, বিশ্বব্যাংক ও অভিবাসী সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক সংস্থার সমন্বয়ে গঠিত ১৪ সদস্যবিশিষ্ট বিশ্ব অভিবাসী গ্রুপ অভিবাসী সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক নিয়মনীতির প্রসারে এবং আন্তর্জাতিক অভিবাসনের ক্ষেত্রে সমন্বিত কার্যক্রম উৎসাহে কাজ করে যাচ্ছে।

বিচার প্রশাসন

বিচারিক প্রক্রিয়ায় মানবাধিকার সুরক্ষা ও শক্তিশালী করতে জাতিসংঘ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তদন্ত, গ্রেফতার, অভিযুক্ত, কারাবন্দি ইত্যাদি সকল পর্যায় রাষ্ট্র কর্তৃপক্ষকে আইন অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মানবাধিকার যে কোনো উপায়ে রক্ষা করতে হবে।

জাতীয় আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে জাতিসংঘ বেশ কিছু মান ও নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। কারাবন্দিদের প্রতি আচার-আচরণ, বন্দি কিশোরদের সুরক্ষা, পুলিশ কর্তৃক অস্ত্রের ব্যবহার, আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তাদের আচার-ব্যবহার, আইনবিদদের ভূমিকা এবং বিচারের স্বাধীনতা ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে উপরোক্ত মান ও নীতিমালাগুলো প্রযোজ্য। এই মান ও নীতিমালার অনেকগুলো অপরাধ প্রতিরোধ ও ফৌজদারি ন্যায়বিচার সংক্রান্ত জাতিসংঘ কমিশন এবং আন্তর্জাতিক অপরাধ প্রতিরোধ কেন্দ্র কর্তৃক প্রণীত।

ওএইচসিএইচআর কারিগরি সহায়তাভিত্তিক একটি কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে, যার মূল উদ্দেশ্য হলো আইন প্রণয়ন, বিচারকবৃন্দ, আইনজীবী, আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তা, কারা কর্মকর্তা এবং সেনাসদস্য—এদের ক্ষেত্রে মানবাধিকার সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ দান।

২০১৩ সালের মে নাগাদ বিচারিক প্রশাসনের ক্ষেত্রে ২৫টি আন্তর্জাতিক বিধিবিধান কার্যকরী ছিল। এদের মধ্যে রয়েছে : Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners, Basic Principles for the Treatment of Prisoners, Body of Principles for the Protection of All Person's under Any From of Detention or Imprisonment, United Nation's Rules for the Protection of juveniles Deprived of their Liberty, Safeguards Guaranteeing Protection of the Rights of those Facing the Death Penalty, Code of Conduct for Law Enforcement Officials, Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials, Basic Principles on the Role of Lawyers, Guidelines on the Role of Prosecutors, Basic Principles

and Guidelines on the Rights to a Remedy and Reparation Ges the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance। (এ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ তালিকার জন্য দেখুন : www.ohchr.org/ EN/Professional-Interest/Pages/ UinversalHumanRightsInstruments.aspx)

জাতিসংঘ মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনারের দপ্তর–অগ্রাধিকার

জাতিসংঘের চেষ্টা সত্ত্বেও বিশ্বব্যাপী মানবাধিকারের ব্যাপক ও মারাত্মক লঙ্ঘন অব্যাহত রয়েছে। সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণার ছয় দশক অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও মানবাধিকারের বিস্তৃত লঙ্ঘনের খবর প্রায়শই শোনা যায়। মানবাধিকার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি ও এ সংক্রান্ত সমস্যার তদারকি এ ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। উল্লেখ্য, শিশু অনাচার, নারী নির্যাতন ও নারী অনাচার কিছুদিন পূর্বেও ঐতিহ্যগত মানদণ্ডে গ্রহণযোগ্য আচরণ বলে বিবেচিত ছিল।

প্রচার ও সুরক্ষায় মানবাধিকার আগের চেয়ে শক্তিশালী হয়েছে এবং সামাজিক ন্যায়বিচার, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও গণতন্ত্রের বিকাশের যে কোনো পদক্ষেপ বর্তমানে মানবাধিকারের সাথে সম্পর্কিত। মানবাধিকার জাতিসংঘের সকল নীতি ও কর্মসূচিতে একটি অবিচ্ছেদ্য ও অপরিহার্য ইস্যুরূপে বিবেচিত। জাতিসংঘের অংশীদারদের সহযোগিতা ও সমন্বয়ে ওএইচসিএইচআর কর্তৃক গৃহীত সকল কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়িত সকল কার্যক্রম মানবাধিকারের প্রশ্নে জাতিসংঘের শক্তিশালী অবস্থান ও কার্যকরী প্রাপ্তির সক্ষমতার পরিচায়ক।

ওএইচসিএইচআর সমর্থিত মানবাধিকার সংশ্লিষ্ট কারিগরি সহযোগিতা কর্মসূচি গণতন্ত্র, উন্নয়ন ও মানবাধিকার প্রসারের লক্ষ্যে কতগুলো প্রকল্প পরিচালনা করে, যার মাধ্যমে একই সাথে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর আইন ও বিচারের ক্ষেত্রে মানবাধিকার সংক্রান্ত সক্ষমতা শক্তিশালী হয়। এই কর্মসূচি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার পদ্ধতি বাস্তবায়নের সমর্থনে উৎসাহ দান করে। কর্মসূচিটি চারটি মুখ্য বিষয়ে গুরুত্ব দেয় : বিচার প্রশাসন, মানবাধিকার শিক্ষা, জাতীয় প্রতিষ্ঠান ও জাতীয় কর্মপরিকল্পনা। মানবাধিকার সংশ্লিষ্ট কারিগরি সহযোগিতার জন্য গঠিত স্বেচ্ছাসেবী তহবিলের দ্বারা প্রধানত এই কর্মসূচিটি পরিচালিত হয়।

২০১২-১৩ বছরের ওএইচসিএইচআর ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত :

- লিঙ্গ, ধর্ম ও আর্থিক অসচ্ছলতা সম্পর্কিত যে কোনো বৈষম্যের প্রতিরোধ;
- বিচারহীনতা প্রতিরোধ, জবাবদিহি, আইনের শাসন এবং গণতান্ত্রিক সমাজ;
- অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সুরক্ষা, বৈষম্য প্রতিরোধ ও দারিদ্র্য; নিরসন, একই সাথে খাদ্য ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা আমলে নেয়া;
- অভিবাসনের ক্ষেত্রে মানবাধিকার সংরক্ষণ ও সুরক্ষা;
- সহিংস ও নিরাপত্তাহীন পরিস্থিতিতে মানবাধিকার সুরক্ষা;
- মানবাধিকার পদ্ধতি ও কার্যক্রম শক্তিশালী করা এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের ক্রমবর্ধমান প্রসার।

৫. মানবাধিকার কর্মসূচি

সিরিয়া-আরব প্রজাতন্ত্রের অন্তর্গত অভ্যন্তরীণ সশস্ত্র সংঘাতময় স্থান হিসেবে বিবেচ্য আল-সাদ্দাদিতে বিশ্ব খাদ্য সংস্থার কাছ থেকে কিছু বালককে খাদ্য সহায়তা নিতে দেখা যাচ্ছে। (৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৩, ডব্লিউএফপি/আবীর এতেফা)

যেহেতু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে ইউরোপে ব্যাপক আকারে ক্ষয়ক্ষতি ও জনসংখ্যা স্থানান্তরের পরবর্তীকালে জাতিসংঘ প্রথম মানবিক ত্রাণ কার্যক্রম সমন্বয় করেছিল, এই আন্তর্জাতিক সংস্থাটি প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগ মোকাবেলায় আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে সহায়তা দিয়ে এসেছে, যা সদস্য রাষ্ট্রগুলোর একার পক্ষে করা সম্ভব নয়। বর্তমান সময়ে জাতিসংঘ জরুরি ত্রাণ ও দীর্ঘমেয়াদি পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিচালনাকারী সর্ববৃহৎ সংস্থা, অন্য অর্থে জরুরি পরিস্থিতিতে সংস্থাটি সরকারগুলোর ক্ষেত্রে একটি কার্যকরী অনুঘটক।

মানবসৃষ্ট ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রায়ই লাখ লাখ মানুষকে নিজেদের বসতভিটা থেকে উচ্ছেদ করে। আফগানিস্তান, সোমালিয়া, আরব প্রজাতন্ত্র ও অনেক দেশে যুদ্ধবিগ্রহ এবং সহিংসতার কারণে সমগ্র জনগোষ্ঠীর দেশান্তর বর্তমান বিশ্বে একটি আন্তর্জাতিক আশঙ্কা। উদাহরণস্বরূপ : গত ১০০ বছরে সংগঠিত ১০টি বিধ্বংসী প্রাকৃতিক দুর্যোগের তিনটি গত এক দশকে সংঘটিত হয় :

- ভারত মহাসাগরের সুনামি, ২০০৪
- মিয়ানমারের নার্গিস ঘূর্ণিঝড়, ২০০৮ ও
- ভূমিকম্প আক্রান্ত হাইতি, ২০১২

এই দুর্যোগগুলোর ফলে ছয় লক্ষাধিক মানুষ প্রাণ হারায়। গত দশকে প্রাকৃতিক দুর্যোগে নিহত ৯৭ শতাংশের বেশি মানুষ উন্নয়নশীল দেশের অধিবাসী; দারিদ্র্য, মাত্রাতিরিক্ত জনসংখ্যা ও পরিবেশগত দুরবস্থা কীভাবে মানুষের ভোগান্তি বৃদ্ধি করে উপরোক্ত তথ্যটি এর একটি বড় প্রমাণ।

দুর্যোগ আঘাত হানার পরে জাতিসংঘ ও এর সংশ্লিষ্ট অঙ্গ প্রতিষ্ঠানগুলো মানবিক সহায়তা কার্যক্রমে নিয়োজিত হয়। ২০১০ সালের জানুয়ারিতে ভূমিকম্পে আক্রান্ত হাইতিতে দুই লাখ ২০ হাজার মানুষের প্রাণহানি ঘটে এবং ১৫ লাখের মতো মানুষ গৃহহারা হয়। জাতিসংঘের নিজস্ব ১০২ জন স্টাফের প্রাণহানি সত্ত্বেও আন্তর্জাতিক সংস্থাটি ৭২ ঘণ্টার মধ্যে চাহিদা নিরূপণ কার্যক্রম সম্পন্ন করে এবং আক্রান্ত এলাকায় ত্রাণ ও পুনর্বাসন টিম প্রেরণ করে। আন্তর্জাতিক মানবিক অংশীদারদের সহযোগিতায় জাতিসংঘ ও হাইতিতে অবস্থিত স্টাবিলাইজেশন মিশন (MINUSTAH) গৃহহারাদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে, পাশাপাশি লাখ লাখ আক্রান্তদের জন্য খাদ্য, পানীয় ও চিকিৎসা সহায়তা দেয়। ২০১২ সালের ডিসেম্বর নাগাদ ভূমিকম্পের কারণে স্থানান্তরিত আক্রান্তদের ৮০ শতাংশ ক্যাম্প ত্যাগ করে; কিন্তু তার পরেও তিন লাখ ৫০ হাজার মানুষ ক্যাম্পে থেকে যায়। ২০১০ সালে কলেরা মহামারী মোকাবেলায় মিনুস্থা হাইতি সরকার ও এর জাতিসংঘ অঙ্গ সংস্থাগুলোকে প্রয়োজনীয় রসদ ও আনুষাঙ্গিক সম্পদ দিয়ে সহায়তা করে।

২০১০ সালের শেষে পাকিস্তানে সংঘটিত গ্রীষ্মকালীন বন্যায় হাজার হাজার গৃহহারা মানুষ ক্যাম্পে আশ্রয় নেয় এবং আরো হাজার হাজার মানুষ সাহায্য-সহযোগিতা-বঞ্চিত থেকে যায়। জাতিসংঘ শিশু তহবিল ও এর সহযোগী সংস্থাগুলো প্রায় ৩০ লাখ আক্রান্তদের প্রতিদিন পানি সরবরাহ করে এবং ১৫ লাখ ক্ষতিগ্রস্তকে পয়ঃনিষ্কাশন ক্ষেত্রে সহায়তা দেয়। একই সাথে, ইউনিসেফ শিশুদের শিক্ষা দানের জন্য ১৫৫০টি অস্থায়ী শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সহযোগিতায় ইউনিসেফ ৯০ লাখের বেশি শিশুর জন্য স্বাস্থ্য টিকা দান করে, পাশাপাশি জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল লিঙ্গ সংক্রান্ত সহিংসতা প্রতিরোধে বিভিন্ন কার্যক্রম সমন্বিত করে।

২০১১ সালের মার্চ মাসে ভূমিকম্প ও সুনামি আক্রান্ত জাপানের ফুকুশিমা পারমাণবিক কেন্দ্রে জাতিসংঘ জাপান সরকারকে ত্রাণ কর্মকাণ্ডে সহায়তার জন্য একটি ত্রাণ ও পুনর্বাসন টিম জাপানে প্রেরণ করে। বিশ্ব খাদ্য সংস্থা জাপান সরকারকে ত্রাণ সামগ্রী পাঠায়; খাদ্য ও কৃষি সংস্থা, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থা খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়ে সংশ্লিষ্ট পদক্ষেপ নেয়। আইএইএ উদ্ভিদের কাছাকাছি বিকিরণ নিরীক্ষণ করে এবং প্রতিকার ও সংক্রমণমুক্ত, উপশম কার্যক্রম রেডিওলজিক্যাল ম্যাপিং এবং বিকিরণ পর্যবেক্ষণের সময় উৎপন্ন বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় ফুকুশিমাকে সহায়তা বা সমর্থন করে।

২০১২ সালে জাতিসংঘের মানবিক বিষয় সমন্বয় সংশ্লিষ্ট কার্যালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত কেন্দ্রীয় জরুরি মোকাবেলা তহবিল জরুরি মোকাবেলা কার্যক্রমের জন্য ৩১ কোটি ৯০ লাখ মার্কিন ডলার বরাদ্দ করে। এর মধ্যে চার কোটি মার্কিন ডলারের অধিক অর্থ সশস্ত্র সংঘাত, জনসংখ্যা স্থানান্তর ও খাদ্য অনিরাপত্তা থেকে উদ্ভূত মারাত্মক মানবিক অবস্থা মোকাবেলায় দক্ষিণ সুদান সরকারকে বরাদ্দ করে। এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে, জাতিসংঘ মানবিক আগাম সতর্ক কর্মসূচি এবং জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক দুর্যোগ নিরসন কৌশলের মাধ্যমে জাতিসংঘ মানবিক বিপর্যয় প্রতিরোধ ও এর কুফল উপশমকল্পে কাজ করে যায়। খাদ্য ও কৃষি সংস্থা আসন্ন দুর্ভিক্ষ এবং খাদ্য ও কৃষি সম্পর্কিত সমস্যা পর্যবেক্ষণ করে এবং বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা সাইক্লোন ও খরা সম্পর্কিত পর্যবেক্ষণ কাজে নিয়োজিত থাকে। জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি দুর্যোগপ্রবণ দেশগুলোকে আপদকালীন পরিকল্পনা ও অন্যান্য দুর্যোগ প্রস্তুতি পদক্ষেপ নিতে সহায়তা করে।

মানবিক কার্যক্রম সমন্বয়

১৯৯০ দশক থেকে বিশ্বে গৃহযুদ্ধের সংখ্যা ও ধ্বংসলীলা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। এর ফলে ব্যাপক মানবিক বিপর্যয় দেখা দেয়, যেমন— প্রাণহানি, জনগোষ্ঠীর স্থানান্তর, বৃহত্তর রাজনীতিক ও সশস্ত্র পরিবেশে সামাজিক ক্ষয়ক্ষতি। এ ধরনের জটিল জরুরি অবস্থা সত্বর ও কার্যকরী মোকাবেলায় জাতিসংঘ এর সক্ষমতা বহুলাংশে বৃদ্ধি করেছে। আন্তর্জাতিক মানবিক বিপর্যয় মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সমন্বয়ের জন্য সাধারণ পরিষদ ১৯৯১ সালে একটি আন্তঃসংস্থা স্থায়ী কমিটি প্রতিষ্ঠা করে। জাতিসংঘ জরুরি ত্রাণ সমন্বয়কারী এ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রমের কেন্দ্রীয় ব্যক্তি, যিনি মানবিক বিপর্যয়-সংশ্লিষ্ট মুখ্য নীতি-উপদেষ্টা, সমন্বয়ক ও পরামর্শক হিসেবে সদা কর্মরত। জরুরি ত্রাণ সমন্বয়কারী মানবিক বিষয়ে সমন্বয় সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের প্রধান; যেটি মানবিক বিপর্যয়

যাবতীয় সহায়তা কার্যাবলি সমন্বয় করে থাকে, যে কর্মকাণ্ডে কোনো একক কর্মসংস্থা দায়িত্বপ্রাপ্ত ও সক্ষম নয়।

জটিল জরুরি বিপর্যয় মোকাবেলায় একই সাথে অনেক আন্তর্জাতিক গোষ্ঠী ভূমিকা রাখতে চান, যাদের মধ্যে সরকার, বেসরকারি সংস্থা ও জাতিসংঘের অঙ্গ সংস্থা উল্লেখযোগ্য। এ ক্ষেত্রে ওসিএইচএ তড়িৎ ও কার্যকরী পদক্ষেপ নিতে উল্লিখিত সংস্থাগুলোর সাথে এক সমন্বিত কাঠামোর আওতায় কাজ করে যায়, যাতে সবাই যার যার ভূমিকা সঠিকভাবে পালন করতে পারে। বিপর্যয় আঘাত হানার সঙ্গে সঙ্গে ওসিএইচএ আন্তর্জাতিক মোকাবেলা কার্যক্রম সমন্বয় শুরু করে। এটি সদস্য রাষ্ট্রগুলো ও আন্তঃসংস্থা স্থায়ী কমিটির সাথে পরামর্শ করে অগ্রাধিকার পদক্ষেপগুলো নির্ণয় করে সদর দপ্তর ও মাঠ পর্যায়ে। মানবিক সহায়তার সংশ্লিষ্ট আন্তঃসংস্থার সমন্বয়ে মুখ্য পদ্ধতি হিসেবে আইএএসসি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রধান প্রধান জাতিসংঘ ও অ-জাতিসংঘ মানবিক সহযোগীদের নিয়োজিত করে। অতঃপর ওসিএইচএ দুর্যোগ আক্রান্ত দেশে সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ডের সমন্বয়ে কার্যকরী সহায়তা দেয়। উদাহরণস্বরূপ, ওসিএইচএ নিশ্চিত করে যে সামরিক সম্পদ মানবিক বিপর্যয় মোকাবেলায় সঠিকভাবে কাজে লাগানো হয়।

ওসিএইচএ একটি নিজস্ব জরুরি মোকাবেলায় সক্ষম অঙ্গ সংরক্ষণ করে, যা একটি সার্বক্ষণিক সতর্কীকরণ ও পরিবীক্ষণ পদ্ধতি দ্বারা সমর্থনপুষ্ট। জাতিসংঘ দুর্যোগ নিরূপণ ও সমন্বয়কারী টিম কোনো দুর্যোগ বা জরুরি অবস্থার ১২ থেকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সংশ্লিষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত স্থানে তথ্য সংগ্রহে, চাহিদা নিরূপণে ও দুর্যোগ সহায়তা সমন্বয়ে কর্মীদল প্রেরণ করতে পারে। এটা আঞ্চলিক অফিস, মাঠ পর্যায়ের অফিস, মানবিক সমন্বয় ও দেশি দুর্যোগ টিমের নেটওয়ার্কের মাধ্যমে কার্যক্রম চালিয়ে যায়। মাঠ পর্যায়ে ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমের ঐক্য ও সমন্বয় রক্ষার দায়িত্ব মানবিক সমন্বয়কারীর। ওসিএইচএ চাহিদা নিরূপণ, আপদকালীন পরিকল্পনা ও কর্মসূচি কাঠামো একত্র করে মানবিক সমন্বয়কারী এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোকে প্রয়োজনীয় সহায়তা দিয়ে যায়। অর্থ ও অনুদান সংগ্রহের জন্য আন্তঃসংস্থা আবেদনের মাধ্যমে এই কার্যালয় আইইএএসসি সহযোগীদের এবং মানবিক সমন্বয়কারীকে সহায়তা দেয়। এটা দাতা সংস্থাগুলোর সভার আয়োজন করে, এ সংক্রান্ত পরবর্তী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে, আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সংগৃহীত অর্থের পরিবীক্ষণ করে এবং একই সাথে দাতা সংস্থাদের জন্য হালনাগাদ পরিস্থিতি প্রতিবেদন তৈরি করে ও সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য প্রেরণ করে। ১৯৯২-২০১২ সাল পর্যন্ত ওসিএইচএ ৩৩০টি ব্যাস্টিক ও তাৎক্ষণিক আপিলের মাধ্যমে জরুরি পরিস্থিতি মোকাবেলায় ৪২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়।

মানবিক জরুরি বিপর্যয় মোকাবেলায় তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ নিতে উন্নত অর্থায়ন পদ্ধতিরূপে ২০০৬ সালের মার্চ মাসে ওসিএইচএ কেন্দ্রীয় জরুরি বিপর্যয় মোকাবেলা তহবিল প্রণয়ন করে। কতগুলো ধ্বংসাত্মক প্রাকৃতিক দুর্যোগ সংঘটিত হওয়ায় এই তহবিল গঠিত হয়; যে দুর্যোগগুলো পূর্বাভাস ও সতর্কতা ব্যতীত সংঘটিত হয় এবং জরুরি ত্রাণ ও পুনর্বাসন সংশ্লিষ্ট তাৎক্ষণিক মোকাবেলা কার্যক্রম প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এই প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য, ডিসেম্বর ২০০৪ সালের ভারতীয় মহাসাগরে সংঘটিত ভূমিকম্প-সুনামি, অক্টোবর ২০০৫ সালের দক্ষিণ এশিয়ার ভূমিকম্প, একটি বিধ্বংসী হারিকেন ঋতু এবং ২০০৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে ফিলিপাইনে

সংঘটিত একটি বড় ধরনের ভূমিধস। ডিসেম্বর ২০১২ সালে সিইআরএফ উচ্চ পর্যায়ের বার্ষিক কনফারেন্সে ৪০টির বেশি জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রগুলো সরকারি ও বেসরকারি দাতা সংস্থার সহযোগিতায় ২০১৩ অর্থবছরের জন্য ৩৮ কোটি ৪০ লাখ মার্কিন ডলার দান করতে প্রতিশ্রুতি দেয়। ২০০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে সিইআরএফ ৮৭টি দেশে পরিচালিত মানবিক সংস্থার কার্যক্রম চালু রাখার জন্য প্রায় ৩০০ কোটি মার্কিন ডলার বরাদ্দ দেয়। ওসিএইচএ নীতিমালা সংক্রান্ত ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও মানবিক সম্প্রদায়ভুক্ত এটার অংশীদারদের সাথে কাজ করে থাকে। এ ক্ষেত্রে মাঠ পর্যায় কর্ম অভিজ্ঞতা থেকে উদ্ভূত মানবিক ইস্যুগুলো কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। মুখ্য মানবিক সমস্যাগুলো যাতে সঠিকভাবে বিবেচিত হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখা হয়; মানবিক সংস্থাগুলোর দায়িত্ব-কর্তব্য এই পরিবীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণের অন্তর্ভুক্ত। মানবিক সমস্যাগুলো চিহ্নিতকরণ ও সঠিক বিবেচনার মাধ্যমে ওসিএইচএ দুর্যোগ ও বিপর্যয়ে আক্রান্ত ক্ষতিগ্রস্তদের চাহিদা ও প্রয়োজনকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে এবং নিশ্চিত করে যে মানবিক সম্প্রদায়ের ধারণা, মতামত ও আশঙ্কা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মসূচি বাস্তবায়ন পর্যায়ে বিবেচিত হয়। এভাবে ওসিএইচএ মানবিক নিয়মনীতির প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করে থাকে এবং ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর সম্পৃক্ততা, অবরোধের মানবিক প্রভাব, ঝুঁকিপূর্ণ স্থলমাইন এবং ছোটখাটো অস্ত্রের অবাধ বিস্তার ইত্যাদির প্রতি সংশ্লিষ্ট সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করে। মানবিক অধিপরামর্শ প্রসারে, রীতিনীতি তৈরিতে ও জরুরি সমন্বয়ের ক্ষেত্রে ওসিএইচএ একগুচ্ছ অনলাইন পদ্ধতি প্রণয়ন করেছে। রিলিফ ওয়েব নামে ওসিএইচএ বিশ্বের সর্বপ্রথম মানবিক ওয়েব সাইট চালু করে, যেখানে বিশ্বব্যাপী দুর্যোগ ও জরুরি অবস্থা সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত সব সময় পাওয়া যায়। আরো বলতে গেলে, ওসিএইচএ আইআরআইএন নামে একটি সংবাদমাধ্যম চালু রেখেছে, যেখানে সাব-সাহারা আফ্রিকা অঞ্চল, মধ্যপ্রাচ্য, এশিয়া ও আমেরিকা সংশ্লিষ্ট সঠিক, নিরপেক্ষ প্রতিবেদন ও বিশ্লেষণ বিদ্যমান।

মানবিক সহায়তা ও সুরক্ষা

জাতিসংঘের তিনটি অঙ্গ সংস্থা ইউনিসেফ, ডব্লিউএফপি ও ইউএনএইচসিআর—বিভিন্ন মানবাধিকার সংকটে নিরাপত্তা ও অন্যান্য সহায়তা প্রদানের প্রাথমিক দায়িত্ব ও ভূমিকা রয়েছে।

সংকটকালে বাস্তুহারা শরণার্থীদের মধ্যে বেশিরভাগই মহিলা ও শিশু। জাতিসংঘ শিশু তহবিল (ইউনিসেফ) এই বাস্তুহারা জনগণের মৌলিক চাহিদাগুলো; যেমন—পানি ও স্যানিটেশন, স্কুল স্থাপন, টিকাদান, ওষুধ ও অন্যান্য প্রয়োজন মেটাতে বিভিন্ন ত্রাণ সংস্থার সাথে সমন্বয় করে কাজ করে। ইউনিসেফ শিশুদের নিরাপদ রাখার জন্য আরো কার্যকর পদক্ষেপ নিতে সর্বদাই সরকার ও যুদ্ধরত পক্ষদের উৎসাহিত করে থাকে। যুদ্ধরত এলাকায় টিকাদান কর্মসূচির মতো মৌলিক সেবাদান কর্মসূচি নিশ্চিতে যুদ্ধবিরতি কার্যকর করতে পদক্ষেপ নিতে হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে ইউনিসেফ যুদ্ধরত এলাকার জন্য 'শিশু শান্তির অঞ্চল' ধারণাটির প্রবর্তন করে এবং 'প্রশান্তিময় দিনগুলো' ও 'শান্তির পথ' নামে অনুকূল আবহাওয়া ও শান্তিমুখী পরিবেশ সৃষ্টি ও বজায় রাখার প্রয়াস পায়। এর বিশেষ কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে ভীত-সন্তস্ত্র শিশুদের সহায়তা করা এবং হারিয়ে যাওয়া

শিশুদের পিতা-মাতার কাছে ফিরিয়ে দেয়া অথবা কোনো পরিবারে তাদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা। ইউনিসেফ ২০১২ সালে ৭৯টি দেশে ২৮৬টি মানবাধিকার বিপর্যয়ে কাজ করেছে এবং এরূপ কর্মসূচিতে মোট ৮০.৯ কোটি মার্কিন ডলার ব্যয় হয়েছিল।

বিশ্ব খাদ্য সংস্থা-ডব্লিউএফপি প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগকবলিত শরণার্থী ও বাস্তুহারা জনগণকে দ্রুত ও কার্যকর ত্রাণ সহায়তা প্রদান করে থাকে। এসব সংকট মোকাবেলায় ডব্লিউএফপি তার বেশিরভাগ আর্থিক ব্যয় করে এবং সম্পদ ও জনশক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার করে থাকে। এক দশক আগেও ডব্লিউএফপির দুই-তৃতীয়াংশ খাদ্য সাহায্য জনগণকে স্বাবলম্বী করার কাজে ব্যয় করা হতো; কিন্তু এখন ডব্লিউএফপির তিন-চতুর্থাংশ সাহায্য মানবাধিকার সংকটগুলো ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের জন্য ব্যয় হয়। ২০১২ সালে ডব্লিউএফপি ৮০টি দেশের ৯ কোটি ৭২ লাখ মানুষের কাছে ৩৫ লাখ মেট্রিক টন খাদ্য সাহায্য পৌঁছিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে। এই সুবিধাভোগীদের মধ্যে রয়েছে অভ্যন্তরীণ বাস্তুহারা জনগণ, শরণার্থী, এইডসের কারণে অনাথ হওয়া শিশু এবং যুদ্ধ ও বন্যা, খরা ও ভূমিকম্পের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণ। যুদ্ধ বা দুর্যোগকালে ডব্লিউএফপি সাহায্য নিয়ে অতি দ্রুত জরুরি অবস্থা মোকাবেলা করে এবং পরবর্তী সময়ে জনগণের জীবন ও জীবনযাত্রার স্বাভাবিকতা পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে কার্যকরী কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকে। জাতিসংঘের শরণার্থীবিষয়ক হাইকমিশনের পরিচালনা করা সকল বৃহদাকারের খাদ্য সম্পর্কিত কর্মসূচি চালু রাখা ও তহবিল সংগ্রহের দায়িত্বও ডব্লিউএফপি পালন করে থাকে।

উন্নয়নশীল দেশের গ্রামীণ এলাকার মানুষজন অধিকতর দুর্যোগ বিপন্ন, যার কারণে এসব এলাকার লোকজন বেশিরভাগ সময়েই বিভিন্ন দুর্যোগে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে; তারা খাদ্য নিরাপত্তা ও জীবনধারণের জন্য কৃষিকাজের ওপর নির্ভরশীল। চাষ-বাস, গবাদিপশু, মৎস্যচাষ ও বনায়ন সম্পর্কিত বিষয়ে জাতিসংঘ খাদ্য ও কৃষি সংস্থা-এফএও-এর দক্ষতা জরুরি ত্রাণ ও পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে অপরিহার্য। এফএওবিভিন্ন রাষ্ট্রকে দুর্যোগ প্রতিরোধ, প্রশমনের প্রস্তুতি গ্রহণ ও দুর্যোগকালে দ্রুত সাড়াদানে সাহায্য করে থাকে। এর বৈশ্বিক তথ্য এবং পূর্ব সতর্কীকরণ পদ্ধতি সারা বিশ্বের খাদ্যজনিত অবস্থার সর্বশেষ ও হালনাগাদ তথ্য সরবরাহ করে থাকে। ফাও মানবসৃষ্ট অথবা প্রাকৃতিক দুর্যোগের পরে খাদ্য ঘাটতি রাষ্ট্রগুলোর খাদ্যজনিত অবস্থার নিরূপণ ও মূল্যায়নে বিশ্ব খাদ্য সংস্থার সাথে সমন্বয় করে কাজ করে। এসব মূল্যায়নের ওপর ভিত্তি করে যৌথভাবে জরুরি খাদ্য সাহায্য সংক্রান্ত অপারেশনগুলো তৈরি ও অনুমোদন করা হয়ে থাকে। এর দুর্যোগ-পরবর্তী ও জটিল সংকটের অবস্থায় বাস্তবায়িত কার্যক্রমে কৃষিভিত্তিক জনগণের পুনর্বাসনের ওপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয়ে থাকে। ফাও-এর লক্ষ্য হলো স্বনির্ভরতা অর্জন ও খাদ্য সাহায্যের হ্রাস করার দিকে জোর দিয়ে স্থানীয় খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা, যাতে খাদ্য সাহায্য ও অন্যান্য সহযোগিতার প্রয়োজন না হয়।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা যে কোনো সংকট অথবা দুর্যোগকালে আক্রান্ত ও ক্ষতিগ্রস্তদের স্বাস্থ্য পরিস্থিতি নিরূপণ ও মূল্যায়ন, স্বাস্থ্য সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ এবং জরুরি কর্মসূচির সমন্বয় ও পরিকল্পনায় সহায়তার ওপর গুরুত্ব দিয়ে থাকে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা পুষ্টি, স্বাস্থ্য ও রোগব্যাধির পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ, মহামারী নিয়ন্ত্রণ, অতি প্রয়োজনীয় ওষুধ সরবরাহ ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা, টিকা প্রদান, প্রজনন স্বাস্থ্য এবং মানসিক স্বাস্থ্য ইত্যাদি বিষয়ে বিভিন্ন

জরুরি কার্যক্রম পরিচালনা করে। এই সংস্থাটি জরুরি সময়ে সংশ্লিষ্ট দেশে ম্যালেরিয়া ও যক্ষ্মা প্রতিরোধ পোলিও নির্মূল করতে বিশেষ পদক্ষেপ নেয়।

জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল একইভাবে দুর্যোগকালীন সময়ে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে দ্রুত পরিস্থিতি মোকাবেলায় অগ্রসর হয়। দুর্যোগকালে গর্ভকালীন মৃত্যুর হার ও যৌন সন্ত্রাস বৃদ্ধি পায় এবং প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা অধিকাংশ ক্ষেত্রে অকার্যকর হয়ে পড়ে। অনেক তরুণ-তরুণী এইচআইভি এবং যৌন নিপীড়নের শিকার হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয় এবং নারীরা বহু ক্ষেত্রে পরিবার পরিকল্পনার সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়। জরুরি অবস্থায় ইউএনএফপিএ ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের প্রজনন স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় সহায়তা করে এবং পরবর্তীকালে পুনর্বাসন প্রক্রিয়া চলাকালে সহায়তা প্রদান করে থাকে।

জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি প্রাকৃতিক দুর্যোগ সংশ্লিষ্ট প্রস্তুতি, প্রশমন, প্রতিরোধ ও সতর্কতামূলক কার্যক্রমের সমন্বয় করে থাকে। বিভিন্ন দেশের সরকার পুনর্বাসন প্রক্রিয়া পরিকল্পনা প্রণয়নে এবং দাতাগোষ্ঠীর সাহায্যপ্রাপ্তির জন্য প্রায়শই ইউএনডিপি-কে আহ্বান করে। ইউএনডিপি এবং মানবকল্যাণ সংস্থাগুলো ক্ষতিগ্রস্তদের পুনরুদ্ধার এবং অন্তর্বর্তীকালীন ও দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নে একত্রে কাজ করে। এছাড়াও ইউএনডিপি প্রাক্তন সেনা সদস্যদের নিষ্ক্রীয়করণ, কার্যকর মাইন অপসারণ, শরণার্থী ও অভ্যন্তরীণ স্থানান্তরিত জনগণের পুনর্বাসন এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর পুনরুদ্ধার সংশ্লিষ্ট কর্মসূচি সমর্থন করে।

প্রাপ্ত সম্পদ ও সহায়তার সম্পূর্ণ উপযোগিতা ও সর্বোচ্চ প্রভাব নিশ্চিত করতে ইউএনডিপি কর্মকর্তারা সকল কার্যক্রম স্থানীয় এবং জাতীয় সরকারের সাথে আলোচনার মাধ্যমে বাস্তবায়ন করে থাকেন। দীর্ঘমেয়াদি শান্তির লক্ষ্যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভিত্তি, উন্নয়ন এবং দারিদ্র্যবিমোচনের উদ্দেশ্যে ইউএনডিপি সকল সম্প্রদায়ের জনগোষ্ঠীকে তাৎক্ষণিক সহায়তা প্রদান করে। এ ধরনের গণভিত্তিক সহায়তা কর্মসূচি যুদ্ধকালীন সহিংসতার শিকার লাখ লাখ মানুষকে তাৎক্ষণিক এবং দীর্ঘমেয়াদি সাহায্য-সহযোগিতা পেতে অবদান রেখেছে। বর্তমানে সহিংসতায় ক্ষতিগ্রস্ত বহু জনগোষ্ঠী জাতিসংঘ প্রণোদিত প্রশিক্ষণ, ঋণ প্রকল্প এবং অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে নিজেদের জীবনমান উন্নত করেছে।

মানবকল্যাণ কর্মীদের সুরক্ষা

জাতিসংঘ এবং অন্যান্য মানবকল্যাণ সংস্থার কর্মীরা প্রায়শই ভয়াবহ সহিংসতার শিকার হন। সহিংস পরিবেশে দায়িত্ব পালনকালে জাতিসংঘের অনেক কর্মী নিহত, অনেকে অপহরণ এবং অনেককে আটক রাখা হয়েছে। সহিংসতার অংশ হিসেবে জাতিসংঘ কর্মীরা সশস্ত্র ডাকাতি, ছিনতাই, মারধর এবং ধর্ষণের মত জঘন্য অপরাধের শিকার হয়েছে। প্রায়ই তাদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কর্মরত অবস্থায় সন্ত্রাসীদের সহিংস লক্ষ্যে পড়তে হয়। এই বিপদের আশঙ্কা প্রমাণিত হয় ২০০৩ সালের ১৯ আগস্ট, যখন বাগদাদে জাতিসংঘ কার্যালয়ে হামলায় মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনার ও বাগদাদে জাতিসংঘ মিশন প্রধান সার্জিও ভিয়েইরাদে মেলোসহ ২২ জন নিহত এবং ১২০ জন আহত হন। এটি জাতিসংঘের বেসামরিক কর্মীদের ওপর ইতিহাসের সবচেয়ে বড় হামলা ছিল।

২০০৭ সালের ১১ ডিসেম্বরে আলজিয়ার্সের বোমা হামলায় ১৭ জন জাতিসংঘ কর্মী নিহত এবং ৪০ জন আহত হয়। জাতিসংঘ মহাসচিব এই ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড তদন্তের জন্য একটি স্বাধীন প্যানেল গঠন করেন এবং সারা বিশ্বে জাতিসংঘের কর্মীদের নিরাপত্তা বিধানে আরও কার্যকরী উপায়জনিত সুপারিশ প্রদানের আদেশ দেন।

১৯৯৪ সালে গৃহীত জাতিসংঘের সাথে সংযুক্ত কর্মীদের নিরাপত্তা বিষয়ক সমঝোতা অনুসারে সকল দেশের সরকারের সে দেশে কর্মরত জাতিসংঘের কর্মীদের নিরাপত্তা বিধানে এবং হত্যা ও অপহরণ প্রতিরোধে ব্যবস্থা নিতে দায়িত্বরত রয়েছে। কিন্তু তবুও প্রতি বছর অনেক জাতিসংঘ কর্মী, শান্তিরক্ষাকারী ও সহযোগী কর্মী পৃথিবীর সবচেয়ে দরিদ্র ও অসহায়দের সেবার সময় হত্যার শিকার হচ্ছে।

শরণার্থী সহায়তা ও সুরক্ষা

২০১২ সালে জাতিসংঘ শরণার্থী সংক্রান্ত হাইকমিশনারের অফিসের হিসাব অনুযায়ী ৪.২৫ কোটি মানুষ বিশ্বব্যাপী জোরপূর্বক উচ্ছেদের শিকার হয়েছে, যার মধ্যে ২৬.৪ মিলিয়ন অভ্যন্তরীণ শরণার্থী, ১৫.২ মিলিয়ন শরণার্থী ও ৮৯৫,০০০ আশ্রয়প্রার্থী রয়েছে। ইউএনএইচসিআর ৬৪টি দেশে প্রায় ৩.৫ মিলিয়ন রাষ্ট্রবিহীন মানুষ চিহ্নিত করেছিল। তবে অনুমান করেছিল যে বিশ্বে রাষ্ট্রবিহীন মানুষের সংখ্যা ১২ মিলিয়নের মতো হবে।

২০১১ সালে ইউএনএইচসিআর ২৬ মিলিয়নের বেশি মানুষকে, যার মধ্যে ১০.৪ মিলিয়ন আন্তর্জাতিক শরণার্থী এবং ১৫.৫ মিলিয়ন অভ্যন্তরীণ শরণার্থীকে সুরক্ষা প্রদান করছে। ২০১০ সালে যার সংখ্যা ছিল ৭০০,০০০। এছাড়া আরো ৪.৮ মিলিয়ন ফিলিস্তিনি নাগরিককে জাতিসংঘ নিকট প্রাচ্য ফিলিস্তিনি সহায়তা কার্যক্রমের আওতায় সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান করা হয়।

১০.৪ মিলিয়ন আন্তর্জাতিক শরণার্থীর মধ্যে অঞ্চল প্রতি বিভাজনটি ছিল নিম্নরূপ : ৩.৬ মিলিয়ন শরণার্থী এশিয়া এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে, ২.৭ মিলিয়ন আফ্রিকায় (উত্তর আফ্রিকা ব্যতীত), ১.৭ মিলিয়ন মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকায় (UNRWA) সমর্থিত ফিলিস্তিনি শরণার্থী ব্যতীত), ১.৬ মিলিয়ন ইউরোপে এবং ৮০৭,৪০০ আমেরিকায়। বিশ্বের সকল শরণার্থীর ৫ ভাগের ৪ ভাগ অর্থাৎ ৮০ শতাংশ উন্নয়নশীল দেশে আশ্রয় নেয়। ইউএনএইচসিআর-এর আশঙ্কায় থাকা শরণার্থীদের মধ্যে শতকরা ৪৯ জন নারী ও শিশু; এই সংখ্যার মধ্যে ৪৭ শতাংশ শরণার্থী ও আশ্রয়প্রার্থী এবং ৫০ শতাংশ সকল অভ্যন্তরীণ শরণার্থীদের প্রতিনিধি। শরণার্থী ও আশ্রয়প্রার্থীদের ৪৬ শতাংশ ১৮ বছরের কম বয়সী শিশু।

২০১১ সালে আফগানিস্তান থেকে সর্বাধিক সংখ্যক ২.৭ মিলিয়ন শরণার্থী বিশ্বের ৭৯টি দেশে আশ্রয় নিয়েছিল; গড়ে প্রত্যেক চারজনের একজন শরণার্থীর জন্মস্থান আফগানিস্তান। ২০১১ সালে প্রধান শরণার্থীদের দেশীয় পরিচিতি নিম্নরূপ : ফিলিস্তিন (৪.৮ মিলিয়ন), ইরাকি (১.৪ মিলিয়ন), সোমালিয়া (১ মিলিয়ন), দক্ষিণ সুদানসহ সুদানি (৫০০,০০০), কঙ্গো (৪৯১,৫০০), মিয়ানমার (৪১৫,০০০) ও কলোম্বিয়া (৩৯৬,০০০)। ২০১৩ সালের জুলাই মাসে ইউএনএইচসিআর এবং এর সহযোগীরা সিরিয়ার সহিংস যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে আসা ১.৮ মিলিয়ন শরণার্থীদের সহায়তায় নিজেদের নিয়োজিত করেছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে ইতিহাসের পাতায় ইউএনএইচসিআর দুর্যোগকালীন মানবদরদি সংস্থাগুলোর মধ্যে অনন্য : উপসাগরীয় যুদ্ধের পরিণামে বলকানে ভয়াবহ শরণার্থী সংকট, আফ্রিকার লেক অঞ্চলের সংকট, কসোভো ও তিমুর-লেস্তে ব্যাপক জনগোষ্ঠী স্থানান্তর সংকট, আফগানিস্তানে শরণার্থী প্রত্যাবর্তন ও অতি সম্প্রতি সহিংস ইরাকে এবং দক্ষিণ ও মধ্য সোমালিয়া শরণার্থী সংকট প্রশমনে ইউএনএইচসিআর-এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

যেসব মানুষ তাদের জন্মস্থানে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, রাজনৈতিক মতাদর্শ কিংবা কোনো সামাজিক গোত্রের সদস্য হওয়ার কারণে শাস্তিপ্রাপ্ত হওয়ার বাস্তব সম্ভাবনায় দেশত্যাগ করে এবং পরবর্তীকালে সেই দেশে প্রত্যাবর্তনে আগ্রহী নয় তাদেরকে 'শরণার্থী' হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। যারা যুদ্ধ বা অন্যান্য সহিংসতা থেকে রেহাই পেতে দেশত্যাগ করেছে তাদেরকেও শরণার্থী হিসেবে গ্রহণ করা হয়। ১৯৫১ সালের শরণার্থী অধিকার বিষয়ক সমঝোতা এবং সমঝোতাটির ১৯৬৭ সালের প্রটোকল এই দুটি দলিলে শরণার্থীদের আইনগত সংজ্ঞা এবং এই সংক্রান্ত অধিকার, কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে বলা আছে। ১৪৭টি দেশ এই দলিলগুলোতে স্বাক্ষর করেছে।

ইউএনএইচসিআর-এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো– আন্তর্জাতিক সুরক্ষা প্রদান, শরণার্থীদের মৌলিক মানবাধিকারের প্রতি সম্মান নিশ্চিত, আশ্রয় প্রার্থনার অধিকার নিশ্চিত এবং যে দেশে তার ওপর নির্যাতন হতে পারে সে দেশে তাকে জোরপূর্বক ফেরত পাঠানো যাতে না হয় সে অধিকার বাস্তবায়ন করা। শরণার্থীদের সুরক্ষায় অন্য যেসব সহায়তা প্রদান করা হয় তা হলো :

- জরুরি অবস্থায় প্রচুর সংখ্যক শরণার্থীর পরিবহনের ব্যবস্থা ও অন্যান্য সহায়তা;
- শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান, ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট নিয়মিত কর্মসূচি;
- শরণার্থীদের স্বাবলম্বী হতে সহায়তা এবং আশ্রয়প্রাপ্ত দেশে মিশে যাওয়ায় সাহায্য করা;
- স্বেচ্ছায় নিজ দেশে প্রত্যাবর্তনে সহায়তা করা;
- প্রথম আশ্রয়প্রাপ্ত দেশে অবস্থানে অনিরাপদ বোধ করলে এবং/অথবা নিজ দেশে ফেরত যেতে অনীহা বা কোনো বাধা থাকলে শরণার্থীদের তৃতীয় কোনো দেশে আশ্রয় প্রদানে সহায়তা।

দীর্ঘস্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে অতিরিক্ত প্রচেষ্টার মাধ্যমে ৫৩২,০০০ শরণার্থীকে স্বেচ্ছায় ফেরত পাঠানো সম্ভব হয়েছিল। এটি ২০১০ সালের তুলনায় দ্বিগুণ; কিন্তু তবুও এটি গত দশকে তৃতীয় সর্বনিম্ন সংখ্যা। শরণার্থী সমস্যা সমাধানের তিনটি কার্যকর সমাধান হলো : নিরাপত্তা ও সম্মানের সাথে শরণার্থীদের নিজ দেশে ফেরত পাঠানো, আশ্রয়প্রাপ্ত দেশের সার্বিক পরিস্থিতির সাথে খাপ খাওয়ানো এবং তৃতীয় কোনো দেশে আশ্রয় প্রদান। স্বেচ্ছায় নিজ দেশে ফেরতকেই সর্বোকৃষ্ট সমাধান হিসেবে বিবেচনা করা হয়। হঠাৎ প্রচুরসংখ্যক শরণার্থী একত্রে দেশে ফেরত আসার ফলে নাজুক অর্থনীতি ও সামাজিক অবকাঠামো অবশ্য চাপের মুখে পড়তে পারে। ইউএনএইচসিআর এবং সহযোগী সংস্থা ফেরত আসা শরণার্থীদের পুনর্বাসন এবং পুনর্গঠনের লক্ষ্যে সহায়তা দিয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে ফেরত আসা শরণার্থীদের জন্য জরুরি সাহায্য, তাদের কর্মসংস্থান তৈরির কৌশল ও ধ্বংসপ্রাপ্ত স্থানগুলোর জন্য উন্নয়ন কর্মসূচি প্রয়োজন। এসব কারণে

শান্তি, স্থিতিশীলতা, নিরাপত্তা, মানবাধিকারের প্রতি সম্মান এবং সুদূরপ্রসারী উন্নয়ন কার্যক্রমে সকল কার্যক্রমের সমন্বয়ের মাধ্যমে শরণার্থী সংকটের স্থায়ী সমাধান লাভ করা সম্ভব বলে সংশ্লিষ্ট মহলের ধারণা।

যদিও ইউএনএইচসিআর-এর দায়িত্ব শরণার্থীদের সহায়তা ও সুরক্ষা করা। তবে ইদানীং শরণার্থীদের মতো বসবাসকারীদের সহায়তার জন্যও এই সংস্থার প্রতি আহ্বান জানানো হচ্ছে। তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে আইডিপি, সাবেক শরণার্থী যাদের ইউএনএইচসিআর-এর সহায়তার প্রয়োজন, নাগরিকত্বহীন এবং স্বল্প মেয়াদের নিজ দেশের বাইরে যারা শরণার্থী হিসেবে বিবেচিত হয় না। বর্তমানে ইউএনএইচসিআর-এর প্রধান বিবেচ্য জনগোষ্ঠী হচ্ছে অভ্যন্তরীণ শরণার্থী (আইডিপি)। যেসব মানুষ সহিংসতা, যুদ্ধ, মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং প্রাকৃতিক বা মানবসৃষ্ট দুর্যোগের কারণে নিজ বাড়ি ত্যাগ করতে বাধ্য হয়, তবে তারা কোনো আন্তর্জাতিক সীমানা পেরিয়ে অন্য দেশে আশ্রয় নেয় না, তাদেরকে আইডিপি বা অভ্যন্তরীণ শরণার্থী বলা হয়। ২০১১ সালে ৩.২ মিলিয়ন আইডিপি নিজ বাড়িতে ফেরত যেতে পেরেছে, যা ছিল গত দশকের মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যা।

যেসব মানুষ নিজ দেশ ত্যাগ করে অন্য দেশে শরণার্থী হিসেবে আবেদন করে এবং আবেদন প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকে, তাদেরকে আশ্রয়প্রার্থী বলা হয়। ২০১১ সালে মোট ১৭১টি দেশের সরকার বা ইউএনএইচসিআর অফিসে ৮৭৬,১০০টি আশ্রয় প্রার্থনার আবেদন জমা পড়ে; সারা বিশ্বে শরণার্থীদের জন্য সবচেয়ে আকর্ষণীয় দেশ দক্ষিণ আফ্রিকা; সে বছর সেখানে ১০৭,০০০ নতুন আবেদন জমা পড়ে। অন্যান্য আকর্ষণীয় আশ্রয়কাম্য দেশগুলো হলো যথাক্রমে : যুক্তরাষ্ট্র, কেনিয়া, ফ্রান্স, কানাডা, যুক্তরাজ্য এবং জার্মানি। সরকার বা ইউএনএইচসিআর অফিসে সবচেয়ে বেশিসংখ্যক আশ্রয় আবেদন জমা পড়েছে জিম্বাবুয়ে (৫২,০০০), আফগানিস্তান (৪৩,০০০), সোমালিয়া (৩৫,৯০০), আইভরি কোস্ট (৩৩,০০০), কঙ্গো প্রজাতন্ত্র (৩১,৫০০), মিয়ানমার (২৯,৮০০) এবং ইরাক (২৯,১০০) থেকে।

ফিলিস্তিনি শরণার্থী

১৯৫০ সাল থেকে জাতিসংঘ নিকট প্রাচ্যে ফিলিস্তিনি শরণার্থীদের ত্রাণ এবং সহায়তা বিষয়ক সংস্থা (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East–UNRWA) শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ত্রাণ এবং বিভিন্ন সামাজিক সেবা দিয়ে আসছে। ১৯৪৮ সালের আরব-ইসরাইল যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত ৭৫০,০০০ ফিলিস্তিনি উদ্বাস্তু শরণার্থীদের আশ্রয় ও জীবিকা নির্বাহের জন্য জাতিসংঘ ইউএনআরডব্লিউএ প্রতিষ্ঠা করে। সংস্থাটি বর্তমানে পাঁচ মিলিয়ন নিবন্ধিত ফিলিস্তিনি শরণার্থীদের সহায়তা প্রদান করে, যার সিংহভাগই জর্ডান, লেবানন, সিরিয়া এবং গাজা, পশ্চিম তীর ও পূর্ব জেরুজালেমসহ দখলকৃত ফিলিস্তিনি এলাকায় বসবাস করে। বারংবার ঘটিত সহিংসতার ফলে এ সংস্থার মানবকল্যাণ কার্যক্রমের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে।

ইউএনএইচসিআর-এর কার্যক্রমের সবচেয়ে বড় ক্ষেত্র হচ্ছে শিক্ষা, যে খাতে সংস্থাটি বাজেটের প্রায় ৬০ ভাগ ব্যয় করে। সংস্থাটি মধ্যপ্রাচ্যের সবচেয়ে বিস্তৃত স্কুল

নেটওয়ার্ক পরিচালনা করে যার মধ্যে রয়েছে ৭০৩টি স্কুল, ২২,৮৮৫ শিক্ষক কর্মকর্তা, ৪৯১,৬৪১ জন নিবন্ধিত ছাত্র-ছাত্রী (গড়ে ৫১.৪ শতাংশ মেয়ে), ৯টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ৭,০২৪টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, দুটি বিজ্ঞান ফ্যাকাল্টি এবং ৮৯১ জন প্রশিক্ষণরত শিক্ষক। সংস্থাটির প্রায় ১৩৯টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র ২০১২ সালে প্রায় ৯.৬ মিলিয়ন চিকিৎসাপত্র প্রণয়ন করেছে। এর স্বাস্থ্যবিষয়ক পরিবেশ প্রোগ্রাম বিশুদ্ধ পানীয় জল ও পয়ঃপ্রণালি নিশ্চিত করে এবং শরণার্থী ক্যাম্পে ভেক্টর ও রডেন্ট নিয়ন্ত্রণ করে।

২০১১ সালে UNRWA ক্ষুদ্রঋণ প্রদান কার্যক্রম শুরু করে এবং ১২.৪ মিলিয়ন ডলার অর্থমূল্যে ১৭,৭১৭টি ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করে। ১৯৯১ থেকে ২০১১ পর্যন্ত সংস্থাটির ঋণ প্রদানের সংখ্যা ২৬৫,৫৫১-তে উন্নীত করেছে, যার অর্থমূল্য প্রায় ৩০২.৬৫ মিলিয়ন ডলার। এই ঋণ প্রায় সকল খাতেই প্রদান করা হয়েছে। ২০১৩ সালের ১ জানুয়ারি পর্যন্ত ২৯২,২৫৯ জন দরিদ্র শরণার্থী খাদ্য এবং বাসস্থান পুনর্বাসন সুবিধা পেয়েছে।

এ সংস্থাটি অবকাঠামো উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি উন্নয়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। জাতিসংঘের অন্য সংস্থাগুলো স্থানীয় কর্তৃপক্ষ দ্বারা তাদের দায়িত্ব পালন করে, ইউএনআরডব্লিউএ সেক্ষেত্রে সরাসরি শরণার্থীদের নিকট সহায়তা প্রেরণ করে। এটি এর কার্যক্রম পরিকল্পনা ও প্রকল্প পরিকল্পনা করে থাকে এবং স্কুল, হাসপাতাল ইত্যাদি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করে এবং ব্যবস্থাপনা করে থাকে। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ইউএনআরডব্লিউএকে মধ্যপ্রাচ্যে স্থিতিশীলতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কর্ম উপাদান হিসেবে গণ্য করে। স্বয়ং শরণার্থীরা এই সংস্থাকে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের তথা ফিলিস্তিন শরণার্থী সংকট সমাধানের অঙ্গীকারের প্রতীক হিসেবে গণ্য করে।

৬. আন্তর্জাতিক আইন

নিকারাগুয়া বনাম কলোম্বিয়ার মধ্যে শুনানির সূচনা। স্থান: নেদারল্যান্ডের দি হেগ শহরের দি গ্রেট অফ জাসটিস অফ দি পিস প্যালেস। (২৪ এপ্রিল ২০১২, ইউ এন ছবি/ ICJ-CIJ/ANP-in-Opdracht/Frank van Beek)

জাতিসংঘের সবচেয়ে সুদূরপ্রসারী প্রভাব হলো আন্তর্জাতিক আইন প্রণয়ন এবং সমঝোতা, চুক্তি, মানদণ্ড তৈরি। যার ফলে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন এবং নিরাপত্তা বিধান নিশ্চিত হয়। জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত অনেক চুক্তি ও সমঝোতা অনেকাংশে সদস্য রাষ্ট্রের মাঝে আইনগত সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করে। যদিও জাতিসংঘের এ কার্যক্রম খুব একটা প্রচার পায় না। এ কাজের প্রভাব বিশ্বব্যাপী মানুষের জীবনে পড়ে।

জাতিসংঘ সনদ সংস্থাটিকে শান্তিপূর্ণ উপায়ে সব ধরনের আন্তর্জাতিক বিরোধ নিষ্পত্তি করতে বিশেষ আহ্বান জানায়, যেমন : ৩৩ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সালিশ ও বিচারিক নিষ্পত্তি এবং অনুচ্ছেদ ১৩ অনুযায়ী সংস্থাটি সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তর্জাতিক আইন ও এর সংকলনের প্রগতিশীল উন্নয়নে উৎসাহিত করে। এ পর্যন্ত জাতিসংঘ প্রায় ৫০০ বহুপক্ষীয় চুক্তিতে মধ্যস্থতা করেছে, যা সদস্য রাষ্ট্রগুলোর অভিন্ন উদ্বেগ সংশ্লিষ্ট; এসব চুক্তি পালনে স্বাক্ষরকারী দেশগুলো আইনত বাধ্য।

জাতিসংঘের আইনগত কর্মকাণ্ড অনেকাংশে সূচনামূলক, যার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মাত্রার সমস্যাগুলো নিষ্পত্তি করতে সচেষ্ট হতে হয়। পরিবেশ সুরক্ষা, অভিবাসী শ্রমিক নিয়ন্ত্রণ, মাদক পাচার হ্রাস এবং সন্ত্রাস প্রতিরোধ ইত্যাদি ক্ষেত্রে একটি কার্যকরী আইনি কাঠামো গঠনে জাতিসংঘ অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করে। মানবাধিকার আইন ও আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের মতো অনেক গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুর কারণে আন্তর্জাতিক আইনের কলেবর অতীতের যে কোনো সময় থেকে ব্যাপক রূপ ধারণ করেছে। যার ফলে জাতিসংঘের আইন সংক্রান্ত কার্যক্রম ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলেছে।

বিরোধের বিচারিক নিষ্পত্তি

আন্তর্জাতিক আদালত (International Court of Justuice-ICJ) জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রগুলোর প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক মামলা নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে প্রধান অঙ্গ। বিশ্ব আদালত হিসাবে অধিক পরিচিত আইসিজে সাধারণ বিচারিক এখতিয়ার সম্বলিত একমাত্র সর্বজনীন আদালত; সদস্য রাষ্ট্রগুলোর বিচার প্রার্থিতা ও এদের বিচার্য বিষয় আইসিজেকে এরূপ মর্যাদা দান করেছে। ১৯৪৬ সালে প্রতিষ্ঠিত বিশ্ব আদালত এযাবৎ ১৫২টি মামলা আমলে নিয়ে পর্যালোচনা করেছে এবং ১১০টি রায় দিয়েছে ও ১০০টি বিচারিক নির্দেশ জারি করেছে। বলা বাহুল্য, মামলাগুলো সদস্য রাষ্ট্রগুলো কর্তৃক দায়েরকৃত। এছাড়াও সংগঠনটি এর অঙ্গ সংস্থার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে অদ্যাবধি ২৭টি উপদেশমূলক মতামত বা সুপারিশ প্রদান করেছে।

সম্প্রতি আইসিজের কর্মভার ও ব্যস্ততা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। যদিও আদালতটি এর কর্মভার অনেকটা লাঘব করেছে, এটি এখনো বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দায়ের করা ১১টি সক্রিয় মামলা নিয়ে ব্যস্ত রয়েছে। চুক্তি পর্যালোচনা, স্থল ও সমুদ্র সীমানা, পরিবেশ রক্ষা ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং আরও অনেক বিষয় নিষ্পত্তি ও সুরাহার তাগিদে সদস্য রাষ্ট্রগুলো অধিকহারে আইসিজের শরণাপন্ন হচ্ছে। ফলত এই আদালত এর কর্মকাণ্ডের প্রথম ৪৪ বছরের তুলনায় পরবর্তী ২২ বছরে অধিক বিচারিক রায় প্রদান করেছে।

আইসিজের স্থল ও সমুদ্র সীমানা বিরোধ নিষ্পত্তিতে বিশেষ ব্যুৎপত্তি ও মুন্সিয়ানা দেখিয়েছে। স্মর্তব্য যে, এসব ক্ষেত্রে রাষ্ট্রগুলোর মাঝে বিদ্যমান উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা প্রায়শই সহিংসতায় পর্যবসিত হতে দেখা যায়। প্রতিপক্ষ রাষ্ট্রগুলো এ ক্ষেত্রে সুবিবেচনাপ্রসূত পর্যালোচনা ও ন্যায়বিচারের আশায় আইসিজের ওপর আস্থা অর্পণ করে, যাতে সমস্যা সমাধানের পথে পারস্পরিক সম্পর্ক স্বাভাবিক হয়ে আসে।

যদিও আইসিজের রায়গুলোর স্বাভাবিক ফলাফল বিরোধগুলোর শান্তিপূর্ণ সমাধান, তথাপি আদালতটির বিচারিক প্রভাব অনেক সুদূরপ্রসারী। এর রায়গুলো আন্তর্জাতিক আইনের ক্ষেত্রে প্রামাণিক বক্তব্য হিসেবে বিবেচিত এবং বিশ্বব্যাপী অন্যান্য কোর্ট ও ট্রাইব্যুনাল, আইনবিদ ও রাষ্ট্রীয় উপদেষ্টারা এসব রায়কে নিবিড়ভাবে গবেষণা করে থাকেন। এসব রায়ের আলোকে প্রথাসিদ্ধ আইনের ব্যাখ্যা বা সংশোধন আন্তর্জাতিক আইনের উন্নয়নে এর অবদানস্বরূপ উল্লেখ্য।

প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক মামলা

১৯৪৬ সাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত আন্তর্জাতিক আদালতে দায়ের করা মামলাগুলোর মধ্যে ৮০ শতাংশেরও বেশি প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক মামলা। সীমান্ত, সমুদ্রসীমা, আঞ্চলিক সার্বভৌমত্ব, বল প্রয়োগে নিষেধাজ্ঞা, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের লঙ্ঘন, রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না-করণ, কূটনৈতিক সম্পর্ক, বন্দি বিনিময়, আশ্রয়ের অধিকার, জাতীয়তা, অভিভাবকত্ব, যাতায়াতের অধিকার ও অর্থনৈতিক অধিকারসহ বিভিন্ন বিষয়ে মামলা নিষ্পত্তিতে আইসিজে সুদূরপ্রসারী রায় দান করে।

প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক মামলার সময়কালের ব্যাপারে বলা যায়, আইসিজে প্রায় ৭১ শতাংশ মামলার নিষ্পত্তি চার বছরের ভেতরেই করতে সক্ষম হয়েছে, ২৩ শতাংশ মামলার নিষ্পত্তি হয়েছে পাঁচ-নয় বছরের মধ্যে এবং ছয় শতাংশ (মাত্র পাঁচটি) মামলার নিষ্পত্তি হয় ১০ বছর অথবা তার বেশি সময় পর। মামলা নিষ্পত্তির সময়কাল মূলত এর জটিলতার ও দ্রুত মামলা পরিচালনায় পক্ষগুলোর সদিচ্ছার ওপর নির্ভর করে। যেহেতু পক্ষগুলো সাধারণত বিভিন্ন সার্বভৌম রাষ্ট্র স্বয়ংই হয়ে থাকে, আইসিজে-এর কাজের ও তদন্তের ক্ষেত্র স্বাভাবিকভাবেই সীমিত।

দ্রুত রায় প্রদানের আবেদন করা হলে আইসিজে তা করতে সক্ষম হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ১৯৯৯ সালে আইসিজে ভিয়েনা কনভেনশন ও দূতাবাসের সম্পর্ক লঙ্ঘন নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জার্মানির করা এক মামলার আবেদনের প্রেক্ষিতে মাত্র ২৪ ঘণ্টার ভেতরে দুই জার্মান নাগরিককে খুনের দায়ে সংশ্লিষ্ট অভিযুক্তদের দণ্ড দেয়া হয়। মামলাটি মাত্র ২৮ মাসেই নিষ্পন্ন হয়।

প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক মামলায় কোর্ট কর্তৃক অনুসারিত কার্যপ্রণালির মধ্যে রয়েছে লিখিত পর্যায় ও মৌখিক পর্যায়; প্রকাশ্য শুনানিতে প্রতিনিধি ও কৌসুলিরা তাদের কথা আদালতে পেশ করেন। মৌখিক কার্যক্রমের পরে কোর্ট রুদ্ধদ্বার বৈঠকে বসেন ও পরে প্রকাশ্যে রায় ঘোষণা করেন, যা সাধারণত মৌখিক পর্যায়ের ছয় মাসের ভেতরে হয়ে থাকে। এই রায়ই চূড়ান্ত হিসেবে বিবেচিত হয় এবং এ ব্যাপারে আপিল করা যায় না। জড়িত কোনো রাষ্ট্র যদি আদেশ পালন না করে, তবে অপর পক্ষের রাষ্ট্রটি চাইলে নিরাপত্তা পরিষদের কাছে প্রতিকার চাইতে পারে। অবশ্য আইসিজে প্রদত্ত প্রায় প্রতিটি রায়ই কার্যকরী হয়েছে।

আন্তর্জাতিক আদালতের সাম্প্রতিক মামলাগুলো

ফেব্রুয়ারি, ২০১২ সালে আন্তর্জাতিক আদালতের এখতিয়ারভুক্ত অনাক্রম্যতা সংক্রান্ত একটি উচ্চপর্যায়ের মামলার নিষ্পত্তি করে, যার দুই পক্ষে ছিল দুই ইউরোপীয় রাষ্ট্র জার্মানি ও ইতালি। কোর্ট সিদ্ধান্ত দেন যে, ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৫ সালের মধ্যকার ঘটনা নিয়ে জার্মান রাইখের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের অধীনে মামলা করে ইতালি জার্মানির অনাক্রম্যতা সংক্রান্ত অধিকারের লঙ্ঘন করেছে।

২০১২ সালের জুন মাসে গিনি ও গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্রের মধ্যকার মামলায় কোর্ট গিনিয়ান এক নাগরিককে আহত করার দায়ে ৯৫,০০০ মার্কিন ডলার ক্ষতিপূরণ দেয়ার জন্য গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্রকে আদেশ দেন।

২০১২ সালের জুলাই মাসে চাদের সাবেক প্রেসিডেন্ট হিসেন হাব্রেকে বিচারের মুখোমুখি বা হস্তান্তর করার প্রসঙ্গে বেলজিয়াম ও সেনেগালের মধ্যকার এক মামলায় আইসিজে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, যদি সেনেগাল হিসেন হাব্রেকে হস্তান্তর নাও করে, তবুও তার মামলাটি যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে প্রদান করতে রাষ্ট্রটি বাধ্য।

২০১২ সালের ডিসেম্বরে সীমানা অধিকার বিষয়ক এক মামলায় আইসিজে নিকারাগুয়া ও কলম্বিয়ার মধ্যকার এক স্থল ও সমুদ্র সীমানা সংক্রান্ত বিরোধের নিষ্পত্তি ঘটায়। এতে সর্বসম্মতিক্রমে ওই সামুদ্রিক এলাকার ওপর কলম্বিয়ার সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৫ জন বিচারকের সর্বসম্মতিক্রমে আদালত একটি একক সমুদ্রসীমা নির্দিষ্ট করে দেন।

২০১৩ সালের এপ্রিলে বুরকিনা ফাসো ও নাইজারের যৌথভাবে দায়ের করা এক জটিল সীমান্ত সংক্রান্ত দ্বন্দ্ব আইসিজে সীমানা রেখা নির্ধারণের মাধ্যমে সমাধান করে। এতে দুই দেশ তাদের মধ্যকার একটি নির্দিষ্ট সেক্টরের সীমা নির্দিষ্টকরণের আবেদন করে, যা কোর্ট কর্তৃক নিষ্পত্তি হয়। বুরকিনা ফাসো এবং নাইজার ১৮ মাসের মধ্যে রায়টি বাস্তবায়ন শুরু করার ব্যাপারে আনুষ্ঠানিকভাবে অঙ্গীকার করে।

২০১৩ সালের ২৮ মে পর্যন্ত আদালতটিতে ১১টি বিচারাধীন মামলা ছিল : যাতে মোট ১৯টি রাষ্ট্র জড়িত। এর মধ্যে রয়েছে : ৭টি মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকান রাষ্ট্র (পেরু বনাম চিলি, ইকুয়েডোর বনাম কলম্বিয়া, দুটি মামলায় কোস্টারিকা ও নিকারাগুয়া, বলিভিয়া বনাম চিলি); চারটি আফ্রিকান রাষ্ট্র (গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্র বনাম উগান্ডা, বুরকিনা ফাসো ও নাইজার); চারটি এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলভুক্ত রাষ্ট্র (কাম্বোডিয়া বনাম থাইল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া বনাম জাপান) এবং চারটি ইউরোপীয় রাষ্ট্র (হাঙ্গেরি/স্লোভাকিয়া, ক্রোয়েশিয়া বনাম সার্বিয়া)।

উপদেষ্টা মতামত

আন্তর্জাতিক আদালতের আরেকটি ভূমিকা হলো জাতিসংঘের বিভিন্ন অঙ্গ সংস্থা ও সংগঠন কর্তৃক উত্থাপিত কোনো আইনি প্রশ্নে বা সমস্যায় পরামর্শ দেয়া। এই কার্যপ্রণালি হচ্ছে উপদেষ্টা মতামত প্রদান করা, যা আইসিজের মোট কর্মপরিধির বা দায়িত্বের ২০ শতাংশ। ১৯৪৬ সাল থেকে এ পর্যন্ত এই আদালত ২৭টি উপদেষ্টা মতামত প্রদান করেছে, যার ৫৫ শতাংশ অর্থাৎ ১৫টি মতামতই ছিল সাধারণ পরিষদ কর্তৃক উত্থাপিত আইনি প্রশ্ন বা বিষয় সংশ্লিষ্ট।

উপদেষ্টা মতামত আদালতটির রায়গুলোর মতো অবশ্যপালনীয় নয়। মতামতগুলোর বাস্তবায়ন এক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবেই আবেদনকারী অঙ্গ-সংস্থাটির ইচ্ছার ওপরে নির্ভর করে। মাঝে মাঝে একটি রাষ্ট্র ও একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন এই ঐকমত্যে পৌঁছে যে তারা তাদের বিরোধের বিষয়ে আন্তর্জাতিক আদালতে উপদেষ্টা মতামত চাইবে এবং দুই পক্ষই এই মতামতকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হিসেবে মেনে নেবে। রাষ্ট্রগুলো এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংগঠন কর্তৃক আদালতের মতামতকে এরূপ গুরুত্ব প্রদান আন্তর্জাতিক আইনের অগ্রগতিতে অবদান রাখে।

আইসিজে-এর উপদেষ্টা মতামত বিভিন্ন ধরনের সমস্যা সংশ্লিষ্ট হয়ে থাকে, যার মধ্যে রয়েছে পারমাণবিক অস্ত্রের ব্যবহার কিংবা ব্যবহারের হুমকির বৈধতা (১৯৯৬), মানবাধিকার প্রতিনিধিদের পদমর্যাদা (১৯৯৯), অধিকৃত ফিলিস্তিনি এলাকায় একটি দেয়াল নির্মাণের আইনগত প্রভাব (২০০৪) এবং কসোভোর একতরফা স্বাধীনতার ঘোষণার সঙ্গে আন্তর্জাতিক আইনের সামঞ্জস্য (২০১০)। অন্যান্য মতামতের মধ্যে রয়েছে জাতিসংঘ সদস্যপদের স্বীকৃতি প্রদান (১৯৪৮), জাতিসংঘে কর্তব্যরত অবস্থায় আহতদের ক্ষতিপূরণ প্রদান (১৯৪৯), দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা সংক্রান্ত প্রশ্ন (নামিবিয়া-১৯৫০, ১৯৫৫, ১৯৫৬ এবং ১৯৭১), পশ্চিম সাহারার সীমান্ত সংক্রান্ত অবস্থা (১৯৭৫), জাতিসংঘের নির্দিষ্ট কিছু কার্যক্রমের ব্যয় (১৯৬২) এবং জাতিসংঘ সদর দপ্তরের চুক্তির প্রযোজ্যতা/উপযোগিতা (১৯৮৮)। আন্তর্জাতিক প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালগুলো কর্তৃক প্রদত্ত রায়ের ওপরও আইসিজে উপদেষ্টা মতামত প্রদান করে থাকে, যেমনটা সম্প্রতি ২০১২ সালে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালের অনুরোধে করা হয়েছে।

এখন পর্যন্ত নিরাপত্তা পরিষদ মাত্র একবার উপদেষ্টা মতামতের জন্য আইসিজেকে অনুরোধ করেছে : ১৯৭০ সালের জুলাই মাসে নামিবিয়াতে দক্ষিণ আফ্রিকার অব্যাহত উপস্থিতিতে রাষ্ট্রগুলোর ওপর আইনগত প্রভাব বিস্তার করে। ১৯৭১ সালের জুন মাসের উপদেষ্টা মতামতে আইসিজে নামিবিয়াতে দক্ষিণ আফ্রিকার অব্যাহত উপস্থিতিকে বেআইনি সাব্যস্ত করে এবং অবিলম্বে দক্ষিণ আফ্রিকাকে সেখান থেকে তার প্রশাসন প্রত্যাহার করতে পরামর্শ দেয়।

আন্তর্জাতিক আইনের বিকাশ ও সংকলন

আন্তর্জাতিক আইন কমিশন আন্তর্জাতিক আইনের ক্রমাগত বিকাশ ও সংকলনের উদ্দেশ্যে ১৯৪৭ সালে সাধারণ পরিষদ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। বছরে একবার বৈঠকে বসা এই কমিশন সাধারণ পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত পাঁচ বছর মেয়াদি ৩৪ জন সদস্য নিয়ে গঠিত। কমিশন সদস্যরা যৌথভাবে বিশ্বের প্রধান প্রধান আইন পদ্ধতিগুলোর প্রতিনিধিত্ব করেন

এবং নিজ নিজ ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ হিসেবে কাজ করেন, কোনো সরকারের প্রতিনিধি হয়ে নয়। তাঁরা রাষ্ট্রগুলোর মধ্যকার সম্পর্ক সংক্রান্ত আইনের সাথে জড়িত বিষয়াবলি নিয়ে ব্যাপক পরিসরে কাজ করেন এবং পরীক্ষিত বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে প্রায়শই 'আন্তর্জাতিক রেডক্রস কমিটি', 'আন্তর্জাতিক বিচার আদালত' এবং 'জাতিসংঘের বিশেষায়িত সংস্থা'গুলোর সাথে শলাপরামর্শ করেন।

কমিশনটির বেশিরভাগ কাজই আন্তর্জাতিক আইনের পরিপ্রেক্ষিতে খসড়া প্রস্তুতির সাথে সংশ্লিষ্ট। কিছু বিষয় কমিশন নিজেই বাছাই করে, আর অন্য বিষয়গুলো সাধারণ পরিষদ এই কমিশনকে অর্পণ করে। কমিশন যখন কোনো একটি বিষয়ের কাজ সম্পন্ন করে, তখন অনেক সময় সাধারণ পরিষদ খসড়াটিকে একটি কনভেনশনে রূপান্তরের উদ্দেশ্যে স্বাধীন কূটনীতিকদের আন্তর্জাতিক সম্মেলন আহ্বান করে থাকে। এরপর এতে সায় প্রদানকারী রাষ্ট্রগুলো কনভেনশনটির বিভিন্ন ধারা-উপধারা মেনে চলতে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়। কনভেনশনগুলোর বেশ কয়েকটি রাষ্ট্রের মধ্যকার আইন পরিচালনামূলক সম্পর্কের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। উদাহরণস্বরূপ :

- ১৯৬১ এবং ১৯৬৩ সালে ভিয়েনায় অনুষ্ঠিত কনফারেন্সগুলোতে গৃহীত যথাক্রমে কনভেনশন অন ডিপ্লোম্যাটিক রিলেশনসও Ges কনভেনশন অন কনস্যুলার রিলেশনস;
- ১৯৬৯ সালে ভিয়েনার এক কনফারেন্সে গৃহীত কনভেনশন অন দ্য ল অফ ট্রিটিজ;
- ১৯৭৩ সালে সাধারণ পরিষদ কর্তৃক গৃহীত কনভেনশন অন দ্য প্রিভেনশন অ্যান্ড পানিশমেন্ট অফ ক্রাইমস এগেইনস্ট ইন্টারন্যাশনালি প্রটেকটেড পারসন্স, ইনক্লুডিং ডিপ্লোম্যাটস;
- ১৯৮৩ সালে ভিয়েনায় অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনে গৃহীত কনভেনশন অন দ্য সাকসেশন অফ স্টেটস ইন রেসপেক্ট অফ স্টেট প্রপার্টি, আর্কাইভস অ্যান্ড ডেটস;
- ১৯৮৬ সালে ভিয়েনায় অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনে গৃহীত কনভেনশন অন দ্য ল অফ ট্রিটিজ বিটুইন স্টেটস অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশনস অর বিটুইন ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশনস;
- ১৯৯৭ সালে সাধারণ পরিষদ কর্তৃক গৃহীত কনভেনশন অন দ্য নন-নেভিগেশনাল ইউসেস অফ ইন্টারন্যাশনাল ওয়াটারকোর্সেস, যা কিনা দুই অথবা ততোধিক রাষ্ট্র কর্তৃক অধিকৃত জলসীমার ন্যায্য ও যুক্তিসঙ্গত ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

১৯৪৯ সাল থেকে 'রাষ্ট্রের দায়িত্ব' সংশ্লিষ্ট বিষয়টি কমিশনের গবেষণার প্রধান ক্ষেত্রতে পরিণত হয়েছে। ১৯৯৯ সালে এটি রাষ্ট্র বিলুপ্তি বা রাষ্ট্র বিভাজনের ফলে কোনো ব্যক্তি বা জনগোষ্ঠীকে শরণার্থী হওয়া রোধে একটি খসড়া বিবৃতি প্রণয়ন করে। ২০০১ সালে বিপজ্জনক কর্মকাণ্ডের কারণে সৃষ্ট আন্তঃসীমান্ত ক্ষতি রোধ করতে কমিশন একটি খসড়া নিবন্ধ প্রকাশ করে।

২০০৮ সালে কমিশনটি চুক্তি সংরক্ষণ ও আন্তঃসীমান্ত জলাধার আইন নিয়ে দুই ধরনের খসড়া নীতি গ্রহণ করে। ২০০৯ সালে এটি আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর কর্তব্য-দায়িত্ব বিষয়ক আরেকটি খসড়া নীতি গ্রহণ করে। ২০১১ সালে কমিশনটি চুক্তি সংরক্ষণ সংক্রান্ত নির্দেশনাবলি প্রকাশ করে এবং একই সাথে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর দায়িত্ব ও চুক্তির ওপর সশস্ত্র বিবাদের প্রভাব সম্পর্কে দুটি খসড়া প্রকাশ করে। ২০১২ সালে

কমিশন কর্তৃক বিবেচিত বিষয়ের মধ্যে ছিল বহিরাগত বিতাড়ন, হস্তান্তর বা বিচারের দায়িত্ব, দুর্যোগকালে ব্যক্তি নিরাপত্তা, বৈদেশিক ফৌজদারি এখতিয়ার থেকে পররাষ্ট্র কর্মকর্তাদের রেহাই, সময়ের আলোকে চুক্তি এবং সবচেয়ে সুবিধাপ্রাপ্ত জাতি সম্পর্কিত দফা।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য আইন

জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিষয়ক কমিশন (United Nations Commission on International Trade Law-UNCITRAL) আন্তর্জাতিক আইনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ রীতিনীতি, নমুনা আইন ও আইনি সহায়িকা উন্নয়নের মাধ্যমে বিশ্ব বাণিজ্যকে সমৃদ্ধ করে। সাধারণ পরিষদ কর্তৃক ১৯৯৬ সালে প্রতিষ্ঠিত ইউএনসিআইটিআরএএল আন্তর্জাতিক বাণিজ্য আইনের ক্ষেত্রে জাতিসংঘ কর্ম-পদ্ধতির মূল অঙ্গ হিসেবে কাজ করছে। জাতিসংঘ আইন বিষয়ক দপ্তরের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য আইন বিভাগ ইউএনসিআইটিআরএএলকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করে। এই কমিশন সাধারণ পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত ৬০টি সদস্য-রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত। কমিশনের সদস্যপদের কাঠামো বিশ্বের বিভিন্ন ভৌগোলিক এলাকা এবং মুখ্য অর্থনৈতিক ও আইনি পদ্ধতির প্রতিনিধিত্বমূলক। কমিশনের প্রত্যেক সদস্য ৬ বছর মেয়াদে নির্বাচিত হন এবং অর্ধেক সদস্যের মেয়াদ প্রতি তিন বছরে উত্তীর্ণ হয়।

বিগত ৪৭ বছরে কমিশনটি এমন কিছু দলিল বা ধারণাপত্র নথি প্রকাশ করেছে, যা আইন ব্যবস্থায় অভূতপূর্ব, মূল্যবান ও প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত। এগুলোর মধ্যে রয়েছে ইউএনসিআইটিআরএএল সালিশ বিধান (১৯৭৬), ইউএনসিআইটিআরএএল মীমাংসা বিধান (১৯৮০), আন্তর্জাতিক পণ্য বিক্রয় চুক্তি বিষয়ক জাতিসংঘ কনভেনশন (১৯৮০), আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক সালিশ বিষয়ক ইউএনসিআইটিআরএএল নমুনা আইন (১৯৮৫), ই-বাণিজ্য বিষয়ক ইউএনসিআইটিআরএএল নমুনা আইন (১৯৯৬), আন্তর্জাতিক পণ্য পরিবহনে সমুদ্রপথের আংশিক বা পূর্ণ ব্যবহার বিষয়ক জাতিসংঘ কনভেনশন (২০০৮) এবং ইউএনসিআইটিআরএএল সালিশি বিধান পুনর্বিবেচনা (২০১০) ও গণক্রয় বা সংগ্রহ বিষয়ক ইউএনসিআইটিআরএএল নমুনা আইন (২০১১)।

২০১২ সালে অনুষ্ঠিত কমিশনের সর্বশেষ অধিবেশনে আলোচ্য বিষয়বস্তুগুলো ছিল সালিশ ও মীমাংসা, অনলাইন দ্বন্দ্ব নিরসন, সচ্ছলতা আইনে ইলেক্ট্রনিক বাণিজ্য এবং নিরাপত্তা অধিকার। বর্তমানে কমিশনের ইউএনসিআইটিআরএএল নথি সংক্রান্ত মোকদ্দমা আইন সংকলন ও প্রকাশনার কাজটি চলমান।

পরিবেশ আইন

সর্বত্র বর্ধিত পরিবেশ নিরাপত্তা নিশ্চিতকারী গুরুত্বপূর্ণ চুক্তির আলোকে আন্তর্জাতিক পরিবেশ আইন বিকাশের ক্ষেত্রে জাতিসংঘ অগ্রদূত হিসেবে কাজ করে আসছে। জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচির মধ্যে অনেকগুলো চুক্তি পরিচালনায় নিয়োজিত করেছে, বাকিগুলো পরিচালনা করছে চুক্তি সচিবালয়সহ জাতিসংঘের অন্য অঙ্গ সংস্থাগুলো, যার মধ্যে রয়েছে :

- কনভেনশন অন ওয়েটল্যান্ডস অফ ইন্টারন্যাশনাল ইম্পর্টেন্স এস্পেশিয়ালি অ্যাজ ওয়াটারফাউল হ্যাবিট্যাট-১৯৭১ রাষ্ট্রপক্ষগুলোকে বিচক্ষণতার সাথে নিজস্ব

এখতিয়ারভুক্ত জলাভূমিকে ব্যবহারে বাধ্য করে (সহযোগিতায় ইউনেসকো)।

- কনভেনশন কনসার্নিং দ্য প্রটেকশন অফ দ্য ওয়ার্ল্ড কালচারাল অ্যান্ড ন্যাচারাল হেরিটেজ-১৯৭২ রাষ্ট্রপক্ষগুলোকে অনন্য প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক নিদর্শনের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে বাধ্য করে (সহযোগিতায় ইউনেসকো);
- কনভেনশন অন ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড ইন এনডেঞ্জারড স্পিসিস অফ ওয়াইল্ড ফনা অ্যান্ড ফ্লোরা-১৯৭৩ নির্দিষ্ট বন্য প্রাণী ও উদ্ভিদ প্রজাতির বা পণ্যের অস্তিত্ব নিশ্চিত করতে কোটাপ্রথা বা সরাসরি নিষেধাজ্ঞা জারি করে আন্তর্জাতিকভাবে এদের ক্রয়-বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ করে;
- বন কনভেনশন অন দ্য কনসারভেশন অফ মাইগ্রেটরি স্পিসিস অফ ওয়াইল্ড এনিমেল; ১৯৭৯ এবং আনুষঙ্গিক কিছু আঞ্চলিক ও প্রজাতিগত চুক্তি স্থলজ, জলজ ও আকাশপথে পরিযায়ী প্রজাতি ও তাদের বাসস্থান সংরক্ষণে কাজ করে;
- কনভেনশন অন লং-রেইঞ্জ ট্রান্সবাউন্ডারি এয়ার পলিউশন 'এসিড রেইন কনভেনশন'-১৯৭৯ এবং ইউরোপ বিষয়ক জাতিসংঘ অর্থনৈতিক কমিশনের পৃষ্ঠপোষকতায় গৃহীত এই কনভেনশনভুক্ত প্রটোকলগুলো ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকাতে বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ ও হ্রাসে কাজ করছে;
- ইউনাইটেড নেশনস কনভেনশন অন দ্য ল অফ দ্য সি-১৯৮২ সমন্বিতভাবে বেশকিছু সামুদ্রিক ইস্যু নিয়ন্ত্রণ করে থাকে, যার মধ্যে রয়েছে উপকূল ও সামুদ্রিক পরিবেশের নিরাপত্তা ও সংরক্ষণ, সামুদ্রিক দূষণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ, জৈব ও অজৈব সম্পদের অধিকার এবং জৈব সম্পদের ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ;
- ভিয়েনা কনভেনশন ফর দ্য প্রটেকশন অফ দ্য ওজোন লেয়ার-১৯৮৫ এবং মন্ট্রিয়ল প্রটোকল-১৯৮৭ ও এর সংশোধনীগুলো ওজন স্তরের ক্ষতি হ্রাস করার উপায় খোঁজ করে, যে স্তর সূর্যের ক্ষতিকর অতিবেগুনি রশ্মির বিকিরণ থেকে জীবনকে রক্ষা করে;
- বাসেল কনভেনশন অন দ্য কন্ট্রোল অফ ট্রান্সবাউন্ডারি মুভমেন্ট অফ হ্যাজারডাস ওয়েস্টস অ্যান্ড দেয়ার ডিসপোজাল-১৯৮৯ ও এর সংশোধনীগুলো এবং একই সাথে ঝুঁকিপূর্ণ বর্জ্যের আন্তঃসীমান্ত অপসারণের কারণে সৃষ্ট দায় ও ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত ১৯৯৯ প্রটোকল রাষ্ট্রপক্ষগুলোকে সীমান্তজুড়ে ঝুঁকিপূর্ণ বর্জ্যের শিপিং এবং ডাম্পিং হ্রাস করতে বাধ্য করে ও এদের বিষাক্ত কার্যকারিতা হ্রাস করে;
- এগ্রিমেন্ট অন দ্য কনসার্ভেশন অফ স্মল সিটেশান্স অফ দ্য বাল্টিক অ্যান্ড নর্থ সিস-১৯৯১ সিটেশান গোত্রভুক্ত স্তন্যপায়ী ছোট প্রাণী ও তাদের আবাস সংরক্ষণের জন্য পক্ষগুলোর মধ্যে সহযোগিতা বাড়ানোর লক্ষ্যে কাজ করে;
- কনভেনশন অন বায়োলজিক্যাল ডাইভারসিটি-১৯৯২ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করতে, এর উপাদানগুলোর টেকসই ব্যবহার উৎসাহিত করতে এবং জিনগত সম্পদের ব্যবহার থেকে প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধার সমবণ্টন নিশ্চিত করতে সচেষ্ট হয়; এর জৈব নিরাপত্তা বিষয়ক কারটাজিনা প্রটোকল-২০০০ জৈব জিনগত পরিবর্তনে সৃষ্ট সম্ভাব্য ঝুঁকি থেকে জীববৈচিত্র্যকে রক্ষায় সচেষ্ট;
- ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন দ্য ক্লাইমেট চেইঞ্জ-১৯৯২ রাষ্ট্রপক্ষগুলোকে বৈশ্বিক উষ্ণতা ও সংশ্লিষ্ট বায়ুমণ্ডলীয় সমস্যা সৃষ্টিকারী গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ কমাতে বাধ্য করে; এই কনভেনশনের কিয়োটো প্রটোকল-১৯৯৭ ২০০৮ থেকে ২০১২ সালের

মধ্যে আইনগতভাবে নিঃসরণের লক্ষ্যমাত্রা বেঁধে দেয়ার মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া জোরদার করেছে;

- ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন টু কমব্যাট ডেজার্টিফিকেশন ইন দোউজ কাউন্ট্রিজ এক্সপেরিয়ন্সিং সিরিয়াস ড্রাউট অয়ান্ড/অর ডেজার্টিফিকেশন, পার্টিকুলারলি ইন আফ্রিকা-১৯৯৪ মরুকরণ প্রতিরোধে এবং খরার প্রভাব উপশমে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধিতে কাজ করে;
- এগ্রিমেন্ট অন দ্য কনসার্ভেশন অফ সিটেশান্স ইন দ্য ব্ল্যাক সি, মেডিটেরেনিয়ান সি অ্যান্ড কন্টিজাস আটলান্টিক এরিয়া-১৯৯৬ ভূমধ্যসাগর ও কৃষ্ণসাগরের সিটেশান গোত্রভুক্ত স্তন্যপায়ী প্রাণীদের হুমকির হাত থেকে বাঁচাতে সচেষ্ট হয় এবং সিটেশানদের স্বেচ্ছায় ধরা নিষিদ্ধকরণে ও সংরক্ষিত জোন ঘোষণা করতে রাষ্ট্রগুলোর ওপর চাপ প্রয়োগ করে;
- রটারডেম কনভেনশন অন দ্য প্রায়োর ইনফরমড কনসেন্ট প্রসিজার ফর সার্টেইন হ্যাজারডাস কেমিক্যালস অ্যান্ড পেস্টিসাইডস ইন ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড-১৯৯৮ ঝুঁকিপূর্ণ রাসায়নিক ও কীটনাশক রপ্তানির ক্ষেত্রে আমদানিকৃত রাষ্ট্রকে সম্ভাব্য বিপদ সম্পর্কে অবহিত করতে রপ্তানিকারকদের বাধ্য করে;
- স্টকহোম কনভেনশন অন পারসিসটেন্ট অর্গানিক পলিউট্যান্টস-২০০১-এর লক্ষ্য হচ্ছে ডিডিটি, পিসিবি ও ডাইঅক্সিনের মতো দ্রুত বিস্তারকারী ও খাদ্য উপাদানে সহজেই মিশে যাওয়া বিষাক্ত কীটনাশক, শিল্পজাত রাসায়নিক ও উপজাতগুলোর ব্যবহার হ্রাস ও বন্ধ করা;
- কিয়েভ প্রটোকল অন স্ট্র্যাটেজিক এনভায়রনমেন্টাল অ্যাসেসমেন্ট-২০০৩-এ রাষ্ট্র পক্ষগুলোকে তাদের খসড়া পরিকল্পনা ও কর্মসূচির পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন করতে বলা হয়েছে।

সমুদ্র আইন

সমুদ্র আইন বিষয়ক জাতিসংঘ কনভেনশন (United Nations Convention on the Law of the Sea) বিশ্বের আন্তর্জাতিক আইনের এক অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দলিল। এর ৩২০টি অনুচ্ছেদ ও নয়টি সংযুক্তিতে নৌচালনা ও অনুপ্রবেশ, খনিজ অনুসন্ধান ও আহরণ, জীবসম্পদের সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা, সামুদ্রিক পরিবেশের সুরক্ষা এবং সামুদ্রিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সাগর সম্পদের যথার্থ ব্যবহারের নীতিমালাসহ সাগর ও মহাসাগরে আইনসম্মত কর্মযজ্ঞের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। কনভেনশন এই ধারণা পোষণ করে যে, সামুদ্রিক এলাকার সকল সমস্যা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত এবং তাদের সবগুলোকে এক সমন্বিত আঙ্গিকে চিহ্নিত ও বিবেচনা করা উচিত। এই আইন একই সাথে সমুদ্র ব্যবহারের চিরাচরিত নিয়ম এবং উদীয়মান বিষয় সংক্রান্ত নতুন নিয়মগুলোকে এক দলিলে সংকলিত করে। সমুদ্র আইন সংক্রান্ত জাতিসংঘের এই কনভেনশনটি এক অনন্য দলিল যাকে প্রায়ই 'সমুদ্রের সংবিধান' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

এটি এখন প্রায় সর্বজনস্বীকৃত যে, সাগর ও মহাসাগরে পরিচালিত সকল কার্যক্রম এই কনভেনশনের বিধি অনুসারেই বাস্তবায়িত হতে হবে। এ ধরনের অন্য দলিলাদির মতো এই কনভেনশনের কর্তৃত্বের গ্রহণযোগ্যতাতেই নিহিত। ২০১৩ সালের জুন নাগাদ

এই কনভেনশনে ১৬৫টি অংশগ্রহণকারী পক্ষ ছিল, যার মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন রাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং দুটি পরাধীন অঞ্চল। অন্যান্য রাষ্ট্র এই কনভেনশনের সদস্য হওয়ার প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে। প্রায় সকল রাষ্ট্রই এর বিধানগুলো আমলে নেয় এবং মেনে চলে।

কনভেনশনের প্রভাব

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইন প্রণয়ন ও সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে রাষ্ট্রগুলো বরাবরই এই কনভেনশনকে এ ক্ষেত্রের শ্রেষ্ঠ আন্তর্জাতিক আইনি দলিল হিসেবে সমর্থন দিয়ে আসছে। এর কর্তৃত্ব প্রায় সর্বজনস্বীকৃত, যা প্রধান কিছু বিষয়ে লক্ষণীয় ও রাষ্ট্রগুলোকে মেনে চলতে দেখা যায়; যেমন—আঞ্চলিক সমুদ্রসীমা হিসেবে ১২ নটিক্যাল মাইল, উপকূলীয় রাষ্ট্রগুলোর সার্বভৌম অধিকার ও ২০০ নটিক্যাল মাইলের সীমা পর্যন্ত একটি 'স্বতন্ত্র অর্থনৈতিক জোন'-এ এখতিয়ার এবং ২০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত এবং নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে সেই সীমার অতিরিক্ত দূরত্ব পর্যন্ত বিস্তৃত মহাদেশীয় বালুচরে তাদের সার্বভৌম অধিকার। এছাড়াও কনভেনশনটি আঞ্চলিক সমুদ্রের মধ্য দিয়ে সরল পথের অধিকার, আন্তর্জাতিক নৌ-চলাচলের জন্য সংকীর্ণ জলপ্রণালির মধ্য দিয়ে পরিবহন পথ, দ্বীপপুঞ্জবেষ্টিত জলাশয়ের মধ্য দিয়ে জাহাজ চলাচলের পথ এবং স্বতন্ত্র অর্থনৈতিক জোনে স্বাধীন নৌ-চলাচলের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করে একটি 'নৌ-চলাচল এলাকার স্থিতিশীলতা' এনেছে।

এই কনভেনশনের প্রায় সর্বজনস্বীকৃতি সহজতর হয়েছে ১৯৯৪ সালে সাধারণ পরিষদে গৃহীত 'কনভেনশনের একাদশ অংশের বাস্তবায়ন সংক্রান্ত চুক্তি'র মধ্য দিয়ে। এই চুক্তি সমুদ্র তলদেশ অঞ্চল সংক্রান্ত নির্দিষ্ট কিছু সমস্যা দূর করে, যা বিভিন্ন শিল্পোন্নত দেশকে ইতিপূর্বে এই কনভেনশনে সই করা থেকে বিরত রাখছিল। ২০১৩ সালের জুন নাগাদ ১৪৪টি রাষ্ট্রপক্ষ নিয়ে এই একাদশ অংশ চুক্তি এখন সর্বজনস্বীকৃত।

এই কনভেনশন উপকূলীয় রাষ্ট্রগুলোর অধিকার, তাদের এখতিয়ারে এর প্রয়োগ, সামুদ্রিক বিজ্ঞানের গবেষণা নিয়ন্ত্রণ, অনুমোদন ও পরিচালনা করা এবং একই সাথে সামুদ্রিক পরিবেশের দূষণ প্রতিরোধ, হ্রাস ও নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিতকরণে তাদের দায়িত্ব, উপকূলীয় রাষ্ট্রের স্বতন্ত্র অর্থনৈতিক জোনের সামুদ্রিক জীবসম্পদের ওপর স্থলবেষ্টিত রাষ্ট্রগুলোর অধিকার বিষয়ক বিধান ইত্যাদির কারণেও এটি সর্বজনস্বীকৃত হয়েছে। সর্বোপরি, এই কনভেনশন যে কোনো ভবিষ্যৎ দলিলের নির্মাণ-কাঠামো ও ভিত্তিরূপে স্বীকৃত, যা সমুদ্রের ব্যাপারে রাষ্ট্রগুলোর অধিকার ও দায়বদ্ধতা বিশ্লেষণের মাধ্যমে অধিকতর স্পষ্ট করে।

এ রকম এক দলিল, ১৯৯৫ সালের স্ট্যাডলিং মাছ ও অতিমাত্রায় পরিযায়ী মাছের মজুদ সংক্রান্ত চুক্তি, যা মাছের মজুত, তাদের সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য একটি বৈধ কর্মপদ্ধতি সম্পর্কিত কনভেনশনের বিধান বাস্তবায়ন করে। এ ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদি কার্যকারিতা ও সর্বোত্তম উপযোগিতা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে রাষ্ট্রগুলোর সহযোগিতা অপরিহার্য। এছাড়া রাষ্ট্রীয় এখতিয়ার ও সংলগ্ন সামুদ্রিক এলাকার মজুত সংক্রান্ত পদ্ধতিগত ব্যবস্থাপনার সামঞ্জস্য অর্জনেও রাষ্ট্রগুলোর সহযোগিতা লাগে। ২০১৩ সালের জুন মাসের হিসাবমতে, এই চুক্তিতে ৮০টি রাষ্ট্রের সম্মতি ছিল।

কনভেনশনের অধীনে প্রতিষ্ঠিত সংস্থাগুলো

সামুদ্রিক আইনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কাজ করার জন্য, অর্থাৎ এর বাস্তবায়নকল্পে এই কনভেনশন তিনটি নির্দিষ্ট অঙ্গ প্রতিষ্ঠা করে।

আন্তর্জাতিক সমুদ্র তলদেশ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সদস্য রাষ্ট্রগুলো 'রাষ্ট্রীয় এখতিয়ারবহির্ভূত সমুদ্র তলদেশ এবং সমুদ্রতল ও তার অন্তমৃত্তিকা' হিসেবে পরিচিত আন্তর্জাতিক সমুদ্র তলদেশ অঞ্চলের গভীর সমুদ্র তলদেশস্থ খনিজ সম্পদ সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করে। জ্যামাইকার কিংস্টনে ১৯৯৪ সালে আন্তর্জাতিক সমুদ্র তলদেশ কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠিত হয়। ২০০২ সালে এই কর্তৃপক্ষ সমুদ্র তলদেশ অঞ্চলে পলিমেটালিক নডিউল সন্ধান ও অন্বেষণ বিষয়ক নীতিমালা গ্রহণ করে।

অনুসন্ধান বিষয়ক ধারা সংবলিত এ ধরনের চুক্তি সম্পাদনের পর গভীর সমুদ্র তলদেশে পলিমেটালিক নডিউল অন্বেষণের জন্য বিভিন্ন দেশের নিবন্ধিত পথিকৃৎ বিনিয়োগকারীর সাথে প্রথম ১৫ বছর মেয়াদি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই বিনিয়োগকারীরা হচ্ছে রাষ্ট্রীয় মালিকাধীন এন্টারপ্রাইজ বা বহুজাতিক বাণিজ্যিক সংস্থা, যারা কনভেনশনে সম্পাদনের আগেই অনুসন্ধান কার্যক্রমের দায়িত্ব নিয়ে সমুদ্র তলদেশ অঞ্চলে অর্থনৈতিকভাবে আহরণযোগ্য পলিমেটালিক নডিউলের মজুতের অবস্থান নির্ণয় করেছিল এবং 'এন্টারপ্রাইজ' ব্যতীত যাদেরকে উৎপাদন অনুমোদন প্রদানে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছিল। 'এন্টারপ্রাইজ' হচ্ছে 'আন্তর্জাতিক সমুদ্র তলদেশ কর্তৃপক্ষে'র অঙ্গ সংগঠন, যা কনভেনশনে উল্লিখিত অঞ্চলে কার্যক্রম পরিচালনা করার পাশাপাশি অঞ্চল থেকে সংগৃহীত খনিজ পরিবহন, প্রক্রিয়াজাত এবং বাজারজাত করে থাকে। এসব কর্মকাণ্ড এখন কর্তৃপক্ষের 'বৈধ ও কারিগরি কমিশন' করে থাকে।

১৯৯৬ থেকে কার্যকর 'সামুদ্রিক আইনের জন্য আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাল' কনভেনশনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও প্রয়োগ সংক্রান্ত বিরোধ মীমাংসার উদ্দেশ্যে স্থাপিত হয়েছিল। জার্মানির সমুদ্রবন্দর হামবুর্গে অবস্থিত এই ট্রাইব্যুনালটি বিভিন্ন রাষ্ট্র কর্তৃক নির্বাচিত ২১ জন বিচারকের সমন্বয়ে গঠিত। ২০০১ সালে প্রথমবারের মতো এই আদালতে মামলা দায়ের করা হয়।

২০১৩ সালের জুন নাগাদ এই ট্রাইব্যুনালে ২১টি মামলা রজু করা হয়েছিল, যার মধ্যে অধিকাংশই ছিল কনভেনশন লঙ্ঘনের অভিযোগে আটককৃত জাহাজ ও নাবিকদের দ্রুত মুক্তি-সংশ্লিষ্ট। কয়েকটি মামলা ছিল জীবসম্পদের সংরক্ষণ বিষয়ক, যেমন দক্ষিণাঞ্চলের ব্লু ফিন টুনার মজুতকে কেন্দ্র করে নিউজিল্যান্ড বনাম জাপান এবং অস্ট্রেলিয়া বনাম জাপানের মধ্যকার বিরোধ। আরেকটি মামলা ব্যবহৃত পারমাণবিক জ্বালানি পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য পরিকল্পিত প্ল্যান্টের কারণে উদ্ভূত ভূমিভিত্তিক দূষণ রোধকল্পে আয়ারল্যান্ড ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সৃষ্ট বিরোধ সম্পর্কিত। এই ২১টি মামলার মধ্যে দুটি মামলা ২০১৩ সালের জুন নাগাদ আদালতের তালিকাভুক্ত ছিল: এদের মধ্যে একটি হলো পানামা ও গিনি-বিসাউয়ের মধ্যে একটি তেলবাহী জাহাজ নিয়ে বিরোধ সম্পর্কিত এবং অন্যটি হলো উপ-আঞ্চলিক মৎস্য কমিশনের অনুরোধক্রমে উপদেষ্টা মতামত প্রদান সম্পর্কিত।

মহীসোপানের সীমা-সংক্রান্ত কমিশনের উদ্দেশ্য হলো কনভেনশনে বর্ণিত কনভেনশনের সর্বনিম্ন আইনি দূরত্ব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত উপকূল থেকে কমপক্ষে ২০০

নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত নিমজ্জিত মহীসোপান এলাকার বহিঃসীমা সংক্রান্ত অংশের বাস্তবায়ন সহজতর করে তোলা। এর ৭৬নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, নির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি সূত্র প্রয়োগের মাধ্যমে কোনো উপকূলীয় রাষ্ট্র তার আইনগত মহীসোপান এলাকার সীমা নির্ধারণ করতে পারে। কমিশন ১৯৯৭ সালে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে তার প্রথম বৈঠক করে। কনভেনশনের রাষ্ট্রপক্ষগুলো কর্তৃক বাছাইকৃত ২১ জন সদস্য ব্যক্তিগত পর্যায়ে দায়িত্ব পালন করে থাকেন। তাঁরা ভূতত্ত্ববিদ্যা, ভূ-পদার্থবিদ্যা, জলবিদ্যা ও ভূগণিতে বিশেষজ্ঞ। ২০০১ সালের ডিসেম্বরে কমিশনটি রাশিয়ান ফেডারেশনের কাছ থেকে তার প্রথম মহীসোপানের সীমা-সংক্রান্ত আবেদন পায়।

রাষ্ট্রপক্ষগুলোর বৈঠক ও সাধারণ পরিষদের কর্মপ্রক্রিয়া

যদিও কনভেনশন অনুযায়ী রাষ্ট্রপক্ষগুলোর কোনো নির্ধারিত বৈঠকের নির্দেশ নেই, তবুও জাতিসংঘ মহাসচিব কর্তৃক আহ্বানকৃত রাষ্ট্রপক্ষগুলোর বার্ষিক সম্মেলনটিই একটি ফোরাম হিসেবে কাজ করে, যেখানে রাষ্ট্রপক্ষগুলো বিভিন্ন জরুরি বিষয় নিয়ে আলোচনা করে থাকে। এর আরও রয়েছে অবশ্য পালনীয় প্রশাসনিক কার্যাবলি, যেমন ট্রাইব্যুনাল ও কমিশনের সদস্য নির্বাচন এবং একই সাথে অন্যান্য বাজেট ও প্রশাসন সংক্রান্ত কার্যক্রম। ২০০১ সালে মৎস্য সরবরাহ চুক্তি বলবৎ হওয়ার পর থেকে মহাসচিবের বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণের জন্য রাষ্ট্রপক্ষগুলোর অনানুষ্ঠানিক বার্ষিক পরামর্শ সভা আহ্বান করে থাকেন।

সামুদ্রিক বিষয়াবলি ও সামুদ্রিক আইন বিষয়ে সাধারণ পরিষদ তদারকিমূলক কর্তব্য পালন করে। ২০০০ সালে এসব ক্ষেত্রে নিজেদের বার্ষিক উন্নয়ন পর্যালোচনার জন্য এটি একটি উন্মুক্ত, অনানুষ্ঠানিক ও পরামর্শমূলক প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠা করে। বার্ষিক আহ্বানকৃত এই প্রক্রিয়া পরিষদকে বিভিন্ন রাষ্ট্র ও সংস্থাগুলোর মধ্যে সমন্বয় ও সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিতকরণে জোর দিতে পরামর্শ প্রদান করে। এসব বিষয়ের মধ্যে রয়েছে নৌ-চালনা ও সামুদ্রিক পরিবহনে নিরাপত্তা এবং সামুদ্রিক পরিবেশ ও বাস্তুসংস্থান রক্ষার মতো বিষয়। এর ইতিবাচক ফলাফল অর্জনের কারণে এই পরামর্শমূলক কার্যক্রম বারবার বর্ধিত হয়েছে। ২০০৪ সালে সাধারণ পরিষদ জাতীয় সীমানার বাইরের সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্যের সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবহার বিষয়ে কাজ করার জন্য একটি উন্মুক্ত, অনানুষ্ঠানিক ও অ্যাডহক কর্মীদলও প্রতিষ্ঠা করে।

আন্তর্জাতিক মানবিক আইন

আন্তর্জাতিক মানবিক আইন যুদ্ধের মাধ্যম ও পদ্ধতি নির্ধারণ করার পাশাপাশি বেসামরিক জনগণ, অসুস্থ ও আহত সৈনিক এবং যুদ্ধবন্দিদের মানবাধিকার রক্ষা সংশ্লিষ্ট নীতিমালা ও শর্তাবলির সম্পৃক্ত একটি কার্যকরী দলিল। এর মূল দলিলাদির মধ্যে রয়েছে ১৯৪৯ সালের 'জেনেভা কনভেনশনস ফর দ্য প্রটেকশন অফ ওয়ার ভিকটিমস' এবং অতিরিক্ত দুটি খসড়া দলিল, যা ১৯৭৭ সালে আন্তর্জাতিক রেডক্রস কমিটির পৃষ্ঠপোষকতায় গৃহীত হয়।

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের উৎকর্ষ ও উন্নতি সাধনে জাতিসংঘ অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। নিরাপত্তা পরিষদ সশস্ত্র সংঘাত থেকে বেসামরিক জনগণের সুরক্ষা,

মানবাধিকার উন্নয়ন এবং যুদ্ধ থেকে শিশুদের সুরক্ষাতে দিন দিন আরও বেশি জড়িয়ে পড়ছে। ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল ট্রাইব্যুনালস ফর দ্য ফরমার যুগোস্লাভিয়া-১৯৯৩ অ্যান্ড ফর রুয়ান্ডা-১৯৯৪-এর প্রতিষ্ঠা মানবাধিকার আইনের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ এবং সুদূরপ্রসারী সমর্থন শক্তিশালী ও বৃদ্ধি করতে সাহায্য করেছে।

এটি জাতিসংঘ থেকে বাস্তব সহায়তাপ্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত তিনটি আদালতের ওপরও বর্তায় : স্পেশাল কোর্ট ফর সিয়েরা লিয়ন (২০০২), এক্সট্রা অর্ডিনারি চেম্বারস ইন দ্য কোর্টস অফ কম্বোডিয়া (২০০৬) এবং স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল ফর লেবানন (২০০৭)। মাঝে মধ্যে 'হাইব্রিড' আদালত নামে আখ্যায়িত এই আদালতগুলো মূলত অস্থায়ী সংস্থা, যা সকল মামলার শুনানি নিষ্পত্তি শেষে অকার্যকর ও অস্তিত্বহীন হয়ে পড়বে।

জাতিসংঘের রাজনৈতিক ফোরাম হিসেবে সাধারণ পরিষদ আন্তর্জাতিক মানবাধিকার নীতির প্রসার ও প্রয়োগ অগ্রসর সম্পৃক্ত বেশ কিছু দলিল সম্প্রসারণে অবদান রেখেছে। এর মধ্যে রয়েছে গণহত্যাজনিত অপরাধের প্রতিরোধ ও শাস্তি বিষয়ক কনভেনশন-১৯৪৮, যুদ্ধাপরাধ ও মানবতাবিরোধী অপরাধের ক্ষেত্রে সংবিধিবদ্ধ সীমাবদ্ধতার অপ্রযোজ্যতা বিষয়ক কনভেনশন-১৯৬৮, অতিশয় অনিষ্টকর প্রভাবযুক্ত হিসেবে গণ্য নির্দিষ্ট কিছু অস্ত্র ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা ও সীমাবদ্ধতা বিষয়ক কনভেনশন-১৯৮০ ও এর পাঁচটি খসড়া দলিল, ১৯৭৩ সালে পরিষদ কর্তৃক গৃহীত যুদ্ধাপরাধ ও মানবতাবিরোধী অপরাধের অপরাধী শনাক্তকরণ, গ্রেফতার, বহিঃসমর্পণ ও শাস্তির ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বিষয়ক মূল নীতিগুলো এবং ক্লাস্টার যুদ্ধোপকরণ বিষয়ক কনভেনশন-২০০৮।

এছাড়াও সাধারণ পরিষদ এক কূটনৈতিক সম্মেলনের আহ্বান করে, যেখানে ১৯৯৮ সালে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের রোম সংবিধি গৃহীত হয়। এরও পূর্বে আদালতের প্রস্তুতিমূলক কমিশন গণহত্যা, যুদ্ধাপরাধ ও মানবতাবিরোধী অপরাধের আলোকে অপরাধের উপাদানগুলো বর্ণনা করেছিল, যা আন্তর্জাতিক মানবতাবাদী আইনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ

জাতিসংঘ তার আইনগত ও রাজনৈতিক উভয় প্রেক্ষিতেই জঙ্গিবাদ সমস্যার প্রসঙ্গ ধারাবাহিকভাবে উত্থাপন ও পর্যালোচনা করে আসছে। জাতিসংঘও জঙ্গিবাদের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছে। আফগানিস্তান থেকে আলজেরিয়া, ইরাক থেকে পাকিস্তান, সবখানেই জাতিসংঘ কর্মীরা কর্তব্যরত অবস্থায়, শান্তি, মানবাধিকার আর উন্নয়ন সেবা দিতে গিয়ে তাদের জীবন হারিয়েছে।

১৯৬৩ সাল থেকে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়গুলো জঙ্গি কার্যকলাপ প্রতিরোধে জাতিসংঘ, তার বিশেষায়িত এজেন্সি ও আন্তর্জাতিক পারমাণবিক শক্তি এজেন্সির পৃষ্ঠপোষকতায় ১৪টি সর্বজনীন আইনি দলিল ও চারটি সংশোধনী সুসম্পন্ন করেছে :

- যাত্রীবাহী আকাশযানে সম্পাদিত অপরাধ ও অন্যান্য নির্দিষ্ট কার্যকলাপ বিষয়ক কনভেনশন, টোকিও-১৯৬৩;
- অনৈতিকভাবে আকাশযান দখলিকরণ দমন সম্পৃক্ত কনভেনশন, দ্য হেগ-১৯৭০ এবং তার পরিপূরক দলিল-২০১০;

- বেসামরিক বিমান চালনা পরিপন্থী অনৈতিক কার্যকলাপ দমন সম্পৃক্ত কনভেনশন, মনট্রিল-১৯৭১;
- কূটনৈতিক দূতসহ আন্তর্জাতিকভাবে সুরক্ষিত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কৃত অপরাধ প্রতিরোধ ও শাস্তি প্রদান বিষয়ক কনভেনশন, নিউইয়র্ক-১৯৭৩;
- জিম্মি আটকের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক কনভেনশন, নিউইয়র্ক-১৯৭৯;
- পারমাণবিক উপাদানগুলোর বিপরীতে শারীরিক সুরক্ষা বিষয়ক কনভেনশন, ভিয়েনা-১৯৮০ এবং তার সংশোধনীগুলো-২০০৫;
- আন্তর্জাতিক বেসামরিক বিমান চালনা সেবাদানকারী বিমানবন্দরগুলোতে হিংসাত্মক অনৈতিক কার্যকলাপ দমন সম্পৃক্ত দলিল, মনট্রিল-১৯৮৮;
- সামুদ্রিক নৌযাত্রার নিরাপত্তারোধী অনৈতিক কার্যকলাপ দমন বিষয়ক কনভেনশন, রোম-১৯৮৮ এবং তার দলিল-২০০৫;
- মহীসোপানে অবস্থিত স্থায়ী প্ল্যাটফর্মের নিরাপত্তাবিরোধী অনৈতিক কার্যকলাপ দমন বিষয়ক প্রটোকল, রোম-১৯৮৮ এবং তার দলিল-২০০৫;
- শনাক্তকরণের উদ্দেশ্যে প্লাস্টিক বিস্ফোরক চিহ্নিতকরণ বিষয়ক কনভেনশন, মনট্রিল-১৯৯১;
- জঙ্গি বোমা হামলা দমন বিষয়ক আন্তর্জাতিক কনভেনশন-১৯৯৭;
- জঙ্গি অর্থায়ন দমন বিষয়ক আন্তর্জাতিক কনভেনশন-১৯৯৯;
- পারমাণবিক জঙ্গি কার্যক্রম দমন সম্পৃক্ত আন্তর্জাতিক কনভেনশন, ২০০৫; এবং
- আন্তর্জাতিক বেসামরিক বিমান পরিচালনা সংক্রান্ত অনৈতিক কার্যকলাপ দমন বিষয়ক কনভেনশন-২০১০।

১৯৯৪ সালে সাধারণ পরিষদ আন্তর্জাতিক জঙ্গিবাদ অপসারণের উপায় সম্পর্কিত ঘোষণা গ্রহণ করে। ১৯৯৬ সালে ১৯৯৪ সালের ঘোষণার সম্পূরক ঘোষণার মাধ্যমে সাধারণ পরিষদ সকল জঙ্গিবাদী কর্মকাণ্ড ও অভ্যাসকে অপরাধ ও অসমর্থযোগ্য হিসেবে আখ্যায়িত করে, তা যেখানে ও যার দ্বারাই সম্পাদিত হোক না কেন। এটি জঙ্গিবাদ দমনে ও নির্মূলে রাষ্ট্রগুলোকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পদক্ষেপ নেয়ার আহ্বানও জানায়। বর্তমানে বিদ্যমান চুক্তিগুলোর ফাঁকফোকর নির্ধারণ করার জন্য পরিষদ ১৯৯৬ সালে একটি অ্যাডহক কমিটি গঠন করে, যা জঙ্গিবাদবিরোধী একটি সর্বাঙ্গীণ নীতিমালা প্রণয়নের কাজ করছে।

যুক্তরাষ্ট্রের টুইন টাওয়ারে ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরে সংঘটিত জঙ্গি হামলার কিছুদিন পরেই নিরাপত্তা পরিষদ 'জঙ্গিবাদবিরোধী কমিটি' গঠন করে। অন্যান্য কার্যকলাপের মধ্যে এই কমিটি পরিষদের প্রস্তাব '১৩৭৩ (২০০১)' ও '১৬২৪ (২০০৫)'-এর বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ করে, যা সদস্য রাষ্ট্রগুলোর ওপর বেশ কিছু নির্দিষ্ট বাধ্যবাধ্যকতা আরোপ করে। এর মধ্যে রয়েছে : জঙ্গিবাদ সম্পর্কিত কার্যকলাপকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করা এবং সে মতে পদক্ষেপ গ্রহণ, জঙ্গি অর্থায়ন ও আশ্রয় অস্বীকার ও প্রতিরোধ করা এবং জঙ্গিগোষ্ঠী সম্পর্কিত তথ্য আদান-প্রদান করা।

২০০৫ সালের বিশ্ব সম্মেলনে বিশ্বনেতারা দ্ব্যর্থহীনভাবে জঙ্গিবাদ এবং তার সকল রূপ ও প্রকাশের প্রতি নিন্দা জ্ঞাপন করেছেন। একই সম্মেলনে সদস্য রাষ্ট্রগুলোকে সাধারণ পরিষদের মাধ্যমে জাতিসংঘ মহাসচিবের পরামর্শের ভিত্তিতে জঙ্গিবাদবিরোধী কৌশল অবলম্বন করতে অনুরোধ করা হয়।

২০০৬ সালে সাধারণ পরিষদে সর্বসম্মতিক্রমে 'জাতিসংঘ বৈশ্বিক জঙ্গিবাদবিরোধী কৌশল' কার্যকরী হয়। জঙ্গিবাদের সব রূপ অগ্রহণযোগ্য ও সমর্থনের অযোগ্য—এই মৌলিক বিশ্বাসের ভিত্তিতে এই কৌশল জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে জঙ্গিবাদকে মোকাবেলার জন্য বিস্তৃত ব্যবস্থামূলক রূপরেখা তৈরি করে। ২০১০ সালে এই কৌশলের দ্বিবার্ষিক পর্যালোচনায় পরিষদ কৌশলগুলোর বাস্তবায়নে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর প্রাথমিক দায়িত্ব পুনর্ব্যক্ত করে। সদস্য রাষ্ট্রগুলোও জঙ্গি কার্যক্রমের শিকার ব্যক্তিদের সমর্থনে সর্বজনীন ঐক্য বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা এবং জঙ্গিবাদের আবেদন প্রতিহত করার ক্ষেত্রে তাদের পালনীয় ভূমিকার ওপর জোরদার করে।

আন্তর্জাতিক অপরাধ বিষয়ক আদালত

আন্তর্জাতিক অপরাধ বিষয়ক আদালত (International Criminal Court-ICC) একটি স্বাধীন ও স্থায়ী আদালত, যা গণহত্যা, মানবতাবিরোধী অপরাধ ও যুদ্ধাপরাধের মতো আন্তর্জাতিক গুরুত্ব বহনকারী গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিচার করে। আগ্রাসনমূলক অপরাধের সংজ্ঞা অনুযায়ী সংঘটিত অপরাধের বিচারও এই আদালতের আওতাভুক্ত। ১৯৯৮ সালের ১৭ জুলাই রোমে অনুষ্ঠিত একটি পূর্ণ ক্ষমতাপ্রাপ্ত সম্মেলনে গৃহীত আন্তর্জাতিক অপরাধ বিষয়ক আদালতের রোম সংবিধির মাধ্যমে এই আদালত প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সংবিধি ২০০২ সালের ১ জুলাই কার্যকর হয়। জুন ২০১৩ পর্যন্ত এর ১২২টি সদস্য রাষ্ট্র রয়েছে।

আইসিসি আইনগতভাবে ও কার্যত জাতিসংঘ হতে স্বাধীন এবং এটি জাতিসংঘ কর্মপদ্ধতির আওতামুক্ত। জাতিসংঘ ও আইসিসির মধ্যকার সম্পর্ক একটি 'মধ্যস্থতা সম্পর্ক চুক্তি'র অধীনে পরিচালিত হয়। নিরাপত্তা পরিষদ আইসিসির আগে সভার কার্যবিবরণী গ্রহণ করতে পারে এবং আদালতের আওতাধীন নয় এমন অবস্থা সম্পর্কে আইসিসিকে অবহিত করতে পারে। এই আদালতের বিচারক সংখ্যা ১৮, যারা রাষ্ট্রীয় পক্ষগুলো কর্তৃক নয় বছরের মেয়াদে নির্বাচিত হন, যদিও বিচারকরা চলমান বিচারকার্য বা আপিল সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত মেয়াদ শেষ হয়ে গেলেও নিজ পদে বহাল থাকতে পারবেন। এই আদালতে একই দেশের দু'জন বিচারক একই সাথে থাকতে পারবেন না।

এখন পর্যন্ত রোম সংবিধির চারটি রাষ্ট্রপক্ষ—উগান্ডা, কঙ্গো প্রজাতন্ত্র, সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক ও মালি তাদের এলাকায় সংঘটিত অগ্রহণযোগ্য পরিস্থিতির সমাধানে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছে। তদুপরি নিরাপত্তা পরিষদ সুদানের দারফুর এবং লিবিয়ায় উত্থিত পরিস্থিতিগুলো আইসিসির কাছে উত্থাপন করেছে; এদের উভয়ই রাষ্ট্র-বহির্ভূত পক্ষ। প্রাপ্ত তথ্য পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের পর আইসিসি প্রসিকিউটর এসব পরিস্থিতিগুলোতে তদন্ত শুরু এবং পরিচালনা করেছেন। ২০১০ ও ২০১১ সালে আদালতের বিচারপূর্ব দ্বিতীয় ও তৃতীয় চেম্বার যথাক্রমে কেনিয়া ও আইভরি কোস্টের ক্ষেত্রে স্ব-উদ্যোগের তদন্ত পরিচালনা করার অনুমোদন দিয়েছে। এখন পর্যন্ত ১৮টি মামলা আদালতের সামনে দায়ের করা হয়েছে।

অন্যান্য আইন সংক্রান্ত বিষয়

আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ও বিশ্ব জনগোষ্ঠী সংক্রান্ত অন্যান্য বিভিন্ন প্রশ্নে সাধারণ পরিষদ আইনগত দলিলের শরণাপন্ন হয়েছে। তার মধ্যে রয়েছে 'ভাড়াটে সৈনিক নিয়োগ, ব্যবহার, অর্থায়ন ও প্রশিক্ষণবিরোধী আন্তর্জাতিক কনভেনশন'-১৯৮৯, 'যে কোনো প্রকার আটক ও কারাদণ্ডের শিকার সকল ব্যক্তির সুরক্ষা সংক্রান্ত নীতিগুলো'-১৯৮৮ এবং 'আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে হুমকি ও বল প্রয়োগ নিবারণমূলক নীতির কার্যকারিতা বর্ধনের ঘোষণা'-১৯৮৭।

১৯৭৪ সালে সাধারণ পরিষদ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'জাতিসংঘ সনদ বিষয়ক ও সংগঠনের ভূমিকা শক্তিশালী করার বিশেষ কমিটি'র সুপারিশে পরিষদ জাতিসংঘের নিজস্ব কাজ সম্পর্কিত একাধিক আন্তর্জাতিক দলিল প্রণয়ন করেছে। এর মধ্যে রয়েছে 'আন্তর্জাতিক বিরোধের শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তি বিষয়ক ঘোষণা'-১৯৮২, 'আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ বিরোধ ও পরিস্থিতির প্রতিরোধ ও অপসারণ এবং উক্ত ক্ষেত্রে জাতিসংঘের ভূমিকা বিষয়ক ঘোষণা'-১৯৮৮, 'আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখার ক্ষেত্রে জাতিসংঘ কর্তৃক প্রকৃত ঘটনা উদ্‌ঘাটন বিষয়ক ঘোষণা'-১৯৯১, 'আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরপত্তা বজায় রাখার ক্ষেত্রে জাতিসংঘ এবং আঞ্চলিক ব্যবস্থাপনা বা এজেন্সির মধ্যকার সহযোগিতা বৃদ্ধির ঘোষণা'-১৯৯৪ এবং 'রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে বিবাদ মীমাংসায় জাতিসংঘ আদর্শ নিয়মাবলি'-১৯৯৫।

জাতিসংঘ সনদের ১০২নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী যে কোনো সদস্য রাষ্ট্র কর্তৃক সম্পাদিত প্রতিটি আন্তর্জাতিক চুক্তি জাতিসংঘ দপ্তরে নিবন্ধিত ও প্রকাশিত হতে হবে। জাতিসংঘের আইন বিষয়ক দপ্তর চুক্তিগুলো নিবন্ধন ও প্রকাশের জন্য দায়বদ্ধ। এখান থেকে জাতিসংঘ চুক্তি সিরিজ প্রকাশিত হয়, যাতে ১৮০,০০০ চুক্তি ও এ সম্পর্কিত পরবর্তী কার্যক্রমের বিস্তারিত অন্তর্ভুক্ত থাকে। এই অফিস বহুপক্ষীয় চুক্তির রক্ষক হিসেবে মহাসচিবের পক্ষে তার ভূমিকাও পালন করে থাকে। এই ভূমিকায় এই অফিস ৫০০টিরও বেশি মুখ্য বহুপাক্ষীয় চুক্তি ইলেক্ট্রনিকরূপে দৈনিক হালনাগাদ করে এবং ইন্টারনেটে জাতিসংঘ চুক্তিগুলোর সহজপ্রাপ্যতা নিশ্চিত করে।

পরিশিষ্ট

নিকট প্রাচ্যের ফিলিস্তিনি রিফিউজি ক্যাম্পে সৃজনশীলতা এবং মনোসামাজিক কল্যাণকে উৎসাহ প্রদানের জন্য জাতিসংঘ ত্রাণ ও কর্ম সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত কর্মসূচিতে একটি মেয়েশিশুকে ছবি আঁকার কাজে ব্যস্ত দেখা যাচ্ছে। (৩ জুলাই ২০১৩, ইউএন ফটো/শরিফ সারহান)

জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রসমূহ

মোট সদস্য : ১৯৩

সদস্য দেশগুলোর নাম	সদস্যপদ লাভ	চাঁদার পরিমাণ ২০১৩ সালের জন্য (%)	নেট অবদান (ইউএস ডলার)
আফগানিস্তান	১৯ নভেম্বর ১৯৪৬	০.০০৫	১২৭,৪১৪
আলবেনিয়া	১৪ ডিসেম্বর, ১৯৫৫	০.০১০	২৫৪,৮২৮
আলজেরিয়া	৮ অক্টোবর, ১৯৬২	০.১৩৭	৩,৪৯১,১৪৬
অ্যানডোরা	২৮ জুলাই, ১৯৯৩	০.০০৮	২০৩,৮৬২
অ্যাঙ্গোলা	১ ডিসেম্বর, ১৯৭৬	০.০১০	২৫৪,৮২৮
এন্টিগুয়া ও বারবুডা	১১ নভেম্বর, ১৯৮১	০.০০২	৫০,৯৬৬
আর্জেন্টিনা	২৪ অক্টোবর, ১৯৪৫	০.৪৩২	১১,০০৮,৫৭৮
আর্মেনিয়া	২ মার্চ, ১৯৯২	০.০০৭	১৭৮,৩৭৯
অস্ট্রেলিয়া	১ নভেম্বর, ১৯৪৫	২.০৭৪	৫২,৮৫১,৩৬৯
অস্ট্রিয়া	৪ ডিসেম্বর, ১৯৫৫	০.৭৯৮	২০,৩৩৫,২৯০
আজারবাইজান	২ মার্চ, ১৯৯২	০.০৪০	১,০১৯,৩১৩
বাহামা	১৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৩	০.০১৭	৪৩৩,২০৮
বাহরাইন	২১ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১	০.০৩৯	৯৯৩,৮৩০
বাংলাদেশ	১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪	০.০১০	২৫৪,৮২৮
বারবাডোস	৯ ডিসেম্বর, ১৯৬৬	০.০০৮	২০৩,৮৬২
বেলারুশ	২৪ অক্টোবর, ১৯৪৫	০.০৫৬	১,৪২৭,০৩৮
বেলজিয়াম	২৭ ডিসেম্বর, ১৯৪৫	০.৯৯৮	২৫,৪৩১,৮৫৪
বেলিজ	২৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৮১	০.০০১	২৫,৪৮৩
বেনিন	২০ সেপ্টেম্বর, ১৯৬০	০.০০৩	৭৬,৪৪৮
ভূটান	২১ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১	০.০০১	২৫,৪৮৩
বলিভিয়া	১৪ নভেম্বর, ১৯৪৫	০.০০৯	২২৯,৩৪৫
বসনিয়া ও হারজেগোভিনা	২২ মে, ১৯৯২	০.০১৭	৪৩৩,২০৮
বতসোওয়ানা	১৭ অক্টোবর, ১৯৬৬	০.০১৭	৪৩৩,২০৮
ব্রাজিল	২৪ অক্টোবর, ১৯৪৫	২.৯৩৪	৭৪,৭৬৬,৫৯৩
ব্রুনাই দারুস সালাম	২১ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৪	০.০২৬	৬৬২,৫৫৩
বুলগেরিয়া	১৪ ডিসেম্বর, ১৯৫৫	০.০৪৭	১,১৯৭,৬৯৩
বুরকিনা ফাসো	২০ সেপ্টেম্বর, ১৯৬০	০.০০৩	৭৬,৪৪৮
বুরুন্ডি	১৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৬২	০.০০১	২৫,৪৮৩
কম্বোডিয়া	১৪ ডিসেম্বর, ১৯৫৫	০.০০৪	১০১,৯৩১
ক্যামেরুন	২০ সেপ্টেম্বর, ১৯৬০	০.০১২	৩০৫,৭৯৪
কানাডা	৯ নভেম্বর, ১৯৪৫	২.৯৮৪	৭৬,০৪০,৭৩৪
কেপ ভার্দে	১৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৫	০.০০১	২৫,৪৮৩
মধ্য আফ্রিকা প্রজাতন্ত্র	২০ সেপ্টেম্বর, ১৯৬০	০.০০১	২৫,৪৮৩
চাদ	২০ সেপ্টেম্বর, ১৯৬০	০.০০২	৫০,৯৬৬
চিলি	২৪ অক্টোবর, ১৯৪৫	০.৩৩৪	৮,৫১১,২৬২

সদস্য দেশগুলোর নাম	সদস্যপদ লাভ	চাঁদার পরিমাণ ২০১৩ সালের জন্য (%)	নেট অবদান (ইউএস ডলার)
চীন	২৪ অক্টোবর, ১৯৪৫	৫.১৪৮	১৩১,১৮৫,৫৫৮
কলম্বিয়া	৫ নভেম্বর, ১৯৪৫	০.২৫৯	৬,৬০০,০৫০
কমোরস	১২ নভেম্বর, ১৯৭৫	০.০০১	২৫,৪৮৩
কঙ্গো	২০ সেপ্টেম্বর, ১৯৬০	০.০০৫	১২৭,৪১৪
কোস্টারিকা	২ নভেম্বর, ১৯৪৫	০.০৩৮	৯৬৮,৩৪৮
আইভরি কোস্ট	২০ সেপ্টেম্বর, ১৯৬০	০.০১১	২৮০,৩১১
ক্রোয়েশিয়া	২২ মে, ১৯৯২	০.১২৬	৩,২১০,৮৩৫
কিউবা	২৪ অক্টোবর, ১৯৪৫	০.০৬৯	১,৭৫৮,৩১৫
সাইপ্রাস	২০ সেপ্টেম্বর, ১৯৬০	০.০৪৭	১,১৯৭,৬৯৩
চেক প্রজাতন্ত্র	১৯ জানুয়ারি, ১৯৯৩	০.৩৮৬	৯,৮৩৬,৩৬৮
জনগণতান্ত্রিক কোরিয়া	১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৯১	০.০০৬	১৫২,৮৯৭
কঙ্গো গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র	২০ সেপ্টেম্বর, ১৯৬০	০.০০৩	৭৬,৪৪৮
ডেনমার্ক	২৪ অক্টোবর, ১৯৪৫	০.৬৭৫	১৭,২০০,৯০৩
জিবুতি	২০ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৭	০.০০১	২৫,৪৮৩
ডমিনিকা	১৮ ডিসেম্বর, ১৯৭৮	০.০০১	২৫,৪৮৩
ডমিনিকা প্রজাতন্ত্র	২৪ অক্টোবর, ১৯৪৫	০.০৪৫	১,১৪৬,৭২৭
ইকুয়েডর	২১ ডিসেম্বর, ১৯৪৫	০.০৪৪	১,১২১,২৪৪
মিশর	২৪ অক্টোবর, ১৯৪৫	০.১৩৪	৩,৪১৪,৬৯৮
এল সালভেদর	২৪ অক্টোবর, ১৯৪৫	০.০১৬	৪০৭,৭২৫
বিষুবীয় গিনি	১২ নভেম্বর, ১৯৬৮	০.০১০	২৫৪,৮২৮
ইরিত্রিয়া	২৮ মে, ১৯৯৩	০.০০১	২৫,৪৮৩
এস্তোনিয়া	১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৯১	০.০৪০	১,০১৯,৩১৩
ইথিওপিয়া	১৩ নভেম্বর, ১৯৪৫	০.০১০	২৫৪,৮২৮
ফিজি	১৩ অক্টোবর, ১৯৭০	০.০০৩	৭৬,৪৪৮
ফিনল্যান্ড	১৪ ডিসেম্বর, ১৯৫৫	০.৫১৯	১৩,২২৫,৫৮৩
ফ্রান্স	২৪ অক্টোবর, ১৯৪৫	৫.৫৯৩	১৪২,৫২৫,৪১২
গ্যাবন	২০ সেপ্টেম্বর, ১৯৬০	০.০২০	৫০৯,৬৫৭
গাম্বিয়া	২১ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫	০.০০১	২৫,৪৮৩
জর্জিয়া	৩১ জুলাই, ১৯৯২	০.০০৭	১৭৮,৩৭৯
জার্মানি	১৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৩	৭.১৪১	১৮১,৯৭২,৮১৮
ঘানা	৮ মার্চ, ১৯৫৭	০.০১৪	৩৫৬,৭৬০
গ্রীস	২৫ অক্টোবর, ১৯৪৫	০.৬৩৮	১৬,২৫৮,০৩৯
গ্রানাডা	১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪	০.০০১	২৫,৪৮৩
গুয়েতেমালা	২১ নভেম্বর, ১৯৪৫	০.০২৭	৬৮৮,০৩৬
গিনি	১২ ডিসেম্বর, ১৯৫৮	০.০০১	২৫,৪৮৩
গিনি বিসাউ	১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪	০.০০১	২৫,৪৮৩
গায়ানা	২০ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৬	০.০০১	২৫,৪৮৩
হাইতি	২৪ অক্টোবর, ১৯৪৫	০.০০৩	৭৬,৪৪৮
হন্ডুরাস	১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৫	০.০০৮	২০৩,৮৬২

সদস্য দেশগুলোর নাম	সদস্যপদ লাভ	চাঁদার পরিমাণ ২০১৩ সালের জন্য (%)	নেট অবদান (ইউএস ডলার)
হাঙ্গেরি	১৪ ডিসেম্বর, ১৯৫৫	০.২৬৬	৬,৭৭৮,৪৩০
আইসল্যান্ড	১৯ নভেম্বর, ১৯৪৬	০.০২৭	৬৮৮,০৩৬
ভারত	৩০ অক্টোবর, ১৯৪৫	০.৬৬৬	১৬,৯৭১,৫৫৮
ইন্দোনেশিয়া	২৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৫০	০.৩৪৬	৮,৮১৭,০৫৬
ইরান (ইসলামি প্রজাতন্ত্র)	২৪ অক্টোবর, ১৯৪৫	০.৩৫৬	৯,০৭১,৮৮৪
ইরাক	২১ ডিসেম্বর, ১৯৪৫	০.০৬৮	১,৭৩২,৮৩২
আয়ারল্যান্ড	১৪ ডিসেম্বর, ১৯৫৫	০.৪১৮	১০,৬৫১,৮১৮
ইসরাইল	১১ মে, ১৯৪৯	০.৩৯৬	১০,০৯১,১৯৭
ইতালি	১৪ ডিসেম্বর, ১৯৫৫	৪.৪৪৮	১১৩,৩৪৭,৫৮৪
জ্যামাইকা	১৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৬২	০.০১১	২৮০,৩১১
জাপান	১৮ ডিসেম্বর, ১৯৫৬	১০.৮৩৩	২৭৬,০৫৫,৩৮৯
জর্ডান	১৪ ডিসেম্বর, ১৯৫৫	০.০২২	৫৬০,৬২২
কাজাকিস্তান	২ মার্চ, ১৯৯২	০.১২১	৩,০৮৩,৪২১
কেনিয়া	১৬ ডিসেম্বর, ১৯৬৩	০.০১৩	৩৩১,২৭৭
কিরিবাতি	১৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৯	০.০০১	২৫,৪৮৩
কুয়েত	১৪ মে, ১৯৬৩	০.২৭৩	৬,৯৫৬,৮১০
কিরগিজস্তান	২ মার্চ, ১৯৯২	০.০০২	৫০,৯৬৬
লাও গণপ্রজাতন্ত্র	১৪ ডিসেম্বর, ১৯৫৫	০.০০২	৫০,৯৬৬
লাটভিয়া	১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৯১	০.০৪৭	১,১৯৭,৬৯৩
লেবানন	২৪ অক্টোবর, ১৯৪৫	০.০৪২	১,০৭০,২৭৯
লেসোথো	১৭ অক্টোবর, ১৯৬৬	০.০০১	২৫,৪৮৩
লাইবেরিয়া	২ নভেম্বর, ১৯৪৫	০.০০১	২৫,৪৮৩
লিবিয়া আরব প্রজাতন্ত্র	১৪ ডিসেম্বর, ১৯৫৫	০.১৪২	৩,৬১৮,৫৬১
লিচটেনস্টাইন	১৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৯০	০.০০৯	২২৯,৩৪৫
লিথুনিয়া	১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৯১	০.০৭৩	১,৮৬০,২৪৬
লুক্সেমবার্গ	২৪ অক্টোবর, ১৯৪৫	০.০৮১	২,০৬৪,১০৮
মাদাগাস্কার্	২০ সেপ্টেম্বর, ১৯৬০	০.০০৩	৭৬,৪৪৮
মালাবী	১ ডিসেম্বর, ১৯৬৪	০.০০২	৫০,৯৬৬
মালয়েশিয়া	১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৭	০.২৮১	৭,১৬০,৬৭২
মালদ্বীপ	২১ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫	০.০০১	২৫,৪৮৩
মালি	২৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৬০	০.০০৪	১০১,৯৩১
মালটা	১ ডিসেম্বর, ১৯৬৪	০.০১৬	৪০৭,৭২৫
মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ	১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৯১	০.০০১	২৫,৪৮৩
মৌরিতানিয়া	২৭ অক্টোবর, ১৯৬১	০.০০২	৫০,৯৬৬
মরিশাস	২৪ এপ্রিল, ১৯৬৮	০.০১৩	৩৩১,২৭৭
মেক্সিকো	৭ নভেম্বর, ১৯৪৫	১.৮৪২	৪৬,৯৩৯,৩৫৫
মাইক্রোনেসিয়া	১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৯১	০.০০১	২৫,৪৮৩
মোনাকো	২৮ মে, ১৯৯৩	০.০১২	৩০৫,৭৯৪
মঙ্গোলিয়া	২৭ অক্টোবর, ১৯৬১	০.০০৩	৭৬,৪৪৮

সদস্য দেশগুলোর নাম	সদস্যপদ লাভ	চাঁদার পরিমাণ ২০১৩ সালের জন্য (%)	নেট অবদান (ইউএস ডলার)
মন্টিনেগ্রো	২৮ জুন, ২০০৬	০.০০৫	১২৭,৪১৪
মরোক্কো	১২ নভেম্বর, ১৯৫৬	০.০৬২	১,৫৭৯,৯৩৪
মোজাম্বিক	১৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৫	০.০০৩	৭৬,৪৪৮
মায়ানমার	১৯ এপ্রিল, ১৯৪৮	০.০১০	২৫৪,৮২৮
নামিবিয়া	২৩ এপ্রিল, ১৯৯০	০.০১০	২৫৪,৮২৮
নাওরু	১৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৯	০.০০১	২৫,৪৮৩
নেপাল	১৪ ডিসেম্বর, ১৯৫৫	০.০০৬	১,৫২,৮৯৭
নেদারল্যান্ড	১০ ডিসেম্বর, ১৯৪৫	১.৬৫৪	৪২,১৪৮,৫৮৫
নিউজিল্যান্ড	২৪ অক্টোবর, ১৯৪৫	০.২৫৩	৬,৪৪৭,১৫৪
নিকারাগুয়া	২৪ অক্টোবর, ১৯৪৫	০.০০৩	৭৬,৪৪৮
নাইজার	২০ সেপ্টেম্বর, ১৯৬০	০.০০২	৫০,৯৬৬
নাইজেরিয়া	৭ অক্টোবর, ১৯৬০	০.০৯০	২,২৯৩,৪৫৪
নরওয়ে	২৭ নভেম্বর, ১৯৪৫	০.৮৫১	২১,৬৮৫,৮৮০
ওমান	৭ অক্টোবর, ১৯৭১	০.১০২	২,৫৯৯,২৪৮
পাকিস্তান	৩০ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭	০.০৮৫	২,১৬৬,০৩৯
পালাউ	১৫ ডিসেম্বর, ১৯৯৪	০.০০১	২৫,৪৮৩
পানামা	১৩ নভেম্বর, ১৯৪৫	০.০২৬	৬৬২,৫৫৩
পাপুয়া নিউগিনি	১০ অক্টোবর, ১৯৭৫	০.০০৪	১০১,৯৩১
প্যারাগুয়ে	২৪ অক্টোবর, ১৯৪৫	০.০১০	২৫৪,৮২৮
পেরু	৩১ অক্টোবর, ১৯৪৫	০.১১৭	২,৯৮১,৪৯০
ফিলিপাইন	২৪ অক্টোবর, ১৯৪৫	০.১৫৪	৩,৯২৪,৩৫৪
পোল্যান্ড	২৪ অক্টোবর, ১৯৪৫	০.৯২১	২৩,৪৬৯,৬৭৭
পর্তুগাল	১৪ ডিসেম্বর, ১৯৫৫	০.৪৭৪	১২,০৭৮,৮৫৭
কাতার	২১ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১	০.২০৯	৫,৩২৫,৯০৯
কোরিয়া প্রজাতন্ত্র	১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৯১	১.৯৯৪	৫০,৮১২,৭৪৩
মলদোভা প্রজাতন্ত্র	২ মার্চ, ১৯৯২	০.০০৩	৭৬,৪৪৮
রুমানিয়া	১৪ ডিসেম্বর, ১৯৫৫	০.২২৬	৫,৭৫৯,১১৭
রুশ ফেডারেশন	২৪ অক্টোবর, ১৯৪৫	২.৪৩৮	৬২,১২৭,১১৫
রুয়ান্ডা	১৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৬২	০.০০২	৫০,৯৬৬
সেন্ট কিটস ও নেভিস	২৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৩	০.০০১	২৫,৪৮৩
সেন্ট লুসিয়া	১৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৯	০.০০১	২৫,৪৮৩
সেন্ট ভিনসেন্ট ও গ্রেনাডাইন	১৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৮০	০.০০১	২৫,৪৮৩
সামোয়া	১৫ ডিসেম্বর, ১৯৭৬	০.০০১	২৫,৪৯৩
সান মারিনো	২ মার্চ, ১৯৯২	০.০০৩	৭৬,৪৪৮
সাও তোমে ও প্রিন্সিপ	১৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৫	০.০০১	২৫,৪৮৩
সৌদি আরব	২৪ অক্টোবর, ১৯৪৫	০.৮৬৪	২২,০১৭,১৫৭
সেনেগাল	২৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৬০	০.০০৬	১৫২,৮৯৭
সার্বিয়া	১ নভেম্বর, ২০০০	০.০৪০	১,০১৯,৩১৩
সিসিলি	২১ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৬	০.০০১	২৫,৪৮৩
সিয়েরা লিওন	২৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৬১	০.০০১	২৫,৪৮৩

সদস্য দেশগুলোর নাম	সদস্যপদ লাভ	চাঁদার পরিমাণ ২০১৩ সালের জন্য (%)	নেট অবদান (ইউএস ডলার)
সিঙ্গাপুর	২১ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫	০.৩৮৪	৯,৭৮৫,৪০৩
স্লোভাকিয়া	১৯ জানুয়ারি, ১৯৯৩	০.১৭১	৪,৩৫৭,৫৬২
স্লোভেনিয়া	২২ মে, ১৯৯২	০.১০০	২,৫৪৮,২৮২
সলোমন দ্বীপপুঞ্জ	১৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৮	০.০০১	২৫,৪৮৩
সোমালিয়া	২০ সেপ্টেম্বর, ১৯৬০	০.০০১	২৫,৪৮৩
দক্ষিণ আফ্রিকা	৭ নভেম্বর, ১৯৪৫	০.৩৭২	৯,৪৭৯,৬০৯
দক্ষিণ সুদান	১৪ জুলাই, ২০১১	০.০০৪	১০১,৯৩১
স্পেন	১৪ ডিসেম্বর, ১৯৫৫	২.৯৭৩	৭৫,৭৬০,৪২৪
শ্রীলংকা	১৪ ডিসেম্বর, ১৯৫৫	০.০২৫	৬৩৭,০৭০
সুদান	১২ নভেম্বর, ১৯৫৬	০.০১০	২৫৪,৮২৮
সুরিনাম	৪ ডিসেম্বর, ১৯৭৫	০.০০৪	১০১,৯৩১
সোয়াজিল্যান্ড	২৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৮	০.০০৩	৭৬,৪৪৮
সুইডেন	১৯ নভেম্বর, ১৯৪৬	০.৯৬০	২৪,৪৬৩,৫০৮
সুইজারল্যান্ড	১০ সেপ্টেম্বর, ২০০২	১.০৪৭	২৬,৬৮০,৫১৩
সিরিয়া আরব প্রজাতন্ত্র	২৪ অক্টোবর, ১৯৪৫	০.০৩৬	৯,১৭,৩৮১
তাজাকিস্তান	২ মার্চ, ১৯৯২	০.০০৩	৭৬,৪৪৮
থাইল্যান্ড	১৬ ডিসেম্বর, ১৯৪৬	০.২৩৯	৬,০৯০,৩৯৪
মেসেডোনিয়া প্রজাতন্ত্র	৮ এপ্রিল, ১৯৯৩	০.০০৮	২,০৩,৮৬২
তিমুর-লেস্তে	২৭ সেপ্টেম্বর, ২০০২	০.০০২	৫০,৯৬৬
টোগো	২০ সেপ্টেম্বর, ১৯৬০	০.০০১	২৫,৪৮৩
টোঙ্গা	১৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৯	০.০০১	২৫,৪৮৩
ত্রিনিদাদ ও টোবাগো	১৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৬২	০.০৪৪	১,১২১,২৪৪
তিউনিসিয়া	১২ নভেম্বর, ১৯৫৬	০.০৩৬	৯১৭,৩৮১
তুরস্ক	২৪ অক্টোবর, ১৯৪৫	১.৩২৮	৩৩,৮৪১,১৮৫
তুর্কমেনিস্তান	২ মার্চ, ১৯৯২	০.০১৯	৪৮৪,১৭৪
টুভালু	৫ সেপ্টেম্বর, ২০০০	০.০০১	২৫,৪৮৩
উগান্ডা	২৫ অক্টোবর, ১৯৬২	০.০০৬	১৫২,৮৯৭
ইউক্রেইন	২৪ অক্টোবর, ১৯৪৫	০.০৯৯	২,৫২২,৭৯৯
সংযুক্ত আরব আমিরাত	৯ ডিসেম্বর, ১৯৭১	০.৫৯৫	১৫,১৬২,২৭৮
যুক্তরাজ্য	২৪ অক্টোবর, ১৯৪৫	৫.১৭৯	১৩১,৯৭৫,৫২৫
তানজিনিয়া সংযুক্ত প্রজাতন্ত্র	১৪ ডিসেম্বর, ১৯৬১	০.০০৯	২২৯,৩৪৫
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	২৪ অক্টোবর, ১৯৪৫	২২.০০০	৬১৮,৪৮১,১৮২
উরুগুয়ে	১৮ ডিসেম্বর, ১৯৪৫	০.০৫২	১,৩২৫,১০৭
উজবেকিস্তান	২ মার্চ, ১৯৯২	০.০১৫	৩৮২,২৪৩
ভানুয়াতু	১৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৮১	০.০০১	২৫,৪৮৩
ভেনিজুয়েলা	১৫ নভেম্বর, ১৯৪৫	০.৬২৭	১৫,৯৭৭,৭২৯
ভিয়েতনাম	২০ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৭	০.০৪২	১,০৭০,২৭৯
ইয়েমেন	৩০ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭	০.০১০	২৫৪,৮২৮
জাম্বিয়া	১ ডিসেম্বর, ১৯৬৪	০.০০৬	১৫২,৮৯৭
জিম্বাবুয়ে	২৫ আগস্ট, ১৯৮০	০.০০২	৫০,৯৬৬

আজকের জাতিসংঘ

১৯৪৭ সাল থেকে নিয়মিতভাবে 'আজকের জাতিসংঘ' নামক প্রকাশনাটি বিশ্বের শীর্ষ নেতৃত্ব কর্মসূচি আন্তর্জাতিক সংগঠন ও সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের কার্যক্রমেরবিশ্বস্ত গাইড হিসেবে পরিগণিত হয়ে আসছে। ছাত্র-ছাত্রী, গবেষক ও আগ্রহী পাঠকদের জন্য প্রয়োজনীয় এই পুস্তকে বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিকাশ, মানবাধিকার, বিশ্বজনীন কার্যক্রম ও আন্তর্জাতিক আইন জোরদারকরণে জাতিসংঘের প্রয়াসের সার্বিক বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে। 'আজকের জাতিসংঘ' বইটিতে সদস্যপদ ও গঠনকাঠামো এবং চলমান শান্তিরক্ষা কার্যক্রম ঐতিহাসিক পটভূমিকায় মেলে ধরেছে। গ্রন্থের এই সংস্করণে বিশ্বে ও জাতিসংঘে সাম্প্রতিক যেসব তাৎপর্যপূর্ণ বিকাশ ঘটেছে তা বিবেচনায় নেয়া হয়েছে। চিত্রিত হয়েছে জাতিসংঘের বিশ্বজনীন তৎপরতার স্থানীয় প্রভাব।

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা, বাংলাদেশ

DPI/2586

ISBN 978-92-1-101279-8